পুলিশ সাহেব

নটরাজন

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :
অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

PULISH SAHEB

A BENGALI NOVEL

BY

NATARAJAN

নিবেদন

সত্য কঠিন। সেই কঠিনকে প্রকাশ করা কেবল কষ্টসাধ্যই নয় বিপজ্জনকও বটে। এই উপন্যাসে সেই বিপজ্জনক কাজ করতেই এগিয়েছি আন্তরিকভাবে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে। কিন্তু তাতেই যে এদেশের পুলিশের মানসিকতার গোটা চিত্র পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছি তা' কিন্তু মনে করি না। এর বাইরে আরও অনেক কিছু হয়তো আছে যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। সত্য যতই কেন না নির্মম হোক তাকে প্রকাশ করাই মানুষের পক্ষে মঙ্গল— বিজ্ঞজনের এহেন উক্তি মনে রেখেই আমার এই প্রচেষ্টা। দেশের পুলিশ বিভাগ কিম্বা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কাজ-কর্ম সম্পর্কে কোনরকম কটাক্ষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে একাজে হাত দিইনি।

অনেককাল আগে রেডিওতে ছোটদের আসরে একটি ছোট মেয়ের আবৃত্তি শুনেছিলাম। কবিতাটি ছিল কোন্ প্রাণী কি খায় তা' নিয়ে। কবিতাটির দু'টো লাইন আজও আমার মনে আছে—

মরা খায় ইলিশে,
ঘুস খায় পুলিশে।

একটি ছোট মেয়েকে দিয়ে রেডিওতে এধরনের কবিতার আবৃত্তি করানো শোভন কিম্বা সমীচীন কিনা সে প্রশ্নে যদি না যাই তা'হলে বলতে হয় পূবদিকে সূর্য ওঠা যেমন সত্যি, আমাদের সমাজে পুলিশের ঘুসও প্রায় তাই, যদিও আজকের দিনে সরকারী-বেসরকারী কোন্ সংস্থা যে এই দোষে দুষ্ট নয় সেটাই গবেষণার বিষয়।

পুলিশ ঘুসখোর, পুলিশ অকর্মণ্য, অপদার্থ, পুলিশ অত্যাচারী ইত্যাদি নানা বিশেষণে পুলিশ আজ ভূষিত এবং এই বিশেষণের বোঝা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। পুলিশের এজাতীয় কু-কীর্তি প্রমাণ করাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয় যেহেতু এর ভূরি ভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। এযুগে সত্যকে প্রমাণ করাই যথেষ্ট, সত্যকে আবিষ্কার করার ইচ্ছে নেই কারুর। পুলিশের কু-কীর্তি নামক সত্যকে কেবলমাত্র প্রমাণ করার চেষ্টা না করে কেউ যদি আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হন তা'হলে তাঁকে অবশ্যই চম্‌কে উঠতে হবে। কেন পুলিশ ঘুসখোর, কেন পুলিশ আজ অকর্মণ্য, অপদার্থ, অত্যাচারী—এই প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে তিনি যে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবেন তা' যেমনই

নগ্ন ও ভয়ঙ্কর, তেমনই বেদনাদায়ক। অসামাজিক সমাজ ব্যবস্থা ও নীতিহীন রাজনীতির কারবারী একদল মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের আগুনে পুড়ে আজ এদেশের সবকিছুই ছাই হতে বসেছে। এ থেকে আজ কারুরই পরিত্রাণ নেই, এমনকি পুলিশেরও নয়।

এই উপন্যাসটি পড়ে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একজনের মনেও যদি সামান্যতম আলোড়নের সৃষ্টি হয় তা'হলেই নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

পরিশেষে, বইখানির প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের প্রত্যেককেই জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

—নটরাজন

"There is no doubt reference to police zulum. It is a constant factor that is brought in everywhere because it is expected that everybody will immediately accept any charge of misbehaviour of the police. The poor police is so used-to-being kicked and cuffed like that and always condemned. It is easy to make a charge against the police....It is becoming intolerable always for this poor policeman to be condemned for trying to do his duty in the most difficult circumstances. Let us punish the policeman when he is guilty or anybody else when he is guilty. But the stone-thrower becomes a hero and is taken out in a procession —may be—and the poor policeman who gets the stone on his head is a person who is guilty of zulum and atrocities."

Jawaharlal Nehru
(Loke Sabha debate, 1956)

—জর্জ বার্ণার্ড শ এই দিলওয়াড়া মন্দির দেখতে এসেছিলেন নাকি ?

জবাব দেয় রুদ্রদেব, না-না, দেখতে পাননি বলেই তো খেদ করেছিলেন। বার্ণার্ড শ যদিও কখনও ভারতের মাটিতে পা দেননি, কিন্তু তিনি একবার জাহাজে বম্বে পর্যন্ত এসেছিলেন অন্য কোথাও যাওয়ার পথে। বম্বে পোর্টে কয়েকজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী জাহাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ভারতের মঠ-মন্দিরের স্থাপত্য শিল্পের ছবি সহ একখানা এ্যালবাম তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এই দিলওয়াড়ার ছবি দেখে তিনি নাকি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন —জীবনে যে ক'টা ভুল করেছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে এত কাছে এসেও এই দিলওয়াড়া মন্দির দেখতে না পাওয়া। ভবিষ্যতে প্রাচ্য দেশ ভ্রমণের সুযোগ এলে প্রথমেই আমি আসবো দিলওয়াড়া দেখতে।

রুদ্রদেবের কথায় যেন একটু আশার সঞ্চার হয় যুবকদের মধ্যে। মন্দিরের ভেতরে যাবার জন্যে তারা পা বাড়াতেই পুলিশ ভ্যানের সেই উর্দিপরা লোকটি এগিয়ে এসে আগের মতই সসম্ভ্রমে হিন্দীতে বললে, একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন স্যার, আমার ওপর হুকুম লাঞ্চের আগেই আপনাদেরকে নিয়ে আমাকে ফিরতে হবে।

উর্দিপরা লোকটির বলার কৌশল বাস্তবিক অপূর্ব। অতি বিনীত ভঙ্গিতে অথচ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই দলটির ওপর খবরদারি করছে সে। স্পষ্ট ভাষায় সে জানিয়ে দিলে যে লাঞ্চের আগে মন্দির দেখার কাজ তাদের শেষ করতে হবে। এর অন্যথা করা চলবে না।

লোকটির কথায় যুবকের দল কোন মন্তব্য না করে এগিয়ে যায় মন্দিরের প্রবেশ পথের দিকে। মনের বিরক্তি মুখে প্রকাশ করার উপায় নেই। এই দু'মাসের ট্রেনিং জীবনেই তারা বুঝতে পেরেছে যে ঐ লোকটি একজন নীচু র‍্যাঙ্কের পুলিশ কর্মচারী হলেও ওর কথামতই তাদের চলতে হবে। আবার ভবিষ্যতে হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন ঐ কর্মচারীটিকেই চলতে হবে তাদের কথামত।

দশ-বারো জন যুবকের ঐ দলটি কোন ট্যুরিস্ট দলের সদস্য নয়। মাউন্ট আবুর সেণ্ট্রাল পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী তারা। কনস্টেবল কিম্বা সাব-ইন্সপেক্টরের ট্রেনিং হয় না এখানে। গোটা ভারতবর্ষ থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে মেধাবী, বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবকদের এখানে এনে দেওয়া হয় পুলিশী ট্রেনিং। ট্রেনিং শেষে এরাই ছড়িয়ে পড়ে ভারতের প্রতিটি রাজ্যে।

কাঁধে তাদের আঁটা থাকে চক্‌চকে ব্যাজ—'আই-পি-এস' অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস। সর্বভারতীয় সার্ভিসের মানুষ এরা। এদের ওপরই দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ আইন-শৃংখলার দায়িত্ব ন্যস্ত। এরাই পরিচালনা করে দেশের বিরাট পুলিশ বাহিনীকে। পুলিশী প্রশাসনের ভালো-মন্দ, দোষ-ত্রুটি প্রধানতঃ এদের কর্মদক্ষতার ওপরই নির্ভরশীল। এরাই গোটা ভারতবর্ষের পুলিশ বাহিনীর সেনাপতি। কাজেই গুরুদায়িত্ব রয়েছে এদের কাঁধে। সেনাপতির সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে দক্ষ সৈন্যবাহিনীও যেমন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তেমনি তার পরিচালনার গুণে একদল সাধারণ সৈনিকও যে অসাধ্য সাধন করতে পারে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতা খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে।

ইদানীং অবশ্য মাউণ্ট আবুর ঐ সেণ্ট্রাল পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আর মাউণ্ট আবুতে নেই। ওটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হায়দ্রাবাদে। নতুন নামকরণ হয়েছে—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমি।

সেকালের পুলিশ প্রশাসনের সেনাপতি ছিলেন আই-পি অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান পুলিশের লেবেল আঁটা অফিসারেরা। নামে ইণ্ডিয়ান পুলিশ হলেও তাঁরা নিজেদের 'ইং রিয়াল পুলিশ' বলে মনে করতেন। ব্রিটিশের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। কিন্তু একালের সেনাপতি আই-পি-এস অফিসারেরা রক্ষা করছেন কাদের স্বার্থ? কত সুষ্ঠুভাবে তাঁরা পালন করছেন তাঁদের সেনাপতির দায়িত্ব? দেশের সাধারণ মানুষ তো বটেই, একজন সাধারণ সৈনিকও সেনাপতির কাছ থেকে সেনাপতির আচরণই প্রত্যাশা করে, সৈনিকের আচরণ নয়। তাদের সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে ভবিষ্যতের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আজও পুলিশের এই সেনাপতিদের সম্পর্কে শোনা যায় জনগণের খেদোক্তি—ইফ গোল্ড রাস্ট, হোয়াট শ্যাল আয়রণ ডু—সোনায় যদি মরচে পড়ে তা'হলে লোহার অবস্থা কী দাঁড়াবে?

সোনাই বটে। খাঁটি সোনা। দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবশক্তি সোনা ছাড়া আর কি? শিক্ষালাভ করলেই যেমন মানুষ হওয়া যায় না, তেমনি পুলিশী ট্রেনিং নিলেই খাঁটি 'পুলিশ' হয়ে সমাজের উপকারে লাগা যায় না। সোনা-লোহা নির্বিশেষে দেশের পুলিশ বাহিনীতে আজ মরচের দাগ সর্বত্র। ঐ মরচের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় যেখানে লোহাকে স্টেনলেস স্টিলে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে লোহা তো কোন্ ছার, আজ সোনায় পর্যন্ত মরচের ছড়াছড়ি।

ছুটির দিন। পুলিশ ইন্‌স্টিটিউটের কম্যাণ্ডাণ্টের অনুমতি নিয়ে আই-পি-এস শিক্ষার্থীর দলটি এসেছে দিলওয়াড়া জৈন মন্দির দেখতে। মন্দিরের দোড়-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পাথরের ভৈরবমূর্তি। হাতে তার ছিন্নমস্তক। পাশে একটি কুকুর। মহাভারতে উল্লিখিত পৌরাণিক 'অর্বুদাচল' থেকেই 'আবু' নামের উৎপত্তি। সেই মাউণ্ট আবুর গর্বের বস্তু এই দিলওয়াড়া।

বিমলবসহী মন্দির নামে খ্যাত প্রথম মন্দিরটির মধ্যে রয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তি। পদ্মাসনে বসে আছেন তিনি। শান্ত সমাহিত মুখ। মন্দিরের ভেতরে গম্বুজগুলোর গায়ে বিদ্যাধরীদেব অসংখ্য মূর্তি। তীর্থঙ্করদেব মূর্তিও রয়েছে তাদের মধ্যে। কী অপূর্ব শ্বেত পাথরের অতি সূক্ষ্ম কাজ! কী চমৎকার পাথরের অলংকরণ! লুনাবসহী মন্দির নামে খ্যাত দ্বিতীয় মন্দিরটির মধ্যে রয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্তি। এর ছাদের ও খিলানের পাথরের কাজ এমন অপূর্ব যে চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। পাথরের ওপর পদ্মের পাপড়ি, লতাপাতা ও মানুষের মূর্তিগুলোর কাজ এতই সূক্ষ্ম ও এতই মসৃণ যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবতে হয় মানুষের হাতে এমন সৃষ্টি কেমন করে সম্ভব।

মন্দিরের স্থাপত্য শিল্পের অভিনবত্ব বিস্মিত করে তুলেছিল যুবকের দলটিকে। তাদের মুখের ওপর থেকে মুছে গিয়েছিল হতাশার চিহ্ন। এ যেন কল্পলোকের কোন এক সৌধ যার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা' নয়। দিলওয়াড়া বাস্তব—সম্পূর্ণ বাস্তব। মানুষের শিল্প সাধনার উৎকর্ষতার এক বাস্তব নিদর্শন এই দিলওয়াড়া। তাই তো দেশ-বিদেশের রসগ্রাহীরা রসের সন্ধানে ছুটে আসে এখানে। ক্যামেরার ফিল্মের ক্ষমতা তো সামান্য, তার চাইতে লক্ষ কোটিগুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন মনের মণিকোঠায় দিলওয়াড়ার ছবি এঁকে নিয়ে তারা পাড়ি দেয় নিজেদের দেশে।

রুদ্রদেবের রুম-মেট্ পাঞ্জাবের অধিবাসী দলবীর সিং একসময় রুদ্রর ম মকে দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, কি হলো ভট্‌চায? একেবারে চুপ করে গেলে ? এই কথা বলছো না কেন?

স্বপ্নোত্থিত চোখ দুটি দলবীরের দিকে মেলে ধরে রুদ্র বললে, কী ব তুমি? ভাই? চোখের সামনে যা দেখেছি তা কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। যত দে তত্তই অভিভূত হয়ে পড়ছি। তাই কথা বলার কথাটাই মনে ছিল পরে এতক্ষণ।

রুদ্রর কথার ধরনে দলবীর হেসে উঠতেই লম্বা-চওড়া মধ্যপ্রদেশের যুবক মায়ারাম একটু ঠাট্টার সুরে দলবীরকে বললে, স্টপ্ দলবীর। ডোণ্ট ডিসটার্ব। দেখছো না ওর চোখ-মুখের অবস্থা? মন্দিরের বিউটি দেখতে দেখতে বোধহয় ওর অন্য কোন বিউটির কথা মনে পড়ে গেছে। তাই আমরা যেখানে কথার ফুলঝুড়ি ছড়াচ্ছি, ভট্চাষ সেখানে ভাম্ব্ —বোবা।

রুদ্র কোন জবাব না দিয়ে কেবল মৃদু হেসে ঠাট্টাটুকু উপভোগ করে। মায়ারাম আবার বললে, সত্যি ভট্চাষ, তোমরা বাঙ্গালীরা বড়ই সেন্টিমেণ্টাল, বড়ই ভাবুক প্রকৃতির।

রুদ্র কিছু বলবার আগেই দলবীর মায়ারামকে বললে, রাইট্—ঠিক বলেছ। আজ দু'মাসের ওপর হয়ে গেল ভট্চাষের সঙ্গে একঘরে পাশাপাশি আছি। ও নিজে তো ভাবুক প্রকৃতির বটেই, আমাকেও প্রায় তাই করে তুলেছে।

—জাস্ট্ রাইট, বলে ওঠে মায়ারাম, তাই বুঝি প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে এত ভুল করো তুমি, কেমন? বি কেয়ারফুল, দলবীর! শিগগির ঘর পাল্টাও!

মায়ারামের কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। সহসা দলবীর নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দলটিকে সতর্ক করে দেয়, বি কুইক, লাঞ্চের টাইমের আর বেশি দেরি নেই।

—হ্যাং ইওর লাঞ্চ টাইম, বিরক্তির সুরে বলে ওঠে মহারাষ্ট্রের গঙ্গাধর দোশী, মাপা সময় নিয়ে কি এসব জায়গায় আসা উচিত? বলতে বলতে একটি সুন্দরী যুবতীর দিকে চোখ পড়তেই দোশী তার পাশে দাঁড়ানো আসামের কমল চালিহাকে কনুয়ের ঠেলা দিয়ে আবার বললে, হাউ বিউটিফুল!

কমল তখনও সেই সুন্দরী যুবতীটিকে দেখতে পায়নি। সে ভাবলো, দোশী বোধহয় মন্দিরের দেয়ালে শ্বেতপাথরের খোদাই করা নারীমূর্তি সম্পর্কেই কথাটা বলেছে। তাই সে সেদিকেই তাকিয়ে মাথা নেড়ে জবাব দেয়, ইয়েস, ষ' ত্যিই সুন্দর।

—ইউ ফুল! এদিকে নয়, ওদিকে। পাথরের মূর্তি নয়, সত্যিকারের ছাড় মূর্তি।

ট্রেনি ালিহা এবার ঘাড় ফিরিয়ে সেই দিকে তাকাতেই কৃত্রিম গম্ভীরমুখে লোহ রাম সাবধান করে তাকে, নো—নো, চালিহা। ওদিকে অমন প্যাট মরো ট করে তাকাতে নেই। ভুলে যেও না তুমি একজন আই-পি-এস অফিসার।

রু কমল চালিহা হেসে জবাব দেয়, সুন্দরকে সুন্দর বলতে আই-পি-এস'দের বারণ আছে নাকি?

দোশীও কমলকে সমর্থন করে, থ্যাংস রাহুল।

এতক্ষণে রুদ্র মুখ খোলে। মৃদু কণ্ঠে মায়ারামকে বললে, চালিহা বোধহয় রূপের মধ্যে অরূপকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে অধিকার নিশ্চয় ওর আছে। ডোণ্ট গেট নার্ভাস, চালিহা। চালিয়ে যাও।

রুদ্রর কথার ধরনে আবার একটা হাসির রোল ওঠে দলের মধ্যে। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে অন্য দর্শনার্থীরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় তাদের দিকে।

রুদ্র সম্পর্কে দলবীরের অনুমান মোটেই মিথ্যে নয়। রুদ্রদেব বাস্তবিকই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হয়েও কাব্য-সাহিত্যের প্রতি তার বরাবরের অনুরাগ। তাই দিলওয়াড়া মন্দির দেখা শেষ হতেই দলটি যখন বেরিয়ে এসে তাদের স্টেশন ওয়াগনের দিকে এগিয়ে যায়, রুদ্র কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের সামনে। তার চোখের সামনে শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিলওয়াড়া। একজন রাজপ্রতিনিধি বণিক নিজের জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় একত্রিত করে গড়ে তুলেছিলেন এই মন্দির। তাঁর মানসিকতার স্পর্শ লেগে রয়েছে প্রতিটি প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে, যেমন নাকি তাজমহলের পাথরে অক্ষয় হয়ে আছে শাজাহানের প্রেমের স্পর্শ। মন্দির নির্মাতা বিমলাসাহের মানসিকতাও ছিল প্রেমের দীপ্তিতে দীপ্তিমান। তবে সেই প্রেম ছিল ঈশ্বর-প্রেম। 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'—এই কথাটা শাজাহানের চাইতে বিমলাসাহ বেশি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শাজাহান তৈরি করেছিলেন তাজমহল, আর বিমলাসাহ দিলওয়াড়া। একটা স্মৃতিসৌধ, অন্যটা দেব-দেউল।

রুদ্রদেবের খেয়াল ছিল না কতক্ষণ সে মন্দিরের সামনে তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সহসা কাঁধের ওপর হাত পড়তেই চমকে তাকায় রুদ্রদেব। দলবীর তার কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে, হ্যালো ভট্চায, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো? আমরা সবাই যে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।

—আই অ্যাম সরি, দলবীর। চল যাচ্ছি। বলতে বলতে দলবীরের পাশাপাশি হাঁটতে থাকে রুদ্রদেব।

মন্দিরের প্রবেশ পথের পাশে সেই ভৈরবমূর্তির কাছে এসেই আবার থমকে দাঁড়ায় রুদ্রদেব। দলবীর জিজ্ঞেস করে, হোয়াট হ্যাপেণ্ড, ভট্চায? এই ভয়ঙ্কর ভৈরব মূর্তির মধ্যে আবার এমন কী শিল্প মাধুর্য আবিষ্কার করলে তুমি?

—সে কি, ভয়ঙ্করের মধ্যে কি শিল্প-মাধুর্য থাকতে নেই?

—তা হয়তো আছে, বলতে থাকে দলবীর, কিন্তু গোটা মন্দির দেখার পরে এই ভৈরব মূর্তিটার মধ্যে এমন কী আছে যে এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে?

[illegible] জবাব না দিয়ে রুদ্রদেব আরও কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেই মূর্তির দিকে। তারপর একসময় দলবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, জানো দলবীর, আমার মনে হয় এই মূর্তিটার মধ্যে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে—গোটা দেশের বিরাট পুলিশ বাহিনীকে।

—কি বলছো, ভট্চায?

—হ্যাঁ ভাই। ভেবে দেখলে তুমিও আমার কথায় সায় দেবে। আমরা প্রত্যেকেই এক একজন ভৈরব। এর চোখের মত আমাদের চোখেও একদিন জ্বলবে ক্ষমতার আগুন। দেশের আইন-শৃংখলার ভার থাকবে আমাদের হাতে। তাই সময় সময় চোখের ঐ ক্ষমতার আগুনই দম্ভের আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে। আমাদের হাতে অপরাধীর ছিন্ন মস্তক। ক্ষমাহীন কঠোর কঠিন হয়ে উঠবো আমরা। ভৈরবের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ পাথরের কুকুরের মত দেশের পুলিশ বাহিনীও নিয়ে থাকে পুলিশ কুকুরের সাহায্য। ভৈরব পাহারা দিচ্ছে এই মন্দিরের ঐশ্বর্য, আর পুলিশ পাহারা দেয় সমাজের ঐশ্বর্য।

দলবীর এবার অখুশি কণ্ঠে বললে, নো—নো ভট্চায, তোমার সঙ্গে এবার একমত হতে পারলাম না। তোমার কথায় মনে হচ্ছে দেশের পুলিশ বাহিনীর প্রত্যেকেই যেন ভৈরব মূর্তির মত এক একটি পাষণ্ড।

দলবীরকে বাধা দিয়ে জবাব দেয় রুদ্রদেব, না দলবীর, তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারোনি। এই ভৈরব মূর্তিকে আমি পাষণ্ড বলিনি। চেয়ে দেখ ওর মুখের দিকে। সংকল্পে অটল, কর্তব্যে কঠোর মুখ। আজকের সমাজের যা পরিস্থিতি তাতে পুলিশের এমন ভূমিকাই হওয়া উচিত। কোন দয়া-মায়া যেমন নয়, কোন অন্যায় কিংবা অত্যাচার—অবিচারও নয়। ইম্পার্শিয়াল—সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকার প্রয়োজন পুলিশের। কারুর মুখাপেক্ষি না হয়ে শতকরা একশো ভাগ আইনের প্রয়োগ করতে হবে পুলিশকে। কিন্তু এই সমাজে—

কথাটা শেষ না করে হঠাৎ থেমে যায় রুদ্রদেব। তারপর দলবীরের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, না ভাই, এসব কথা এখন থাক্। ওরা বসে রয়েছে আমাদের জন্যে। শিগগির চলো, দে উইল বি এনয়েড্।

বলতে বলতে রুদ্রদেব ও দলবীর এগিয়ে যায় পাহাড়ী পথের দিকে।

দুপুরে লাঞ্চের পরে একটা ডেক চেয়ারে বসে শেলীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তন্ময় হয়েছিল রুদ্রদেব। তার চৌকির পাশে টেবিলের ওপর আইনের

খানকয়েক মোটা বইয়ের পাশেই শোভা পাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র ও কীট্‌সের কয়েকখানা গ্রন্থ। এইগুলোই রুদ্রদেবের আসল সঙ্গী। অবসর সময় এগুলোর পাতা ওল্টাতেই তার ভাল লাগে। একটু দূরে ঘরের অন্যপাশে তার রুমমেট দলবীর সিং চেয়ারে বসে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। এমন সময় চাকর শ্রেণীর একটি ছোকরা দরজার কাছে এসে বলে ওঠে, আপকো চিঠ্‌ঠি, সাব।

মুহূর্তে ডেক চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে উঠে বসে রুদ্রদেব। মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সহসা। আজ সকাল থেকেই কেন যেন অলকাকে মনে পড়ছিল বারে বারে। বিশেষ করে, দিলওয়াড়া মন্দির দেখার সময় কেবলই তার মনে হচ্ছিল এই সময় যদি অলকা তার পাশে থাকতো তা'হলে দিলওয়াড়ার সৌন্দর্য সে আরও বেশি উপভোগ করতে পারতো।

কলকাতা ছেড়ে আসার সময় অলকা কথা দিয়েছিল প্রতি সপ্তাহে সে রুদ্রকে চিঠি দেবে। দিয়েও ছিল প্রথম দুটো সপ্তাহ। তাতে থাকতো কলকাতায় তাদের বন্ধু মহলের কথা, ইউনিভার্সিটির হালফিল খবরাখবর, রুদ্রদেব সম্পর্কে অলকার দুশ্চিন্তার কথা, আর সবশেষে দু'চার লাইন অলকার নিজের কথা।

রাজস্থানের চার হাজার ফুট উঁচু শৈলাবাস মাউন্ট আবুর ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটে নিজের ঘরে বসে অলকার সেই চিঠি তন্ময় হয়ে পড়তো রুদ্রদেব। রুমমেট দলবীর সিং এগিয়ে এসে চিঠির বাংলা অক্ষরগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করতো তাকে, লেটার ফ্রম ক্যালকাটা?

চিঠিখানা কলকাতা থেকে এসেছে কিনা জানতে চাওয়া হলেও তার মধ্যে যে আরও অনেক প্রশ্ন জড়িত থাকতো তা মুখ না তুলেই বুঝতে পারতো রুদ্রদেব।

চিঠি ও তার পাঠকের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে দলবীর একটু হেসে বলতো, ও—আই সী।

এবার মুখ তুলতো রুদ্রদেব। দলবীরের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিতে একটু হাসতো যে দলবীর তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেত সেই হাসির মধ্যে। রুদ্রদেবের ঘাড়ে আলতো চাপড় মেরে সে বলে উঠতো, ব্রেভো ব্রাদার, চিয়ার আপ্‌।

অলকার তৃতীয় চিঠিখানা এসেছিল দু'সপ্তাহ পরে। তারপর, প্রায় এক-মাসের মধ্যে আর কোন চিঠি নেই। এর মধ্যে রুদ্রদেব তিনখানা চিঠি ছেড়েছে তাকে। কিন্তু কোন জবাব পায়নি। তাই সেই ছোক্‌রা চাকর এসে

চিঠির কথা বলতেই রুদ্রদেব হাসিমুখে তার দিকে হাত বাড়াতেই চাকরটি বললে, আপকো নেহি সাব, সিং সাহাব কো।

মুহূর্তে মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে রুদ্রদেবের। ম্লান মুখে ভেসে ওঠে নিরাশার ছায়া। আজও এলো না অলকার চিঠি। দিনকয়েক আগে ইউনিভার্সিটির দীপকদার একখানা চিঠি পেয়েছে রুদ্র। কিন্তু তার মধ্যেও অলকার কথা কিছুই ছিল না।

অভিমানে মনটা ভরে ওঠে রুদ্রদেবের। এই দু'মাসের মধ্যেই যে অলকা এমনি হয়ে উঠবে তা সে ভাবতে পারেনি। অথচ চলে আসার দিন হাওড়া স্টেশনে ছল্‌ছল চোখে অলকার কত কথা, কত প্রতিশ্রুতি।

রুদ্রদেব ভট্টাচার্য, অলকা মজুমদার ও দীপক মৈত্র এই তিনজনের দলটিকে তাদের বন্ধু-বান্ধবেরা 'ট্রায়ো' বলে ডাকতো। পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম-এ ক্লাশের ছাত্র রুদ্রদেব ভালবাসতো কাব্য-সাহিত্য। তার সহপাঠিনী অলকার সাব্‌জেক্ট ছিল ইংরেজী। কিন্তু পড়াশোনার চাইতে পলিটিক্স নিয়েই সে মাথা ঘামাতো বেশি। ধনী ব্যবসায়ীর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা অলকা কিন্তু বেশ সহজভাবেই মেলামেশা করতো রুদ্র ও দীপকের সঙ্গে। দীপক ছিল ইকনমিক্সের ছাত্র। ওদের চাইতে এক বছরের সিনিয়র।

এমনিতে শান্ত প্রকৃতির হলেও দীপক ছিল অত্যন্ত একরোখা চরিত্রের ছেলে। বসন্ত কেবিনের চায়ের টেবিল ঘিরে বসে রুদ্র ও অলকা যখন কোন বিষয়ে তর্কযুদ্ধে মেতে উঠতো তখন দীপককেই সামলাতে হতো তাদের। তর্কে কোণঠাসা হয়ে রুদ্র হয়তো বলতো, আচ্ছা দীপকদা, তুমিই বলো না, শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের তৈরি অমিতের চরিত্রটা নাকি আগাগোড়া কাল্পনিক। ডিরোজিও'র ইয়ংবেঙ্গল যুগেও নাকি এমন একটা চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সহানুভূতির চোখে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে দীপক তার হাতের সিগারেটে শেষটান দিয়ে বলতো, নিজে হালে পানি না পেয়ে আমাকে আবার এর মধ্যে টানছিস কেন রুদ্র ?

—না-না, তুমিই বলো না দীপকদা। তোমার অভিমতটা একবার শুনতে চাই। অলকা আমার যুক্তিকে মোটেই আমল দিতে চাইছে না। বলেই রুদ্র তার টানা চোখ দুটো মেলে অলকার দিকে তাকাতো।

অলকাও মধ্যস্থ মানতো দীপকদাকে। বলতো, বেশ তাই হোক্‌। তোমার অভিমতটা শুনতে চাই দীপকদা।

দীপক অলকার সুন্দর মুখখানার ওপর একবার আলতো দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলতো, আমার অভিমত শুনলে তোদের দু'জনের কেউই খুশি হবি না।

অলকা বলতো, বেশ তো, তুমি বলই না দীপকদা।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকতো দীপক। তারপর এক সময় অলকার দিকে তাকিয়ে বলতো, শোন্। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে একাধিক বস্তুকে মিলিয়ে যিনি যত পাঞ্চ্ করতে ওস্তাদ, তিনিই ততো সাক্সেসফুল। এই পাঞ্চ্ করাটা মোটেই দোষের নয়। জানিস্ তো, তোর কানের ঐ দুল জোড়া যে সোনা দিয়ে তৈরি তা মোটেই খাঁটি নয়। তামার খাদ রয়েছে ওর মধ্যে। খাঁটি সোনায় গয়না তৈরি হয় না। কাব্যে, সাহিত্যে সত্যিকারের রস সৃষ্টি করতে হলেও পাঞ্চিং-এর প্রয়োজন। এবার বুঝলি? বলেই দীপক অলকার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে রুদ্রর দিকে তাকাতো।

রুদ্র বলে উঠতো, তা'হলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি?

জবাব দিতো দীপক, কিছুই দাঁড়ালো না। তর্কযুদ্ধে ড্র হয়ে গেল তোদের। তবে আমার ধারণা—

কথাটা শেষ না করে দীপক থেমে যেতেই অলকা জিজ্ঞেস করতো, কী ধারণা তোমার, দীপকদা?

রুদ্র ও অলকার দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে মৃদু হেসে দীপক বলতো, আমার ধারণা তোরা দু'জনেই খাঁটি গোমুখ্যু। সেই কবিতায় আছে না—হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল, পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল। তোদের অবস্থাও তেমনি। শেষের কবিতায় অমিতের চরিত্র বাস্তব, অবাস্তব কিম্বা অর্ধবাস্তব সেই প্রশ্নের মীমাংসা করে কার কোন্ উপকারটা হবে বলতে পারিস? শেষের কবিতা যদি তোদের ভাল লেগে থাকে, চরিত্রগুলোর উক্তি যদি পাঠকের চিন্তার খোরাক জোগায়, তা'হলেই তো তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ। লেখক আর কতটুকু লেখেন? তিনি যতটুকু লেখেন, পাঠক পড়ার সময় মনে মনে তার বহুগুণ তৈরি করে নেয়। লেখকের লেখা ও পাঠকের তৈরি করা এই দু'য়ের সমন্বয়ের ওপরেই তো নির্ভর করে চরিত্রের বাস্তবতা।

দীপকের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মেয়েদের সম্পর্কে তার মনে কোন দুর্বলতা ছিল না। তাদের সম্পর্কে প্রায় মোহমুক্তই বলতে হবে তাকে। সেই কথার জের টেনেই একদিন অলকা রুদ্রর সামনেই দীপককে ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, আচ্ছা দীপকদা, তুমি কখনও প্রেম করেছ?

কথাটা শুনেই হো-হো করে হেসে উঠেছিল, দীপক। তারপর হাসি থামিয়ে

বলেছিল. প্রেম করার মত মেয়েই তো আজ পর্যন্ত চোখে পড়লো না রে।

অলকা হেসে বলেছিল, প্রেমে পড়লে তোমাকে কেমন দেখায়, তা-ই একবার দেখতে ইচ্ছে করে আমার।

কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে দীপক জবাব দিয়েছিল, বেশ তো, তোর সাথে প্রেম করতে পারি। রাজি থাকিস তো বল।

— কী যা-তা বলছো? ঝংকার দিয়ে উঠেছিল অলকা।

দীপক একবার আড়চোখে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলেছিল, থাক্—থাক্। তোর সাথে প্রেম করতে গিয়ে রুদ্রর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে রাজি নই। বলেই আবার হো-হো করে হেসে উঠেছিল। আর, তার কথার স্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু কানে যেতেই রুদ্র ও অলকা দু'জনেই লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়।

দীপক একদিন রুদ্র ও অলকাকে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, তোরা কি এনগেজ্‌ড হয়েছিস?

রুদ্র ও অলকা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো।

— কিরে, কথা বলছিস্ না কেন? এনগেজড না হয়ে থাকিস তো আর দেরি না করে কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল। বিয়ে যবে হোক্ হবে। এনগেজ-মেণ্টটা হয়ে থাক। তোরা যে একদিন পরস্পরকে বিয়ে করবি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ভালো। যা দিনকাল। এই ইউনিভার্সিটিতেই তো এমন কতজোড়া দেখলাম যারা একদিন হাবুডুবু খেতো প্রেমের সাগরে। তারপর, ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চলে যেতো যে যার পথে। তেমন স্ট্রীট লাভারের সংখ্যাই তো আজকাল বেশি।

— স্ট্রীট লাভার? সে আবার কি দীপকদা? মৃদু হেসে প্রশ্ন করেছিল রুদ্র।

জবাব দিয়েছিল দীপক, প্রেম বস্তুটা যাদের কাছে নিছক একটা হালকা খেলার সামগ্রী, আমি তাদেরই বলি স্ট্রীট লাভার। রাস্তা-ঘাটের প্রেম রাস্তা-ঘাটেই সাঙ্গ করে ঝাড়া হাত-পায়ে বাড়ি ফিরে যায়। আমি চাই না তোদের অবস্থাও তেমনি হোক্।

বলতে বলতে দীপক অলকার রক্তিম আনত মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে আবার বলেছিল, এতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন তুই? প্রেম তো লজ্জার বিষয় নয়। তোরা পরস্পরকে ভালোবাসিস, এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু আমার অনুরোধ, তোদের এই ভালোবাসা যেন চিরকাল বজায় থাকে। সময় সুযোগ মতো তোরা বিয়ে করবি, সুখে থাকবি, তাই তো কাম্য। অন্ততঃ তোদের এই দীপকদা মনেপ্রাণে তাই কামনা করে।

জবাব দিয়েছিল রুদ্র, তাই হবে, দীপকদা। পড়াশোনার শেষে যেদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবো সেইদিনই আমাদের বিয়ে হবে। অন্ততঃ আমাদের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে বিলিতি কায়দায় এনগেজ্‌ড না হয়েও বিয়ে আমাদের হবেই।

—ছাট্‌স লাইক এ ম্যান। পুরুষের মতই কথাটা বললি, বলে উঠল দীপক, কিন্তু অলকার মনের কথাটা তো জানতে পারলাম না।

জবাব দিয়েছিল রুদ্র, ওর মনের কথাও ঠিক আমারই মত, দীপকদা।

এমনি সময় অলকা তার সুন্দর মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে দীপকের দিকে তাকিয়েই মাথা নীচু করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে দীপক হেসে উঠে অলকার পিঠে একটা আলতো চাপড় বসিয়ে বলে উঠেছিল, ছাট্‌স লাইক এ পারফেক্ট ওম্যান।

—বারে, কৃত্রিম অভিযোগের সুরে বলে উঠেছিল রুদ্র, তুমি বড়ই একচোখা, দীপকদা। আমার বেলায় শুধু 'ম্যান', আর ওর বেলায় 'পারফেক্ট ওম্যান' কেন?

—কারণ ওরাই পারফেক্টের কাছাকাছি, বলেছিল দীপক।

—আর, পুরুষেরা বুঝি ইম্‌-পারফেক্ট? হেসে বলেছিল রুদ্র।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভালোবাসার ব্যাপারে ওদের তুলনায় আমরা অনেক ইম-পারফেক্ট। পুরুষ ভালোবাসে মন দিয়ে, আর মেয়েরা ভালোবাসে মন-প্রাণ দিয়ে। পুরুষ ভালোবেসে প্রাণ দিতে পারে, আর মেয়েরা ভালোবাসার স্মৃতি বুকে নিয়ে গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

দীপক থামতেই অলকা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, তুমি মেয়েদের সম্পর্কে এত কথা জানলে কেমন করে?

দীপক কিছু জবাব দেবার আগেই রুদ্র বলে উঠেছিল, এসব তোমার নিজস্ব থিওরী, দীপকদা।

আর একটা সস্তা দামের সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে জবাব দিয়েছিল দীপক, বোধহয় তাই। তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলেছিল, আমার ক্লাশ আছে। আমি চললাম। তোরা বোস্‌।

দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এসে অলকার দিকে তাকিয়ে বলেছিল দীপক, কফির পয়সাটা তুই দিয়ে দিস্‌। বলেই নির্বিকার ভঙ্গিতে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সেইমুহূর্তে শেলী আর ভাল লাগছিল না রুদ্রর। বইটা বন্ধ করে ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। আড় চোখে লক্ষ্য করে

তার রুম-মেট দলবীর সিং গুন গুন করে একটা পাঞ্জাবী গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের চুলের ঝুঁটি পরিচর্যার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

অলকার বদলে এবার ঐ দলবীরের কথাই ভাবতে থাকে রুদ্র। একটু আগেই দলবীর তার চিঠিখানা পড়া শেষ করেছে। তারপরেই তার কণ্ঠে জেগে উঠেছে পাঞ্জাবী গানের সুর। বোধহয় চিঠিখানা পড়ে খুশী হয়ে উঠেছে সে। হয়তো চিঠির মধ্যে কোন ভালো খবর আছে। দলবীরকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল রুদ্রর। কিন্তু কি ভেবে কিছু জিজ্ঞেস না করেই চুপ করে রইলো।

সহসা ঘরে প্রবেশ করে মধ্যপ্রদেশের সেই মায়ারাম। সঙ্গে মহারাষ্ট্রের গঙ্গাধর দোশী।

—হ্যাল্লো—হ্যাল্লো, কী করছো তোমরা? ছুটির দুপুরটা ঘরে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছ? চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললে মায়ারাম।

রুদ্র কিছু জবাব দেবার আগেই দলবীর জবাব দেয়, আজ আমার হেয়ার ড্রেসিংয়ের দিন। এটা শেষ করেই একবার বেরোবো।

গঙ্গাধর দোশী রুদ্রর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার বিকেলের প্রোগ্রাম কি, ভট্‌চায?

রুদ্রর বদলে জবাব দেয় মায়ারাম, ওর প্রোগ্রাম তো কীটস, বায়রন, রবীন্দ্রনাথ। কি বলো ভট্‌চায?

সেই মুহূর্তে কথা বলতে ভাল লাগছিল না রুদ্রর। তবুও ভদ্রতার খাতিরে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে সে বললে, একজাক্টলি ব্রাদার। বোতলের রসের চাইতে বইয়ের রসে অনেক বেশি নেশা হয় আমার।

মায়ারাম আর কিছু না বলে পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে। মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে পড়ে কয়েকটা সিগারেট। দোশীকে একটা সিগারেট দিয়ে চোখের ইঙ্গিতে দলবীরকে জিজ্ঞেস করে, একটা চলবে নাকি, সিং?

—নো থ্যাঙ্ক্‌স, দলবীর বললে, আমি ওটা ঠিক সহ্য করতে পারিনা, মায়ারাম। দু'বোতল নির্জলা স্কচ-হুইস্কি সাবাড় করে দিতে পারি, কিন্তু তোমার ঐ হাসিসের সিগারেট কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

—ভট্‌চায? মায়ারাম হাসিমুখে রুদ্রর দিকে তাকায়।

—থ্যাঙ্কস্। আমার অবস্থাও দলবীরের মত। জবাব দেয় রুদ্র।

—নাঃ, তোমরা দেখছি সব হাণ্ড্রেড্ পার্সেণ্ট পিউরিটান। এ যুগের ছেলে হয়েও হাসিস, এল-এস-ডি কিম্বা মারিজুয়ানার স্বাদ যে তোমরা পেলে না

তা' ভাবলে আমার সত্যিই দুঃখ হয়। বলতে বলতে নিজের ও দোশীর সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে মায়ারাম।

বিশেষ ধরনের সেই হাসিসের সিগারেট টানতে টানতে মায়ারাম ও গঙ্গাধর গল্প করতে থাকে রুদ্র ও দলবীরের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, দলবীর তার সামনের আয়নার ওপর চোখ রেখে নিজের লম্বা চুলের পরিচর্যা করতে থাকে, আর রুদ্র তার ডেক চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে কথা বলতে থাকে।

হাসিসের নেশায় আচ্ছন্ন মায়ারাম ও গঙ্গাধর কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না সেখানে। গল্প গুজরের মাঝখানেই উঠে দাঁড়ায় তারা। তারপর ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বিদায় নিয়ে নিজেদের রুমের দিকে চলে যেতেই দলবীর হেসে উঠে রুদ্রের উদ্দেশে বললে, হোপ্‌লেস, ওদের জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়। ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটে এসেও এসব বদ অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারেনি।

কোন জবাব না দিয়ে চুপ্‌ করে থাকে রুদ্র। দলবীরের উদ্দেশে সে মনে মনে হাসে। দলবীর নিজেও তো কম যায় না। এল-এস-ডি, হাসিস প্রভৃতি অত্যাধুনিক নেশায় অভ্যস্ত না হলেও বহু পুরাতন ও চির নতুন মদের প্রতি দলবীরের আকর্ষণ কম নয়। সুযোগ পেলেই সে বাইরে গিয়ে আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা মিটিয়ে আসে।

মাতালকে ঘৃণা করলেও মদের ওপর ঘৃণা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নেই রুদ্রর। অভ্যস্ত না হলেও ছাত্রজীবনে একটু আধটু মদের স্বাদ সে নিজেও গ্রহণ করেছে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে।

কথাটা কানে যেতেই অলকা একদিন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, তুমি নাকি মদ খাও?

খবরটা কোত্থেকে অলকার কানে এলো সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করে অলকার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল রুদ্র। তারপর স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে খাই। তবে নেশা করি না।

বলেছিল অলকা, মাঝে-মধ্যে খাওয়া থেকেই তো নেশার সূত্রপাত হয় বলে শুনেছি।

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ তুমি। তবে আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো। আমার তা হবে না। খেলে আমিই মদ খাবো, মদ কখনও খেতে পারবে না আমাকে।

—তা আমি জানি, রুদ্রর আর একটু কাছে সরে এসে মৃদু হেসে বলেছিল অলকা, তবে ভয় হয়—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সে থেমে গিয়েছিল।

রুদ্র অলকার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে তার চোখের ওপর চোখ রেখে তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, বেশ তো, তুমি যদি বলো তাহলে আজ থেকে আর কখনও আমি ঐ জিনিস ছোঁব না।

—না—না, তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল অলকা, এমন প্রতিজ্ঞা করতে বলছি না তোমাকে। কোন কিছুর গোঁড়ামীই আমার ভাল লাগে না। ছেলেরা একটু আধটু মদ খেলেই যে খারাপ হয়ে যায় তা' আমি বিশ্বাস করি না।

—আমিও না। কথাটা বলেই রুদ্র ও অলকা এক সঙ্গেই হেসে উঠেছিল।

হাসি থামিয়ে অলকা একসময় হালকা সুরে বলেছিল, আচ্ছা, আমার একটা কথা রাখবে?

—বল। জবাব দিয়েছিল রুদ্র।

বলেছিল অলকা, মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু মদ যদি খেতে ইচ্ছে করে তো খেও। তবে খাওয়ার সময় আমাকে মনে করো। কথাটা বলেই সলজ্জ ভঙ্গিতে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল সে।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেছিল রুদ্র। হাসতে হাসতে বলেছিল, এ যে দেখছি মদ খাওয়ার ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুরের উপদেশ!

রুদ্রের সঙ্গে কথা-বার্তায়, চাল-চলনে সাহিত্যের এম-এ ক্লাসের ছাত্রী অলকা মজুমদারের চরিত্রে সময় সময় দু'টো ভিন্ন ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটাতে ধনীর কন্যা অলকা মজুমদার অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কথা-বার্তায় চৌকস, চাল-চলনে আধুনিকা। যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি এমনকি তাদের দীপকদাও কাছে থাকে তাহলেও তার এই রূপটিই প্রকাশ পায় রুদ্রর সামনে। যেন রুদ্রর সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দেওয়ার জন্যে সে প্রস্তুত। কিন্তু একা রুদ্রর সামনে অলকার সম্পূর্ণ অন্য রূপ। সেখানে সে একটি লজ্জাবতী যুবতী। নম্র ও বিনয়ী অলকার সেখানে বলার চাইতে শোনার আগ্রহই বেশি। আদরে আব্দারে, মমতায়-কোমলতায় সে তখন একটি খাঁটি বাঙ্গালী যুবতী।

অলকার চরিত্রে এই দু'টি ভিন্ন ধারা খুবই ভালো লাগে রুদ্রর। প্রথমটায় সে বোধ করে কৌতুক, আর দ্বিতীয়টায় তৃপ্তি। তার কাছে প্রথমটা গুরুত্বহীন, আর দ্বিতীয়টার গুরুত্ব সীমাহীন।

দলবীর সিং সাজ-পোশাক করে বেরিয়ে যায়। একা ঘরে বসে থাকে রুদ্র। চোখের সামনে খোলা আকাশে ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে আছে টুকরো টুকরো মেঘ। জানালার ফাঁকে চোখে পড়ে মাউণ্ট আবুর ছোট্ট সহরের একাংশ। মাঝে মধ্যে কানে আসে ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটের পুলিশভ্যানের আনাগোনা। ছুটির

দিনের অলস মধ্যাহ্নে গোটা ইন্‌স্টিটিউট্‌টাই যেন হাসিসের নেশায় আচ্ছন্ন মায়ারাম ও গঙ্গাধরের মত বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

আই-পি-এস—ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস—ভবিষ্যতের পুলিশ সাহেব অর্থাৎ যাঁরা এককালে জেলার পুলিশী প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবেন তাঁদের ট্রেনিংয়ের জন্যেই রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতমালার অদূরে আবু পর্বতের ওপর এই সেণ্ট্রাল পুলিশ ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট। নিয়ম-কানুনের শিকলে বাঁধা এখানকার জীবন। সময়ের প্রতি আনুগত্যহীন ঢিলেঢালা জীবন নয় এখানকার শিক্ষার্থীদের। তবুও এই নিয়ম-শৃংখলার মধ্যেই শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ গোপনে আধুনিক নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে। বোধহয় লাগামছাড়া যৌবনের অভিব্যক্তি এটা।

ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের ছাত্রসমাজের একাংশ আজ যে নেশায় আচ্ছন্ন ঐ মায়ারাম ও গঙ্গাধরের আসক্তিও তার ওপর। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কিসের এক দুর্নিবার আকর্ষণে ছাত্রসমাজের একটা অংশ আজ ঐদিকেই ধেয়ে চলেছে পরিণতির কথা চিন্তা না করেই। কলেজের তো বটেই, স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও একটা দল আজ ম্যান্‌ড্রেকস, মবিস্‌য়ানা কিম্বা এল-এস-ডি'র সঙ্গে পরিচিত। এর কাছে তুচ্ছ মদের নেশা। এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এসেও মায়ারাম, গঙ্গাধরের মত কেউ কেউ ছাড়তে পারে নি কলেজ জীবনের সেই অভ্যাস। অথচ স্কুল-কলেজ জীবনে ওরা বাস্তবিকই কৃতী ছাত্র ছিল। সর্বভারতীয় পরীক্ষার শক্ত বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওরা এসেছে ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে। বলতে-কইতে, চলতে-ফিরতে কেতাদুরস্ত ওরা। বুদ্ধিরও অভাব নেই। তবুও একটা অভাব রয়েছে ওদেব—জীবনের মূল্যবোধের অভাব। এই অভাবেব তাড়নাতেই ছট্‌ফট করছে দেশের যুবসমাজ। চরিত্রের দৃঢ়তা হারিয়ে বুঁদ হয়ে আছে সস্তা নেশার ঘোরে।

চারিত্রিক দৃঢ়তার যতই কেন না অভাব ঘটুক, সর্বভারতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতে বিদ্যা-বুদ্ধিই যথেষ্ট। চারিত্রিক দৃঢ়তা কিংবা মানসিক গুণাবলী যাচাইয়ের তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই। দেশের কর্মকর্তাদের কাছে বোধহয় তার কোন প্রয়োজনও নেই। কিন্তু প্রশাসনে বিশেষ করে পুলিশী প্রশাসনের ক্ষেত্রে ঐ চরিত্রই যে প্রধান। যাদের হাতে একদিন তুলে দেওয়া হবে প্রচণ্ড ক্ষমতা, বিপদে-আপদে যাদের গিয়ে দাঁড়াতে হবে সাধারণ মানুষের পাশে, দুর্জনকে কঠিন আঘাত হেনে দুর্বলকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে যাদের, তাদের যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠিই তো হওয়া উচিত চারিত্রিক দৃঢ়তা,

লোভের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা, ন্যায়নীতির প্রতি গভীর আনুগত্য। কিন্তু কোথায় আজ সে সব? পুলিশী 'কোড-অফ-কণ্ডাক্টের' সার্থক প্রয়োগ কোথায়?

ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষাসূচীর মধ্যে কিন্তু সবই রয়েছে। আইন, ক্রিমিনোলজি ও পুলিশের কাজের খুঁটিনাটির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সোস্যাল প্রবলেম ও তার প্রতিকারের দিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শেখানো হয়—দেশের মানুষকে আপন বলে ভাবতে হবে, করতে হবে তাদের সেবা, প্রতিকার করতে হবে তাদের অভিযোগের, বন্ধ করতে হবে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, গ্রহণ করতে হবে জনগণের সেই সাহায্য যার অভাবে পুলিশ কিছুতেই সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে পারে না।

শেখানো তো হয়, কিন্তু শিখবে কে? যারা শিখবে তারা তো এই ঘুণে ধরা সমাজেরই মানুষ। বিদ্যা-বুদ্ধিতে কৃতী হলেও জীবনবোধের মূল্যায়নে তারা যে একান্তই অক্ষম। তাই তো আজ পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ এত সোচ্চার। তাই তো আজ দেশব্যাপী দুর্নীতির জোয়ারে পুলিশবাহিনীর এই সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই কেবল ফয়দা তুলতেই ব্যস্ত। দলের মধ্যে একটিমাত্র 'ব্ল্যাক শিপের' অস্তিত্বই যে গোটা দলটির মুখে চূণ-কালি লেপে দিতে যথেষ্ট। কাঁধের তকমা খুলে ফেলে সেনাপতি আজ সাধারণ সৈনিকের পর্যায়ে নেমে এসেছে। সে ভুলে গেছে সত্যিকারের হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা। সে আজ অসহায়, পঙ্গু। সৈন্যদলের সামনে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'কম্যাণ্ড' করার ক্ষমতা সে হারিয়েছে। তাই তো আজ জনগণের মুখে সেই খেদোক্তি—ইফ্ গোল্ড্ রাস্ট্, হোয়াট শ্যাল্ আয়রণ্ ডু?



আই-পি-এস-এর জন্যে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দেওয়ার আগে পর্যন্ত খবরটা একেবারেই চেপে রেখেছিল রুদ্রদেব। বাড়িতে একমাত্র বাবা জগদীশ ছাড়া আর কেউ জানতেন না।

ছেলের কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন জগদীশ। বোধহয় ছেলের মানসিকতাকে মনে মনে যাচাই করে নিলেন কিম্বা রুদ্রর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে

তার নিজের বাবা অর্থাৎ রুদ্রর দাদু সোমেশ্বরের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা-ই বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তা'হলে এম-এ পড়া ছেড়ে দিচ্ছ তুমি?

জবাবে রুদ্র বললে, না, এখনই ছেড়ে দিচ্ছি না। ভেবেছি পরীক্ষায় বসবো। পাশ করতে পারলে তারপর আছে ভাইভা। শেষপর্যন্ত যদি সিলেক্ট হতে পারি তখন না হয় পড়া ছেড়ে দেব।

জগদীশ আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এম-এ'টা পাশ করে পরীক্ষায় বসলে হতো না?

জবাব দেয় রুদ্র, কম্পিটেটিভ পরীক্ষা, দিলেই যে পাশ করবো তার নিশ্চয়তা কি? একবার দিয়েই দেখি না। পাশ করতে না পারলেও খানিকটা অভিজ্ঞতা তো হয়ে থাকবে।

—বেশ, তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাই না। বলতে থাকেন জগদীশ, আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয়। সংসারে টাকারও দরকার। স্মিতার বিয়ের দেনা এখনও শোধ করতে পারি নি।

রুদ্র চুপ করে থাকে। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে দাদু সোমেশ্বরের কথা। প্রচুর পয়সা-কড়ির মালিক তিনি। জগদীশ নিজের জেদ্ ছেড়ে একবার মুখ ফুটে বললেই সেই পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ তাঁর একমাত্র পুত্র জগদীশের সংসারের সব অভাব ঘুচিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত। মুখ ফুটে বলারও দরকার নেই, জগদীশ রাজি থাকলেই তিনি ছেলের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া আদর্শবাদী জগদীশ তা' করবেন না কিছুতেই। না খেয়ে মরবেন, তবুও বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না, তাঁর পয়সা স্পর্শ করা তো দূরের কথা।

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে জগদীশ আবার বললেন, পরীক্ষায় যদি বসতেই হয় তো প্রস্তুত হয়ে বসাই ভালো। শুধু শুধু পরীক্ষায় বসে ফি'র টাকাটা জলে দিয়ে কোন লাভ নেই। একটি পয়সা নষ্ট করার সামর্থ্যও যে আমাদের এখন নেই সে কথা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়।

জবাবে রুদ্র বললে, মোটামুটি প্রস্তুত আমি হয়েছি। তবে জানিনা পরীক্ষার ফল কেমন হবে।

—না—না, ফলের কথা চিন্তা করো না। ভগবদ্গীতার কথা মনে রেখো। বলতে থাকেন জগদীশ, আমরা কেবল চেষ্টাটুকুই করতে পারি। ফলাফল তো সেই মঙ্গলময়ের হাতে। আমাদের কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের সেই প্রচেষ্টায় যেন কোন ফাঁকি না থাকে।

একটু থেমে জগদীশ আবার বললেন, বেশ, নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে পরীক্ষা দাও। দেখা যাক্ কী হয়।

পরীক্ষায় বসেছিল রুদ্র। ভালোই হয়েছিল পরীক্ষা। ভাইভায়ও সে মন্দ করেনি। প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে একজন অবশেষে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাকে, আপনি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢুকতে চাইছেন কেন?

সপ্রতিভ কণ্ঠে রুদ্র সোজাসুজি জবাব দিয়েছিল, প্রথম কারণ চাকরি। সংসারে অর্থের প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় কারণ কৌতূহল।

—কৌতূহল? কিসের কৌতূহল?

জবাবে বলেছিল রুদ্র, পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে কৌতূহল। এই বিভাগে প্রবেশ করে মানুষের মানসিকতায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে সেই সম্পর্কেই আমার কৌতূহল।

—পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করলেই যে মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে একথা আপনি জানলেন কেমন করে?

—জেনেছি সাধারণ বুদ্ধিতে। একজন সাধারণ মানুষ হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলে তার চরিত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে সকলেব ক্ষেত্রে যে এই পরিবর্তন ঘটে তা' বলছি না। আমার ধারণা অনেকের ক্ষেত্রেই তা ঘটে থাকে।

প্রশ্নকর্তাও নাছোড়বান্দা। তিনি আবার বললেন, আমি যদি বলি আপনার এই ধারণা ভুল?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রুদ্র, ভুল কি ভুল নয় তা' জানতে গিয়েই তো ডিপার্টমেণ্টে ঢুকতে চাইছি।

—একটা সাধারণ কৌতূহল মেটাতে আপনি নিজের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করতে চাইছেন? প্রশ্নটা রুদ্রের দিকে ছুঁড়ে দিতেই বোর্ডের প্রশ্নকর্তারা সবাই একযোগে হেসে ওঠেন।

রুদ্রও হালকা সুরে জবাব দেয়, এক্সপেরিমেণ্ট যদি করতেই হয় তা'হলে তা' নিজের ওপর করাই ভালো। এতে অন্যকেও যেমন বিরক্ত করার প্রয়োজন হয় না, তেমনি ফলাফলও ভালোভাবে উপলব্ধি করা চলে। তা'ছাড়া আমি এটাকে একটা সাধারণ কৌতূহল বলেও মনে করি না। পুলিশ বিভাগেব কর্মীদের মানসিক পরিবর্তনের মত একটা বিষয় কিছুতেই সাধারণ হতে পারে না।

রুদ্র থামতেই বোর্ডের খোদ্ চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করেন, অনেকে জবাব দেন

যে দেশের মানুষকে সেবা করার মনোভাব নিয়েই নাকি তাঁরা এই ডিপার্টমেণ্টে আসতে চান। আপনারও তেমন কোন মনোভাব আছে কি ?

স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্র, না নেই।

—সে কি ? বিস্ময় প্রকাশ পায় চেয়ারম্যানের কণ্ঠে, আপনি কি দেশের মানুষকে সেবা করতে চান না ?

—না, দেশের মানুষকে সেবা করার বিশেষ কোন মনোভাব আমার নেই। সে উদ্দেশ্য নিয়েও আমি আসি নি। তবে, আমার বরাদ্দ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলে যদি তাদের সেবা করা হয় তাহলে আমি প্রাণপণে তা' করতে চেষ্টা করবো—এইটুকু আশ্বাসই কেবল আমি আপনাদের দিতে পারি।

—থ্যাঙ্ক্ ইউ। আপনি এবার যেতে পারেন।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল রুদ্র। ভাইভাতে কিন্তু সে-ই পেয়েছিল সব চাইতে বেশি নম্বর।

তখনও ক্যাণ্ডিডেটরা ইউ-পি-এস্-সি থেকে কোন চিঠি পায় নি। তার আগেই সফল পরীক্ষার্থীদের নাম ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজে।

রুদ্র তার সাফল্যের খবর প্রথম পায় তার বাবার কাছেই। সকালে সরকারী দুধের বোতল হাতে রুদ্র বাড়ি ঢুকতেই জগদীশ বললেন, আজকের পত্রিকায় ইউ-পি-এস-সি'র নামের লিস্ট বেরিয়েছে। তোমার নামও রয়েছে ওর মধ্যে।

একটু থেমে আক্ষেপের সুরে তিনি আবার বললেন, দেশের কী দুর্দিন! লিস্টের মধ্যে তুমিই একমাত্র বাঙ্গালী। এর পরে বাংলায় আর বাঙ্গালী অফিসার খুঁজে পাওয়া যাবে না। বলতে বলতে জগদীশ সেখান থেকে চলে গেলেন।

বাবার মুখে খবরটা শুনে মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল রুদ্রর। সে আই-পি-এস হয়েছে। সর্বভারতীয় পুলিশের চাকরি এখন তার করায়ত্ত। কিন্তু তার বাবা জগদীশ এমন নির্বিকার কেন ? একমাত্র ছেলে আই-পি-এস হয়েছে, এতে কি তিনি খুশি নন ? তার কথার মধ্যে ছেলের আই-পি-এস হওয়ার আনন্দের চাইতে বাঙালীর পিছিয়ে পড়ার দুঃখই যেন বেশি।

রান্নাঘরে দুধের বোতল রাখতে গিয়ে রুদ্র তার মাকে জিজ্ঞেস করে, শুনেছ মা, আমি আই-পি-এস হয়েছি।

মিলের লাল পেড়ে শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রুদ্রর মা এগিয়ে এসে ছেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে বললেন, হ্যাঁ বাবা, একটু আগেই ওঁর কাছে শুনেছি।

—তুমি খুশি হয়েছ মা? মাকে প্রণাম করতে করতে জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

ছেলের চিবুক স্পর্শ করে হাতে চুমু খেয়ে রুদ্রর মা হেসে বললেন, খুশি হবো না? খুব খুশি হয়েছি। শুনলাম ওদের মধ্যে তুমিই নাকি একমাত্র বাঙ্গালী।

একটু থেমে রুদ্র আবার বললে, কিন্তু বাবার মুখ দেখে তো মনে হলো তিনি বোধহয় তেমন খুশি হন নি।

—নারে না, খুশি হয়েছেন ঠিকই। জানো তো উনি চিরকালের চাপা স্বভাবের মানুষ। মুখ দেখে ওঁর মনের কথা বোঝার উপায় নেই। তা'ছাড়া, চিরকালই ওঁর নিজের বদলে দেশের কথা ভাবতে ভাবতেই দিন কেটে গেল। তুমি কৃতকার্য হয়েছ তাতে উনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। কিন্তু সেই খুশি ছাপিয়ে উনি দুঃখ পেয়েছেন এই ভেবে যে বাঙ্গালী পিছিয়ে পড়ছে। ওঁর স্বভাবটাই তো এমনি। দেশ-দেশ করেই সারাটা জীবন কাটলো। কিন্তু তার বদলে দেশের কাছ থেকে উনি নিজে কী যে পেলেন—! কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন তিনি।

সেদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল অলকার সঙ্গে। রুদ্র নিজেই এইটি চাইছিল। অলকাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে রুদ্র বললে, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে, অলকা।

স্নিগ্ধ চোখে রুদ্রর মুখের দিকে একবার তাকায় অলকা। তারপর নিজের ছোট্ট হাতঘড়িব ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, খুব জরুরী? ঘণ্টা খানেক পরে বললে হবে না?

—কেন তোমার ক্লাশ আছে নাকি?

মাথা নেড়ে সায় দেয় অলকা। রুদ্র আবার বললে, না-না, ক্লাশ নষ্ট করার দরকার নেই। তুমি যাও। পরেই না হয় বলবো।

দুপুরে বসন্ত কেবিনের একটা টেবিল ঘিরে বসেছিল রুদ্র ও দীপক। একটু পরে অলকা এসে হাজির হতেই দীপক হৈ-চৈ বাধিয়ে অভ্যর্থনা করে তাকে, আয়—আয়। তোর জন্যেই বসে আছি আমরা। জবর খবর আছে তোর জন্যে। বুঝলি অলকা, রুদ্র একটা কাজের মত কাজ করে ফেলেছে। আজকের খবরের কাগজে ওর নাম দেখে—।

—আঃ, দীপকদা, একটু আস্তে কথা বলো। সবাই যে হা-করে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। রুদ্র মৃদু ধমক দেয় দীপককে।

—বেশ তো, থাক না। বলেই কণ্ঠস্বর খাটো করে দীপক আবার বলতে থাকে, খবরের কাগজে ওর নামটা দেখে একবার মনে হয়েছিল, আমাদের

রুদ্র নাকি? পরে ভাবলাম, অন্য কেউ হবে হয়তো। ও যে আমাদের সবাইকে লুকিয়ে এমন একটা কাজ করে বসবে তা বুঝতে পারি নি। ব্রেভো ব্রাদার, ব্রেভো। কংগ্রাচুলেট করছি তোকে। এক্ষুনি ডবল ডিমের ওমলেট ও চায়ের অর্ডার দে। সেই সঙ্গে এক প্যাকেট ভালো সিগারেটও আনা। আজকের সমস্ত খরচ-খরচা বেয়ার করবে অলকা। কথাটা শেষ করেই দীপক এমন গম্ভীর মুখে হঠাৎ চুপ করে যেন মনে হয় জজসাহেব এইমাত্র তাঁর রায় পড়ে শেষ করলেন। এর ওপর যেন আর কোন আপিল চলবে না।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে অলকা তাকায় দীপকের দিকে। তারপর বললে, খরচ বেয়ার করতে হবে আমাকে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ তোকে। তোর ভাগ্যেই রুদ্র ভাগ্যবান।

দীপকের কথায় অলকার ফর্সা মুখে লালের আভা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর মুখ তুলে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে সে বললে, তখন তুমি এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলে?

স্মিত মুখে জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ, ভেবেছিলাম তোমাকেই প্রথম বলবো। তা', তুমি তখন ক্লাশে চলে গেলে। এখানে এসে দীপকদাকে দেখে তাকেই প্রথম বললাম।

—বলেছিস বেশ করেছিস। অপাত্রে তো আর বলিস নি। তা' অলকাকে প্রথম বললেই ভালো হতো। যাক্ গে। বলেই দীপক আবার তাড়া দেয় অলকাকে, কিরে, চুপ করে রইলি কেন? চা-ওমলেটের অর্ডার দে।

—তা' না হয় দিচ্ছি, বলে ওঠে অলকা, কিন্তু কেন দিচ্ছি তা' কি এখনও জানতে পারবো না?

অলকার কথার মধ্যে যে একটা অভিমানের সুর লুকিয়ে ছিল তা' কিন্তু নজর এড়ায় না রুদ্রর। বোধহয় কথাটা তাকেই প্রথম বলা হয় নি বলেই তার এই অভিমান।

রুদ্র মনে মনে একটু হেসে অলকাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নিজের সস্তা দামের সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দীপক বলে ওঠে, এই যাঃ, আসল কথাটাই তো তোকে বলা হয় নি। আজ খবরের কাগজ পড়েছিস?

জবাব দেয় অলকা, না, সময় পাই নি।

—সেকি, বাড়িতে আজকাল পড়াশোনা নিয়ে কি এতই ব্যস্ত থাকিস যে খবরের কাগজটা পড়তেও সময় পাস না?

—না দীপকদা, আজ সকালে উঠেই একটু পার্টি-অফিসে যেতে হয়েছিল বিশেষ কাজে। ছাত্র-আন্দোলনের ব্যাপারে—।

—থাক্-থাক্। তোর ছাত্র-আন্দোলন নিয়ে তুই গিয়ে মাথা ঘামা। এ যুগের এসব পলিটিক্সে আমার বিশ্বাস নেই। সকালের কাগজটা পড়লে ওতে রুদ্রব নাম দেখতে পেতিস। ও আমাদের সবাইকে লুকিয়ে ইউ-পি-এস-সির পরীক্ষা দিয়েছিল। রুদ্র আই-পি-এস হয়েছে।

—আই-পি-এস? স্খলিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে অলকা।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আই-পি-এস, বলে ওঠে দীপক, ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস— ভবিষ্যতের পুলিশ সাহেব।

অলকা কিছু না বলে চুপ করে থাকে। রুদ্র একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়, খবরটা শুনে অলকা যেন ঠিক খুশি হয় নি।

দীপকের মুখে ফুটে ওঠে রুদ্ররই মনের কথা। ভ্রূ-যুগল কুঁচকে দীপক জিজ্ঞেস করে অলকাকে, কিরে, চুপ করে রইলি কেন? খবরটা শুনে খুশি হতে পারিস নি নাকি?

অলকা তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, না-না, এতে অখুশি হবার কী আছে? ভালোই তো। তবে কিনা পুলিশের চাকরি—

দীপক আবার বললে, পুলিশের চাকরি তো হয়েছে কি? এ কি তোর দারোগা-কনস্টেবলের চাকরি? এ হচ্ছে গিয়ে সর্বভারতীয় পুলিশের চাকরি— একটা গোটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—পুলিশ সাহেব। ওকে এ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট দেবেন খোদ রাষ্ট্রপতি, বুঝলি?

সত্যি বলতে কি, খবরটা শুনে অলকা মোটেই খুশি হয় নি। পুলিশকে সে কোনকালেই পছন্দ করে না। তা' ছাড়া রুদ্র সবাইকে লুকিয়ে এমন একটা কাজ করে ফেলল, আর সে নিজে পর্যন্ত এতদিন কিছু টের পেল না, এই চিন্তাটাই যেন তাকে বারে বারে খোঁচা দিচ্ছিল। এ যেন তার নিজেরই অক্ষমতা।

দীপকের কথায় একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে অলকা বললে, আমি ভাবছি, ওর মত একটি গুড্‌ বয় কি পুলিশের কাজ পারবে?

—বেশ তো, তুই না হয় ওকে ব্যাড্‌ বয় বানিয়ে পুসিশের কাজের উপযুক্ত করে তুলিস। তোরা হচ্ছিস গিয়ে শক্তির অংশ। গুড্‌কে ব্যাড করতে তোদের আর কতক্ষণ? ইভ্‌ যেখানে আদম ব্যাটাকে পর্যন্ত পটিয়ে ফেলতে

পেরেছিল, সেখানে আমাদের রুদ্র তো তোদের কাছে নশ্যি। কথার শেষে হো-হো করে হেসে ওঠে দীপক। রুদ্রও অলকার দিকে আড়চোখে চেয়ে মিটি-মিটি হাসতে থাকে।

—এ তোমার ভারি অন্যায়, দীপকদা। মেয়েদের সম্পর্কে তোমার এই আণ্ডার-এস্টিমেটের তীব্র প্রতিবাদ করছি আমি। মুখের ওপর কৃত্রিম অভিমানের ছায়া ছড়িয়ে অলকা বলে ওঠে।

জবাবে দীপক বললে, বেশ তো, আগে ওমলেট চায়ের অর্ডার দে। তারপর দেখতে পাবি তোদের কেমন ওভার-এস্টিমেট করি। দানবী-মানবী থেকে একেবারে দেবী পর্যায়ে ঠেলে তুলবো তোদের। প্রমাণ করে দেব যে সৃষ্টির আদিতেও ছিলি তোরা, আর অন্তেও থাকবি তোরা। মাঝখানে কেবল আমাদেব অর্থাৎ একদল বোকা পুরুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে তোবা দিব্বি রাজত্ব করে চলেছিস। নে—নে, আর দেরি করিস না। এবার অর্ডার প্লেস কর।

গরম ওমলেটে কামড় দিয়ে দীপক রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, তা'হলে তুই এবার আমাদের ছেড়ে চললি?

হাসিমুখে জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ চললাম। তবে মনে হয় ট্রেনিং পিরিয়ডে এক-আধবার এখানে আসতে পাববো।

—তখন কি আর আমাদের সঙ্গে দেখা করার সময় পাবি? অবশ্যি, অলকার কথা আলাদা। বলেই দীপক অলকার আনত মুখের দিকে তাকায়।

রুদ্র কোন জবাব না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। দীপক আবার বললে, তোব এই পুলিশ সার্ভিসের চাকরি আমাকে একটা ইংরেজি শব্দ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

—কি শব্দ? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

জবাব দেয় দীপক, জেনারেশন গ্যাপ।

—তার মানে? রুদ্র জিজ্ঞেস কবে, জেনারেশন গ্যাপ কথাটাব সঙ্গে আমার এই পুলিশ সার্ভিসের সম্পর্ক কি?

হেসে জবাব দেয় দীপক, সাধারণ ভাবে সম্পর্ক নেই ঠিকই, তবে একটু ঘুরিয়ে বললে একটা অর্থ তৈরি করা চলে। এই ধর্, তোর কাছেই শুনেছি তোর ঠাকুর্দা নাকি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতেন, আর তোর বাবা শুনেছি আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষক। আবার তুই চলেছিস পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে। ভবিষ্যতে তোর ছেলে হয়তো হবে কলেজের প্রফেসর। তোর ছেলেকে যে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে দেওয়া হবে না তা' আমি এই মুহূর্তে এখানে

বসেই বলতে পারি। কথাটা বলেই দীপক আড়চোখে এমনভাবে অলকার দিকে তাকায় যে সেই মুহূর্তে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে অলকার।

দিন কয়েক পরে রুদ্রকে একদিন একা পেয়ে জিজ্ঞেস করে অলকা, কবে তুমি মাউণ্ট আবু রওনা হচ্ছো?

রুদ্র তারিখটা বলতেই মনে মনে কি যেন চিন্তা করে অলকা। তারপর বললে, ঐ দিন তো আমাদের পার্টি অফিসে একটা জরুরী মিটিং আছে। স্টেশনে তোমাকে সি-অফ্ করতে যাবো কেমন করে?

কৃত্রিম নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দেয় রুদ্র, যাবে না।

রুদ্রর একটা হাত নিজের হাতেব মধ্যে নিয়ে অলকা আবার বললে, তা' হয় নাকি? স্টেশনে তোমাকে বিদায় জানাতে আমি যাবো না, তা তুমি ভাবতে পারো?

তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে রুদ্র বললে, তোমার পার্টি, তোমার রাজনীতির চাইতে তো তোমাব কাছে আমি বড় নই। কাজেই জরুরী মিটিং ছেড়ে আমার জন্যে তুমি স্টেশনে ছুটবে কেন?

—এই গ্যাখো, নির্ঘাৎ রাগ করেছ তুমি। ভালো লাগে বলেই তো একটু-আধটু রাজনীতি করি। কিন্তু তুমি কোনদিন এটাকে ভালো চোখে দেখলে না। আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? তোমার যাওয়ার দিনটাকে একদিন পিছিয়ে দেওয়া যায় না?

—না, তা' সম্ভব না। রিজার্ভেশন হয়ে গেছে।

আবার একটু ভেবে অলকা বললে, বেশ, ঠিক আছে। স্টেশনে তোমাকে সি-অফ্ করে তাবপরেই না হয় মিটিংয়ে যাবো। একটু হয়তো দেরি হবে। তা' আর কি করা যাবে।

এসেছিল অলকা। শুধু অলকা কেন, রুদ্রর আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই সেদিন স্টেশনে এসেছিল। এসেছিল দীপকও। রুদ্র এক ফাঁকে অলকাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, দেখবো কেমন কথা রাখো। সপ্তাহে একটা করে চিঠি কিন্তু চাই।

ছল্ ছল্ চোখে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলেছিল অলকা, হ্যাঁ পাবে। প্রতি সপ্তাহেই আমার চিঠি পাবে।

রওনা হওয়ার দিন কয়েক আগে রুদ্র একদিন জগদীশকে বলেছিল, ভাবছি যাবার আগে বর্দ্ধমান গিয়ে একবার দাদুকে প্রণাম করে আসবো।

চশমার ফাঁকে ছেলের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন জগদীশ। তারপর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, তাই যেও।

—আমার চাকরির কথা জানিয়ে দাদুকে একটা চিঠিও দিয়েছি। বলেছিল রুদ্র।

—ভালো করেছ। কথাটা বলতে বলতেই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন জগদীশ। রুদ্রও তার বাবার কাছ থেকে দাদু সোমেশ্বর সম্পর্কে এর চাইতে বেশি কিছু কথা আশা করে নি। এটা তার কাছে নতুনও নয়। সেই ছেলেবেলা থেকেই সে এই জিনিস দেখে আসছে। বাপ সোমেশ্বর সম্পর্কে পুত্র জগদীশ বরাবর এমনই নির্বিকার। সোমেশ্বরের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি চুপ করে থাকেন।

পিতা-পুত্রের এই অদ্ভুত সম্পর্ক বড়ই আশ্চর্য ঠেকতো ছোট্ট রুদ্রর কাছে। ছেলেবেলায় সে ভাবতো তার দাদু বোধহয় কোনদিন তার বাবাকে বকা-ঝকা করেছিলেন, তাই তার বাবা দাদুর ওপর এমনি রেগে আছেন। কথাটা একদিন সে জিজ্ঞেসও করেছিল তার মাকে। কিন্তু সঠিক কোন উত্তর পায় নি। অবশেষে বড় হয়ে ধীরে ধীরে সে সবকিছুই জানতে পেরেছিল।

ব্রিটিশ যুগের দারোগা ছিলেন সোমেশ্বর। পুলিশের দারোগা, দোর্দণ্ড প্রতাপ। তার ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। সাধারণ চোর-ডাকাত তো বটেই, এমনকি স্বদেশীওয়ালারাও এই করিৎকর্মা ও সরকারের একান্ত বশম্বদ মানুষটিকে এড়িয়ে চলতেন। তাঁরা জানতেন, যমের হাত থেকে পার পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু সোমেশ্বর দারোগার হাত থেকে পার পাওয়া একান্তই অসম্ভব।

এ যুগের মত সে যুগেও সরকারের একান্ত অনুগত অফিসারদের সাতখুন মাপ ছিল। বিশেষ করে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের যেসব অফিসারেরা ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করাকেই তাঁদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন তাঁদের প্রতি সরকারের উদারতা ছিল অপরিসীম। দারোগা সোমেশ্বর ভট্টাচার্য সেই দলের মানুষ ছিলেন বলেই ডিপার্টমেণ্টের উর্ধতন সাহেবদের সেই উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর পয়সা-কড়ির মালিক হয়েছিলেন। বর্দ্ধমান সহরে পাকা বাড়ি ছাড়াও প্রচুর জমি-জমার মালিক হয়েছিলেন সোমেশ্বর। সরকারী কাগজ-পত্রেও মোটা টাকা খাটতো তাঁর। ইচ্ছে করলে সে যুগে সোমেশ্বর দারোগা ছোটখাটো জমিদারীও কিনে ফেলতে পারতেন। সরকারী বিভাগে বিশেষ করে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ব্রিটিশ তোষণের এমনই মহিমা ছিল সে যুগে।

সোমেশ্বরের একমাত্র ছেলে জগদীশ। সোমেশ্বরের ইচ্ছে ছিল সাহেব-

সুবোদের বলে কয়ে জগদীশকেও পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢোকাবেন। তাঁর নিজের চেষ্টায় এক জেনারেশনে তিনি যে সম্পদ আহরণ করেছেন, দ্বিতীয় জেনারেশনে জগদীশ তা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে। সেই মুহূর্তে সোমেশ্বরের মনের কোণে তৃতীয় জেনারেশনের কথাও উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছিল কিনা তা' একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আইনের ধ্বজা উড়িয়ে বে-আইনী কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করার এমন অপূর্ব সুযোগ সেকালে একমাত্র পুলিশ বিভাগ ছাড়া আর কোথাও তেমন ছিল না। শুধু সেকাল কেন, একালেও তার তেমন কোন হের-ফের ঘটে নি। তবে তফাৎ কেবল এইটুকুই যে সেকালে এই বিভাগের নীচু স্তরের কর্মীরা তেমন একটা ইংরেজী না জেনেও অপরাধ দমনের টেক্‌নিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং পয়সার বিনিময়ে কিছু কাজও করতেন। আর একালের কর্মীদের একাংশ অশুদ্ধ ইংরেজীর জ্ঞান নিয়ে এবং অপরাধ দমনের ধারে কাছেও না গিয়ে কেবল লুটেপুটে খাওয়ার ধান্দাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেকালে কাজ ও পয়সা দু'টোই ছিল মুখ্য। আর একালে পয়সাটাই কেবল মুখ্য, কাজ একেবারেই গৌণ। অবশ্য ব্যতিক্রম সেকালেও ছিল, একালেও আছে।

সোমেশ্বরের আশা কিন্তু ফলবতী হলো না। কেবল তাই নয়, জগদীশ সম্পর্কে এমন সব খবর তাঁর কানে আসতে লাগলো যাতে সোমেশ্বর উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলেন না।

যে জেলায় সোমেশ্বর চাকরি করতেন সেখানকার বিলিতি এস-পি একদিন সোমেশ্বরকে ডেকে বললেন, লুক্‌ সোমেশ্বর, তোমার ছেলের সম্পর্কে ডি-আই-বি থেকে যেসব খবর পাচ্ছি তা' কিন্তু মোটেই ভালো নয়। বি কেয়ারফুল এবাউট ইওর সন।

সোমেশ্বর একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। যে ছেলেকে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢোকাবার জন্যে তিনি চেষ্টা তদ্বির করছেন তার সম্পর্কে জেলার এই বিলিতি পুলিশ সাহেব এমন কি খবর পেয়েছেন যাতে তার সম্পর্কে তাকে সতর্ক থাকতে বলছেন? কিছুই বুঝতে না পেরে সোমেশ্বর সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এস-পি বোধহয় বুঝতে পারলেন সোমেশ্বরের অবস্থা। তাই আরও একটু স্পষ্ট করে তিনি বললেন, তোমার ছেলে স্বদেশী দলে নাম লিখিয়েছে। ওকে এখন থেকেই কণ্ট্রোল করতে না পারলে এরপর কণ্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে তোমার সার্ভিস রেকর্ডের ওপরও খারাপ ছাপ পড়তে পারে। তাই বলছি, বি কেয়ারফুল এবাউট ইওর সন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সোমেশ্বর। তিনি কখনও চিন্তাই করতে পারেন নি যে তাঁর ছেলে কোনদিন স্বদেশী করবে, আর তারই ফলে তাঁর এতদিনের যত্নে তৈরি করা সার্ভিস রেকর্ড কালিমালিপ্ত হয়ে উঠবে। নিজের চমৎকার সার্ভিস রেকর্ডটি তৈরি করতে কম মেহনত করতে হয়নি তাঁকে। পরিশ্রম করতে তো হয়েছেই, এমনকি নিজের আদায় উশুলের একটা মোটা অংশ নিয়মিত খরচ করতে হয়েছে জেলার উঁচু মহলের পেছনে।

বাড়িতে ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে রইলেন সোমেশ্বর। স্ত্রীকে সবকিছু বললেন, কিন্তু জগদীশকে ডেকে তাকে ধম্‌কানোর মত সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। আসলে, বি-এ ক্লাশের ভালো ছাত্র, একটু অতিরিক্ত গম্ভীর ও ন্যায়পরায়ণ জগদীশকে সোমেশ্বর মনে মনে একটু ভয় করেই চলতেন। পুত্রের মুখোমুখি দাঁড়ালে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হতো তাঁর।

অবশেষে সোমেশ্বর একদিন কথাটা বলেই ফেললেন জগদীশকে। শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন জগদীশ। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন, বাবা। আমি স্বদেশী করি। দেশকে আমি ভালোবাসি, তাই স্বদেশী করছি।

সোমেশ্বর বললেন, কিন্তু তুই কি বুঝতে পারছিস না, এতে আমার চাকরির ওপর আঘাত আসতে পারে? দারোগার ছেলে স্বদেশী করে বেড়ায়, এটা সাহেব সুবোরা কতদিন সহ্য করবে?

—সহ্য না করতে পারে তো করবে না, কিন্তু তার জন্যে আমি স্বদেশী ছাড়বো কেন? আমি তো আর তাদের চাকরি করি না।

—তুই না করিস, তোর বাবা করে, ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন সোমেশ্বর, তোর বাবার কথা ভেবেও তো তোর এপথ থেকে সরে আসা উচিত।

—না, এমন কোন খারাপ পথে আমি যাইনি যে সরে আসার প্রশ্ন উঠতে পারে। আর সাহেব সুবোদের কথা ছেড়ে দিন। ছেলের দোষে বাপকে শাস্তি দিতে ওদের কোনকালেই বাধে না।

—তা'হলে ডিপার্টমেণ্টে সকলের কাছে আমি হেয় হই, তাই তুই চাস, কেমন?

—না, আমি তা চাই না। তবে ছেলে স্বদেশী করছে বলে বাপকে যদি হেয় হতে হয় তা'হলে আমার কিছু করার নেই।

সোমেশ্বর একটু সময় চুপ করে থাকেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললেন, পয়সা খরচ করে কলেজে পড়াচ্ছি। এখন দেখছি পয়সাটাই জলে যাচ্ছে।

বলে ওঠেন জগদীশ, না বাবা, পয়সা জলে ঢালছি না আমি। পড়াশোনা ঠিক মতই করছি। আর, সেই সঙ্গে স্বদেশীও করছি।

—তা'হলে তুই আমার কথা শুনবি না? ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে উঠতে থাকেন সোমেশ্বর।

—আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন, বাবা। আপনার অন্যায় কথা আমি শুনতে পারবো না।

—কী, আমি অন্যায় বলছি? হঠাৎ দারুণ রেগে ওঠেন সোমেশ্বর। এতক্ষণে বাপ সোমেশ্বরের জায়গায় দেখা দেয় দারোগা সোমেশ্বর।

ভয় পেয়ে নয়, বাপের এই হঠাৎ উত্তেজনাকে সম্মান দেখাতে গিয়েই চুপ করে থাকেন জগদীশ।

বলতে'থাকেন সোমেশ্বর, ন্যায়-অন্যায় আমি জানি না। তবে এটুকু জানি যে আমার কথামতই তোর চলা উচিত এবং চলতেও হবে। আর, তা' যদি না পারিস তা'হলে তোর পেছনে আর একটি পয়সাও আমি খরচ করবো না। ভস্মে ঘি ঢালতে আব আমি রাজি নই।

শান্ত কণ্ঠে জগদীশ বললেন, বেশ তাই হবে বাবা, আমার পেছনে আপনাকে আর খরচ করতে হবে না। কলেজে আর যাবো না আমি।

—হ্যাঁ, তাই করিস। বলেই সেখান থেকে উঠে যান সোমেশ্বর।

কলেজের মেধাবী ছাত্র জগদীশ যে সত্যি সত্যি লেখাপড়া ছেড়ে দেবেন তা' কিন্তু বাস্তবিকই ভাবতে পারেন নি সোমেশ্বর। কিন্তু সত্যিই যখন জগদীশ কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে পুরোপুরি স্বদেশী নিয়ে মেতে উঠলেন তখন নিজের অদৃষ্টকেই কেবল ধিক্কার দিলেন সোমেশ্বর। এমনি ভাবেই পিতা-পুত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলো একটা ব্যবধান। মা কাঁদেন, সোমেশ্বর গম্ভীর হয়ে থাকেন, কিন্তু জগদীশ নির্বিকার। স্বদেশী কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে তিনি মাসের অধিকাংশ দিনই বাইরে বাইরে কাটান। কখনও হঠাৎ একবেলা বা একটা দিনের জন্যে বাড়ি এসে মা'কে দেখা দিয়েই আবার বেরিয়ে যান। সোমেশ্বর ওপরওয়ালাদের জানিয়ে দিলেন যে ছেলে জগদীশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

মানুষ একদিকে পিছু হটলে আর একদিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। সোমেশ্বর স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে পুত্রের ব্যাপারে সাংসারিক ক্ষেত্রে তিনি পিছু হঠছেন। জগদীশ সম্পর্কে তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। ছেলে নিরাশ করেছে তার বাপকে। কাজেই তিনি নিজের চাকরিকে আরও আঁকড়ে

ধরলেন। চাকরিই এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। অবশ্য নিষ্ঠার অভাব কোন কালেই তাঁর ছিল না, ইদানীং সেই নিষ্ঠা আরও বেড়ে উঠলো।

স্বদেশীদের সম্পর্কে এতকাল একটা হালকা ধরনের মনোভাব ছিল সোমেশ্বরের। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে স্বদেশীওয়ালারা ব্রিটিশ শক্তির মত বিশ্বের একটা পয়লা নম্বর শক্তিকে কোনদিন এদেশের মাটি থেকে উৎখাত করতে পারবে। তাদের মুখে স্বাধীনতার বুলিকে ফাঁকা আওয়াজ বলেই মনে করতেন সোমেশ্বর। এতদিন তিনি বিনা প্রয়োজনে স্বদেশীওয়ালাদের সম্পর্কে মাথা ঘামাতেও যেমন রাজি ছিলেন না, তেমনি চাকরির খাতিরে তাদের ওপর অত্যাচার কবতেও পেছপা হতেন না। কিন্তু পুত্রের আচরণ পাল্টে দিয়েছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে। কেবলমাত্র সরকারের স্বার্থে নয়, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থেই তিনি এরপর থেকে স্বদেশীওয়ালাদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। তাদের ওপর অত্যাচার করা কিম্বা তাদের অপদস্থ করার কোন সুযোগই তিনি ছাড়তেন না। তাঁর কেবলই মনে হতো, এদের কার্যকলাপই তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁর একমাত্র পুত্রকে। তাই তিনি গায়ের ঝাল মেটাতে শুরু করলেন স্বদেশীওয়ালাদের ওপর। জগদীশ সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব ধীরে ধীরে কঠোর কঠিন হয়ে উঠলো।

অবশেষে এলো উনিশশো বেয়াল্লিশের সেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। গান্ধীজীর ডাকে আসমুদ্র হিমাচল তোলপাড় হয়ে উঠলো। অহিংস আন্দোলন রূপ নিল সহিংস সংঘর্ষে। হাজার হাজার মানুষকে কারান্তড়ালে পাঠাতে লাগলো ব্রিটিশ সবকার। নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মগোপন করে আন্দোলনের কাজ করে যেতে লাগলেন। সোমেশ্বর দারোগার ছেলে জগদীশও ছিলেন সেই দলে।

জগদীশ কিন্তু বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। দীর্ঘ তিনমাস পরে একদিন গভীর রাতে তিনি দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর মায়ের সঙ্গে: ফিরে যাবার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন তিনি। পুলিশ রেকর্ডে যাই লেখা থাকুক না কেন, সোমেশ্বরের পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় মহলে কিন্তু প্রচার হয়ে গেল সোমেশ্বর নিজেই ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এইজন্যে নাকি তিনি মোটা পুরস্কারও পেয়েছিলেন সরকারের কাছ থেকে। বিচারে দীর্ঘ মেয়াদের জেল হয়ে গেল জগদীশের।

জেলে থাকতে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ দেখা করতে যেত জগদীশের সঙ্গে। স্পষ্ট করে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে তারা তাঁকে

জানিয়েছিল যে তাঁর এই ধরা পড়ার মূলে নাকি ছিলেন তাঁর বাবা। কথাটা শুনে কেবল একটু হেসেছিলেন জগদীশ। তাঁর মা'ও দু'একবার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে জেলে গিয়েছিলেন। জগদীশ কিন্তু মায়ের কাছে কোনদিন তাঁর বাবার প্রসঙ্গ তোলেন নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটলো উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট। স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ। ছাড়া পেলেন রাজবন্দীরা। জেল থেকে বেরিয়ে জগদীশ সোজা চলে গেলেন তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সোমেশ্বর তখন একটা থানার ও-সি। থানা সংলগ্ন কোয়ার্টারেই স্ত্রী ও কয়েকজন আত্মীয়-আত্মীয়া নিয়ে সোমেশ্বরের সংসার।

মার কাছে মাত্র আধঘণ্টা ছিলেন জগদীশ। তারপরেই তিনি সোজা চলে এলেন কলকাতায়। তারপরেই শুরু হলো তাঁর নিজের জীবন সংগ্রাম।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো স্বাধীনতা লাভের আনন্দ ও উন্মাদনা। নেতারা এবার কালনেমির লঙ্কাভাগে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দীর্ঘ পরিশ্রমের পরে এবার একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন তাঁদের। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লোভে তাঁরা তখন দিশেহারা। দিল্লীর মাটিতে বুকের রক্ত ঢাললেন মহাত্মাজী। শ্রদ্ধেয় নেতাদের কার্যকলাপে হতাশ হয়ে পড়লেন জগদীশ। নিজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তিনি একা—সম্পূর্ণ একা। কেউ নেই তাঁর দলে। মধু লোভী মৌমাছির মত তারা সব গিয়ে জুটেছে অন্যত্র।

পবিত্র রাজনৈতিক চরিত্রের এমন অপমৃত্যু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর দেখতে পারলেন না জগদীশ। নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। কিন্তু এই বিরাট সহরে থাকবেন কোথায় তিনি ? খাবেন কি ?

বি-এ পর্যন্ত পড়া বিদ্যেয় চাকরি জোটানো ভার। রাজনৈতিক দাদাদের ধরলে তেমন একটা কিছু অবশ্য জুটিয়ে নিতে পারতেন তিনি। কথাটা কেবলমাত্র ভাবতেই মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো তাঁর। অবশেষে অনেক কষ্টে একটা মাষ্টারী জুটিয়ে নিলেন একটা স্কুলে।

এককালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধাচরণ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্মীর চাকরিজীবনে ছেদ্ টেনে দিয়েছিল বলে শোনা যায়নি। বিশেষ করে, নীচুস্তরের কর্মীরা আগেও যা ছিল পরেও তা-ই রইলো। বরঞ্চ দেশভাগের কল্যাণে রাতারাতি উঁচু পদে উঠে গেল অনেকে। দারোগা সোমেশ্বরও কেবল একটা জেলা থেকে বদলী হলেন আর একটা জেলায়। স্বাধীনতার নতুন হাওয়া কিন্তু পুলিশ মহলে দুর্নীতির ছেদ্ ঘটাতে পারলো না,

বরঞ্চ দুর্নীতির নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হলো যার অস্তিত্ব ব্রিটিশ আমলে ছিল না।

জেলা সদর থানার ও-সি সোমেশ্বরের রিটায়ার করতে আর মাত্র বছর খানেক বাকি। পয়সার মোহ তখনও তাঁর ঘোচেনি। দু'হাতে পয়সা রোজগার করে চলেছেন তখনও। দেশের নতুন আবহাওয়ায় টেকনিক পরিবর্তন করার কথাও বোধহয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আর, তারই ফলে দীর্ঘ চাকরি জীবনের শেষ মুহূর্তে কালো হয়ে উঠলো তাঁর সার্ভিস রেকর্ড। সরকারী পারমিট কেনা-বেচার ঘটনায় মোটা টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেন তিনি। প্রায় ঘাটে এসে নৌকো ডুবলো তাঁর।

আদালতে ঘুষের মামলা না টিকলেও ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিংয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন সোমেশ্বর। কিন্তু তাতে তাঁর বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হলো না। ততদিনে তিনি প্রচুর অর্থ ও বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছেন। বর্দ্ধমান সহরে নিজের বাড়িতে এসে উঠলেন সোমেশ্বর।

স্ত্রী ও জনাকয়েক আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বর্দ্ধমানে আর্থিক স্বচ্ছলতায় দিন কাটান সোমেশ্বর, আর কলকাতায় চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটে জগদীশের। ততদিনে জগদীশ বিয়ে করেছেন। স্ত্রী ও দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। একমাত্র পুত্রকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে পরবর্তী কালে চেষ্টাও করেছিলেন সোমেশ্বর। কিন্তু জগদীশ ফেরেন নি। চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যেও বাপের পাঠানো টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, শত শত মানুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাস মাখানো ঐ পয়সায় আমার প্রয়োজন নেই। বাবার টাকা-কড়ি বাবারই থাক। তাঁর বিষয় সম্পত্তিও আমি চাই না। তিনি তা' যাকে ইচ্ছে তাকে দিতে পারেন। তাঁর কোন কিছুই আমি স্পর্শ করতে চাই না। এমনি করেই পিতাপুত্রের বিচ্ছেদের শক্ত দেয়ালে সামান্যতম ফাটল ধরতেও দিলেন না জগদীশ।

একটু বড় হয়ে দাদু সোমেশ্বর সম্পর্কে সব কথাই জানতে পেরেছিল নাতি রুদ্রদেব। জগদীশ নিজে কখনও বর্দ্ধমান না গেলেও রুদ্রকে কিন্তু দাদুর কাছে যেতে বারণ করেন নি কখনও। রুদ্র মাঝে মধ্যেই যেত সেখানে, তবে দু'এক দিনের বেশি সেখানে থাকার অনুমতি মিলতো না জগদীশের কাছে।

সোমেশ্বর এখন বৃদ্ধ। চাকরি জীবনের উষ্ণ রক্ত এখন অনেক ঠাণ্ডা। প্রকৃতির নিয়মে দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেও ঘটেছে দারুণ পরিবর্তন। সহজকে এখন প্রায়শই জটিল বলে মনে হয়। সাংসারিক অভিজ্ঞতার পোড়-খাওয়া মন এখন

অনেক সতর্ক, অনেক সন্দিগ্ধ। সেই মন নিয়েই জীবনের দেনা-পাওনার হিসেব করতে বসে সোমেশ্বর দেখলেন যে পাওনার ঘরে রয়েছে একটা বিরাট শূন্য। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারে নি তাঁর সারা জীবনের সংগৃহীত ধন-সম্পদ।

মনটা হাহাকার করে ওঠে সোমেশ্বরের। চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে ওঠা অতীতকে ভুলতে চান তিনি। কিন্তু অতীত এত সহজে রেহাই দেয় না মানুষকে। সে তার পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নেয় অনুশোচনার মাধ্যমে।

সোমেশ্বর এতদিনে বুঝতে পেরেছেন জগদীশ আর কোনদিনই ফিরবে না। তাই পৌত্র রুদ্রকে অবলম্বন করেই আবার নতুন করে বাঁচতে চান তিনি। ইচ্ছে হয় রুদ্রকে নিজের কাছে বরাবরের জন্যেই ধরে রাখেন, কিন্তু তার উপায় নেই। এমনকি তাকে নিজের কাছে একটা দিন বেশী ধরে রাখতেও সাহস হয় না তাঁর। কি জানি, জগদীশ যদি রেগে গিয়ে ওর এখানে আসাটাই বন্ধ করে দেয়?

দাদুকে কিন্তু ভারি ভাল লাগে রুদ্রর। তার এই দাদুটি যেন একখানি গল্পের জাহাজ। তাঁর পুলিশী জীবনের কীর্তি কাহিনীর রোমাঞ্চকর ঘটনা হাঁ-করে বসে শোনে রুদ্র। শুনতে শুনতে তার ছোট্ট মন কখনও ভয়ে ধুক্ ধুক্ করে, কখনও বা উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করে। দাদু থামতে চাইলেও তাঁকে থামতে দেয় না রুদ্র। বলে, আর একটু বলো না দাদু, কাল সকালে তে কলকাতা চলে যেতেই হবে।

রুদ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছল্ ছল্ চোখে ভারি কণ্ঠে বলেন সোমেশ্বর হ্যাঁ দাদু, এখানে থাকার মেয়াদ তো তোমার কাল সকালেই শেষ। আবার কতদিন পরে আসবে কে জানে?

—আমার তো এখানে থাকতে ভালই লাগে দাদু, কিন্তু বাবা যে থাকতে দেন না। অনুযোগের স্বর ভেসে ওঠে রুদ্রর কণ্ঠে।

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন সোমেশ্বর। তাঁর সেই মুহূর্তে নিজেকে বিশ্বের রিক্ততম মানুষ বলেই মনে হয়।

পুলিশী জীবনে সোমেশ্বরের কার্যকলাপ, তাঁর ওপর জগদীশের বিতৃষ্ণার কারণ, এমনকি প্রচণ্ড ঘুষখোর দারোগা সোমেশ্বরের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার কাহিনী আত্মীয় স্বজন মারফত কানে এলেও কেন যেন যুবক রুদ্র তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে না। বরঞ্চ দাদুর জন্যে তার মনের একটা বিশেষ কোণ বেদনায় টন্‌টন্ করে ওঠে। দাদুর তোবড়ানো মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড অনুশোচনার ছায়া লক্ষ্য করে সে। মাঝে মাঝে তার বাবার আচরণকে

অতিরিক্ত কঠোর বলে মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে কখনও আলোচনা করে না রুদ্র। মনের কথা মনেই চাপা থাকে তার।

ইদানীং কলেজের ছুটি-ছাটায় প্রায়ই দাদুর কাছে বেড়াতে আসে রুদ্র। জগদীশ যেন দেখেও আজকাল দেখেন না, বলেনও না কিছু রুদ্রকে। কিন্তু তাঁর এই না বলাটাই যেন বলার চাইতে অনেক বেশি। সতর্ক হয়ে থাকতে হয় রুদ্রকে। দাদু থাকার জন্যে বেশি পীড়াপীড়ি করলে রুদ্র তাঁর শীর্ণ হাতখানি নিজের সবল হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, না দাদু, আজ আমি যাই। নইলে বাবা হয়তো রাগ করবেন। সামনের সপ্তাহেই আবার না হয় আসবো।

রুদ্রর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সোমেশ্বর হয়তো বলেন, বেশ, তাই আসিস দাদু। আর যে ক'টা দিন বেঁচে আছি এমনি ভাবেই মাঝে মাঝে এসে দাদুকে দেখা দিয়ে যাস।

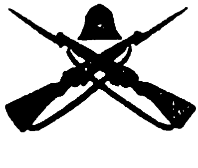
সোমেশ্বরের গায়ের কাছে ঘেঁষে বসে তাঁর পুলিশী জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী শুনতে এই বয়সেও কিন্তু ভালো লাগে রুদ্রর। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার কৌতূহলেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর নিছক গল্পের জন্যেই গল্প শুনতে ইচ্ছে হয় না তার। গল্পের সীমানা ছাড়িয়ে পুলিশী মানসিকতার খবর সংগ্রহ করতে ইচ্ছে হয়। এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে, ওদের এমন একটা নিজস্ব জগৎ আছে যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওদের সেই নিজস্ব জগৎটাকে ওরা বাইরের সাধারণ জগৎ থেকে পৃথক করে রাখে। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের যে কর্মী বাইরে কারুর স্বামী, কারুর পুত্র বা কারুর পিতা, ওদের নিজস্ব জগতে তার একমাত্র পরিচয় 'পুলিশ' – প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী পুলিশ বাহিনীর একজন কর্মী। সমাজের নিজের হাতে দেওয়া ক্ষমতার আয়নায় সেখানে বসে সে নিজের মুখ দেখেই নিজে পুলকিত হয়ে ওঠে। গ্রীক পুরাণের নার্সিসাসের মত কেউ কেউ আবার নিজের সেই প্রতিচ্ছবিকেই এত ভালবেসে ফেলে যে অন্য জগৎটাকে প্রায় আমল দিতেই চায় না। সমাজের দেওয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে সমাজকেই প্রায় ভুলতে বসে। আর, ঠিক তখনই সে হয়ে ওঠে সমাজের বোঝা।

এত কিছু জেনেও কিন্তু জানার কৌতূহল শেষ হয় না রুদ্রর। আরও গভীরে ডুব দিতে চায় সে। জানতে চায়, মানুষ হয়েও কেমন করে তারা সময় সময় অমানুষের মত আচরণ করে। বুঝতে চায়, সমাজকে রক্ষা করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েও কেন তারা অতি সহজে ভুলে যায় সেই অঙ্গীকারের

কথা। ভদ্র শিক্ষিত একটি যুবক কেমন করে সহসা অর্থ-সর্বস্ব মনের অধিকারী হয়ে উঠে অপরাধীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীর মন ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজের ঠাকুর্দা সোমেশ্বরের সেই পুলিশী মনটাকেও যাচাই করতে চেষ্টা করে রুদ্রদেব। সময় সময় তার মনে হয় এদেশের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে অসততা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বিশেষণগুলোই শেষ কথা নয়। পাঁকেই পদ্ম জন্মে। দস্যু রত্নাকরই একদিন হয়ে উঠেছিলেন মহর্ষি বাল্মীকি। ওদের মানবিক গুণগুলি বিকাশের পথ খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ওদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে 'লা-মিজারেবল'-এর সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর। সেদিন ওদের দেওয়া ঐ বিশেষণগুলোর ধার আপনিই যাবে কমে। কিন্তু তার জন্যে যে চাই ভালোবাসা, চাই সহানুভূতি। কে দেবে সেই ভালোবাসা? কোন্ রামচন্দ্র আপন ইচ্ছায় এগিয়ে এসে উদ্ধার করবে পাষাণী অহল্যাকে?

দাদু সোমেশ্বরের সঙ্গে মিশে সেই ছেলেবেলা থেকেই রুদ্রর সংবেদনশীল মন কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রতি। এই আকর্ষণ কোন ভালোবাসার আকর্ষণ নয়, বরঞ্চ বলা চলে, অজানাকে জানার এক প্রচণ্ড কৌতূহল। ওদের সেই নিজস্ব জগৎটাকে ভালকরে জানতে চায় রুদ্র। দেখতে চায়, বুঝতে চায় সেই জগতের বাসিন্দাদের মানসিকতা। কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে তো অন্দরমহলের সঠিক খোঁজ পাওয়া যায় না। তার জন্যে যে অন্দরমহলেই ঢুকতে হয়। তাই তো একদিন সর্বভারতীয় পরীক্ষার কথা মনে হতেই ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের দিকে তার নজর পড়লো। আর তারই ফলে ইউনিভার্সিটির এম-এ ডিগ্রি লাভের আগেই আই-পি-এস হয়ে আদর্শবাদী সামান্য স্কুল শিক্ষক জগদীশ ভট্টাচার্যের পুত্র ও সেকালের প্রচণ্ড ঘুষখোর দারোগা সোমেশ্বর ভট্টাচার্যের পৌত্র রুদ্রদেব ভট্টাচার্য চলে গেল মাউণ্ট আবুর সেন্ট্রাল পুলিশ ট্রেনিং ইন্স্টিটিউটে।



মানুষের মনের পরিবর্তন যে কত তাড়াতাড়ি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা বোধহয় একান্তই অসম্ভব। কিন্তু তবুও মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করতে ছাড়ে না। পরস্পরের সম্পর্কের বিষয়ে মানুষ অহরহই সেই ভবিষ্যদ্বাণী

করে চলেছে। সে অবশ্য তা' প্রকাশ্যে করে না, করে মনে মনে। অবশেষে, সে যখন দেখতে পায় যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, যখন বুঝতে পারে পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা মাপতে গিয়ে সে একদিন ভুল করেছে, তখন সে বিস্মিত হয় মানসিক পরিবর্তনের সেই দ্রুত গতি দেখে, দুঃখ পায় হিসেবে ভুল করেছিল ভেবে।

মানুষের জীবনে প্রেম ভালোবাসা কিছু চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। তারও জোয়ার-ভাটা আছে। বিশেষ করে যে ভালোবাসা মাটিতে শেকড় গাঁথার আগেই ডালপালা ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, একটা বড়সড় ঝড় তো দূরের কথা, সামান্য একটা হাওয়ার ঝাপ্টাই তাকে কাত করে ফেলতে যথেষ্ট। নোঙরহীন নৌকা জোয়ারের টানে যতই কেন না তর তর করে এগিয়ে যাক, ভাটার মুখে তাকে আবার ফিরে আসতেই হবে।

মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই অলকার পরিবর্তন দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না রুদ্র। দিন কয়েকের মাত্র ছুটিতে রুদ্র মাউণ্ট আবু থেকে এসেছিল কলকাতায়। ইচ্ছে ছিল অলকার সঙ্গেই সে প্রথম দেখা করবে। ভেবেছিল তার সেই অনিয়মিত চিঠি লেখার জন্যে তার সঙ্গে ঝগড়া করবে। কিন্তু অলকার সঙ্গে দেখা করার আগেই একদিন রাস্তায় অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল তার দীপকদার সঙ্গে।

রুদ্রকে দেখে রাস্তার মাঝেই হৈ-হৈ করে উঠলো দীপক। তার স্বভাবসিদ্ধ চড়া গলায় বলে উঠলো, আরে রুদ্র যে, কবে এলি ? বাঃ, এই ক'মাসের মধ্যেই যে চেহারাটাকে বেশ বাগিয়ে নিয়েছিস। তা, সত্যি বলতে কি, চেহারায় কোনকালেই তুই তেমন স্মার্ট ছিলি না। কিন্তু এখন তোকে সত্যিই স্মার্ট লাগছে।

রুদ্র কিছু জবাব দেবার আগেই দীপক আবার বললে, রাস্তায় এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা চলে ? চল্ একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

রুদ্র আবার কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে দীপক হেসে বললে, নারে, না। আজ আর তোর পয়সায় চা খাবো না। তোকেই আজ আমি চা খাওয়াবো। জানিস, তোদের দীপকদার এখন অনেক পয়সা। দিনে রাতে তিনটে টিউশনি করে নগদ আড়াইশো টাকা মাসে আয় করি। নে, চল্—চল্। বলতে বলতে দীপক প্রায় জোর করেই রুদ্রকে নিয়ে এসে তোলে একটা রেস্টুরেন্টে।

টিউশনি করে দীপক যে ইদানীং দু'পয়সা রোজগার করছে তা' বোঝা

গেল রেস্টুরেণ্টের বয়কে অর্ডার দেওয়া খাবারের তালিকা থেকে। রুদ্র প্রতিবাদ করে বললে, তুমি কি পাগল হলে নাকি দীপকদা? শুধু শুধু এতসব খাবারের অর্ডার দিয়ে পয়সা নষ্ট করার কোন মানে হয়?

হো-হো করে হেসে উঠে দীপক বললে, দেখ রুদ্র, তোদের পয়সায় চা-টোস্ট অনেক খেয়েছি। কিন্তু কখনও খাওয়াতে পারিনি তোদের। আজ যখন পকেটে টাকা আছে তখন আমাকে বাধা দিস্ না। আর পাগল হওয়ার কথা যখন বলছিস তো বলি, পাগল যদিও এখনও হইনি, তবে হতেও আর বেশি দেরি নেই।

—কেন, কী হয়েছে? কৌতূহলী হয়ে ওঠে রুদ্র।

বলতে থাকে দীপক, আমাদের সংসারের অবস্থা তো তুই সবই জানিস। বাবা যে ক'টা টাকা রেখে গিয়েছেলেন তা'দিয়ে তো এতকাল চললো। এখন ভরসার মধ্যে আমার এই তিনটে টিউশনি। এদিকে মা এবার জেদ ধরেছেন এই অগ্রাণেই আমাকে বিয়ে করতে হবে। পাত্রীও নাকি তিনি পছন্দ করে ফেলেছেন। আমাকে একটু কষ্ট করে টোপর মাথায় দিয়ে কেবল বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হবে। এবার তুই-ই বল্, পাগল হতে আর কী বাকি আছে আমার?

রুদ্র হেসে বললে, তা', মা যখন ব্যবস্থা করেই ফেলেছেন—

—সেখানেই তো ঠেকেছি রে, রুদ্র। সংসারে থাকার মধ্যে তো কেবল ঐ মা। তাঁর মনে কষ্ট দিতে বড় লাগে। বয়স হয়েছে। বাঁচবেনও না আর বেশিদিন। তাই ভাবছি—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে দীপক আবার বললে, যাক্ গে ওসব কথা। এখন তোর কথা বল্, শুনি। কবে এলি? কতদিন থাকবি?

জবাব দেয় রুদ্র, মাত্র কাল এসেছি সাত দিনের মেয়াদে।

—কেমন কাটছে ওখানে? জিজ্ঞেস করে দীপক, লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?

—ভালই। ছোট্ট জবাব দেয় রুদ্র।

—আচ্ছা, তোদের ওখানকার কোর্সের মধ্যে মানুষ ঠেঙানোও একটা আইটেম, তাই না রে? ওতেও বোধ হয় তোদের ট্রেনিং নিতে হয়? হালকা সুরে কথাটা বলেই হেসে ওঠে দীপক।

রুদ্রও হালকা সুরে জবাব দেয়, হ্যাঁ, নম্বর ওয়ান আইটেম। ঐটেই তো পুলিশের প্রধান কাজ। বলেই সেও হেসে ওঠে।

হাসি থামিয়ে রুদ্র আবার বললে, ওসব কথা এখন থাক, দীপকদা। এবার বলো, চিঠি দিলেও জবাব দাও না কেন?

সহসা কোন জবাব না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে দীপক। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, আমার কথা ছেড়ে দে। কখন কোন্ মুডে থাকি তার ঠিক কি? ইদানীং মায়ের কড়া তাগিদে মাথাটা খারাপ হবার জোগাড়। তা,' অলকার চিঠিপত্র ঠিকমত পাচ্ছিস তো?

অলকার প্রসঙ্গে একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে রুদ্র। একটু সময় চুপ করে থেকে তারপর বললে, না, সেও ঠিকমত চিঠি দেয় না। আমার দেওয়া তিন চারখানা চিঠির পরে হয়তো একখানার জবাব দেয়, তাতেও এখানকার খবরাখবর প্রায় কিছুই থাকে না। থাকে কেবল তার রাজনীতির প্রসঙ্গ।

—তা' তো থাকবেই, বলতে থাকে দীপক, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন সে রাজনীতির সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টায় ব্যস্ত।

—অলকা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে নাকি? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রুদ্র, কই সেকথা তো ঘুণাক্ষরেও সে আমাকে জানায় নি।

—না-না, জবাব দেয় দীপক, কাগজে কলমে ইউনিভার্সিটিতে নামটা এখনও আছে বটে, তবে এখন সে দেশ উদ্ধার করে বেড়াচ্ছে। পুরো টাইমের কর্মী। ইউনিভার্সিটিতে প্রায় আসেই না।

চুপ করে ভাবতে থাকে রুদ্র। বোধহয় এইজন্যেই অলকা তার চিঠি-পত্রের জবাব দিতে সময় পায় না। মনটা ভারি হয়ে ওঠে রুদ্রর। এই ক'টা মাসের মধ্যেই এতটা পাল্টে গেছে অলকা!

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপক আবার জিজ্ঞেস করে, অলকার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, এখনও হয়নি, রুদ্র বললে।

—ওর বাড়ি গিয়ে আজকাল ওকে পাবি না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পার্টি অফিসেই থাকে। দেখা করতে চাস তো সেখানেই যা।

—হ্যাঁ, তাই যাবো। জবাব দেয় রুদ্র।

যাবো বললেও কিন্তু রুদ্র যায় না অলকার সঙ্গে দেখা করতে। কেমন যেন একটা অভিমান এসে তার যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। কী দরকার অলকার সঙ্গে দেখা করবে? এককালে সে তার বান্ধবী ছিল। তখন একটা স্রেফ ছেলেমানুষি মন দেয়া-নেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে। এর চাইতে আর কোন্ সম্পর্ক রয়েছে অলকার সঙ্গে? সে যদি বাস্তবিকই রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চায় তা'হলে রুদ্রর এমন কি প্রয়োজন পড়েছে সেখানে যেতে?

মানুষের মনের সত্যিকারের বাসনা কিন্তু নিজের প্রয়োজনেই যুক্তি খাড়া

করতে ওস্তাদ। অভিমান ছাপিয়ে মনের ইচ্ছা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন কেবল মুখ রক্ষার জন্যে মন যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে। রুদ্রর অবস্থাও অনেকটা তাই। দু'টো দিন যেতে না যেতেই অলকার স্বপক্ষে সে মনে মনে যুক্তি খাড়া করে। রাজনীতির প্রতি অলকার আকর্ষণ বরাবরের। এখন হয়তো কোন কারণে সেদিকে একটু বেশি ঝুঁকছে। সেইজন্যেই হয়তো সব সময় তার খবরাখবর নিতে তেমন একটা সময় পায় না অলকা। কিন্তু তাই বলে কলকাতায় এসে ওর ওপর অভিমান করে থাকারও কোন মানে হয় না।

এই ক'টা মাসের মধ্যেই অলকা যেন খানিকটা ভারিক্কি হয়ে উঠেছে। চেহারায় যদিও তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নি, কিন্তু মুখে-চোখে একটা অভিজ্ঞতার ছাপ্ পড়তে শুরু করেছে। গায়ের রংটাও ময়লা হয়েছে খানিকটা।

পার্টি অফিসের দরজার কাছেই অলকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রুদ্রর। অলকা একজন খদ্দর-পরা বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরে আসছিল। রুদ্রকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অলকা। তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সেই ভদ্রলোক বললেন, তা'হলে আমি যাই, মিস্ মজুমদার। কাল সকালে তো আপনি সি-এম্-এর ওখানে যাচ্ছেন। ওখানেই আবার দেখা হবে। মোট কথা, মিটিং-এর অ্যাজেণ্ডা কাল সকালের মধ্যে রেডি করে ফেলতেই হবে।

রুদ্রর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেই ভদ্রলোকের কথায় কেবল মাথা ঝাঁকায় অলকা। ভদ্রলোক রুদ্রর পাশ দিয়েই চলে যান। আর অলকা তার সুন্দর মুখখানায় একটা হাসির ঝিলিক তুলে এগিয়ে আসে রুদ্রর দিকে। সেই মুহূর্তে খদ্দর-পরা সেই ভদ্রলোকের কথায় রুদ্র এটুকু বুঝতে পারে যে এই অল্প-দিনের মধ্যেই অলকা ওর পার্টির একজন ছোট-খাটো নেত্রী হয়ে উঠেছে। এখন সে যখন-তখন সি-এম্ অর্থাৎ চীফ-মিনিস্টারের সঙ্গে দলের কাজ নিয়ে কথাবার্তা বলে।

অলকা এগিয়ে এসে রুদ্রর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তারপর মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বলে ওঠে, আজ ক'দিন ধরেই মাঝে মাঝে তোমার কথাই যখন মনে হচ্ছিল তখনই বুঝতে পারছিলাম যে তুমি নির্ঘাৎ আসবে। দেখ, আমার ভাবনার সঙ্গে তোমার এখানে আসাটা একদম মিলে গেছে। তা, আসার আগে একটা খবর দিলে না কেন?

অলকার কথায় রুদ্রর সেই প্রায়-নিঃশেষ হওয়া অভিমানটুকু আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। গম্ভীর কণ্ঠে সে কেবল বললে, খবর দিলে স্টেশনে গিয়ে আমাকে রিসিভ করতে নাকি?

রুদ্রর গম্ভীর কণ্ঠস্বর নজর এড়ায় না অলকার। এক-মুহূর্ত চুপ্ করে থেকে হালকা স্বরে সে জবাব দেয়, চেষ্টা অন্ততঃ করতাম।

—কিন্তু তুমি যেতে পারতে না নিশ্চয়ই, রুদ্র বললে, রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু ভাববার মত সময় আছে তোমার?

এবার খিল খিল করে হেসে ওঠে অলকা। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, এই যাঃ, তুমি যে দেখছি সত্যিই রেগে গেছ। বিশ্বাস করো লক্ষ্মীটি—

কথাটা শেষ না করেই অলকা থেমে গিয়ে কণ্ঠস্বর খাটো করে আবার বললে, না—না, এখানে নয়। চলো, বাইরে চলো। তুমি এতদিন পরে এসেছো। আজ আর কোন কাজ নয়। আজ শুধুই গল্প করবো তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে গল্প করার সময় তোমার হবে?

রুদ্রর পাশে হাঁটতে হাঁটতে তার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে তার একটা হাত স্পর্শ করে হেসে বলে ওঠে অলকা, হবে গো মশাই, হবে। বাব্বাঃ, কী রাগ! এতদিন পর দেখা, কোথায় দুটো মিষ্টি কথা বলবে। তা নয় তো, বাবু কেবল রাগই দেখাচ্ছেন। সময়মত চিঠির জবাব না দিয়ে না হয় অপরাধই করেছি, কিন্তু তাই বলে কি দুটো মিষ্টি কথাও বলতে নেই?

অলকার কথা বলার ভঙ্গিতে অভিমানটুকু কর্পূরের মত উবে যায় রুদ্রর। মৃদু হেসে সে বললে, এ যে দেখছি টন্‌টনে জ্ঞান। তা'হলে সময়মত চিঠির জবাব দিলেই পারতে?

অলকা কোন জবাব না দিয়ে কেবল রুদ্রর পাশে পাশে হাঁটতে থাকে।

সবে সন্ধ্যে হয়েছে তখন। রুদ্র ও অলকা কাছের একটা পার্কের মধ্যে বেঞ্চিতে এসে বসতেই একটা ঝালমুড়িওয়ালা এগিয়ে আসে তাদের দিকে। অলকা সেইদিকে তাকিয়ে রুদ্রকে বললে, এতক্ষণ ধরে আমাকে বকা-ঝকা করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তুমি। এবার এসো, ঝালমুড়ি খাই। কথাটা বলেই আবার হেসে ওঠে সে।

মুড়ির একটা ঠোঙা রুদ্রর হাতে তুলে দিতে দিতে মুখ টিপে হেসে অলকা আবার বললে, তা' পুলিশ সাহেবের এসবে রুচি আছে তো? কি জানি, আই-পি-এস'রা এসব আবার খান কিনা।

ঠোঙাটা হাতে নিয়ে হালকা স্বরে জবাব দেয় রুদ্র, না খাওয়াই উচিত। তবে তুমি যখন দিচ্ছ, তখন—। কথাটা শেষ না করেই একমুঠো ঝালমুড়ি মুখে পুরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে থাকে সে।

পাশাপাশি বসে মুড়ি খেতে খেতে গল্প করতে থাকে রুদ্র ও অলকা। জবাবদিহির ভঙ্গিতে একসময় অলকা বললে, বিশ্বাস করো, সত্যিই এক ফোঁটা সময় পাই না। রাত দিন কেবল কাজ আর কাজ। বাড়িতে বাবা রেগে আগুন, মাও প্রায় কথাই বলেন না আমার সঙ্গে। কিন্তু ওঁরা বুঝতে চান না যে ভালো লাগে বলেই তো দলের কাজ করছি। এতে শরীর খারাপ হয় না কখনও। এ একটা নেশা।

—আর, এই নেশাতেই বুঝি ইউনিভার্সিটি যাওয়াটাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছ? এম-এটা পাশ করার মত ধৈর্যটুকুও বুঝি আর ধরতে পারলে না?

মুড়ি খেতে খেতে অলকা জিজ্ঞেস করে, তোমাকে এসব কথা কে বললে?

—যে-ই বলুক না কেন, কথাটা সত্যি কিনা বলো।

মৃদু হেসে অলকা জবাব দেয়, সত্যি না হলেও একেবারে মিথ্যে নয়। বিশ্বাস করো, পড়াশোনা আর একদম ভালো লাগে না। দলের কাজ-কর্ম করতেই বেশ লাগে।

—হুঁ, মুখে একটা শব্দ করে রুদ্র বললে, দীপকদা তা'হলে ঠিকই বলেছে যে তুমি নাকি আজকাল ইউনিভার্সিটিতে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছ।

রুদ্রর মুখে দীপকের নাম শুনে অলকার ভ্রু-যুগল একটু বেঁকে ওঠে। মুড়ি খাওয়া থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে নাকি?

মাথা নেড়ে সায় দেয় রুদ্র। অলকা একটু সময় চুপ করে থেকে সহসা বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, স্নব—লোকটা এক নম্বর স্নব্। এখন ভাবি ঐ লোকের সঙ্গে এতদিন মিশেছি কেমন করে?

—কি বলছো তুমি, অলকা? দীপকদাকে স্নব্ বলছো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাকেই বলছি, বলতে থাকে অলকা, শুধু স্নব্ নয়, লোকটা পয়লা নম্বরের সিনিক্। সবেতেই কেবল সন্দেহ করাটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ওকে আজকাল আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না আমি।

রুদ্র চুপ করে থাকে। দীপকদার নামে অলকার দেওয়া ঐ সব বিশেষণগুলো তার ভালো লাগে না। নিজের সম্পর্কে দীপকদার ধারণা যদিও বরাবরই একটু উঁচু, কিন্তু তাই বলে তাকে এমনিভাবে স্নব্, সিনিক্ বলাটা মোটেই ঠিক নয়।

রুদ্র কিন্তু অলকার কথার কোন প্রতিবাদ করে না। সে বুঝতে পারে, দীপকদা বোধহয় অলকার এই রাজনীতি করাটাকে নিয়ে এমন কোন ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে যাতে ওদের মধ্যে এমনি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কাজেই এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর নাড়াচাড়া না করে রুদ্র অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে অলকার কাছে।

বললে, তুমি তো দেখছি ইতিমধ্যেই দলের একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছ। খোদ্ চীফ মিনিস্টারের সঙ্গেই ওঠ-বস করো।

একটু সলজ্জ হাসি হেসে জবাব দেয় অলকা, ওঠ-বস না ছাই। তবে দলের কাজে সবাই আমার ওপর খুশি। আমাকে স্নেহও করেন সবাই। যাক্ গে আমার কথা। এবার তোমার কথা কিছু বলো।

—আমার আবার কী কথা? মাউণ্ট আবুতে পাকা পুলিশ অফিসার হওয়ার সাধনায় মগ্ন আছি।

—ক'দিন থাকবে এখানে?

—মাত্র সাত দিনের জন্যে এসেছি। তার মধ্যে তিনটে দিন তো দেখতে দেখতেই চলে গেল।

—আবার কবে আসছো?

—এখন আর আসা হবে না। একেবারে ট্রেনিং শেষ করে আসবো, যদি অবশ্যি এই রাজ্যেই আমার এলট্‌মেণ্ট হয়।

রাত ন'টা নাগাদ পার্ক থেকে দু'জনে বেরিয়ে আসে। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে রুদ্র বললে, কাল ইউনিভার্সিটিতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছে আছে। এসো না একবার।

অনুনয়ের সুরে অলকা বলে ওঠে, লক্ষ্মীটি, কিছু মনে করো না। একটা জরুরী মিটিংয়ের ব্যাপারে কাল একদম নিঃশ্বাস ফেলতে সময় পাবো না। পরশু —হ্যাঁ, পরশু আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

—কোথায়? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দেয় অলকা, বিকেলের দিকে একবার দলের অফিসেই এসো না। তারপর কি যেন একটু চিন্তা করে তাড়াতাড়ি আবার বললে, আচ্ছা থাক্, তোমাকে আসতে হবে না। বিকেলের দিকে বাড়ি থেকো। আমিই যাবো তোমাদের ওখানে। অনেকদিন তোমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করিনি। একবার তাঁদের প্রণাম করে আসবো।

খুশি হয়ে রুদ্র বললে, বেশ তাই হবে।

সারাটা বিকেল বাড়িতে বসেই কাটিয়ে দিলে রুদ্র, কিন্তু অলকার দেখা নেই। মনটা আবার ভারি হয়ে উঠলো তার। অবশেষে রাত আটটা নাগাদ এসে হাজির হলো অলকা। সঙ্গে রুদ্রর বাবা-মায়ের জন্যে একঝুড়ি ফল।

রুদ্রর বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করে রুদ্রকে একান্তে ডেকে নিয়ে অলকা বললে, কিছুতেই সময় মত আসতে পারলাম না। একটা না একটা ঝঞ্ঝাট

রোজই লেগে আছে পার্টি অফিসে। আমি আর থাকতে পারছি না। কিছু মনে করো না, কেমন? পারি তো, যাবার দিন স্টেশনে দেখা করবো তোমার সঙ্গে।

যাবার দিনও যথারীতি স্টেশনে হাজির হতে পারলো না অলকা। কেবল দলের একটি ছেলেকে দিয়ে স্টেশনে রুদ্রর কাছে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলে।

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল রুদ্র। খোলা জানালাপথে বাইরের দৃশ্যগুলো একের পর এক তার চোখের সামনে থেকে দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছিল। একটার পর একটা ছবি, টুকরো টুকরো সেই ছবির স্মৃতি। কোনটা বা কয়েক মুহূর্ত দাগ কাটছিল মনের মধ্যে, কোনটা বা সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে মুছে যাচ্ছিল। এ যেন ট্রেনের কামরায় বসে দেখা বাইরের কোন ছবি নয়, এ যেন তার মনেরই ছবি যা নাকি মনের পর্দায়'দেখা দিয়েই সরে সরে যাচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে কেউ যদি রুদ্রকে জিজ্ঞেস করতো যে এই সাতটি দিন কলকাতায় সে কেমন কাটালো তা'হলে বোধহয় তার কোন সরাসরি জবাব দিতে পারতো না সে। এই ক'টা মাসের মধ্যেই তার নিজের সম্পর্কে বন্ধু ও আত্মীয় মহলে কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে রুদ্র। বন্ধুদের মধ্যে যারা তার এই চাকরির খবর রাখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন একটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল যেন তার মধ্যে কোন এক ধরনের পরিবর্তনের আশা করে বসেছিল তারা। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে তার নিজের চরিত্রে কোনরকম পরিবর্তন ঘটেছে বলে বিশ্বাস করতে পারে না রুদ্র। তবে কি তার নিজের গায়ে চাপানো আই-পি-এস-এর আবরণটাই এর জন্যে দায়ী? যারা তার চাকরি সম্বন্ধে কিছু জানতো না তারা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের নাম শুনে প্রথমটায় একটু ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকিয়েছিল। কিন্তু আই-পি-এস কথাটা শুনেই সেই কুঞ্চিত ভুরু সোজা হয়ে খানিকটা কপালের দিকে উঠে গেলেও মুখে সহজ কোন ভাব ফুটে ওঠেনি তাদের। রুদ্রর সবচাইতে আশ্চর্য লেগেছে তার দীপকদার হাব-ভাব। জীবনটাকে একটু হালকা ভাবে গ্রহণ করতেই সে বরাবর অভ্যস্ত। কোন কিছুতেই যেন তেমন একটা আসক্তি নেই তার। ইদানীং সেই নিরাসক্ত ভাবটুকু যেন আরও একটু বেড়েছে বলেই মনে হয়েছিল রুদ্রর। তা'ছাড়া, অলকা তার সম্বন্ধে একেবারে মিথ্যেও বলেনি। বরাবরই সে একটু 'সিনিক' প্রকৃতির। সবকিছুতেই কেমন যেন একটা অবিশ্বাস তার। সব ব্যাপারেই কেমন যেন একটা সন্দেহ। সেই সন্দেহের মাত্রাই বোধহয় ইদানীং আরও খানিকটা বেড়ে উঠেছে। আর, অলকার নিজের পরিবর্তন তো চোখে

লাগার মত। দলের কাজে আত্মনিয়োগ করে সে যেন তার গোটা অতীতকেই প্রায় ভুলতে বসেছে। রাজনীতির আকর্ষণ এটা। আকর্ষণ না বলে নেশা বলাই বোধহয় ঠিক। এযুগের সবচাইতে বড় নেশা এই রাজনীতি। সেই নেশাতেই পেয়ে বসেছে অলকাকে।

রুদ্র তার ছুটির সাতদিনের মধ্যে একটি দিন বর্দ্ধমান থেকেও ঘুরে এসেছে। নাতিকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে তাকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন বৃদ্ধ সোমেশ্বর। তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, ভালো আছিস্ তো, দাদুভাই ?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রুদ্র বলেছিল, হ্যাঁ দাদু, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো ?

—আমাদের আর এই বয়সে থাকা! শুক্‌নো মুখে ম্লান হেসে বলেছিলেন সোমেশ্বর, এখন তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি।

একটু সময় চুপ করে থেকে সোমেশ্বর অপেক্ষাকৃত নীচু কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, বৌমা ভালো আছে তো? আর, ঐ গোঁয়ার গোবিন্দটা?

রুদ্র জানে গোঁয়ার গোবিন্দ বলতে সোমেশ্বর তাঁর ছেলে জগদীশের কথাই বলছেন। আর বৌমা হচ্ছে রুদ্রর মা।

জবাবে রুদ্র বলেছিল, মা ভাল আছেন। তবে বাবার শরীরটা তেমন ভালো নয়। বরাবর লো-প্রেসারের মানুষ—

রুদ্র কথাটা শেষ করার আগেই রেগে উঠেছিলেন সোমেশ্বর, লো-প্রেসার—লো-প্রেসার। আমি জানি ও না খেয়ে লো-প্রেসারেই একদিন মরবে। হ্যাঁ, না খেয়েই মরবে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন সোমেশ্বর। তাঁর কোটরগত চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল। তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে অনেকটা আপন মনেই বলেছিলেন, পয়সা কড়ির অভাব নেই আমার। আর আমারই একমাত্র ছেলে কিনা না খেয়ে মরতে বসেছে। তা, দাদুভাই, তাড়াতাড়ি ট্রেনিং শেষ করে চাকরি শুরু কর। ওকে পয়সা-কড়ির চিন্তা থেকে খানিকটা মুক্তি দে। বাপের পয়সার মুখ যখন দেখলই না, তখন ছেলের পয়সায় না হয় একটু সুখের মুখ দেখুক।

ম্লান হেসে বলেছিল রুদ্র, তুমি তো জানো না দাদু, ভালো-মন্দ খাওয়ার সঙ্গে আজকাল লো-প্রেসারের কোন সম্পর্ক নেই। ডাক্তারদের মতে এটা একটা রোগ। নানা কারণে এ রোগের সৃষ্টি।

বৃদ্ধ আর কিছু না বলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। বোধহয় সেই মুহূর্তে বহুদিন না-দেখা ছেলের মুখখানাই মনে মনে কল্পনা করছিলেন। তারপর একসময় আবার বলেছিলেন, যাক্ গে, এবার বল ট্রেনিং কেমন চলছে?

—ভালো। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিল রুদ্র।

—হ্যাঁ দাদুভাই, ভালো করে পুলিশের কাজ কর্ম শিখে নে। সোজা কথা তো নয়, পুলিশ সাহেব হবি তুই। একটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে হবে। কত বিপদ-আপদ আসবে, কত ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট সামলাতে হবে। ভালোমত কাজ কর্ম না জানলে যে পদে পদে হোঁচট্ খেতে হবে। জেলার ঘুঘু সাবর্ডিনেট অফিসারেরা যে মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে। জানিস দাদু, আমাদের সময় কটন্ নামে একটা সাহেব এস্-পি ছিল। কাজ-কর্ম কিছুই জানতো না। মাসখানেক যেতে না যেতেই বোঝা গেল ব্যাটা পুলিশের কাজ কিছুই জানে না। ব্যস, হয়ে গেল। যে যা বোঝায় সাহেব তাই বোঝে। সবাই বলে—আহা, সাহেব আমাদের বড ভালো লোক। একেবারে মাটির মানুষ। শেষ পর্যন্ত সেই মাটির মানুষকেই জেলার কয়েকজন ঘোড়েল অফিসার একেবারে ডোবালো। বাধ্য হয়ে লম্বা ছুটি নিয়ে সাহেব সেই যে বিলেতে গেল, আর ফিরে এল না। তাই বলছিলাম দাদুভাই, ভাল করে কাজ-কর্ম শিখতে হবে। কেউ যেন ফাঁকি দিয়ে পার পেতে না পারে। ভালো কাজ-কর্ম-জানা পুলিশ সাহেবকে নিয়ে জেলার সাবর্ডিনেট অফিসারেরা অখুশি থাকলেও মনে মনে কিন্তু তারই তারিফ করে।

সোমেশ্বরের কথা শুনতে শুনতে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির কথাই মনে পড়ছিল রুদ্রর। সেনাপতিকে অবশ্যই একজন ভালো যোদ্ধা হতে হবে। নইলে সে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করবে কেমন করে? তবে সেটুকুই তো সব নয়। আরও কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে তাকে। মিশতে হবে তাকে সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে, শুনতে হবে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রমাণ করতে হবে যে সে তাদেরই বন্ধু। প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে, আবার দরকার মত হতে হবে কোমল। এমনি গুণের অধিকারী হলেই তো যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ সৈনিকেরা সেনাপতির আদেশে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না। পেতে হলে কিছু দিতেই হবে। সঠিক কাজ পেতে হলে দিতে হবে সঠিক নেতৃত্ব।

কিন্তু কে দেবে সেই সঠিক নেতৃত্ব? মধ্যপ্রদেশের মায়ারাম কিম্বা মহারাষ্ট্রের গঙ্গাধর দোশীর মত ছেলেরা যখন কোন জেলায় গিয়ে পুলিশের হাল ধরবে

তখন তাদের কাছ থেকে কি সঠিক নেতৃত্ব আশা করা যাবে ? নেতৃত্ব করার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা তাদের কোথায় ? সংখ্যায় তো এরাই বেশি। তেমন ক্ষমতা যাদের আছে তারা তো একান্তই মুষ্টিমেয়। আর, এদেশের মুষ্টিমেয়রা তো চিরকালই কোণঠাসা। তাদের কণ্ঠস্বর কতদূর গিয়ে পৌছবে ? তা ছাড়া, এদেশের বিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তারা এগোতে পারবেই বা কতটুকু ? পদে পদে যে বিপদ ঘটবে তাদের। শেষ পর্যন্ত একদিন এদেশের এই বিষাক্ত আবহাওয়াই তাদের বাধ্য করবে হাল ছেড়ে দিতে। কেউ কেউ শিং ভেঙে মিশে যাবে বাছুরের দলে। আর যারা তা একান্তই পারবে না তারা শেষ পর্যন্ত ছুটবে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে।

কিন্তু কেউ যদি সত্যিই রুখে দাঁড়াতে পারে ? কেউ যদি জোর গলায় বলতে পারে—না হাল ছাড়বো না আমি। কিছুতেই না। অহেতুক কথার ফুলঝুরি ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের ভণ্ডামীর আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে নগ্ন দেহে আমি গিয়ে দাঁড়াবো ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি কর্মীর সামনে। শোনাবো আমার বলার কথা। নিজের আচার-আচরণ দিয়েই তাদের বোঝাবো তাদের আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত। যদি এমন একটা পরিস্থিতি সত্যিই কেউ সৃষ্টি করে বসে তা হলে তখন কি হবে ? পারবে কি সে শেষরক্ষা করতে ?

এর জবাব রুদ্র জানে না। রুদ্র কেন, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের কেউই বোধহয় এর জবাব দিতে পারবে না।



মাউণ্ট আবুর ট্রেনিং শেষ। পাসিং-আউট-প্যারেডে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এলেন বক্তৃতা দিতে। বললেনও তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা। নতুন আই-পি-এস অফিসারদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিছু উপদেশও দিলেন তিনি। বক্তৃতায় পুলিশ-জনসাধারণের সম্পর্কের বিষয়টিই প্রাধান্য পেল।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় বললেন—পোলিশ আর দি সাব্‌জেক্ট এ্যাণ্ড পিপল্‌স আর দি অবজেক্ট অফ দি কন্‌স্টিটিউশন। কথাটা ভারি ভালো লাগালো রুদ্রর। দেশের সংবিধান যেখানে অফ দি পিপ্‌ল—ফর দি পিপ্‌ল

—বাই দি পিপ্‌ল, সেখানে সাব্‌জেক্ট-অব্‌জেক্ট সবই জনসাধারণ। জনসাধারণের সেই সাব্‌জেক্ট অংশটির নামই পুলিশ যারা নাকি প্রশাসনের প্রধান হাতিয়ার।

প্যারেড শেষে আফিসার্স মেসে ফিরে এসে পাঞ্জাবের দলবীর সিং রাষ্ট্রপতির সেই বক্তৃতার অন্য একটা অর্থ খাড়া করেছিল। ঠাট্টার সুরে বলেছিল, প্রেসিডেণ্ট ঠিকই বলেছেন। পুলিশ হচ্ছে সাব্‌জেক্ট অর্থাৎ কর্তা, আর জনসাধারণ হচ্ছে অব্‌জেক্ট অর্থাৎ কর্ম। কর্তার ইচ্ছাতেই যে কর্ম হয় সেকথা তো সবাই জানে। কাজেই প্রেসিডেণ্ট তাঁর বক্তৃতায় সেই কথাটাই আমাদের মনে করিয়ে দিলেন। আমাদের ইচ্ছেমতই জনসাধারণকে চলতে হবে।

দলবীরের কথায় উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেও রুদ্র কিন্তু হাসতে পারেনি। সে বুঝেছিল, দলবীর নেহাত ঠাট্টার ছলে কথাটা বললেও এদেশের পুলিশী প্রশাসন সম্পর্কে একটা অতি সত্য কথা সে বলে ফেলেছে। এই সাব্‌জেক্ট-অবজেক্টের ব্যাপারটা মোটেই হালের আমদানী নয়। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এমনি একটা মনোভাব গড়ে উঠেছে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে। আজও সেই মনোভাবের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। জনসাধারণের সেবকের বদলে তাদের প্রভু—এমনি একটা মনোভাব নিয়েই পুলিশ এদেশের সমাজে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুমুখো সাপের একটা মুখ যখন নিজেকে অধিক শক্তিশালী মনে করে নিজেরই আর একটা মুখের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চায় তখন সে বুঝতে পারে না যে সে নিজেরই ক্ষতি করছে।

ট্রেনিং শেষে প্রবেশনার আই-পি-এস্ অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্য ফিরে এল তার নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। এই দলে একমাত্র বাঙ্গালী অফিসার সে। বাকি যারা এই পশ্চিমবঙ্গে এ্যালট্‌মেণ্ট হলো তারা সবাই অবাঙ্গালী। তাদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের সেই মায়ারামও আছে। পুলিশের আসল চাকরি শুরু করে মায়ারাম কিম্বা দোশীর মত অফিসারেরা হয়তো আর হাসিস, মারিহুয়ানা কিম্বা এল-এস-ডি'র নেশা করবে না। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় এই ধরনের নেশায় আসক্ত যুবকেরা তাদের আসল কর্মজীবনে দেশের কতটা উপকারে আসবে সেটা সত্যিই ভাববার বিষয়।

কিন্তু দেশের চিন্তা যাঁরা করে থাকেন বলে শোনা যায় সেইসব দেশনেতারা এসব বিষয় নিয়ে তেমন কোন চিন্তা-ভাবনা করেন বলে মনে হয় না। তাই যদি হতো তাহলে সর্বভারতীয় পরীক্ষায়, বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের কাজে পরীক্ষার্থীর শিক্ষার মান যাচাই করার আগে তার চরিত্রের মান যাচাই করাটাই প্রাধান্য পেত। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেখানে জ্ঞানলাভ, সেখানে সেই শিক্ষা মানুষের

নতিক চরিত্রকে আরও দৃঢ় করে তোলে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যেখানে কবলমাত্র অর্থলাভ, সেখানে সেই শিক্ষার সঙ্গে মানুষের নৈতিক চরিত্রের সম্বন্ধ এমনই ক্ষীণ যে অর্থলিপ্সা অতি সহজেই সেই ক্ষীণ সম্বন্ধটাকে অস্বীকার করে নতিক চরিত্রকে রসাতলে নিয়ে যায়। তাই তো, প্রচণ্ড ক্ষমতার চাবিকাঠি যাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে তাদের ঝাড়াই বাছাই হওয়া উচিত নৈতিক চরিত্রের মাপকাঠিতে, কেবলমাত্র কলেজী শিক্ষার মাপকাঠিতে নয়।

রুদ্রদেবের পোস্টিং হলো কলকাতার কাছাকাছি একটা সহরে। শিক্ষানবীশ আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেবকে এখন হাতে কলমে পুলিশের কাজের ট্রেনিং নিতে হবে। জেলার এস-পি অশোক হাজরা ডাইরেক্ট আই-পি-এস নন। ডেপুটি-পুলিশ-সুপার হয়ে ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছিলেন। আই-পি-এস হয়ে জেলার চার্জ পেয়েছেন। ভদ্রলোক এমনিতে বেশ কর্মক্ষম অফিসার। ডিপার্টমেণ্টে নামও বেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর একটিমাত্র দোষ, তিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা, এই বিভাগের অধিকাংশ কর্মীই উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ করে না।

জেলার এস-পি অশোক হাজরার এই ধারণাকে একেবারে মিথ্যে বলে যদিও উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কিন্তু এতে কর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতাও পাওয়া যায় না। বিশ্বাস পেতে হলে বিশ্বাস করতেও হয়। তা' না হলে কেবল অবিশ্বাসের বাষ্পই জমতে থাকে চারিদিকে। তাতে আর যা হোক্ পুলিশের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে না।

প্রথমদিন অশোক হাজরা রুদ্রকে কাছে বসিয়ে চা খাওয়ালেন, নানা ধরনের পুলিশী গল্পের ফাঁকে কিছু উপদেশও দিলেন। অবশেষে একসময় বললেন, কাজ না শিখলে ভবিষ্যতে আপনাকে ঠকতে হবে। কাজেই ভালোমত কাজ শিখতে হবে আপনাকে। কিছুদিন এখানকার সদর থানার সঙ্গে যুক্ত থাকুন। ইন্সপেক্টর সুখেন চ্যাটার্জী যদিও লোক খারাপ নন, তবে অফিসার হিসেবে তাঁকে সাক্‌সেসফুল বলতে পারি না। টেবিল ওয়ার্কে ভদ্রলোক যত পটু ক্রাইমের ব্যাপারে তত নয়। যাই হোক্, ওঁর কাছেই কিছুদিন কাজ শিখুন।

অশোক হাজরা থামতেই রুদ্র জিজ্ঞেস করে, কী ধরনের ক্রাইম এখানে বেশি হয়, স্যার ?

—সহর এলাকা। সব রকম ক্রাইমই এখানে বেশি। বলতে থাকেন অশোক হাজরা, নাইট বার্গলারি থেকে শুরু করে ডাকাতি পর্যন্ত।

অশোক হাজরার কথায় বিস্মিত হয় রুদ্র। তার এতকাল ধারণা ছিল ডাকাতি একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। গভীর রাতে ডাকাতের দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের কোন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়। তারপর মারধোর লুঠপাট করে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সরে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীরা ভয়ে এগোয় না, কিম্বা এগোলেও বোমা ও গুলির শব্দে ভয় পেয়ে সরে পড়ে। পুলিশ এসে হাজির হয় অনেক পরে। এই ধরনের ডাকাতির কথাই এতকাল জানতো রুদ্র। কিন্তু সহর এলাকায় খোদ পুলিশের নাকের ডগায় যে ডাকাতি হয় তা' সে জানতো না। কাগজপত্রে এ রকম ডাকাতি-রাহাজানির খবর দু'চারটা চোখে পড়লেও এতকাল তা' নিয়ে সে মাথা ঘামায় নি।

কথাটা এস-পি অশোক হাজরাকে বলতেই তিনি হেসে উঠে বললেন, ডাকাতি সম্পর্কে আপনার ধারণা তো দেখছি সেই সাবেক ধরনের, যখন মালকোঁচা মেরে মাথায় কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে মশাল হাতে ডাকাতের দল হা-রে-রে-রে শব্দে সারা গাঁয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করে কোন ধনীর বাড়িতে গিয়ে চড়াও হতো। ইদানীংকালে, তারাও আধুনিক হয়েছে। এখন বোমা-পিস্তল-পাইপ গানের যুগ। সহর এলাকাতেও আজকাল ডাকাতি হয়। পাঁচ-সাতটি যুবক কোন অছিলায় বাড়িতে ঢুকে রিভলবারের ভয় দেখিয়ে বাড়ির লোকদের মুখ বন্ধ করে এমন নিঃশব্দে ডাকাতি করে সরে পড়ে যে পাশের বাড়ির লোকেরাও কিছু টের পায় না। পালিয়ে যাবার সময় কেবল প্রয়োজনে দু'চারটা বোমা ছোঁড়ে। ব্যাস, এই পর্যন্ত। সহরাঞ্চলে আধুনিক ডাকাতিতে এর চাইতে বেশি কিছু হৈ-চৈ হয় না।

রুদ্র বললে, সহরাঞ্চলে এরকম ডাকাতি পুলিশ বন্ধ করতে পারে না?

অশোক হাজরা তেমনি হেসে ঠাট্টার সুরে বললেন, এসব যেদিন বন্ধ হবে সেদিন তো পুলিশের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। আপনার আমার চাকরিও খতম্।

তারপর হাসি থামিয়ে একটু গম্ভীর সুরে আবার বলতে থাকেন ডিপার্টমেণ্টে সবে এসেছেন। কিছুদিন থাকুন। নিজেই বুঝতে পারবেন এসব ক্রাইম পুলিশ বন্ধ করতে পারে কিনা।

রুদ্র বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে অশোক হাজরার দিকে। তাঁর কথা রুদ্রর মনে হলো পুলিশ ইচ্ছে করলে এসব একেবারে বন্ধ করতে না পারলে অনেকটাই কমাতে পারে। কিন্তু কেন যে করে না সেটাই আশ্চর্যের কথা

মাউণ্ট আবুর ট্রেনিং ইন্স্টিটিউটে এসব কথা নিয়ে কেউ কখনও আলোচনা করেছে বলে তার মনে পড়ে না। তবে কি পুলিশের অসততার সঙ্গে ক্রাইম বন্ধ না করার কোন সম্পর্ক আছে ?

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে এস-পি অশোক হাজরা আবার বললেন, একালের অফিসারদের দিয়ে এসব বন্ধ করানো বাস্তবিকই শক্ত। ডিপার্টমেণ্টের কাজ কেউ কিছু জানে নাকি ? তদন্ত বলতে যা বোঝায় তা আর এযুগে নেই। এখন কেবল দায়সারা গোছের কাজ। একে তো অফিসারদের একটা বড় অংশই কাজ কর্ম তেমন কিছু জানে না, কিছু শেখে না কিম্বা শেখার কোন ইচ্ছাও নেই, তার ওপর অধিকাংশই ধান্ধাবাজ। পকেট ভারি করার ফাঁক ফোঁকড় খুঁজতেই তারা ব্যস্ত। পানিশমেণ্ট দিন্ তো যতটুকু কাজ-কর্ম করছে তাও করবে না। প্রসিডিং করে ডিস্‌মিস করুন তো আদালতের দরজা খোলা আছে। এবার বলুন যাবেন কোথায় ? যাক্ গে, সবে এসেছেন, এসব নিয়ে এখনই চিন্তা করবেন না। কাজ কর্ম শিখুন। ধীরে ধীরে নিজেই সবকিছু জানতে-বুঝতে পারবেন।

রুদ্র যেদিন প্রথম সদর থানায় ঢুকলো সেদিনই যেন সে প্রথম টের পেল যে সে বাস্তবিকই একজন আই-পি-এস অফিসার। নতুন আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্য যে সেদিন থানায় জয়েন করবে তা' থানার সবাই জানতো। সেই মত প্রস্তুতও ছিল সবাই। রুদ্র একখানা পুলিশ জীপ থেকে নেমে থানায় ঢুকতেই দেউড়িতে দাঁড়ানো পাহারাদার সেপাই ঘাড়ের বন্দুক বিশেষ কায়দায় সামনে এনে বন্দুকের বাটে প্রচণ্ড শব্দ করে রুদ্রকে "প্রেজেণ্ট আর্ম" অর্থাৎ "সেলামী সস্ত্র" করে অভিবাদন জানালো। নিজের ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে থানার ইন্‌-চার্জ সুখেন চ্যাটার্জী স্যালুট করলো তাকে। তারপর বললে, আসুন স্যার, ভেতরে আসুন।

রুদ্র সুখেনের পিছে পিছে থানার ইন্-চার্জের ঘরে ঢুকতেই সুখেন তার নিজের গদিমোড়া বড়সড় চেয়ারখানা দেখিয়ে বললে, এখানে—এখানে বসুন, স্যার।

একমুহূর্ত দ্বিধা করে রুদ্র। সে নিজে আই-পি-এস হলেও থানার অফিসার ইন্-চার্জের যে একটা আলাদা মর্যাদা আছে তা' সে ট্রেনিং ইন্স্টিটিউটেই জেনেছিল। তাই ও-সির চেয়ারে বসা তার পক্ষে ঠিক হবে কিনা তাই সে মনে মনে ভাবছিল। তা' ছাড়া, এই মুহূর্তে এখানে শিক্ষার্থী বলেই তার পরিচয়।

রুদ্রর দ্বিধাটুকু কিন্তু নজর এড়ায় না সুখেনের। সে মনে মনে ভাবে—

নতুন অফিসার, তাই বোধহয় ও-সি'র চেয়ারে বসতে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। মনে মনে হেসে সে আবার বললে, আসুন স্যার, এখানেই বসুন।

রুদ্র এবার সোজা তাকায় সুখেনের মুখের দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললে, না বড়বাবু, আপনার চেয়ারে আপনিই বসুন। আমি এই সামনের চেয়ারে বসছি। আফটার অল্, আই এ্যাম এ প্রবেশনার। আপনার এখানে এসেছি কাজ শিখতে। পজিশনে বড় হলেও ইউ আর মাই টিচার।

চল্লিশের কাছাকাছি বয়স সুখেনের। দারোগা হিসেবে চাকরিতে ঢুকেছিল। এখন সদর থানার ইন্সপেক্টর-ইন্-চার্জ। একটু শান্ত প্রকৃতির। বেশ কিছুকাল ডিপার্টমেণ্টে থাকলেও পুলিশের মারাত্মক দোষগুলোকে এতকাল এড়িয়ে চলতেই পেরেছে। আর সেই সুবাদেই সে "ভালো মানুষ" আখ্যা পেয়েছে ডিপার্টমেণ্টে। কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে "ভালো মানুষ" আখ্যা লাভ করার বিপদ যে কি, তা সুখেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বাস্তবিকই সে কারুর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করতে পারে না। থানা স্টাফের মধ্যে কেউ কোন অপরাধ করলে সুখেন তার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠতেও পারে না। সোজা কথায়, তার শান্ত মেজাজ কখনও অশান্ত হয় না। সে নিজে যেমন সৎ অন্যের কাছেও সে তেমনি সততাই আশা করে। কিন্তু তার বদলে তাদের অসততার কথা কানে এলে সে পারে না তাদের বিরুদ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আর, এই দোষেই জেলার সদর থানাটা হয়ে উঠেছে অসৎ অফিসারদের স্বর্গরাজ্য। জেলার এস-পি অশোক হাজরা সুখেনের চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। মৌখিক উপদেশ দেন তাকে। অকর্মণ্য অফিসারদের সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলেন। কিন্তু কারুর বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখতে কলম সরে না সুখেনের, কারণ সে জানে তাতে কোন ফল হবে না। সে তাদের সাবধান করে, মাঝে মধ্যে একটু আধটু ধমকায়ও, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কিন্তু এযুগে কেবলমাত্র ভালো কথায় যে কোন কাজ হয় না, বাধ্য না হলে যে কেউ কিছু করে না, একথা বুঝেও কোন উপায় খুঁজে পায় না সুখেন। একজন অফিসারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে তার কেরিয়ার খারাপ করে দিতে মন সরে না তার। স্বার্থের লোভে একালের অধিকাংশ মানুষই যে বিবেক বর্জিত তা' স্বীকার করেও সে অফিসারদের শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে থাকতে চেষ্টা করে, আর মাঝে মাঝেই এস-পি অশোক হাজরার ধমক খায়।

রুদ্রর কথায় সুখেন তাকে অন্য একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে বসে জিজ্ঞেস করে, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি, স্যার?

একটু ভেবে রুদ্র জবাব দেয়, বেশ করুন। তবে শুধুই চা, আর কিছু নয়।

—সেকি স্যার? বলতে থাকে সুখেন, আপনি এই প্রথম আমার থানায় এলেন—

গম্ভীর সুরে রুদ্র বললে, এলামই বা প্রথম। তাই তো চা খাচ্ছি। আর, ভদ্রতা রক্ষা করতে এককাপ চা-ই তো যথেষ্ট।

রুদ্রর কথায় একটু নিরুৎসাহ বোধ করে সুখেন। বুঝতে পারে, এই অফিসারটির ধরন-ধারন একটু যেন অন্যরকম।

চা খেতে খেতে রুদ্রর কিন্তু মনে পড়ছিল তার দাদু সোমেশ্বরের মুখে শোনা সেকালের কথা। সেকালের আই-পি অফিসাররা থানায় এলে কি কাণ্ডটাই না হতো। খাওয়া দাওয়ার বিরাট আয়োজন। সাহেবকে খাইয়ে খুশি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠতো থানার দারোগা। "তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট"-এর মত সাহেব খুশি হলেই দারোগার পোয়াবারো। ইচ্ছেমত নিজের এলাকায় চড়ে খাও। সাহেব তো হাতের মুঠোয়। সাহেব হয়তো ভদ্রতার খাতিরে যাওয়ার সময় দারোগাকে জিজ্ঞেস করতেন, ওয়েল ও-সি, কত খরচ হলো তোমার?

সাহেবের কথায় কৃত্রিম বিস্ময়ে কাঁদ কাঁদ মুখে দারোগা বলতো, স্যার, একথা জিজ্ঞেস করে আমাকে আর পাপের ভাগী করবেন না। আমাদের দেশে অতিথি নারায়ণ। আপনাকে খাইয়ে যে পুণ্য অর্জন করতে পেরেছি তার কি কোন দাম হয়, স্যার?

সাহেব যদি বোকা হতেন তা'হলে সেখানেই প্রসঙ্গের ইতি টেনে দারোগাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠতেন। যাবার আগে ইন্সপেক্শন বইতে দারোগা সম্পর্কে যে রিমার্ক লিখে যেতেন তা' ভাঙ্গিয়েই সেই দারোগা বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করতো। আর সাহেব যদি একটু শেয়ানা হতেন তা'হলে দারোগার কৃত্রিম কাঁদো কাঁদো মুখখানা দেখে মনে মনে একটু হেসে আবার বলতেন, নো—নো, ও-সি। আই ডোণ্ট লাইক টু টেক এনি রিস্ক। বলো, কত খরচ হয়েছে তোমার।

একশো টাকা খরচ করে সাহেবকে খাইয়ে ও সেই সঙ্গে ভালো ভালো দামী জিনিস মেমসাহেবের জন্যে সাহেবের গাড়িতে তুলে দিয়ে কাঁচুমাচু মুখে দারোগা হয়তো বলতো, এখানে সবকিছুই ড্যাম চিপ, স্যার। মাত্র দশ টাকা খরচ হয়েছে আমার।

শেয়ানা সাহেব বুঝলেন সব। খুশিও হলেন দারোগার বুদ্ধি দেখে। বিনে পয়সায় খেয়েছে বলে আর কেউ বদনাম দিতে পারবে না। দারোগার হাতে দশটাকার নোটখানা ধরিয়ে দিয়ে কেবল হয়তো বলে যেতেন, রসিদখানা কাল অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।

আপদ বিদেয় করে খুশি মনে দারোগা ফিরে এলেন নিজের ঘরে। যাক, নব্বই টাকার ওপর দিয়েই এবারের ফাঁড়াটা কাটলো। সাহেব খুশি থাকলে এই নব্বইটি টাকা তো তার কাছে নস্যি। কত নব্বই আসবে এর বিনিময়ে। আর, সাহেবের পীড়াপীড়িতে ভুলে কোন দারোগা যদি একশো টাকা খরচের কথা বলতো তা'হলে সেই মুহূর্তে দারুণ গম্ভীর হয়ে উঠতো সাহেবের মুখখানা। টাকাটা হয়তো তিনি দিতেন, কিন্তু দারোগার আর দুর্গতির অন্ত থাকতো না। সোমেশ্বর তাঁর নাতি রুদ্রকে বলেছিলেন, এমনিভাবে সত্যি কথা বলতে গিয়ে তিনিও নাকি একবার এমনি দুর্গতিতে পড়েছিলেন। ঠেকে শিখে তারপর নাকি সাবধান হয়েছিলেন তিনি।

সেই ট্রেডিশন যে আজও প্রায় তেমনিই চলছে তা' কিন্তু তখনও নতুন আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব জানতো না। তাই সুখেনের দেওয়া চা খেতে খেতে দাদুর সেই কাহিনীই মনে পড়েছিল তার।

হঠাৎ একসময় রুদ্র সুখেনকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বড়বাবু, 'প্রেজেণ্ট আর্ম' অর্থাৎ 'সেলামী সস্ত্র' তো শুনেছি জেলার এস-পি এবং তার উপরের অফিসারেরাই পাওয়ার অধিকারী। আমার তো এস-পি হতে এখনও অনেক দেরি। আমাকে তা'হলে, আপনার সেণ্ট্রি কনস্টেবল 'প্রেজেণ্ট আর্ম' দিলে কেন?

রুদ্রর প্রশ্নে একটু বিপাকে পড়ে সুখেন চ্যাটার্জী। বিষয়টি নিয়ম বহির্ভূত হলেও গর্হিত কিছু নয়। হাইকোর্টের ঝানু এ্যাড্‌ভোকেট নিম্ন আদালতে দাঁড়িয়ে মুখ ফস্কে বলে ফেলার ভঙ্গিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারককে 'ইওর অনার' না বলে যদি হাইকোর্টের প্রথামত 'মাই লর্ড' বলে সম্বোধন করে তাতে যেমন নিম্ন আদালতের বিচারকের পক্ষে একটু অস্বস্তি বোধের কারণ ঘটলেও ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ ঘটে না, এ যেন অনেকটা তাই। নতুন আই-পি-এস প্রবেশনার অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্যকে একটু খুশি করার ইচ্ছায় ইন্সপেক্টর সুখেন চ্যাটার্জী সেণ্ট্রি কনস্টেবলকে 'প্রেজেণ্ট আর্ম' দিয়ে সেলাম করার নির্দেশই দিয়েছিল। কিন্তু তা' নিয়ে যে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন তুলবে তা' সে অনুমান করে নি। তাই রুদ্রর প্রশ্নে বিব্রত ভঙ্গিতে সুখেন জবাব দেয়, সেণ্ট্রি কনস্টেবল

ঠিক বুঝতে পারে নি, স্যার। আই-পি-এস অফিসার দেখেই 'প্রেজেন্ট আর্ম' করেছে। ঠিক আছে, স্যার। আমি ওকে শুধরে দেব।

রুদ্র এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন না করে কেবল মনে মনে একটু হাসে।

মাস খানেকের জন্যে জেলার সদর থানায় যুক্ত হয়ে থানার কাজ মোটামুটি ভালই শিখছে রুদ্রদেব। কাজ শিখছে সে চোখ-কান খোলা রেখেই, আর সেই খোলা পথেই থানা-পুলিশের কাজ-কর্ম, দোষ-ত্রুটি, অভাব অভিযোগের বিচিত্র সব ঘটনা একে একে হাজির হয়ে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে এসে জমা হচ্ছে। সব কিছু দেখে শুনে প্রথম প্রথম বিস্মিত হতো রুদ্রদেব। ট্রেনিং ইন্স্টিটিউটে থাকার সময় পুলিশের কাজ ও সেই কাজের আদর্শ সম্পর্কে সে যতকিছু গালভরা কথা শুনেছে তার সঙ্গে যে কিছুই প্রায় মেলে না। জেলার এস-পি অশোক হাজরা সেদিন মোটেই মিথ্যা বলেন নি। অধিকাংশ অফিসারই ধান্দাবাজ। অপরাধ ও অপরাধীকে দমন করার চাইতে নিজেদের তৃতীয় রিপুকে পরিতৃপ্ত করতেই তারা উন্মুখ। থানার বাইরের ঠাঁট-বাট, চাকচিক্য কিন্তু পুরোপুরি বজায় রয়েছে। বাইরে বন্দুক হাতে সেন্ট্রি, ভেতরে পোশাক-পরা কর্মব্যস্ত অফিসারের দল, হাজতঘরে একদল বন্দী অপরাধী—সব কিছুই ঠিক্ আছে। কেবল যা নেই তা' হচ্ছে কর্তব্যবোধ ও জনসাধারণকে সাহায্য করার সত্যিকারের আগ্রহ। রুদ্রদেব লক্ষ্য করেছে একটু হাবাগোবা নিম্নশ্রেণীর কেউ থানায় ডাইরী করতে এলে ডিউটি অফিসার প্রথমেই তাকে বলে—খালি হাতে কি থানায় ডাইরী হয়? দোকানে গিয়ে এক দিস্তা ভালো কাগজ ও কয়েকখানা কার্বন কিনে নিয়ে এসো। সেই সঙ্গে এক প্যাকেট সিগারেট ও একটা দেশলাই। ডাইরী হবে তারপরে।

ব্যাপারটা অন্যায় জেনেও প্রথম দুটো বস্তু জোগাড় করার খরচ অভিযোগ-কারীর ঘাড়েই চাপাতে হয়। সরকারের দেওয়া কাগজ পেন্সিলে যেখানে সাতদিনও চলে না সেখানে বাকি একুশ দিনের দায় এমনিভাবেই চাপাতে হয় অন্যের ঘাড়ে। আর সেই সঙ্গে সিগারেট দেশলাইটা অবশ্যি ফাউ। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে থানার কাজ চলবে কেমন করে? এগুলো অবশ্যি এমন কিছু নয়, কিন্তু ক্রাইম ও ক্রিমিন্যাল নিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থের আমদানি-রপ্তানি যখন ঘটে তখনই সেটা সমাজদেহে দগদগে ঘা'য়ের সৃষ্টি করে। আর সেই ঘা'ই ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজদেহকে করে তোলে বিষাক্ত। রুদ্রদেব লক্ষ্য করেছে জেলার এই সদর থানার প্রত্যেকটি অফিসারই যে এমনি অসৎ তা'

নয়, দু'চারজন সৎ অফিসারও আছে। কিন্তু তারা একেবারেই কোণঠাসা। থানার ইন্সপেক্টর খোদ সুখেন চ্যাটার্জীও পড়ে এই দলে।

নিজের কোয়ার্টারে একটি চাকর নিয়ে রুদ্রদেবের সংসার। সারাদিন পর বাড়ি ফিরে বারান্দায় ডেক্-চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে দেশের এই পুলিশ বিভাগের কথাই মনে মনে আলোচনা করে রুদ্রদেব। একটি সহজ-সরল যুবক এই ডিপার্টমেণ্টে ঢুকে কেমন করে ধীরে ধীরে অসততার পথে পা বাড়িয়ে পঙ্কিলতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। একজন মানুষ কেমন করে অমানুষ হয়ে উঠে মানুষের স্বাভাবিক গুণগুলি ভুলে যায়, সেই মানসিকতার খোঁজ করে বেড়ায় রুদ্রদেব। এই একটি বিষয় যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে তাকে। জটিল সমাজ-জীবনে জটিলতর পুলিশী মনোবৃত্তির খবর নিতে চায় সে। আসল খবর চাই—সঠিক খবর। নইলে ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের মত এই পুলিশী মনোভাবের উৎস সন্ধান তো ব্যর্থ হবে তার।

নিজের কথাও মাঝে মাঝে ভাবে রুদ্রদেব। বারাসত অঞ্চলে তার বাবা জগদীশ দু'কামরার একখানি ছোট্ট বাড়ি তৈরি করিয়েছেন। কলকাতার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখানেই তিনি চলে গেছেন। সময় সুযোগ মত রুদ্র মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে সেখানে যায়। মা খোঁজ-খবর নেন তার খাওয়া পরার, বাবা চাকরির।

ট্রেনিং শেষে কলকাতার কাছে এই সহরে পোস্টিং হওয়ার আগে দিন কয়েক ছুটি পেয়েছিল রুদ্রদেব। ইচ্ছে ছিল এই কটা দিন বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প গুজব করে কাটাবে। ইউনিভার্সিটিতে একদিন গিয়েছিল সে। সেখানে অলকার সঙ্গে তো নয়ই এমনকি দীপকের সঙ্গেও তার দেখা হয় নি। খবর নিয়ে জেনেছে যে দীপক নাকি ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে। কিন্তু সে কোথায় আছে সে খবর কেউই তাকে দিতে পারলে না। দীপকদের ভাড়া বাড়িতে গিয়েও খোঁজ করেছিল রুদ্রদেব। মাস কয়েক আগে মাকে নিয়ে নাকি সে কোথায় চলে গেছে।

মনটা খারাপ হয়ে ওঠে রুদ্রদেবের। তার দীপকদা কি শেষ পর্যন্ত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? যাবার আগে তাকে একটা খবর পর্যন্ত দিয়ে যেতে পারলে না।

অলকা তো প্রায় ডুমুরের ফুল। দু'দিন চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারে নি রুদ্রদেব। মেদিনীপুর জেলায় একটা বাই-ইলেকশন নিয়ে নাকি সে ভয়ানক ব্যস্ত। সে নিজেই দলের ক্যাণ্ডিডেট্। তাই ব্যস্ততা তো খুবই স্বাভাবিক। অবশেষে তৃতীয় দিন তার দেখা পেল রুদ্রদেব। তাকে দেখেই অলকা বলে

উঠেছিল, সত্যি আমার দুর্ভাগ্য। তুমি এমন দিনে এলে যে তোমার সঙ্গে যে মনখুলে কিছুক্ষণ গল্প করবো সে সময়ও আমার নেই। তারপর গলা খাটো করে আবার বলেছিল, বাই-ইলেক্শনে দাঁড়াচ্ছি। আমাদের দলের সীট ছিল ওটা। ফেয়ার চান্স আমার।

জবাব দিয়েছিল রুদ্র, হ্যাঁ শুনেছি।

—কার কাছে শুনলে? হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেছিল অলকা।

জবাবে রুদ্র বলেছিল, শুনলাম এখানেই তোমাদের দলের একজন কর্মীর কাছে।

একটু সময় চুপ করে থেকে অলকা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, আমি এম-এল-এ হচ্ছি এতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

একটা ঢোক গিলে জবাব দিয়েছিল রুদ্র, আনন্দ না হওয়ার কী আছে? ভালই তো।

—সত্যি বলছো?

—মিথ্যে বলবো কেন?

মিষ্টি হেসে বলেছিল অলকা, আমি জানতাম যে এতে তুমি খুশি হবেই। কিন্তু জানো, বাড়িতে কেউ এতে খুশি নয়।

রুদ্র কি যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আবার বলে উঠেছিল অলকা, রাগ করোনা লক্ষ্মীটি। আর একদিন অনেকক্ষণ ধরে গল্প করবো তোমার সঙ্গে। আজ আমি ভয়ানক ব্যস্ত।

স্পষ্ট ইঙ্গিত। এর পরে আর বসে থাকা শোভন নয়। তাই রুদ্রও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, আমিও এবারে চলি। পরশু কাজে জয়েন করছি।

—কোথায়? জিজ্ঞেস করেছিল অলকা।

রুদ্রদেব জায়গার নাম বলতেই অলকা আবার বলেছিল, তা'হলে তো কলকাতার একেবারে কাছেই।

—হ্যাঁ তাই।

—আর একদিন এসো কিন্তু।

—হ্যাঁ আসবো।

অলকা মুখে যা-ই বলুক না কেন রুদ্রদেব কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে অলকা তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এই অলকার মধ্যে আর ইউনিভার্সিটির সেই অলকাকে খুঁজে পাওয়া যায় না যে নাকি একটি দিনের

অদর্শনে মুখ ভার করে থাকতো। অনুযোগের ঝড় তুলতো রুদ্রর সামনে। অবশেষে অনেক সাধ্য সাধনা করে তার সেই অভিমান ভাঙাতে হত তাকে।

কিন্তু এ কেমন করে হয়? এত তাড়াতাড়ি একটা মানুষ বদলে যায় কেমন করে? রাজনীতির আকর্ষণ কি এতই তীব্র যে ভালোবাসার আকর্ষণও ম্লান হয়ে ওঠে তার কাছে? রাজনীতির স্থান কি প্রীতি, প্রেম, ভালবাসারও উর্দ্ধে?

সেদিন মিথ্যে বড়াই করে নি অলকা। বাই-ইলেকশনে অলকারই জয় হয়েছিল। খবরের কাগজে খবরটা পড়ে খুব একটা খুশি হতে পারে নি রুদ্রদেব। যে অলকা এমনিতেই রাজনীতি-পাগল, এম্-এল্-এ হয়ে রাজনীতি ছাড়া সে যে আর কিছু বুঝবে না, জানবে না কিম্বা জানতে চাইবে না তা' তো স্বাভাবিক। রুদ্রদেবের ভয় সেখানেই। যে নারীকে সে এতদিন একান্ত আপন বলে ভেবে এসেছে তার এই দূরে সরে যাওয়ার আঘাত সে সহ্য করবে কেমন করে? অলকা না হয় রাজনীতির নেশায় সব ভুলতে পারে কিন্তু রুদ্রদেব তো নেশাগ্রস্ত নয়। তার পক্ষে রাতারাতি সব কিছু ভুলে যাওয়া কেমন করে সম্ভব?

অলকার কথা ভাবতে বসলেই মনটা খারাপ হয়ে ওঠে রুদ্রর। কিন্তু ওর কথা না ভেবেও পারে না। মাঝে মাঝে নিজের ওপরই রাগ হয় তার। অলকার এই খ্যাতি, তার এই সম্মানকে কি তবে ভাল চোখে দেখছে না সে? একেই কি বলে ঈর্ষা? কিন্তু পরক্ষণেই জবাব আসে নিজেরই মনের কাছ থেকে। না, ঈর্ষা নয়। অলকার খ্যাতি, অলকার সম্মান মোটেই ঈর্ষার বস্তু নয় তার কাছে। সে যদি এমনিভাবে তার কাছ থেকে দূরে সরে না যেত তা'হলে কিছুই বলার থাকতো না রুদ্রর। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্মান যে স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মানের চাইতে কোন অংশে বড় নয় এই বোধটুকুই কেবল অলকার মধ্যে আশা করেছিল রুদ্র। কার্যক্ষেত্রে তার অভাবটাই মাঝে মাঝে মনটাকে খারাপ করে তুলেছিল তার।

তবুও কিন্তু হাল ছাড়ে নি রুদ্রদেব। নিজের পৌরুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ দেয় নি নিজেকে। অলকার এম্-এল্-এ হওয়ার খবরটুকুর ওপর বারে বারে চোখ বুলিয়েছিল। তারপর তাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। চিঠির ভাষায় উচ্ছ্বাস না থাকলেও গভীরতার অভাব ছিল না মোটেই। অবশেষে একদিন জবাবও এসেছিল অলকার কাছ থেকে। অতি সাদামাটা দু'লাইনের জবাব। কংগ্রাচুলেশন লেটার পেয়ে যে সে ধন্য হয়েছে তারই স্বীকৃতি। সেই জবাবের মধ্যে ছিল না কোন উষ্ণতার স্পর্শ, ছিল কেবল শুষ্ক ভদ্রতা।

সদর থানার ইন্-চার্জ-ইন্সপেক্টর সুখেন চ্যাটার্জীর যে এত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বদলি হবে তা' কেউ ধারণাই করতে পারে নি। মাত্র মাস ছ'য়েক হলো সে এখানে এসেছে, এর মধ্যেই জেলার এস-পি অশোক হাজরা তাকে বদলির হুকুম দিলেন।

ও-সি'র ঘরে বসে সুখেনের সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল রুদ্রর। একটু ম্লান হেসে সুখেন বললে, কী আর করা যাবে, স্যার। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। যেখানে বদলি করবে সেখানেই যাবো। চেষ্টা-তদ্বির করে কোথাও পোষ্টিং নিই নি, কোনদিন নেবও না।

সুখেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে রুদ্রদেব, কিন্তু বড়বাবু, এত তাড়াতাড়ি এখান থেকে আপনার বদলিই বা হলো কেন?

—বেশ বললেন স্যার, হালকা সুরে বলতে থাকে সুখেন, পুলিশ সাহেবের আমাকে পছন্দ হয় নি, তাই বদলি করেছে। কথাটা বলেই আবার মৃদু মৃদু হাসতে থাকে সে।

সন্দিগ্ধ চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে রুদ্রদেব আবার বললে, না বড়বাবু, মনে হচ্ছে আপনি যেন কিছু গোপন করতে চাইছেন।

—ভারি মুশকিলে ফেললেন, স্যার। এর মধ্যে গোপন করার কী থাকতে পাবে? হাসিমুখে তেমনি ম্লান কণ্ঠে সুখেন বললে।

—কিন্তু এস-পি আপনাকে কেন পছন্দ করলেন না সেটাই তো প্রশ্ন।

—এলাকার ক্রাইম কণ্ট্রোল করতে পারিনি, তাই।

—এটা তো কেবল বাইরের কারণ। কিন্তু আপনার কথার ধরনে মনে হচ্ছে এ ছাড়া ভেতরের আরও কিছু কারণ আছে।

সহসা কোন জবাব দেয় না সুখেন। একটু সময় চুপ্ করে থাকে সে। তারপর আবার বললে, স্যার, আপনি নিজে যখন আই-পি-এস অফিসার, তখন আর একজন আই-পি-এস অফিসার সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু বলা কি ভালো দেখায়?

—বুঝেছি, বলতে থাকে রুদ্র, আপনি জেলার এস-পি হাজরা সাহেব সম্পর্কে

কিছু বলতে চাইছেন। তবে, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, বড়বাবু।

কয়েক মুহূর্ত রুদ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে যেন যাচাই করে নিতে চেষ্টা করে সুখেন। তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললে, এস-পি'র কথামত চলি নি বলেই আজ আমার এই দুর্দশা।

বিস্মিত কণ্ঠে রুদ্রদেব বলে ওঠে, কেন চলেন নি?

—চলা সম্ভব নয় বলেই চলি নি। উনি চাইছিলেন এলাকার ক্রাইম কমাতে। তা' সে ক্রিমিন্যাল এ্যারেস্ট করেই হোক্, কিম্বা ক্রাইম সাপ্রেস করেই হোক। ক্রাইম ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। চেষ্টা করেও তা' কমাতে পারছি না। এ নিয়ে খোদ্ এস্-পি'কে কথা শুনতে হচ্ছে রেঞ্জ ডি-আই-জির কাছে। সরাসরি মুখে না বললেও এস-পি চান যে কিছু কিছু অপরাধ আমি নথিভুক্ত না করি। কিন্তু এতে আমি রাজি হই নি। ক্রাইম সাপ্রেস করার অর্থ হলো সমাজের নিদারুণ ক্ষতি করা। আমার দ্বারা কিছুতেই তা হবে না। আমি থানার ডিউটি অফিসারদের স্পষ্ট বলে দিয়েছি প্রত্যেকটি ক্রাইমের ঘটনা যেন নথিভুক্ত করা হয়।

—কিন্তু জেলার এস্-পির কথামত না চলে কি চাকরি করতে পারবেন?

এবার গম্ভীর কণ্ঠে সুখেন জবাব দেয়, পারবো না যে তা' জানি। আর জানি বলেই যে কোন মুহূর্তে বদলির জন্যে তৈরি হয়েই রয়েছি। তা'ছাড়া এও জানি যে আমার সার্ভিস রেকর্ড হয়তো উনি এমন খারাপ করে দেবেন যে প্রমোশনই আর হবে না। কিন্তু উপায় কি, স্যার? এস্-পির পছন্দমত ক্রাইম সাপ্রেস করবো আর যেদিন সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে সেদিন এর দায়িত্ব এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। এস্-পি কি সেদিন এই অন্যায়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন?

একটু সময় চুপ্ করে থেকে খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে সুখেন আবার বললে, শুনুন স্যার, বোকা হতে পারি, কিন্তু একেবারে গবেট নই। আমার ঘাড়ে বন্দুক রেখে অন্য কাউকে গুলি ছুঁড়তে দেওয়ার মত মূর্খ আমি নই। তাতে আমার যা হবার হবে। ক্রাইম নথিভুক্ত না করে সরকারী কাগজপত্রে ক্রাইম বন্ধ করেছি বলে ফাঁকা বাহবা নিতে রাজি নই আমি।

রুদ্রদেব বললে, কিন্তু বড়বাবু, এলাকার ক্রাইম বন্ধ করতে পারছেন না কেন? এর কৈফিয়ৎ কি?

—দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ আর কী আছে, স্যার? জবাব দেয় সুখেন, চেষ্টা তো করছি কিন্তু ফলবতী হচ্ছে না।

—কেন হচ্ছে না ? প্রশ্ন করে রুদ্র।

—আবার খানিকক্ষণ চুপ্ করে থেকে সুখেন বললে, এ যুগের পুলিশ ফোর্স দিয়ে ক্রাইম বন্ধ করা সম্ভব নয়, স্যার।

—সেকি বড়বাবু ? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রুদ্রর, আপনি কি বলতে চাইছেন যে আপনার এই থানার অফিসারদের দিয়ে এলাকার ক্রাইম বন্ধ করা সম্ভব নয় ?

—হ্যাঁ, সম্ভব। পুরোপুরি সম্ভব না হলেও অনেকটাই সম্ভব। আমি যদি এদের ওপর সম্পূর্ণ খবরদারি করতে পারতাম তা'হলে এদের দিয়েই হয়তো কিছুটা কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু এরা তো আমাকে পরোয়াই করে না।

—নিজের অফিসারদের কণ্ট্রোল করতে না পারা তো আপনারই অক্ষমতা।

একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় সুখেন, স্বীকার করছি, স্যার। কিন্তু উপায় নেই। থানার অফিসারেরা যদি ভাবে যে তাদের রক্ষা করার জন্যে উপর তলার অফিসারেরা রয়েছেন তা'হলে তারা ও-দিকে পাত্তা দেবে কেন ? আমার অবস্থাও ঠিক তাই।

একটু ভেবে রুদ্র প্রশ্ন করে, তা'হলে আপনি কি বলতে চাইছেন যে জেলার খোদ্ এস্-পি'ই অসৎ অফিসারদের রক্ষাকর্তা ? তাই যদি হয় তা'হলে তো বলতে হয় যে তিনি নিজেও ভয়ানক অসৎ।

সহসা কোন জবাব দেয় না সুখেন। রুদ্র তার দ্বিধার কারণটুকু বুঝতে পেরে কণ্ঠস্বর নামিয়ে আবার বললে, আমিও আই-পি-এস অফিসার বলে আমাকে অবিশ্বাস করবেন না বড়বাবু। ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারি এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই বলেই জানতে চাইছি। সত্যিই কি জেলার এস্-পি অশোক হাজরা নিজেই অসৎ প্রকৃতির ? তাই কি তিনি অসৎ অফিসারদের রক্ষাকর্তা ?

জবাব দেয় সুখেন, এতদিন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে কে সৎ আর কে তা' নয় সেটুকু বুঝতে পারার মত ক্ষমতা অন্ততঃ জন্মেছে। আমাদের এস্-পি নিজে যে অসৎ প্রকৃতির তা' আমার মনে হয় না। তেমন কোন প্রমাণও আমি কখনও পাই নি। তবে ক্রাইমের ব্যাপারে তিনি এতই স্পর্শকাতর যে ইন্‌ডাই-রেক্টলি তিনি অনেকবার আমাকে ক্রাইম সাপ্রেস করাব কথা বলেছেন। তা'ছাড়া তাঁর আরও একটা বড দোষ আছে। আর সেই দোষেই অসৎ অফিসাবেরা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে।

—কি দোষ ? মাসিক বন্দোবস্তের ব্যাপার নাকি ? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

—না—না স্যার, তাড়াতাড়ি জবাব দেয় সুখেন, তাঁর নিজের নয়। তবে

শুনতে পাই অসৎ অফিসারদের আশ্রয়স্থল নাকি খোদ্ মেমসাহেব। এই ধরনের অফিসারেরা ঐ মেমসাহেবের হুকুম তামিল করতে সর্বদাই নাকি এক-পায়ে খাড়া। আর, সাহেব নিজে নাকি মেমসাহেবের কথামত চলতেই অভ্যস্ত।

—আই সী। মৃদু হেসে বলে ওঠে রুদ্রদেব। সুখেনও হেসে চুপ্ করে।

মেমসাহেব—মেমসাহেব! দেশের রাজনীতি কিম্বা শাসন ব্যবস্থায় এই মেম-সাহেবদের ভূমিকার সঠিক সমীক্ষা বোধহয় আজও হয় নি। পর্দার আড়ালে থাকেন বলেই এঁরা সাধারণতঃ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু সেই আডাল থেকেই যে বিক্রমে এঁরা মাঝে মধ্যে কলকাঠি নাড়েন তাতে অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে ক্ষমতাহীন কিন্তু বাস্তবে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান এই মেম-সাহেব গোষ্ঠীর কার্যকলাপ তাদের স্বামী নামক মানুষটিকে প্রায় ভেড়ার পর্যায়ে নামিয়ে এনে তাকে দিয়ে এমন অনেক কাজই করিয়ে নেওয়া হয় যে কাজ স্বাভাবিক ক্ষেত্রে হয়তো তিনি কিছুতেই করতেন না। মুখোমুখি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের চাইতে আড়াল থেকে আঘাত হানার তীব্রতা বরাবরই বেশি। স্ট্রেট্ ফাইটিংয়ের চেয়ে গেরিলা ফাইটিং অনেক বেশি কার্যকর।

নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসে সুখেনের কথাগুলোই মনে মনে নাড়াচাড়া করতে থাকে রুদ্রদেব। কি বিচিত্র মানুষের মন! জেলার পুলিশ সুপার অশোক হাজরা নিজে সৎ হয়েও ও-সি সুখেনকে ক্রাইম সাপ্রেস করতে পরামর্শ দেন। তাঁরই প্রশ্রয়ে থানার অসৎ অফিসারেরা যখন এলাকায় লুটেপুটে খায় তখন তিনি চোখ বুজে থাকেন নিজের মেমসাহেবের ভয়ে। আবার এ নিয়ে সুযোগ পেলে ও-সি সুখেনকে ধমকাতেও কসুর করেন না, যদিও তিনি জানেন যে সুখেন বাস্তবিকই সৎ প্রকৃতির। মানুষের প্রকৃতির এই পরস্পর বিরোধী দিকগুলি লক্ষ্য করে বিস্মিত না হয়ে পারে না রুদ্রদেব। পরস্পর বিরোধী এই মানসিক বৈশিষ্ট্য পুলিশী প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে কি ভয়ানক তার হিসেব সম্ভবতঃ রাখে না কেউ। জেলা প্রশাসনের সেনাপতির এই মানসিকতা যে গোটা পুলিশী প্রশাসন যন্ত্রকেই ধীরে ধীরে অকেজো করে ফেলছে সেদিকেও কারুর হুঁস নেই। এর পরে কোন সত্যিকারের কুশলী যন্ত্রবিদও যদি এসে পুলিশী প্রশাসনের হাল ধরে তা'হলেও কি তার পক্ষে ঐ অকেজো পুলিশী যন্ত্রকে পুরোপুরি সচল করা সম্ভব? পতন একবার শুরু হলে প্রচণ্ড দক্ষতায় তার গতিবেগ হয়তো কিছুটা কমানো যায়, কিন্তু তাই বলে তা' রোধ করা বোধহয়

সম্ভব নয়। বিচিত্র মানসিকতার অধিকারী একজন পুলিশ সুপার তাঁর পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থাপনায় পুলিশী প্রশাসনের যে ক্ষতি করেন সেই ক্ষতি পূরণ করা ভবিষ্যতে কয়েক ডজন দক্ষ পুলিশ সুপারের পক্ষেও অসম্ভব।

পুলিশী প্রশাসনের এই সমস্যা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার কথাও মনে উদয় হয় রুদ্রদেবের। এই সমস্যা যে আরও জটিল, আরো কঠিন। এর সমাধান হবে কেমন করে? ইদানীং বাড়িতে তার মা রুদ্রর বিয়ের ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করেছেন। একদিন তিনি রুদ্রকে বলেও ছিলেন, বাবা, চাকরি-বাকরি যখন করছিস তখন এবার দেখে-শুনে একটি ভালো মেয়েকে ঘরে আনি, কি বলিস?

জবাবে বলেছিল রুদ্র, এত তাড়া কিসের মা? আরও কিছুদিন যাক্ না।

—কেন বাবা? ভগবানের ইচ্ছেয় যা হোক্ নিজেদের মাথা গোঁজবার মত একটু ঠাঁই হয়েছে। চাকরিও করছিস নেহাত খারাপ নয়। বাইরে চাকর-বাকরের হাতে খেয়ে কি আর শরীর টেঁকে?

একটু হাল্কা হেসে রুদ্র বলেছিল, তুমি কি মনে করেছ মা যে তোমার বৌমা এসে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাওয়াবে?

—কেন খাওয়াবে না? তেমন মেয়ে আনলে নিশ্চয়ই খাওয়াবে। তুই যদি রাজি থাকিস তো তোর বাবা এখনই চেষ্টা শুরু করবেন।

জবাব না দিয়ে চুপ্ করে রইলো রুদ্র। সহসা তার মনে পড়েছিল সেই দীপকদার কথা। বিয়ে করতে অনিচ্ছা, আর মায়ের আদেশ পালন করার ইচ্ছা, এই দু'য়ে মিলে সেদিন তার মুখের ওপর যে বিব্রত ভাবটুকু সে লক্ষ্য করেছিল সেই কথাই মনে পড়েছিল তার।

রুদ্রকে চুপ্ করে থাকতে দেখে মা হঠাৎ এমন একটা প্রসঙ্গ তুলেছিলেন যাতে নাকি মায়ের সামনে দারুণ লজ্জিত হয়ে পডতে হয়েছিল তাকে। তিনি সহসা বলেছিলেন, আচ্ছা খোকা, তোদের কলেজের সেই অলকার বিয়ে হয়ে গেছে? মেয়েটি কিন্তু ভারি লক্ষ্মী।

একটু সময় চুপ্ করে থেকে রুদ্র জবাব দিয়েছিল, না বিয়ে হয় নি।

—কি করছে এখন?

—রাজনীতি—দেশ উদ্ধার করে বেডাচ্ছে।

—ওদের বাড়ির ঠিকানাটা জানিস্ তুই?

মায়ের মনের কথা বুঝতে পেরে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে রুদ্রর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বলেছিল, ঠিকানা দিয়ে কি হবে?

—তাতে তোর দরকার কি? ঠিকানাটা জানিস কি না বল্। তোর বাবাই সেদিন কথায় কথায় অলকার ঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

রুদ্র এতক্ষণে বুঝতে পারে, তার মা-ই কেবল নন, তার বাবাও রয়েছেন এর মধ্যে। ছেলের মনের ঝোঁক বুঝতে পেরে তার মা-বাবা দু'জনেই যে সেইদিকে ঝুঁকবেন এতটা বাস্তবিকই আশা করতে পারে নি রুদ্রদেব। বিশেষ করে জগদীশের মত আদর্শবাদী মানুষ যে ছেলের মনের খবরও রাখেন এবং তারই ভিত্তিতে পাত্রী নির্বাচন করতে সচেষ্ট হবেন এটা তার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এই নিয়ে অলকার সঙ্গে একদিন কথাও হয়েছিল রুদ্রর। অলকা জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, এতে তোমার মা-বাবা রাজি হবেন?

জবাব দিয়েছিল রুদ্র, মা নিশ্চয়ই রাজি হবেন। আমাদের পাল্টি ঘর তোমরা। কোনদিকেই কিছু অসুবিধে নেই। তবে বাবাকে নিয়েই যা একটু চিন্তা। আদর্শবাদী মানুষ তিনি। একালের এসব তিনি পছন্দ করবেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।

শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল অলকা, যদি তিনি রাজি না হন?

হেসে অলকাকে আশ্বাস দিয়েছিল রুদ্র, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ও ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। ব্যবস্থা একটা করবোই।

কিন্তু সেদিন আর নেই। এর মধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। যাঁকে নিয়ে এত চিন্তা সেই জগদীশ ভট্টাচার্য এখন অলকার বাড়ির ঠিকানার খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু অলকা এখন কোথায়? তার কাছে এখন রাজনীতির হাতছানি। বাসর ঘরের হাতছানিকে সে এখন কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে সেটাই প্রশ্ন।

রুদ্র সেদিন ইচ্ছে করেই অলকার বাড়ির ঠিকানা তার মায়ের হাতে তুলে দেয় নি। ইচ্ছে ছিল সময়-সুযোগ মত একদিন অলকার সঙ্গে দেখা করে সে নিজেই কথাটা পাড়বে তার কাছে। কিন্তু যাই যাই করেও আর যাওয়া হয় নি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল বিয়ে-শাদীর মত একটা সাধারণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় কি এম-এল-এ অলকা মজুমদারের এখন হবে? তার চাইতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করাই বোধহয় ভালো।

নিজের কোয়ার্টারে একখানা ডেক্ চেয়ারে বসে মনে মনে এইসব কথাই ভাবছিল রুদ্র। সহসা তার আর্দালী কনস্টেবল এসে বললে, স্যার একজন ইন্সপেক্টরবাবু এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

একটু বিস্মিত হয় রুদ্রদেব। তার কোয়ার্টারে ইন্সপেক্টরের আবির্ভাব কেন? সে নিজে তো এখনও শিক্ষানবীশ। সরকারী পদ কিম্বা তেমন কোন ক্ষমতাও এখন পর্যন্ত লাভ করে নি সে। তা' ছাড়া, এই জেলার অফিসারদের মধ্যে একমাত্র সদর থানার বড়বাবু সুখেন চ্যাটার্জী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে তেমন একটা মেলামেশাও সে এখন পর্যন্ত করে নি। তা'হলে কে এলো তার সঙ্গে দেখা করতে?

রুদ্র কনস্টেবলটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, সদর থানার বড়বাবু এসেছেন নাকি?

কন্‌স্টেবল জবাব দেয়, না স্যার, তিনি নন।

—ঠিক আছে। ইন্সপেক্টরবাবুকে এখানেই নিয়ে এসো।

একটু পরেই দরজার কাছে দেখা দেয় সেই আগন্তুক অফিসার। পরনে তার ইন্সপেক্টরের পোশাক। ঘরের ভেতর দু'পা এগিয়ে এসে জুতোর গোড়ালীর শব্দ করে এ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে রুদ্রকে স্যালুট করে সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, আমার নাম পলাশ ব্যানার্জী। আগামী কাল সদর থানার চার্জ নেব আমি।

—ও, আপনিই পলাশ ব্যানার্জী? প্রতি নমস্কার করে রুদ্র বললে, হ্যাঁ শুনেছি যে আপনিই এখানে বদলি হয়েছেন।

রুদ্রর নির্দেশে একটা চেয়ারে বসতে বসতে মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে পলাশ আবার বললে, বুঝতেই তো পারছেন স্যার, জেলার সদর থানা। ঝক্কি ঝামেলার অন্ত নেই। তার ওপর আমাদের সুখেনবাবু এলাকাটাকে নাকি একটা ক্রিমিন্যালের ঘাঁটি করে রেখে যাচ্ছেন। আমাকে তো এসে সেই ছাই-পাঁশই পরিষ্কার করতে হবে। তাই, কাল থানার চাজ নেওয়ার আগে পুলিশ সাহেবকে একবার সেলাম জানিয়ে এলাম। পুলিশ অফিসে আপনার কথা শুনে আপনাকেও সেলাম জানাতে এসেছি, স্যার।

পলাশের কথায় একটু যেন বিব্রত বোধ করে রুদ্রদেব। হেসে বললে, আমাকে সেলাম জানানোর কি আছে? আমি তো প্রবেশনার অফিসার।

—এ কি কথা বলছেন, স্যার? বিস্ময়ে যেন আঁৎকে ওঠে পলাশ ব্যানার্জী। বলতে থাকে সে, প্রবেশনার হোন আর যাই হোন, আপনারা হচ্ছেন আই-পি-এস অফিসার। আজ বাদে কাল জেলার এস-পি হবেন। সেদিন আপনাদের কাছেই তো আমাদের কাজ করতে হবে।

স্তব-স্তুতিতে যেখানে দেবতারা পর্যন্ত খুশি হন সেখানে রুদ্রদেব তো একজন সাধারণ মানুষ। তার পক্ষে পলাশের স্তুতিতে খুশি হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

সেই মুহূর্তে নতুন ও-সি পলাশ ব্যানার্জীকে বেশ কর্তব্যপরায়ণ অফিসার বলে মনে হচ্ছিল তার। সেই সঙ্গে নিজের সম্পর্কে বিশেষ করে নিজের র‍্যাঙ্ক সম্পর্কে একটু সচেতন না হয়ে সে পারে নি। মিথ্যে বলে নি পলাশ ব্যানার্জী একদিন জেলার পুলিশ সাহেবের চেয়ারে বসতে হবে তাকে। সেদিন সে হ উঠবে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। অবশ্য সেদিন এখনও অনেক দূরে। কি সাবর্ডিনেট অফিসার মহলে তার প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। নিজে ভুলে গেলেও এই অফিসার মহল তাকে প্রতিনিয়তই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে সে একজন আই-পি-এস অফিসার। সাবর্ডিনেটদের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক।

রুদ্রদেবকে চুপ করে থাকতে দেখে পলাশ আবার বললে, সদর থানা আর ক'দিন থাকবেন স্যার?

জবাব দেয় রুদ্র, এক মাসের জায়গায় তো প্রায় দেড় মাস হতে চললো সেদিন এস-পিও সেই কথাই বলছিলেন। এবার বোধহয় অন্য কোন সার্কে ইন্সপেক্টরের অফিসে দিন কয়েক থাকতে হবে।

—সদর থানার কাজ-কর্ম কেমন দেখলেন, স্যার?

পলাশ ব্যানার্জীর কথার ঢংয়ে তাকে বেশ ঘুঁদে অফিসার বলেই মনে হ রুদ্রর। যে অফিসার এস-পি'র সঙ্গে দেখা করতে এসে কেবলমাত্র সেলা জানাতে প্রবেশনার অফিসারের কোয়ার্টারে এসে হাজির হয়ে তাকে স্তুতি বন্দনা করতে পারে সে যে ভয়ানক বুদ্ধিমান ও চালু অফিসার তাতে আ সন্দেহ কি? তাই পলাশের প্রশ্নে সতর্কভাবে সে জবাব দেয়, ভালই তো।

মৃদু হেসে পলাশ বললে, আপনারা টাটকা আনকোরা অফিসার। থানা বাইরেটা দেখেই আপনারা ভালো বলছেন। একটু অভিজ্ঞ হলে বুঝতে পারতেন যে আসলে কিছুই তেমন ভালো নয়। তাই যদি হতো তা'হলে বি আর ছ'মাসের মধ্যে সদর থানার ও-সি'র বদলি হয়?

আরও কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পরে পলাশ ব্যানার্জী এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, এমন গরমে আপনার এই ঘরে দেখছি কোন পাখার ব্যবস্থা নেই, স্যার।

মৃদু হেসে জবাব দেয় রুদ্র, না এখনও কিনে উঠতে পারি নি। শোবার ঘরে অবশ্যি একটা পুরানো টেবিল ফ্যান্ আছে।

—সেকি স্যার, সুখেনবাবু দু'একটা সিলিং পাখার ব্যবস্থা করে দিতে পারে নি?

রুদ্র তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, না–না, সুখেনবাবু পাখা ভাড়া করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আমিই বারণ করেছি তাকে। একা মানুষ, একটা টেবিল পাখাই যথেষ্ট।

–তা' কেমন করে হয়, স্যার? এই প্রচণ্ড গরমে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে আপনার। পাখা ভাড়া-টাড়ার কথা ছেড়ে দিন। থানার চার্জ নিয়ে সাত দিনের মধ্যেই হু'টো পাখার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি আপনার জন্যে। গরমে আপনি কষ্ট পাবেন, এটা কোন কাজের কথা হলো নাকি?

রুদ্র কিছু জবাব দেবার আগেই পাখার প্রসঙ্গে ইতি টেনে পলাশ বললে, এবার চলি, স্যার। কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই আমাকে বলবেন। এই শর্মা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনার এতটুকু অসুবিধে হবে না।

পলাশের কথার তোড়ে রুদ্রর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। তাবে যথারীতি স্যালুট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় জেলা সদর থানার ভাবী ইন্-চার্জ পলাশ ব্যানার্জী।

লোক চিনতে ভুল করে নি রুদ্রদেব। বাস্তবিকই ঘোড়েল অফিসার এই পলাশ ব্যানার্জী। এদের মত অফিসার গোটা কয়েক আই-পি-এস অফিসারকে একসঙ্গে ঘোল খাওয়াতে পারে। সাহেব-সুবোদের খুশি রাখার টেক্‌নিক এরা ভালভাবেই জানে। ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখেই এরা একজন প্রবেশনার আই-পি-এস'কে পর্যন্ত খুশি করতে সচেষ্ট। সুপীরিয়র অফিসারদের হাতের মুঠোয় রাখার কায়দা-কানুন এদের মুখস্থ। বাগে পেয়ে নতুন আই-পি-এস অফিসারদের স্তুতি বন্দনার মাধ্যমে প্রথমেই তাদের মাথা বিগড়ে দিতে চেষ্টা করে এরা। তারপর আনুষঙ্গিক লোভের বস্তু সামনে এনে হাজির করে ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে যায় অধঃপাতের পথে।

স্তুতি-বন্দনায় ঈশ্বর পর্যন্ত যেখানে খুশি হন সেখানে মানুষ তো কোন্ ছার। নতুন আই-পি-এস্ অফিসার। হয়তো সাদা মন নিয়েই ডিপার্টমেণ্টে এসেছে চাকরি করতে। কিন্তু জেলায় এসেই পলাশ ব্যানার্জীর মত ঘোড়েল অফিসারদের স্তুতি বন্দনায় অভিভূত হয়ে নিজের সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা করে বসে। বিপদের শুরু এখানেই। নিজের সম্পর্কে এই অতিরিক্ত সচেতনতাই কালক্রমে পর্যবসিত হয় এমন এক অন্ধ বিশ্বাসে যেখানে নিজেকে একটা মস্ত কেউকেটা বলে ভাবতে ভালই লাগে। অবশেষে পুলিশ বিভাগের প্রচণ্ড ক্ষমতা সেই অন্ধ বিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলে তাকে করে তোলে স্বৈরাচারী। এলাকার ছোট-খাটো এক সম্রাট বলে মনে হয় নিজেকে। সেই সঙ্গে লোভের

আগুন মিশলে তো আর কথাই নেই। আমদানার স্রোতে গা ভাসাতে আর কোন বাধাই থাকে না তখন।

নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই পলাশ ব্যানার্জীর মত অফিসারদের পাতা ফাঁদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে রুদ্রদেব। পলাশ চলে যেতেই নিজের মনে একটু হাসে সে। ফাঁদের ছক্ ঠিকই আছে। প্রথমে স্তুতি-বন্দনা, তারপরে লোভ। সদর থানার চার্জ হাতে নিয়ে সাত দিনের মধ্যে পাথার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সেই লোভের আগুনে ঘৃতাহুতি ছাড়া আর কিছু নয়।

শুরু হয় টানা পোড়েন। ততদিনে রুদ্রদেব থানা থেকে চলে এসেছে পুলিশ অফিসে। সেখানেই চলেছে তার শিক্ষানবিশী। কিন্তু রুদ্রদেব ছাড়তে চাইলে কি হবে, কমলি যে তাকে ছাড়ে না। নতুন সাহেবের দুঃখ-কষ্টে যে প্রাণ কাঁদে পলাশ ব্যানার্জীর। দু' একখানা সিলিং পাখা তাকে না গছালেই যে নয়! তাও আবার ভাড়া-টাড়া কিছু নয়। সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্ট্। অবশেষে গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার আগমনের দোহাই পেড়ে নিজেকে কোনক্রমে বাঁচায় রুদ্রদেব।

পুলিশ অফিসে বসেই সদর থানার ইন্-চার্জ পলাশ ব্যানার্জীর ক্ষমতার হদিশ পায় রুদ্রদেব। ক্রাইম কণ্টোল করতে সিদ্ধহস্ত সে। মাত্র তিনটি মাসের মধ্যেই এলাকার ক্রাইম সে কমিয়ে ফেললে। সত্যিকারের ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন, কাগজে-পত্রে দেখা গেল এলাকার ক্রাইম হু-হু করে নীচে নেমে গেছে। সুখেন চ্যাটার্জী যা পারে নি, পলাশ ব্যানার্জী তা' পেরেছে। জেলার পুলিশ সুপার অশোক হাজরা খুব খুশি। এতদিনে একজন মনোমত অফিসারকে সদর থানার চেয়ারে বসাতে পেরেছেন তিনি।

বাস্তবিকই তুখোড় অফিসার এই পলাশ ব্যানার্জী। ক্রাইম সাপ্রেস্ করে চলেছে সে নির্বিবাদে। এতটুকু চিন্তা ভাবনা নেই তার। তা'ছাড়া এলাকার জনসাধারণের ওপর ইতিমধ্যেই যে প্রভাব সে বিস্তার করে ফেলেছে তা' সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। মুখে সর্বদাই মিষ্টি কথা, আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি, কিন্তু কাজের বেলায় একেবারে শূন্য। এলাকার রাজনৈতিক দাদাদের সঙ্গে প্রচুর দহরম-মহরম। তাদের চামচাদের কুকর্মের ব্যাপারে সর্বদাই চোখ বুজে থাকে। কাজেই চামচারা স্বভাবতই খুশি এই নতুন ও-সির ওপরে, আর সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দাদারাও। তবে একই রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠিবাজী কিম্বা বিভিন্ন দলের দলবাজীর ফলে উদ্ভূত সমস্যার বেলায় মাঝে মাঝে একটু অসুবিধায় পড়তে হয় তাকে, কিন্তু বুদ্ধিবলে সেটুকু অনায়াসেই কাটিয়ে ওঠে পলাশ ব্যানার্জী।

কাগজে-কলমে যাই থাক না কেন, এলাকার ক্রাইম বেড়েই চলেছে ধীরে ধীরে। পুলিশ নির্বিকার, ক্রিমিন্যালদের পোয়াবারো। থানার এক শ্রেণীর অফিসারদের সঙ্গে বন্দোবস্তের মারফত নির্বিবাদে ক্রাইম করে চলেছে তারা। মাঝে মধ্যে দু' চারজন ক্রিমিন্যালকে না ধরলে চলে না। ধরা পড়ে কিছুদিন জেলে কাটিয়ে আসে তারা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আদালতের বিচারে ছাড়া পায়। নেহাত হাতে-নাতে ধরা না পড়লে আদালতে শাস্তি হওয়া কঠিন। সাক্ষী কোথায়? সাক্ষী ছাড়া আদালতে অভিযোগ প্রমাণ হবে কেমন করে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে এলাকায় বাস করে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে? তা'ছাড়া ভুল ত্রুটি আর অসতর্কতার প্রমাণ পুলিশের ডাইরীর পাতায় পাতায়। সেই রন্ধ্রপথেও ছাড়া পায় অনেকে। তদন্ত না জানলেও যেখানে চাকরি বজায় থাকে এবং লুটেপুটে খাওয়ার অধিকারে হাত পড়ে না, সেখানে পরিশ্রম করার প্রয়োজন কোথায়?

কিন্তু সবাই তো এমন নয়। দু'চারজন সৎ কাজ-জানা অফিসার সর্বত্রই আছে। সত্যি বলতে কি, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সামান্যতম সুনাম বলে এখনও যদি কিছু থাকে, বিপদে পড়লে জনসাধারণের এখনও যদি পুলিশের কথাই প্রথমে মনে আসে তা'হলে তার জন্যে দায়ী মুষ্টিমেয় সেই সব অফিসারেরা যারা নাকি গাধার মত খেটে ভালো অফিসার বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু আখেরে তেমন কোন লাভই তাদের হয় না। ডিপার্টমেণ্টে দই মারার সময় কিন্তু সেই নেপোরাই এগিয়ে আসে যাদের সম্পর্কে কোন সুপীরিয়র অফিসার কোন বিশেষ গোপনীয় কারণে বিরাট সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। সেখানে ঐ সার্টিফিকেটখানারই কেবল মূল্য, সার্টিফিকেট প্রদানকারী সুপীরিয়র অফিসারের সততার বিষয়টি একেবারেই গৌণ।

জঙ্গলে বাঘের মুখোমুখি পড়লেও বোধহয় পালিয়ে আসা সম্ভব কিন্তু পলাশ ব্যানার্জীর মত অফিসারের খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। নানা উপায়ে নতুন সুপীরিয়র অফিসারদের মাথা বিগড়ে দিতে তারা সিদ্ধহস্ত। সৎকে অসৎ করে তোলার ক্ষমতা তাদের অসীম। সেই পলাশ ব্যানার্জীকেই নিজের কঠিন সংযম দিয়ে ঠেকিয়ে রাখে রুদ্রদেব। কৌশল বিফল হয় পলাশ ব্যানার্জীর। মনে মনে হয়তো বলে—দু'চার বছর যাক্, দেখা যাবে তোমার সততার বড়াই। পাঁচে না হলে পঞ্চাশে একদিন আত্মসমর্পণ করতে হবে তোমাকে। পঞ্চাশে না হলে পাঁচশো'তে। তাতেও না হলে পাঁচ হাজারে। চাঁদির জুতোর যে অপার মহিমা।

ডিপার্টমেণ্টের হাল-চাল যতই দেখে ততই বিস্মিত হয় নতুন আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্য। মাঝে মধ্যে নিজেকে বড়ই অসহায় বলে মনে হয় তার। কিন্তু পরমুহূর্তেই কেমন যেন একটা জেদ চেপে বসে তার মনের মধ্যে। পুলিশী মানসিকতার কালো দিকটির সঠিক খোঁজ পেতেই হবে তাকে। চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে এই ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি আনাচ-কানাচ পরীক্ষা করে বের করতে হবে সেই রোগের জীবাণু। সম্ভব হলে ধ্বংস করতে হবে সেই জীবাণুকে। রুদ্রদেব জানে, একাজ তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। সে আরও জানে, এর সঙ্গে দেশের সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি জড়িত। তবুও সে এগিয়ে যাবে, চালিয়ে যাবে তার একক প্রচেষ্টা।

বাড়িতে মায়ের তাগাদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একটি সুলক্ষণা পুত্রবধূকে ঘরে এনে তুলতে খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন তিনি। রুদ্র কিন্তু আজও 'হাঁ-না' কিছুই জবাব দেয় নি বাবা-মাকে। এর মধ্যে দু'একবার অলকার সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল। রুদ্রদেব প্রতিবারেই তাদের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল রাজনৈতিক নেত্রী অলকা মজুমদার প্রতিবারেই অপূর্ব কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল কথাটা। অবশেষে আর একদিন অলকার সঙ্গে দেখা হতেই রুদ্র সরাসরি সেই প্রসঙ্গ তুললো তার কাছে। বললে, এদিকে বিয়ের জন্যে মা তো অস্থির হয়ে উঠেছেন।

রুদ্র ভেবেছিল তাদের বিয়ের প্রসঙ্গে হয়তো একটু গম্ভীর হয়ে উঠবে অলকা। রাজনৈতিক নেত্রী অলকার কাছ থেকে তেমন একটা কিছুই আশা করেছিল রুদ্র। ইদানীং তার হাব-ভাবে রুদ্রর পক্ষে তেমন কিছু ধারণা করা অস্বাভাবিক ছিল না। তাদের কলেজ জীবনে এই ধরনের কথায় অলকা যেমন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতো তেমনটা সে অবশ্যই আশা করতে পারে নি। ছাত্রী অলকার সঙ্গে এম-এল-এ অলকার তফাত যে অনেক তা বোধহয় রুদ্রর চাইতে বেশি আর কেউ জানতো না।

কিন্তু রুদ্রকে বিস্মিত করে চোখের ভুরু নাচিয়ে হাল্‌কা স্বরে অলকা বললে, মাকে কি জবাব দিলে?

একটু সময় চুপ করে থেকে রুদ্র পাল্টা প্রশ্ন করে, বলো তো কি জবাব দিলে ভালো হতো?

—বারে, আমি তা' বলবো কেমন করে? তোমার ব্যাপার তুমিই ভালো জানো।

—ব্যাপারটা বুঝি আমার একার? তোমার বুঝি কিছু নয়? সুযোগ পেয়ে আসল বিষয়টির অবতারণা করে বসলো রুদ্র।

রুদ্রর প্রশ্নে একটু যেন থতমত খেল অলকা। একটা ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললে, না ঠিক তা' নয়। তবে—

কথাটা শেষ না করেই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে অলকা। পরক্ষণেই কথাটা ঘুরিয়ে বললে, সত্যি, বিয়ের কথায় মাকে কি জবাব দিলে?

—কিছুই জবাব দিই নি। তোমাকে জিজ্ঞেস না করে কেমন করেই বা জবাব দিই?

রুদ্রর কথায় খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে অলকা। হাতের ইংরেজি খবরের কাগজখানার একটা পাতা আপন মনে অহেতুক ভাঁজ করতে থাকে। তারপর একসময় মুখ তুলে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি।

—বলো। রুদ্র একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অলকার মুখের দিকে।

একটু নড়েচড়ে বসে অলকা যেন নিজেকে খানিকটা সহজ করে নিতে চেষ্টা করে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, আমাদের এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে একদম ভাবিনি তা যেন মনে করো না। কিন্তু বিশ্বাস করো, ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারি নি।

—কেন, এতে এত ভাবনার কি আছে? তুমি রাজনীতি নিয়ে আছো বলে আমার তো কোন অভিযোগ নেই। বিয়ের পরে তুমি থাকবে তোমাব রাজনীতি নিয়ে, আমি থাকবো আমার চাকরি নিয়ে। এতে এত ভাবনা কিসের? একালে স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ প্রফেসন নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা তো কিছু অস্বাভাবিক নয়।

ম্লান হেসে অলকা বললে, না, তা' অবশ্যি নয়। তবে এদেশে রাজনীতি করা ঠিক প্রফেসন বলে গণ্য হয় না। বিপদ তো সেখানেই।

—কেন, কিসের বিপদ? কৌতূহলী হয়ে ওঠে রুদ্র।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অলকা জবাব দেয়, দেখ, আমি যদি কোন চাকরি বা অন্য কোন কাজ করতাম তা'হলে বলার কিছুই থাকতো না। কিন্তু জানো তো, রাজনীতি বড় গোলমেলে জিনিস। এখানে নিজের পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও খুব সাবধানে থাকতে হয়। একচুল এদিক-ওদিক হলেই আর রক্ষে নেই।

অলকা থামতেই রুদ্র আবার বললে, আমি বুঝতে পারছি না অলকা, তুমি

কি বলতে চাইছো। যারা রাজনীতি করে তারা কেউ বিয়ে করে না নাকি? এদেশে বিবাহিতা মহিলা এম-এল-এ'র কি কিছু অভাব আছে?

জবাব দেয় অলকা, না, তা' নেই। খুঁজলে হয়তো দু'একজন কুমারী এম-এল-এও পাওয়া যাবে। রাজনীতিতে থাকা অবস্থায় তারা হয়তো বিয়েও করে। কিন্তু তাদের কারুর স্বামীই বোধহয় পুলিশ অফিসার নয়।

কথাটা কানে যেতেই দারুণ চমকে ওঠে রুদ্র। তার এই চমকে ওঠার ভঙ্গিটুকু কিন্তু নজর এড়ায় না অলকার। সে তাড়াতাড়ি আবার বললে, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ, পুলিশ অফিসারের স্ত্রী হয়ে রাজনীতিতে সফল হওয়া কি সম্ভব? এদেশের পুলিশ ইমেজ যে কি তা' তো তোমার অজানা নয়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিতে চেষ্টা করে রুদ্র। অলকার সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়টি নিয়ে সে এর আগে অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছে। অলকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিয়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে মনে মনে সে আলোচনাও করেছে। তার নিজের দিক থেকে বিষয়টি যদিও জটিল বলে কখনও মনে হয় নি, কিন্তু অলকার দিক থেকে এর পরিণাম সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারে নি রুদ্র। কিন্তু অলকা এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটা তুললো তা' কিন্তু কখনও মনে আসে নি তার। স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম জীবনে স্বামীর পুলিশের চাকরি যে স্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনের একটা অন্তরায় হতে পারে সে সম্পর্কে একেবারেই ভাবে নি রুদ্র।

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে অলকা আবার বললে, বুঝতে পারছি আমার কথায় তুমি ব্যথা পেয়েছ। কিন্তু একটু ভালোভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, যে কথাটা কঠিন হলেও সত্যি।

অলকার কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি না হলেও একেবারেই যে যুক্তিহীন তা' কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয় না রুদ্রর। একজন মহিলার উঠতি রাজনৈতিক জীবনে তার পুলিশ স্বামীর অস্তিত্ব বাস্তবিকই কেমন যেন একটু বেখাপ্পা বলে মনে হয়। এমনকি এটা তার সেই জীবনের একটা অভিশাপ হয়ে দেখা দিলেও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অলকার মত রাজনীতি-পাগল একটি তরুণী, যে নাকি সবে মাত্র এম-এল-এ হয়ে এ্যাসেম্বলিতে ঢুকেছে, যার সামনে রয়েছে ভবিষ্যতের হাতছানি, সে যদি রুদ্রর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের গাঁটছড়া বাঁধতে ইতস্ততঃ করে তা'হলে বোধহয় তাকে তেমন একটা দোষ দেওয়া যায় না।

এতক্ষণে রুদ্র কথা বলে। পূর্ণদৃষ্টিতে অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে, মিথ্যে বলো নি তুমি, অলকা। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার কথায় এখন বুঝতে পারছি আমরা দু'জনে এখন যে অবস্থায় রয়েছি, তাতে আমাদের বিয়ে বোধহয় সম্ভব নয়।

রুদ্র থামতেই অলকা আবার বলে ওঠে, আচ্ছা, পুলিশের এই চাকরি ছেড়ে তুমি কি অন্য কোনো চাকরি নিতে পারো না?

ম্লান হেসে জবাব দেয় রুদ্র, পারবো না কেন? তবে এই বাজারে একটা চাকরি জোগাড় করা কি সহজ? তা'ছাড়া কম্পিটেটিভ পরীক্ষায় পাশ করে এই চাকরি জোগাড় করেছি। এই ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে চিরকাল যে কৌতূহল অনুভব করেছি তা' মেটাতেই আমার এই চাকরি। এক কথায় এ চাকরি ছেড়ে দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব? তা'ছাড়া, আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথাও তো তুমি জানো।

—হ্যাঁ জানি, তাই তো ভেবে ভেবেও কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না। তুমি যদি পুলিশের চাকবি ছাড়া অন্য কোন চাকরি করতে তা'হলেও যেমন অসুবিধার কিছু ছিল না, তেমনি রাজনীতি ছেড়ে এম-এল-এ থেকে রিজাইন দিয়ে আমি যদি তোমার হাত ধরে তোমার পুলিশ কোয়ার্টারে গিয়ে উঠতে পারতাম তা'হলেও ভাববার কিছু থাকতো না। কিন্তু তোমার কিম্বা আমার পক্ষে এর কোনটাই যখন সম্ভব নয় তখন—

কথাটা শেষ না করে অলকা থেমে গেলেও রুদ্র নিজেই একটু ম্লান হেসে তার কথার পাদপূরণ করে, তখন আমাদের সোজাসুজি নিজ নিজ পথেই চলা উচিত, তাই তো?

অলকা জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। বলতে থাকে রুদ্র, দেখো অলকা, আমার মনে হয় কলেজ জীবনে আমাদের সেই ভালোবাসা বোধহয় খাদহীন ছিল না। তাই যদি থাকতো তা'হলে ভালোবাসার টানে আমরা দু'জনেই পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতে পারতাম। বিলেতের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী অষ্টম এড্ওয়ার্ড যেখানে কেবল প্রেমের টানে গোটা সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে পারেন, সেখানে আমিও যেমন আমার আই-পি-এস চাকরি ছাড়তে পারছি না, তুমিও পারছো না তোমার এম-এল-এ পদ ছাড়তে। কাজেই বলা চলে যে একদিন তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছিল, আবার আমাকে দেখে তোমারও। কিন্তু ভালো আমরা বাসিনি। ভালো লাগাকেই ভালোবাসা বলে ভুল করেছিলাম আমরা।

কথাটা শেষ করে চুপ করে থাকে রুদ্র। অলকাও কোন কথা বলে না। আসলে সেই মুহূর্তে বলার চাইতে চুপ করে থাকতেই ভালো লাগছিল তাদের। এ যেন তাদের বিচ্ছেদ মুহূর্তের নীরবতা, যখন নাকি চুপ করে থেকে বিচ্ছেদের বেদনাটুকু অনুভব করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

রুদ্র একসময় অলকাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা তুমি কি ঠিক করেছ যে রাজনীতিতে থেকে কখনও বিয়ে করবে না?

চোখ তুলে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে অলকা বললে, তেমন কোন প্রতিজ্ঞা তো আমি করি নি। কিন্তু এ প্রশ্ন করছো কেন?

—এমনি। জবাব দেয় রুদ্র।

—না, এমনি নয়, বলতে থাকে অলকা, তুমি আমার জন্যে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে চাও নাকি?

রুদ্র বললে, যদি বলি চাই।

জবাব দেয় অলকা, কিন্তু আমি তা' চাই না। রাজনীতির নেশায় আমি আমার জীবনটা মাটি করলেও, আমার জন্যে তোমার জীবন মাটি হোক্, তা আমি চাই না। বিয়ে করে ঘর-সংসার করো তুমি। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না। মনে করো, অলকা নামে একটা মেয়েকে একদিন তুমি ভালোবাসতে। রাজনীতির আবর্তে পড়ে সে কোথায় তলিয়ে গেছে।

অলকার কথায় রুদ্র একটু ম্লান হেসে বললে, না, ভুল বললে তুমি। তলিয়ে সে যায় নি। সে জাগছে। রাজনৈতিক নেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার। সেই রূপটি বজায় রাখতে গিয়ে সে পুলিশের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। পুলিশের কলুষ স্পর্শ যাতে তার রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে অপবিত্র করে তুলতে না পারে, তাই সে আজ অস্বীকার করতে চায় অতীতকে।

কথা বলতে বলতে রুদ্রর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র বলে মনে হয় তার। কেমন যেন এক অপমানের জ্বালা ঘিরে ধরে তার সত্তাকে। এ জ্বালা প্রত্যাখ্যানের জ্বালা, এ অপমান যেন তার সেই পৌরুষের প্রতি অপমান যে পৌরুষ একদা নিজেকে প্রকাশের পথ খুঁজেছিল তার পুলিশী সত্তার মাধ্যমে।

পুলিশের চাকরিতে ঢুকলেও চাকরির প্রতি আসক্তি জন্মাবার মত সময় তখনও হয় নি রুদ্রর। কাজেই নিজের এই পুলিশী জীবনের প্রতি ভালবাসাও জন্মায় নি। জীবনের সঙ্গে জীবিকা যখন মিলেমিশে এক হয়ে যায় তখনই আসে ভালবাসা। পুলিশকে কেউ গালাগাল দিলে মনে সত্যিকারের ব্যথা অনুভব

করার মত সময় এখনও আসে নি রুদ্রর জীবনে। কিন্তু অলকার এই প্রত্যাখ্যান যে মুহূর্তে তার পৌরুষকে আঘাত করলো সেই মুহূর্তে এই নতুন পুলিশী জীবনটাকে বড়ই আপনার বলে মনে হলো রুদ্রর। মনে হলো, অলকার এই প্রত্যাখ্যানের আঘাত স্পর্শ করেছে রুদ্রকে নয়, সর্বভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের একজন নিষ্ঠাবান সদস্য রুদ্রদেব ভট্টাচার্যকে।

জোর করে সহজ হতে চাইলেও রুদ্রদেব যেন আর সহজ হতে পারে না অলকার কাছে। সেই মুহূর্তে অলকাকে তার নিজের হাতের ছোট্ট ঘড়িটির দিকে তাকাতে দেখে মুখের ওপর সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে রুদ্র জিজ্ঞেস করে, কোন এনগেজমেণ্ট আছে নাকি তোমার ?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অলকা বললে, এ্যাসেম্বলি সেশন চলছে। আমাকে যে আর না উঠলেই নয়।

চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে রুদ্র বললে, আই এ্যাম এক্সট্রিম্‌লি সরি, অলকা। কতগুলো বাজে কথার অবতারণা করে তোমার সময় নষ্ট করে দিলাম। আই এ্যাম রিয়েলি সরি।

রুদ্রর বলার ভঙ্গিটুকু কিন্তু লক্ষ্য করে অলকা। কিন্তু সেই মুহূর্তে বাস্তবিকই তার তাড়া ছিল। তাই আর কিছু না বলে সেও উঠে দাঁড়ায়। তারপর সহসা রুদ্রর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, গোটা ব্যাপারটাকে স্পোর্টিংলি নিতে চেষ্টা করো। নাই-বা হলো আমাদের বিয়ে, জীবনভোর বন্ধু হয়ে থাকতে তো আমাদের আপত্তি নেই। চেষ্টা করো, নিজের জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে।

কথাটা বলে আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না অলকা। রুদ্রর হাতে সামান্য একটু ঝাঁকুনি দিয়ে পায়ের স্লিপারের শব্দ তুলে সেখান থেকে সে চলে যায়। আর, সেইমুহূর্তে একটা সব হারানোর দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে অলকার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে রুদ্র।

রুদ্র ও অলকা। কলেজ জীবনে বাঁধা তাদের ভবিষ্যৎ মিলিত জীবনের গাঁটছড়া এমনিভাবেই হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। রাজনীতির আকর্ষণে কেন্দ্রচ্যুত হলো অলকার ভালবাসা। কেন্দ্রচ্যুত পরমাণু কণিকার মত সেই মুহূর্তে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হলো, সেই তাপে সেখানেই দাঁড়িয়ে দগ্ধ হতে লাগলো নতুন আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্য।

পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের মত সততা-অসততাও এমন দু'টি শব্দ যার সত্যিকারের অর্থ বোধহয় বিশ্বের কোন ভাষার কোন অভিধানেই কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় সততার শেষ এবং কোথায় অসততার শুরু তা' সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা বোধহয় কারুরই নেই। সামাজিক পরিবেশ ও আচার আচরণ ভেদে এর অর্থেরও কিছু কিছু তারতম্য ঘটে। অসৎ আচরণ সব দেশে সব সমাজেই নিন্দনীয়, কিন্তু এই অসৎ আচরণের সংজ্ঞা নিয়েই যত গোলমাল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সভ্য মানুষের সমাজে সৎ ও অসৎ নামে কতগুলো সাধারণ আচরণ বিধি চালু আছে। এগুলো ইউনিভার্সাল। সভ্যতার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সেগুলো চালু আছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ধার কিছু কমতে বাড়তে পারে। অসহায় ও দুর্বলকে রক্ষা করা যেমন সৎ আচরণের অঙ্গ তেমনি অন্যের জিনিস চুরি করা অসততার পরিচয়। সমস্ত সভ্য সমাজে এই কাজগুলোকে আজও এই দৃষ্টিতেই দেখা হয়ে থাকে।

এমনি একটা অসৎ কাজের দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'ঘুষ' যার সাবেকী নাম উৎকোচ। সমাজবিদেরা বলেন, সভ্যতার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে দু'টো ব্যাধি সভ্যসমাজ-দেহে উৎপাত করে বেড়াচ্ছে তার একটি হলো গণিকাবৃত্তি, আর অপরটি ঘুষ। সরকারী কর্মচারীর ঘুষ নেওয়াকে মনীষীরা সরকারী পদের গণিকাবৃত্তি বা ব্যভিচার বলে বর্ণনা করে গেছেন। এই ব্যাধির হাত থেকে কোনকালে কোন সমাজই রেহাই পায় নি। ভগবান যীশুখৃষ্টের বারোজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে জুডাস ছিলেন অন্যতম। সেই জুডাস মাত্র তিরিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে সেকালের জল্লাদদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তিরিশের বদলে তিনটি মুদ্রায় হয়তো তিনি বশীভূত হতেন না, কিন্তু তিরিশটি মুদ্রার উৎকোচে বশীভূত হয়েছিলেন। একালেও ঠিক তাই। পাঁচশোতে যিনি সৎ, পাঁচ হাজারে হয়তো তিনি অসৎ। আবার পাঁচ হাজারে যিনি সৎ, পাঁচ লাখে তিনিই আবার অসৎ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন

একবার বলেছিলেন—উৎকোচ প্রদানকারীর সর্বোচ্চ নিলামের ডাকে সাড়া না দেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন।

এযুগে ঘুষের সুযোগ নেই এমন সরকারী বিভাগের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এই বস্তুটি অল্প বেশি সব বিভাগেই আছে। যেখানে সুযোগ খুবই কম সেখানকার কর্মীরা হয় নিজেদের সৎ বলে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে চায়, নয় তো গোপাল ভাঁড়ের সেই ঢেউ গোণার গল্পের মত সীমিত সুযোগকেই কাজে লাগায়। ঘুষ নেওয়াকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে এমন কর্মীর সংখ্যা বাস্তবিকই মুষ্টিমেয়। কেউ সুযোগ না পেয়ে সৎ, কেউ বা সাহসের অভাবে সৎ। সত্যিকারের সততা এযুগে একান্তই বিরল।

পুলিশ বিভাগের কর্মীদের যত দোষই থাক্, ঘুষ নেওয়ার বেলায় তাদের সাহসের অভাব এই অপবাদ বোধহয় তাদের কেউ দিতে পারে না। কেউ জনসাধারণকে প্যাচে ফেলে কিম্বা ভয় দেখিয়ে ঘুষ আদায় করে, আবার কেউ বা কোন বিশেষ উপকারের বিনিময়ে আদায় করে কিছু পারিতোষিক। কেউ ঘুষ আদায় করে টাকা পয়সায়, কেউ বা দামী বস্তুতে। খুশি হয়ে 'পান' খাওয়ার জন্যে দারোগাবাবুকে কোন মুচীর জুতো দানও ঘুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। পারিতোষিক, উৎকোচ কিম্বা বকশিশ, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আসলে সবই ঘুষের পর্যায়ে পড়ে। আইনের ভাষায় সবগুলোই ইল্-লিগাল গ্র্যাটিফিকেশন। সুদখোর কাবুলীদের যেমন আসলের চাইতে সুদের ওপর নজর ও লোভ বেশি, তেমনি এই অসৎ কর্মচারীদের নজরও ঐ ঘুষের দিকে। অন্যান্য সরকারী বিভাগের মত পুলিশ বিভাগেও হাঁসের দলে যে দু'একটা বক দেখা যায় তারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। ডিপার্টমেণ্টে তারা বোধহয় মিস্ফিট্। তাই দলে ভারি হাঁসেরা সম্ভবতঃ এই বক ক'টাকে বোকা ও ভীতু বলেই মনে করে।

মহকুমা সদর থানায় তেমনি হাঁসের দলের মধ্যে একমাত্র বক হচ্ছে থানার মেজবাবু অসিত মুখার্জী। ডাইরেক্ট দারোগায় ভর্তি। সাতাশ আঠাশের মত বয়স। ফর্সা ছিপ্ছিপে চেহারা। একে ঠোঁট-কাটা বলে অসিত মুখার্জীর বরাবরই একটু বদনাম, তার ওপর ঘুষের পয়সা কড়ির ধার ধারে না সে। কাজেই থানার ইন্সপেক্টর-ইন্-চার্জ রাজেন নন্দী তেমন একটা খুশি নয় অসিতের ওপর।

পাকা পুলিশ অফিসার বলতে যা বোঝায় রাজেন নন্দী হচ্ছে ঠিক তাই। ময়লা গায়ের রং, কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। কন্স্টেবলে ভর্তি হয়েছিল, এখন ইন্সপেক্টর। ডিপার্টমেণ্টের অলি-গলি তার মুখস্থ। জেলার পুলিশী

প্রশাসনের চাবিকাঠি পুলিশ-সাহেব দিবাকর সেনকে সে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে। রাজেন নন্দীর কর্মক্ষমতার ওপর অগাধ বিশ্বাস তাঁর। তাই জেলার অন্যান্য ছোট-বড় সাহেবদের তেমন একটা আমলই দিতে চায় না রাজেন নন্দী।

ডাইরেক্ট আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্য যেদিন কলকাতার প্রায় লাগোয়া এই মহকুমা শহরে এস-ডি-পি-ও অর্থাৎ সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসার হিসেবে প্রথম পোস্টিং নিয়ে এলো সেদিন এস-ডি-পি-ও অফিসের দোরগোড়ায় থানার ইন্-চার্জ রাজেন নন্দীর বদলে উপস্থিত ছিল সেকেণ্ড এস-আই অসিত মুখার্জী।

রুদ্রদেব জীপ থেকে নামতেই অসিত এগিয়ে এসে তাকে স্যালুট করে বললে, অফিসের দোতলায় আপনার কোয়ার্টার ধুয়ে মুছে সাফ করে রাখা হয়েছে, স্যার। দু'জন কনস্টেবলকেও রাখা হয়েছে আপনার কাজ কর্মের জন্যে।

মৃদু হেসে রুদ্রদেব বললে, থ্যাঙ্কস্। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, আপনি বুঝি এখানকার থানাতেই পোস্টেড্?

জবাব দেয় অসিত, হ্যাঁ স্যার, থানার সেকেণ্ড এস-আই। ইন্সপেক্টরবাবু থানায় একটু ব্যস্ত আছেন বলে আমায় পাঠিয়েছেন।

মহকুমা পুলিশ অফিসারের চার্জ নিয়ে প্রথমটায় একটু ভয় ভয় করছিল রুদ্রর। চাকরির এই শুরু। প্রথম পোস্টিংই এমন একটা মহকুমায় হলো যেটা নাকি এই রাজ্যের অর্থনীতিতে তো বটেই এমনকি রাজনীতিতেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্পুট প্রায় বারোমাসের ব্যাপার। তা'ছাড়া সাধারণ ক্রাইমও প্রচুর। গোটা ছয়েক থানা নিয়ে এই সাব-ডিভিশন। অধিকাংশই শহরতলী এলাকা, তবে গ্রাম এলাকাও কিছুটা আছে।

এখানে জয়েন করার আগে রুদ্রদেব জেলা সদরে গিয়ে পুলিশ সাহেব দিবাকর সেনের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। কথাবার্তায় দিবাকর সেনকে তেমন কিছু খারাপ বলে মনে হয় নি তার। তিনিও ডাইরেক্ট আই-পি-এস অফিসার। চল্লিশের মত বয়স। অনেকদিন আগেই জেলার চার্জ পেয়েছেন।

এস-পি দিবাকর সেন রুদ্রকে কেবল একটা কথা বলেছিলেন, শুনুন মিস্টার ভট্টচার্যি, এই প্রথম পোস্টিং নিয়ে যাচ্ছেন। একটু দেখে শুনে সাবধানে চলবেন। কিছু অসুবিধে হলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তা'ছাড়া রাজেনবাবুর মত পাকা অফিসার তো আপনার হাতের কাছেই রয়েছে। তাকে বলে দিয়েছি আমি। সব রকম সাহায্যই তার কাছ থেকে আপনি পাবেন।

অসমতল পথ বেয়ে পুলিশের স্টেশন ওয়াগনখানা একসময় অপেক্ষাকৃত সমতল একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াতেই ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে উর্দিপরা লোকটি তাড়াতাড়ি নেমে এসে আরোহীদের উদ্দেশে সসম্ভ্রমে বললে, এহি হ্যায় দিলওয়াড়া। আপলোগ উতারিয়ে, সাব।

লোকটির কথায় চঞ্চলতা দেখা দেয় গাড়ির আরোহীদের মধ্যে। ওদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে কেমন এক হতাশার চিহ্ন। দূরে একটু নীচুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি যে দু'টো মন্দির তাই নাকি বিশ্ববিখ্যাত জৈন মন্দির দিলওয়াড়া। একেবারেই সাদা-মাটা চেহারা যে! এর জন্যেই বিশ্বের তাবৎ শিল্পানুরাগী ট্যুরিস্টরা ছুটে আসে এখানে! বাইরে থেকে তো অতি সাধারণ বলেই মনে হয়।

গাড়ি থেকে একে একে নেমে এলো আরোহীরা। সংখ্যায় দশ-বারোজন। বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যেই প্রত্যেকের বয়স। পরনে সাহেবী পোশাক। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তারা। কেউ উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা, কেউ বা পশ্চিম ভারতের মানুষ। দক্ষিণ ভারতের লোকও রয়েছে ওদের মধ্যে। এমনকি অল্প দাড়ি-গোঁফ ও মাথায় পাগড়ি সমেত পাঞ্জাব কিম্বা হরিয়ানার অধিবাসীও রয়েছে দু'জন। সবশেষে গাড়ি থেকে যে যুবকটি নেমে এল তার নাম রুদ্রদেব ভট্টাচার্য।

নামে রুদ্র হলেও চেহারায় কিন্তু রুদ্রের ছিঁটে-ফোঁটাও নেই কোথাও। লম্বা দোহারা গড়ন। এক মাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো কালো চুল। উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রং। কিন্তু চোখ দুটি ভারি আশ্চর্য। টানা লম্বা চোখ জোড়ায়

কেমন যেন এক স্বপ্নালু দৃষ্টি। এমন চোখের দৃষ্টি পুরুষের চাইতে মেয়েদের চোখেই ভাল মানায়। কিন্তু রুদ্রদেবের চেহারার সঙ্গে এমন এক অদ্ভুত মিল ঐ চোখ জোড়ার যে ঐ চেহারায় ঐ চোখ ছাড়া আর কিছুই যেন ঠিক মানাতো না। তার চেহারা ও চোখ দু'টো যেন ঠিক 'মেড ফর ইচ আদার।'

গাড়ি থেকে নেমে এসে যুবকেরা জড়ো হয় এক জায়গায়। ওদের কথাবার্তা কিম্বা চাল-চলনে আধুনিকতার উচ্ছৃংখলতা না থাকলেও উচ্ছ্বাসের অভাব ছিল না। ওরা পরস্পর কথাবার্তা বলছিল ইংরেজিতেই। কেউ কেউ ইংরেজির মধ্যে দু'চারটা হিন্দী শব্দ ঢুকিয়ে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করছিল। ওদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু ঐ দিলওয়াড়া মন্দির। মন্দিরের বাইরের রূপ দেখে যে তারা খুশি হতে পারেনি, বরঞ্চ হতাশ হয়েছে সেকথা স্পষ্টই বলাবলি করছিল তারা।

সত্যিই তাই। বিশ্ববিখ্যাত জৈন মন্দির দিলওয়াড়ার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে সারা পৃথিবীর ট্যুরিস্টরা ছুটে আসে রাজস্থানের এই ছোট্ট সুন্দর শৈলাবাস মাউন্ট আবুতে। সহর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে ঐ মন্দির। কিন্তু মন্দিরের বাইরের রূপ দেখে কোন ট্যুরিস্টই বোধহয় কোনকালে খুশি হতে পারেনি। আজ থেকে সাড়ে ন'শো বছর আগে চালুক্যরাজ প্রথম ভীমের রাজপ্রতিনিধি বণিক বিমলাশাহ সাড়ে আঠারো কোটি টাকা ব্যয়ে যে প্রথম মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন এবং তারও দু'শো বছর পরে তেজপাল ও বাস্তপাল নামে দুই ভাই সাড়ে বারো কোটি টাকা ব্যয়ে যে দ্বিতীয় মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন তার বাইরের চেহারা এমন সাদা-মাটা কেন, তার সঠিক জবাব বাইরের চাকচিক্যে অভ্যস্ত একালের মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। বাইরে অতি সাধারণ, কিন্তু ভেতরে অসাধারণ ঐশ্বর্যই ছিল সেকালের মানসিকতার প্রকৃত রূপ। আর একালে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো।

তাদের মধ্যে একজন দক্ষিণ ভারতীয় যুবক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, এসেই যখন পড়েছি তখন আর দেরি করে সময় নষ্ট না করে চলো ভেতরে যাই। দেখাই যাক না ভেতরে কি আছে।

মৃদু হেসে সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণে জবাব দেয় রুদ্রদেব, ভেতরে নিশ্চয় এমন কিছু আছে যার জন্যে বিশ্বের সবচাইতে খুঁতখুঁতে মানুষটিকে পর্যন্ত একদিন খেদ করতে হয়েছিল।

— তাই নাকি ? কে সে ? জিজ্ঞেস করে একজন উত্তর ভারতীয় যুবক।

জবাব দেয় রুদ্রদেব, জর্জ বার্ণার্ড শ।

চার্জ নেওয়ার ছ'দিন পরে ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো রুদ্রর। রুদ্র নিজের অফিসে বসে কাজ করছিল। বাইরে একটা জীপ এসে থামল। একটু পরেই রাজেন নন্দীর দীর্ঘ চেহারা দেখা গেল দরজার গোড়ায়।

রাজেন নন্দী ঘরে ঢুকে হালকা চালে রুদ্রকে স্যালুট করে নিজে থেকেই একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললে, এক্সকিউজ মি স্যার। থানার কাজে একটু বেশি ব্যস্ত থাকায় এই ছ'টো দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। আজ একটু সময় পেতেই চলে এলাম। অবশ্যি, আপনার যাতে কোন অসুবিধে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপনার জন্যে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলাম।

মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দেয় রুদ্র, না-না, আমার কোন অসুবিধেই হয়নি, বড়বাবু।

হাসিমুখে কথাটা বললেও রাজেন নন্দীর হাব-ভাব কিন্তু তেমন ভালো লাগছিল না রুদ্রর। তার কেবলই মনে হচ্ছিল নিজের সম্পর্কে এই ভদ্রলোক যেন একটু অতিরিক্ত সচেতন। র‍্যাঙ্কের বিচারে সে রুদ্রর চাইতে অনেক ছোট হলেও সে যে একজন কেউকেটা ব্যক্তি এটা যেন ইচ্ছে করেই সে নিজের চাল চলনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিল রুদ্রর সামনে। বিশেষ করে রুদ্র নিজে একেবারেই আনকোরা। ডিপার্টমেন্টের অন্ধি-সন্ধি এখনও তেমন কিছু জানে না। এই লোকটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যেন পোড়খাওয়া ঝানু অফিসার রাজেন নন্দীর।

রাজেন নন্দী এবার জিজ্ঞেস করে রুদ্রদেবকে, সুকুমার বাবুকে আপনার কেমন লাগছে, স্যার?

—সুকুমার বাবু কে? প্রশ্নটা করেই রুদ্রদেবের মনে পড়ে, যে বয়স্ক এ্যাসিস্টেণ্ট সাব-ইন্সপেক্টরটি তার অফিস দেখাশোনা করে তারই নাম সুকুমার বক্সী। তাই সে আবার জবাব দেয়, ও—আমার অফিসের এ-এস-আই সুকুমার বাবুর কথা বলছেন? এই ছুদিনের দেখায় তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। কাজ কর্মে বেশ টিপ্-টপ্। একটু স্লো প্রকৃতির। তবে আমার ধারণা অতিরিক্ত ফাস্ট চলার চাইতে একটু স্লো চলা ভালো। তাতে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম থাকে।

—কথাটা অবশ্যি ভালই বলেছেন, স্যার, হেসে জবাব দেয় রাজেন নন্দী, ফাস্ট চলার চাইতে স্লো চলা ভালো। তবে কি জানেন স্যার, ঘড়ির মেকানিকেরা বলে যে ঘড়ি ফাস্ট চললে তা শোধরানো নাকি সহজ, কিন্তু স্লো চললে তাকে নাকি সারিয়ে তোলা অনেক শক্ত। তবে স্যার, যিনি এখানকার

এস-ডি-পি-ও ছিলেন সেই আব্রাহাম সাহেবের ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে এই সুকুমার বক্সীই তাকে ডুবিয়েছে। এস-ডি-পি-ও অফিসে যে কাগজ একবার ঢুকতো তা' নাকি আর বেরোত না। ডি-আই-জি ইন্সপেক্‌শনে এসে কড়া করে একগঙ্গা লিখে দিয়ে গেলেন। সেই দুঃখেই মিস্টার আব্রাহাম ছুটি নিয়ে নিজের দেশ কেরালায় চলে গেলেন। ছুটির পরে ফিরে এসে জয়েন করলেন কলকাতার সি-আই-ডি'তে। আর, আপনি এলেন এখানে। তাই বলছিলাম, ঘড়ি স্লো হলে মেরামতি করে সারিয়ে তোলা কঠিন।

রাজেন নন্দী থামতেই রুদ্র জিজ্ঞেস করে, এত কাণ্ডের পরেও সুকুমার বক্সীর এখান থেকে বদলি হলো না কেন ?

– সেটাই তো এক রহস্যময় ব্যাপার, স্যার। সত্যি বলতে কি, এস-ডি-পি-ও অফিসে বসে কেরাণীর কাজ করতে কোন এ-এস-আই-ই চায় না। এই অফিসে পোস্টিং মানে পানিশমেণ্ট পোস্টিং। কিন্তু এই বক্সীবাবু যেন এখানে আঁঠার মত লেগে আছে। আসলে এসব সদরের রিজার্ভ অফিসের অফিসারদের কারসাজি।

একটু সময় চুপ করে থেকে রুদ্র বললে, সুকুমার বাবু স্লো হলেও আমি নিজে কিন্তু একটু ফাস্ট। কাজেই এই স্লো ফাস্ট মিলে এখানকার অফিস আশাকরি ভালই চলবে। এখানে কাগজ পত্রের পাহাড় যাতে না জমে সেদিকে না হয় লক্ষ্য রাখবো, কিন্তু বক্সীবাবু যে কেন এখানে আঁঠার মত লেগে আছে সেটাই তো ভাবনার বিষয়।

জবাব দেয় রাজেন নন্দী, না স্যার, ভাবনার তেমন কিছু নেই। ব্যাপারটা অতি সহজ। এই ভদ্রলোক ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে অভ্যস্ত। আব্রাহাম সাহেবকে নতুন পেয়ে তাঁকে দিয়ে কেবল নিজের ইচ্ছেমত কাজই করিয়ে নেয় নি, তাঁকে ডিঙ্গিয়েও মাঝে মাঝে থানার ইন্‌-চার্জদের ওপর ছড়ি ঘোরাতো। আসলে সেটাই ওর এখানে থাকার কারণ। সেই সুবাদে দু'পয়সা পকেটেও আসতো তার।

রাজেন নন্দীর কথায় মনে মনে একটু হাসে রুদ্রদেব। এতক্ষণে বোঝা গেল রাজেনবাবুর দুঃখটা কোথায়। সোজা কথায় চোরের ওপর বাটপাড়ি করতো সুকুমার বক্সী। তাই এই সামান্য এ-এস-আই'টির ওপর জাঁদরেল ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর এত উষ্মা।

সুকুমার প্রসঙ্গ ছেড়ে রুদ্র জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বড়বাবু, আপনার এলাকায় এ বছর ক'টা ডাকাতি হয়েছে ?

একটু ভেবে জবাব দেয় রাজেন নন্দী, মোট সাতটা, স্যার। এর মধ্যে তিনটে সাধারণ হাউজ ডেকয়েটি। এর দু'টো ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা, সোনা-দানার সঙ্গে বন্দুকও নিয়ে গেছে, বাকিটা সম্ভবতঃ রেষারেষির ব্যাপার। আর অন্য চারটে ডাকাতি ঘটেছে জাতীয় সড়কের ওপর। তিনটে ক্ষেত্রে লরী আটকে মালপত্র লুঠ করে নিয়ে গেছে, আর অন্যটায় হামলা চালিয়েছে যাত্রীবোঝাই বাসের ওপর।

রাজেন নন্দী থামতেই রুদ্র বলে ওঠে, তা'হলে তো খুবই এলার্মিং ব্যাপার। ডাকাতি ছাড়া রবারি তো আছেই, কেমন ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় রাজেন নন্দী। তারপর হেসে বললে, এ নিয়ে আপনাকে তেমন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না, স্যার। অনেকদিন চাকরি হলো। দেখেছি-শুনেছি অনেক কিছু। এটাকে ঠিক এলার্মিং সিচুয়েশন বলা চলে না। ডাকাতদের একটা গ্যাং ট্রেস করেছি। চারজনের বিরুদ্ধে বোধহয় চার্জশীট হবে। তা'ছাড়া, দেশের যা পরিস্থিতি তাতে এ ধরনের ডাকাতি বন্ধ করা কি সম্ভব ?

—কনস্টেবল ও অফিসারেরা নাইট-পেট্রল কি রকম করছে ?

—নাইট-পেট্রল ঠিক মতই হচ্ছে, স্যার।

হঠাৎ রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বড়বাবু, এই এলাকায় জুয়োর আড্ডা কেমন চলছে ? এই ধরনের আড্ডাগুলোই তো ক্রিমিন্যালদের ঘাঁটি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রাজেন নন্দীর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ...ম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব পাল্টে স্বাভাবিক ...ণ্ঠে বললে, জুয়োর আড্ডা বেশ কয়েকটা আছে, স্যার। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা। জুয়ো তো থাকবেই। তবে মাঝে মাঝেই রেইড্ করা হয়। ধরাও পড়ে কিছু কিছু।

মৃদু হেসে রুদ্র বললে, যারা ধরা পড়ে তারা সবাই কি কেবল চুনোপুঁটি ? নাকি রুই-কাতলাও ধরা পড়ে ?

—তাও পড়ে বৈকি, স্যার। একটু আমতা আমতা করে জবাব দিয়ে থেমে যায় রাজেন নন্দী।

মহকুমার পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে আরও কিছু কথাবার্তার পরে রুদ্র একসময় রাজেন নন্দীকে বললে, আমার জন্যে একটি ছোকরা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ডের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন বড়বাবু, যে নাকি রান্না-বান্না থেকে শুরু করে আমার একার সংসারের সবকিছু দেখা শোনা করতে পারবে ? তবে বিশ্বাসী লোক হওয়া চাই।

জবাবে রাজেন নন্দী বললে, কেন স্যার, আপনার আর্দালী কনস্টেবলটি তো বেশ ভালই রান্না-বান্না করে বলে শুনেছি।

—হ্যাঁ, তা করে, বলতে থাকে রুদ্র, তবে কনস্টেবলকে দিয়ে নিজের রান্না করানোটা আমি ঠিক পছন্দ করি না। সরকার তো ওকে ঠিক এইজন্য মাইনে দিয়ে পুষছে না। কাজেই একটা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ডের একান্ত দরকার।

রুদ্রদেবের কথায় রাজেন নন্দীর ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় যার একমাত্র অর্থ—নতুন ডিপার্টমেণ্টে এসে অনেক সাহেব-সুবোরাই এমনি সততার পরিচয় দেন। তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই ওলটপালট হয়ে যায় সবকিছু। তখন সাহেবদের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে কয়েক গণ্ডা আর্দালী কনস্টেবল না হলে আর চলে না।

রাজেন নন্দী মুখে বললে, ঠিক আছে, স্যার। একটা বিশ্বাসী লোকের খোঁজ করবো।

রাজেন নন্দী চলে যেতেই রুদ্রদেব তার টেবিলের ফাইলগুলোর দিকে মন দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মন কিছুতেই বসে না। ঘুরে ফিরে কেবল রাজেন নন্দীর কথাগুলোই মনে পড়ে। ভদ্রলোক যেন দেখা করবার অছিলায় সুকুমার বক্সী সম্পর্কে কথাগুলো বলতেই তার কাছে এসেছিল। যে কোন কারণেই হোক সুকুমারকে রাজেন নন্দী ভালো চোখে দেখে না। অবশ্য, সুকুমার সম্পর্কে তার কথাগুলো মিথ্যে না-ও হতে পারে। হয়তো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার অভ্যেস সুকুমারের আছে। হয়তো কাগজপত্রে মহকুমার অফিসারদের বেকায়দায় ফেলে কিছু কিছু সে আদায়ও করে থাকে তাদের কাছ থেকে অসম্ভব কিছুই নয়। তার এই সামান্য অভিজ্ঞতায় সে ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে যে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের মধ্যে প্রীতি-প্রেমের সম্পর্ক যতটা জোরালো তার চাইতে বেশি জোরালো টাকা-পয়সার সম্পর্ক। সত্যিকারের গুণের কদর এখানে যতটা তার চাইতে অর্থের লেন-দেনের কদর অনেক বেশি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে তা কেবল ব্যতিক্রমই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত একটা বিশ্রী গোপন মানসিকতা এই বিভাগের একদল কর্মীর অন্তরে খেলা করে বেড়ায়। সেই মানসিকতার লক্ষ্য অর্থলাভ করার মত একটা ভালো পোস্টিং। এটাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান। সরকারী কাজ সেকেণ্ডারী ব্যাপার, প্রাইমারী বিষয়টি হচ্ছে অর্থ যা নাকি ঘুষ কিম্বা উৎকোচ, পারিতোষিক কিম্বা খুশিকরা প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধরে এসে তাদের কাছে ধরা দেয়। এর মধ্যে সরকারী কাজকে প্রাইমারী বলে ধরে নিয়ে যারা ঘুষকে

সেকেণ্ডারী পর্যায়ে ফেলে দেয় তারা তো রীতিমত নমস্য ব্যক্তি। তাদের নামে এলাকার জনসাধারণ তো জয়ধ্বনি দেয়। কিন্তু এদেশের মানুষের এমনই দুর্ভাগ্য যে সেই জয়ধ্বনি দেওয়ার সুযোগটুকুও পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অধিকাংশ কর্মীরা তাদের দেয় না। পুলিশ বিভাগের প্রত্যেকটি কর্মী তাদের আপন আপন কর্মক্ষমতার শতকরা মাত্র পঁচিশ ভাগ যদি সাধারণের মঙ্গলের জন্যে আন্তরিকভাবে প্রয়োগ করতো তা' হলেই যে এদেশের পুলিশ প্রশাসনে একটা বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হতো। ধন্য ধন্য পড়ে যেত চারিদিকে। কিন্তু সেটুকুই বা কে করে?

এস-ডি-পি-ও হিসেবে মাত্র ছ'মাসের চাকরিতেই রুদ্রদেবের মনে গোটা মহকুমার পুলিশী প্রশাসন, বিশেষ করে মহকুমার সদর থানা সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হলো তাতে তার পক্ষে হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক। ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দী বাস্তবিকই একজন জাঁদরেল অফিসার। সোজা কথায় একটি সাক্ষাৎ বাস্তু ঘুঘু। বে-আইনী মদ ও জুয়োর আড্ডার মাধ্যমে থানায় একটা নিয়মিত মোটা আয়ের ব্যবস্থা করেছে সে। থানার সেপাই থেকে অফিসার পর্যন্ত প্রত্যেকে এই আয় থেকে উপকৃত হয় নিয়মিত। এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম থানার মেজবাবু অসিত মুখার্জী। আর সেই সুবাদেই অসিতকে যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না রাজেন নন্দী। বিশেষ করে তার ঐ ঠোঁটকাটা কথাবার্তার স্বভাবটিকে সে মনে মনে একটু ভয় করেই চলে।

রুদ্র আরও লক্ষ্য করেছে জেলার পুলিশ সাহেব দিবাকর সেন যেন রাজেন নন্দীর বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকতেই পছন্দ করেন। এই ছ'টি মাসের মধ্যেই ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর সঙ্গে প্রশাসনের অনেক ব্যাপারেই রুদ্রদেবের মতান্তর হয়েছে। এস-ডি-পি-ও হিসেবে তার নিজের হুকুম মানতে রাজেন নন্দীকে বাধ্য করতে চেষ্টা করেছে রুদ্র, কিন্তু সফল হয় নি। এ নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয়েছে তাদের মধ্যে। রাজেন নন্দী স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, আমার কাজে কেউ অহেতুক হস্তক্ষেপ করে তা' আমি পছন্দ করি না, স্যার। আপনার হুকুম মানতে আমি আইনতঃ বাধ্য। কিন্তু তার চাইতেও জেলার পুলিশ সাহেবের হুকুম আমার কাছে অনেক বড়।

দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে রুদ্র বলেছিল, জেলার পুলিশ সাহেব কি আপনাকে বে-আইনী কাজ করতে হুকুম দিয়েছেন?

জবাবে রাজেন নন্দী বলেছিল, এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে রাজি নই, স্যার। খোদ পুলিশ সাহেবকেই জিজ্ঞেস করবেন।

রুদ্রদেব কিন্তু বাস্তবিকই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল দিবাকর সেনকে। সেন সাহেব উত্তরে একটু শুকনো হেসে এমন একটা জবাব দিয়েছিলেন যা নাকি একজন পুলিশ সাহেবের কাছে রুদ্র আশা করে নি। সেন সাহেব বলেছিলেন, রাজেন বুঝি এসব কথা আপনাকে বলেছে? পাগল—পাগল, আমাদের রাজেন একটি আস্ত পাগল। বুঝলেন মিষ্টার ভট্চায, এমনিতে তুখোড় অফিসার, কিন্তু কোন ব্যাপারে রেগে গেলে যা খুশি তাই বলে। লোকটার গুণের জন্যেই ওর এসব কথা সহ্য করতে হয়। জানেন তো, যে গরু দুধ দেয় তার দুরন্তপনা একটু সহ্য করতেই হয়। রাজেন সত্যিই ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসেট্। এলাকার ক্রাইম ও ক্রিমিন্যাল সম্পর্কে ওর দারুণ অভিজ্ঞতা। তাই ওর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে ওকে একটু অন্যরকমে ট্যাক্ল করতে হবে।

রাজেন সম্পর্কে স্নেহরসে ভরা এস-পি দিবাকর সেনের এ ধরনের কথার পরে আর কিছু বলতে প্রবৃত্তি হয় না রুদ্রদেবের। নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে সেন সাহেবের এই দুর্বলতার উৎসটুকু ধরে ফেলে সে। বুঝতে পারে, এই ব্যক্তিকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে রাজেন নন্দী। এর সম্পর্কে সেন সাহেবকে কিছু বলতে যাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়।

দারুণ দমে যায় রুদ্রদেব। সর্বভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের একজন মানুষ এত নীচে কি করে নামতে পারে, তা সে ভেবে পায় না। মদ ও জুয়োর পয়সার ক্ষমতা কি এতই প্রচণ্ড যা নাকি পুলিশী শাসন যন্ত্রের কাউকেই রেহাই দেয় না? এর ক্ষুধা সর্বগ্রাসী নাকি? তা'হলে কি একদিন এর ফাঁদে সে নিজেও ধরা পড়তে পারে? না—না, তা' হবে না—হতে পারে না। অসিত মুখার্জীর মত দারোগা যেমন এই ডিপার্টমেণ্টে এখনও রয়েছে, তেমনি জেলার পুলিশ সাহেবদের মধ্যেও এরকম দু'একজন অসিত মুখার্জীর সন্ধান পাওয়া যাবে। এরাই তো পুলিশী প্রশাসনের ভবিষ্যৎ। সংখ্যায় হয়তো এরা নগণ্য, কিন্তু সংখ্যাটাই তো সব নয়। কোয়ালিটি গভর্ণস্ কোয়াণ্টিটি।

এ ধরনের কথা ভাবতে গিয়ে মনে বল পায়, ভরসা পায় রুদ্রদেব। ডাইরেক্ট আই-পি-এস সেন সাহেবের কথা ভাবতে গিয়ে মনটা যতটা দমে যায়, দারোগা অসিত মুখার্জীর কথা মনে করে মনটা ঠিক ততটা কিম্বা তার চাইতেও বেশি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজেন নন্দীর ঠাট্-বাট, চাল-চলন যা নাকি তিন-চার হাজারী অফিসারকেও হার মানায় কিম্বা তার দু'দুটো পোষা এ্যাল্সেসিয়ান কুকুরের পেছনে খরচের পরিমাণ যা নাকি তার মাসিক মাইনের চাইতেও বেশি, সে সব কথা মনে করে তার সর্বাঙ্গ যখন ঘৃণায়

রি-রি করতে থাকে, তখন নিজের ঠাকুর্দা সোমেশ্বর ভট্টাচার্যের কথা মনে করে সেই ঘৃণার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চেষ্টা করে রুদ্রদেব। নিজেকে প্রবোধ দেয়—ধৈর্য ধরো। এত উতলা হয়ো না। এই ভুবনটাব ভার তোমার হাতে নেই। খোঁজ করো, মনপ্রাণ ঢেলে আলোর খোঁজ করে বেড়াও। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই সেই আলোর খোঁজ একদিন পাবে তুমি। সেই আলোতে নিজে চলবে, অন্যকে চলতে সাহায্য করবে।

সময় সময় নিজের মনটাকে যাচাই করতে গিয়ে বিব্রত বোধ করে রুদ্রদেব। দাদু সোমেশ্বর ভট্টাচার্যকে যে সে সত্যি সত্যি কোন্ দৃষ্টিতে দেখে তা বোধহয় সে নিজেই জানে না। সোমেশ্বর যে এককালে প্রচণ্ড ঘুষখোর দারোগা ছিলেন এ তথ্য এখন আর অজানা নয় তার। ঐ ঘুষের জন্যে যে তাঁর চাকরি গেছে তাও সে জানে। তবুও কেন যেন সেই বৃদ্ধকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না রুদ্র। তার বদলে তাঁর জন্যে নিজের মনের কোণে একটুখানি সহানুভূতির অস্তিত্ব সর্বদাই সে অনুভব করে। কিন্তু কেন? এই কেন'র সঠিক জবাব সে আজও দিতে পারে না। তবে কি সোমেশ্বর কেবল তার পিতামহ বলেই রুদ্রর এই একচোখা বিচার? নাকি এ কেবল অনুতাপের আগুনে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি? "পাপকে ঘৃণা করো, কিন্তু পাপীকে নয়"—এই তত্ত্ব দিয়েও নিজের মনের এই বিচিত্র অবস্থাকে যেন ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না রুদ্রদেব। অবশেষে মনের সহানুভূতির পরিধিকে প্রসারিত করে দিয়ে সেই সহানুভূতির ছাকনিতে পাপ থেকে পাপীকে পৃথক করার কঠিন সাধনায় আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্প করে রুদ্রদেব। বুঝতে পারে, পুলিশ বিভাগের কর্মীদের বিচিত্র মানসিকতার সঠিক খবর পেতে হলে এটাই হচ্ছে সত্যিকারের পথ। ঘৃণা দিয়ে দূরে ঠেলে ফেলা যায়, কিন্তু কাছে পেতে হলে চাই সহানুভূতি। আর কাছে না পেলে তো সেই মানসিকতার দেখা মেলে না যার খোঁজে সে একদিন এই পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেছিল।

সরকারী, বেসরকারী সব চাকরিতেই ওপরওয়ালাকে খুশি রাখার প্রবণতা দেখা যায়। ওপরওয়ালাকে খুশি রাখার অর্থই হলো কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ। সেকালে অবশ্য এই খুশি রাখার সঙ্গে পদোন্নতিরও সম্পর্ক ছিল। এমন দিনও ছিল যখন স্রেফ ওপরওয়ালাকে খুশি রেখেই অনেকের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। সেদিন অবশ্য আর নেই। নিয়ম-কানুনের বাঁধনে ওপর-ওয়ালারা অনেকটাই বাঁধা পড়েছেন আজকাল। শুধুমাত্র খেয়াল খুশি মত কিছু

করার জো নেই। তবুও এখনও যা আছে তা-ই বা কম কি? বিশেষ করে পুলিশ বিভাগে র‍্যাঙ্কের মধ্যে ক্ষমতার ব্যবধান যখন খুবই বেশি এবং সি-সি-আর অর্থাৎ কন্‌ফিডেনসিয়াল ক্যারেক্টার রোল নামক কাগজে দু'টো বাঁকা কথা লেখা হলেই যেখানে একজনের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দেওয়া যায় সেখানে ওপরওয়ালাকে খুশি না রেখে উপায় কি? ওপরওয়ালাকে খুশি রেখে সেকালের মত একালে আর পদোন্নতির সম্ভাবনা না থাকলেও পদোন্নতিতে বাগ্‌ড়া দেওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে। নিগেটিভ এ্যাপ্রোচ এটা। লক্ষ্মীকে পূজো করা হয় ধন-সম্পদ লাভ করার জন্যে, আর অলক্ষ্মীকে পূজো করে খুশি রাখা হয় তার কু-দৃষ্টি এড়াবার জন্যে।

এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেবের সঙ্গে সেই কথা কাটাকাটির পর থেকেই একটু সতর্ক হয়ে থাকে ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দী। শত হলেও আই-পি-এস্ অফিসার। কখন কোন্ বিপদে ফেলে দেবে তার ঠিক কি? তবে এতদিনে সে এইটুকু বুঝে নিয়েছে যে বয়েস অল্প হলেও এই এস-ডি-পি-ও ভদ্রলোক একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। অসততার জলে স্নান করিয়ে একে ব্যাপ্‌টাইজ করে নিজের মুঠোয় আনা তেমন সহজ নয়। এস-পি দিবাকর সেনের সঙ্গে রুদ্রদেব ভট্টাচার্যের তফাত অনেক।

রুদ্র সম্পর্কে রাজেন নন্দী যাই ভাবুক না কেন, রুদ্র কিন্তু তার ওপর কোন আক্রোশ পোষণ করে না। সে বুঝতে পেরেছে রাজেন নন্দীর বল-ভরসা কোথায়। খোদ জেলার এস-পি যার হাতের মানুষ তার আবার ভয় কি? তার মতে, দোষ রাজেন নন্দীর নয়, দোষ এস-পি দিবাকর সেনের। জেলার পুলিশী প্রশাসনের উচ্চতম পদে আসীন হয়েও যিনি অসততাকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রশাসনকে পঙ্গু করে তোলেন তাঁর অপরাধ নিম্নতম অফিসারদের চাইতে ঢের বেশি। এমনি করে ডিপার্টমেণ্টের নিম্নস্তরের অফিসারেরা ডিপার্টমেণ্ট তথা দেশের যতটা ক্ষতি করে তার চাইতে ঢের বেশি ক্ষতি করে উঁচুতলার এই অফিসারেরা যাদের চাকরির টিকি বাঁধা প্রাদেশিক গভর্নর ছাড়িয়ে খোদ রাষ্ট্রপতির হাতে।

এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেবের মহকুমার একটি থানায় ইন্সপেক্‌শন। পরিদর্শন করবেন জেলার এস-পি দিবাকর সেন। ছোট্ট থানা। সর্বসাকুল্যে পাঁচজন অফিসার। সাব-ইন্সপেক্টর সুজিত দেব এই থানার ইন-চার্জ। ভদ্রলোক কণ্ডেম্‌ড অফিসার। দীর্ঘ দশ বছর ধরে দারোগাগিরি করেও এতকাল কোন থানার চার্জ পায় নি। এই না পাওয়ার কারণ তার খারাপ রেকর্ড। অবশেষে মাত্র

ছ'সাত মাস আগে এই ছোট্ট থানাটির চার্জ পেয়েছে সে। সেই থানাটিই ইন্সপেক্‌শন করতে আসছেন জেলার পুলিশ সাহেব।

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে এই থানা ইন্সপেক্‌শনের সঙ্গে একমাত্র ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষার তুলনা চলতে পারে। ছাত্রদের সারা বছরের পড়াশোনার হিসেব নিকেশ যেমন সম্পন্ন হয় তাদের বাৎসরিক পরীক্ষার মাধ্যমে, পড়াশোনার ফাঁকির ফোঁকরগুলো ভরাট করতে ছাত্রদের যেমন পরীক্ষার আগে রাত জাগতে হয়, থানার ইন্সপেক্‌শনও অনেকটা তেমনি। এই ইন্সপেক্‌শনকে আবার বেনে দোকানের পয়লা বৈশাখের প্রস্তুতির সঙ্গেও তুলনা করা চলে। সারা বছরের দোকানের আবর্জনার স্তূপ ও কালিঝুলি পরিষ্কার করে ঐ দিনটিতে যেমন দোকানখানাকে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা হয়, থানার ব্যাপারেও ঠিক তাই। থানার ঝুল-কালি ধূলো-ময়লা পরিষ্কার করে ও সেই সঙ্গে রাত জেগে অফিসারেরা বাকি-পড়া পুরানো কাজ শেষ করে প্রস্তুত হয় পরের দিনের ইন্সপেক্‌শনের জন্যে। পরিদর্শনকারী অফিসার যদি সবকিছু দেখে-শুনে খুশি হন তা'হলে থানার ও-সির কপালে জোটে শিরোপা, আর না হলে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয় কৈফিয়ত দেবার জন্যে। আবার, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কিম্বা থানার কাজ-কর্মের সঙ্গে ও-সি'র শিরোপা লাভের প্রায় কোন সম্বন্ধই থাকে না। অবশ্য, তার জন্যে ইন্‌স্পেকটিং অফিসারকে খুশি রাখার ব্যবস্থা করতে হয় ও-সি'কে।

ইন্সপেক্‌শনের আগের রাতে এস-পি দিবাকর সেন টেলিফোন করেন রুদ্রদেবকে, হ্যালো ভট্‌চায, কাল ইন্সপেক্‌শনে যাচ্ছি। উইল ইউ মাইণ্ড্‌ টু বি প্রেজেণ্ট দেয়ার?

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় রুদ্র, কাল তো স্যার, সুজনপুরের সেই ডাকাতি কেসের সুপারভিশনে যাচ্ছি। সাক্ষীদের রেডি থাকতে বলেছি। এখন যদি—

রুদ্রর কথা শেষ হবার আগেই দিবাকর সেন বললেন, ও, তাই নাকি? তবে থাক।

রুদ্র আবার জবাব দেয়, অল রাইট্‌ স্যার, সুজনপুর থেকে সোজা আমি ঐ থানায় গিয়ে আপনার সঙ্গে মিট্‌ করবো। হয়তো একটু দেরি হবে।

--বেশ, তাই হবে। টেলিফোন ছেড়ে দেন দিবাকর সেন।

এস-পি থানা ইন্সপেক্‌শন করবেন। সেখানে যে এস-ডি-পি-ও'কে উপস্থিত থাকতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। কেবল দিবাকর সেনের ইন্সপেক্‌শনের ধরনটা দেখবার জন্যেই রুদ্র সেখানে উপস্থিত থাকতে রাজী হয়েছিল।

রুদ্র যখন সেই থানায় উপস্থিত হলো তখন ইন্সপেক্‌শন শুরু হয়ে গেছে। থানার রেকর্ড পরীক্ষা করতে করতে দিবাকর সেন তাঁর স্টেনোগ্রাফারকে ডিক্‌টেশন দিচ্ছিলেন। পাশে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থানার ও-সি ও সার্কেল ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্‌শনে যদি কিছু দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে তার জন্যে থানার ও-সি যতটা দায়ি, সেই সার্কেলের ইন্সপেক্টরের দোষও তার চাইতে কম নয়। পুলিশ বিভাগের সেই বাঁধাধরা বুলি 'ল্যাক্ অফ্ সুপারভিশন' যার অর্থ সাধারণ হলেও অনর্থ ঘটাবার ক্ষমতা প্রচণ্ড, সেই বিশেষণটিব প্রয়োগ ঘটবে তার ওপর। কাজেই ও-সির মত সার্কেল ইন্সপেক্টর ভদ্রলোকও দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

রুদ্র এসে স্যালুট করে দাঁড়াতেই গম্ভীর মুখে দিবাকর সেন বললেন, এই যে ভট্‌চায, এসে গেছেন। দেখুন একবার, কেমন ইন্সপেক্‌শন হচ্ছে। বলেই তিনি ভুরু কুঁচকে পর্যায়ক্রমে ও-সি এবং ইন্সপেক্টরের দিকে তাকান।

রুদ্র ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কেবল তাকিয়ে থাকে দিবাকর সেনের দিকে। দিবাকর সেন নিজের গম্ভীর মুখের ওপর একচিলতে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে আবার বললেন, আই অ্যাম রিয়েলি সারপ্রাইজ্‌ড! তিন মাস আগে ইন্সপেক্‌শনের খবর পেয়েও এদের ঘুম ভাঙে নি। যা ধরছি তাতেই গল্‌তি। এ বাঞ্চ অফ ফুল্‌স আর ওয়ার্কিং হিয়ার। আই শ্যাল্ ড্র আপ প্রসিডিং এগেন্‌স্ট দিস ও-সি।

একটা ঢোক গিলে ও-সি সুজিত দেব মিন মিন করে বললে, আমি তো স্যার এখানে নতুন। মাত্র ক'মাস আগে চার্জ নিয়েছি—

সুজিত দেবকে ধমকে উঠে দিবাকর সেন বললেন, চুপ করুন। ডোণ্ট্ ট্রাই টু সার্ক রেসপনসিবিলিটি। কাগজপত্র আপ-টু-ডেট করার যথেষ্ট সময় আপনি পেয়েছেন। এতকাল বাদে আপনার মত একটা ওয়ার্থলেস অফিসারকে থানার চার্জ দিয়েই আমি ভুল করেছি। ট্রান্সফার করবো আপনাকে, সাসপেণ্ড করবো।

রুদ্রদেব কোন কথা না বলে বসে বসে সব শুনছিল। সেই মুহূর্তে বোধ হয় সে মনে মনে দিবাকর সেনের প্রশংসাই করছিল। যা দিন-কাল পড়েছে তাতে এমনি ভাবে বকাঝকা না করে আর উপায় নেই। এ্যাড্‌মিনিসট্রেশন রাখতে হলে এমনিই চাই।

থানার লাগোয়া একটা ছোট ঘরে পুলিশ সাহেবের দুপুরের লাঞ্চের ব্যবস্থা

হয়েছিল। অনিচ্ছুক রুদ্রদেবকে একরকম জোর করেই সেখানে টেনে নিয়ে এলেন দিবাকর সেন। টেবিলের ওপর সাজানো খাবারের ডিসগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারে না রুদ্র। এ যে এলাহি কাণ্ড! রীতিমত রাজসূয় ব্যাপার। জেলা সদর কিম্বা মহকুমা সহরের কোন দামী হোটেল থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়েই বোধহয় এসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্যে হয়তো বিশ-ত্রিশ টাকার সরকারী পেট্রলও পুড়েছে।

খাবাবের ব্যবস্থা দেখে কিন্তু খুশি না হয়ে পারেন না দিবাকর সেন। এতক্ষণে তাঁর গম্ভীর মুখখানায় সত্যিকারের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সাহেব হেসেছেন, কাজেই দরজাব কাছে দাঁড়ানো ও-সি ও সার্কেল ইন্সপেক্টরের মুখেও এতক্ষণে হাসি ফুটে ওঠে। হয়তো সেই মুহূর্তে তারা ভাবছিল, ইন্সপেক্‌শন সম্পর্কে সাহেব তাঁব স্টেনোকে যে ডিক্‌টেশন দিয়েছেন তা' হয়তো আর ত্যাহার হবে না। কিন্তু খাওয়াদাওয়ায় খুশি হয়ে সাহেব যদি ইন্সপেক্‌শনের াকি অংশটা সম্পর্কে একটু ভালো লেখেন তা'হলেই যা ভরসা। নইলে তা একেবারে ভরাডুবি। প্রসিডিং না হোক্ ট্রান্সফার নির্ঘাৎ। খাওয়ার টা ও আয়োজন দেখে রুদ্রবও তেমন একটা কিছুই মনে হয়েছিল।

রুদ্রদেবের অনুমান মিথ্যে নয়। লাঞ্চেব পরে সাহেবের ইন্সপেক্‌শনেব নাট মোটামুটি ভালই হয়েছিল। অবশেষে বিকেলেব দিকে চা-পর্ব শেষ তেই পুলিশ সাহেব থানা স্টাফের সেলাম গ্রহণ করে নিজের গাডিতে চেপে সলেন। রুদ্রও তাকে অনুসরণ করলো তার নিজের গাড়িতে।

এস্‌-পি দিবাকব সেনের নিজস্ব এ্যাম্‌বাসেডর গাড়িটি আগে আগে াচ্ছে, আর পিছে চলেছে রুদ্রর সরকারী জীপ। ড্রাইভারের পাশে জীপের াকদিকে ঠেস দিয়ে আপন চিন্তায় বিভোব রুদ্র। থানা থেকে বেরিয়ে াসার কিছুক্ষণ আগে সেখানে যে ছোট্ট নাটকটুকু অভিনীত হয়েছিল সেই থাই বসে বসে ভাবছিল সে।

ইন্সপেক্‌শন শেষে তখন থানায় বসে চা-পর্ব সমাধা কবছিলেন দিবাকর সন। পাশে আর একখানা চেয়ারে রুদ্র। হঠাৎ সার্কেল ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এসে সেলাম ঠুকে দিবাকরকে বললে, স্যার, ও-সি'র একটা নিবেদন ছিল আপনার কাছে। কথাটা আপনাকে বলতে সে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। তাই আমি এসেছি, স্যার।

ভুরু কুঁচকে দিবাকর বললেন, কী কথা?

একটা ঢোক গিলে সার্কেল ইন্সপেক্টর বিনীত ভঙ্গিতে বললে, আপনি

বোধহয় জানেন না স্যার, এখানকার এই থানার এলাকায় কিছু কিছু মাছে চাষ হয়। বিশেষ করে, এই অঞ্চলের কই মাগুর খুবই বিখ্যাত। ও-সি আপনার জন্যে কিছু মাছের ব্যবস্থা করে রেখেছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তো মাছের জায়গাটা আপনার গাড়ির ক্যারিয়ারে তুলে দেবে।

পূর্ববঙ্গের মানুষ দিবাকর সেন এমনিতেই মাছ ভক্ত। তার ওপর কই মাছ যে তাঁর একান্তই প্রিয় এই খবরটি ও-সি সুজিত দেব সাহেবের খা আর্দালী কনস্টেবলের কাছ থেকে আগেই জোগাড় করে রেখেছিল। এতক্ষণে ঝোপ বুঝে কোপ মারলো।

সার্কেল ইন্সপেক্টরের কথায় দিবাকর সেনের মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের সেই মুখের ওপর একটা গাম্ভীর্যের পর্দা টেনে দিয়ে তিনি বললেন, আমাকে জিজ্ঞেস না করে সে মাছ জোগাড় করতে গেল কেন?

সাহেবের কথায় একটু থতমত খেয়ে গেল সার্কেল ইন্সপেক্টর। এমনটা তো হবার কথা নয়। পরক্ষণেই এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেবের ওপর তার চোখ পড়তেই ব্যাপারটা এক লহমায় বুঝে নিল সে। তাড়াতাড়ি আবার বললে, সস্তায় পেয়ে গেল, তাই রেখে দিলে আপনার জন্যে।

দিবাকর সেন গম্ভীর মুখে পকেট থেকে নিজের মানি ব্যাগ বের করে খুলে ফেললেন। একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর ব্যাগটা আবার বন্ধ করে নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, স্পেয়ার করার মত টাকা তো এইমুহূর্তে আমার কাছে নেই। কাউকে বলে দিন কাল সদরে গিয়ে যেন আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আসে।

সার্কেল ইন্সপেক্টরের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবার। খুশির ভঙ্গিতে সাহেবকে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে দিবাকর সেন আবার জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের এস-ডি-পি-ও সাহেবের জন্যে মাছের জোগাড় করেন নি?

সার্কেল ইন্সপেক্টর কিছু জবাব দেবার আগেই রুদ্র তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—না, আমার দরকার নেই। তা'ছাড়া কই-মাগুর আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

সরকারী জীপে বসে এই ঘটনার কথাই মনে মনে ভাবছিল রুদ্র। এই ক'মাসে দিবাকর সম্পর্কে তার যে ধারণা হয়েছে তাতে তার মনে হচ্ছিল সে নিজে সেখানে উপস্থিত ছিল বলেই দামের প্রশ্নটা উঠেছিল, নইলে হয়তো তা-ও উঠতো না। সে এবার স্থির নিশ্চিত যে ও-সি সুজিত

দেব এ-যাত্রা এই থানাতেই টিকে গেল। তার বিরুদ্ধে প্রসিডিং তো দূরের কথা, সাধারণ বদলীও হবে না তার। এমনি ভাবেই চলেছে এই জেলার পুলিশী প্রশাসন। শুধু পুলিশী প্রশাসন কেন, গোটা দেশের প্রশাসনেই আজ চলেছে এই দেওয়া-নেওয়ার চোরা স্রোত যার সামান্য একটা ভগ্নাংশ মাত্র মাঝে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় জনসাধারণের। শীতের দেশের সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের মত তার সামান্য একটু অংশই কেবল জলের ওপর দেখা যায়, বাকিটা থাকে জলের তলায়। রুদ্রদেবের ধারণা, এ দেশের প্রশাসনের টাইটানিক জাহাজ এই অসততার হিমশৈলে ধাক্কা খেয়েই আজ ডুবতে বসেছে। রুদ্রদেবের মতে, যারা বলে দারিদ্র্যই নাকি এদেশের সব চাইতে বড় শত্রু, তারা হয় ভুল করে নয় তো ইচ্ছে করেই সত্যকে গোপন করে। এদেশের সব চাইতে বড় শত্রু সরকারী বেসরকারী কর্মীদের মধ্যে অসততা। এই অসততার বক্র পথেই আজ এদেশের সমাজে এত অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার।

কিন্তু ভাবনাই সার। একা রুদ্রদেব কি করতে পারে? চোখ মেলে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় তার নেই। সে নিরুপায়, সে অসহায়। শুধু সরকারী বেসরকারী কর্মীরা কেন, গোটা দেশের মানুষই আজ অসততার শিকার। পুলিশ বিভাগে যারা সৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশ যেমনি ভীরু, তেমনি জনসাধারণের সেই সৎ অংশটি একান্তই নির্লিপ্ত কিম্বা উদাসীন। তাই আজ মুষ্টিমেয় অসৎ কর্মচারী আর জনসাধারণের অসৎ অংশটিই হাত ধরাধরি করে এদেশের বুকে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। কেউ নেই তাদের বাধা দেবার, তাদের নিরস্ত করার। ডুবতে বসেছে টাইটানিক। তাকে রক্ষা করার কেউ নেই, কোন উপায় নেই।



অবশেষে রুদ্রদেব ঠিক করলে অলকার জন্যে আর সে অপেক্ষা করবে না। এবার সে বিয়ে করবে। মেয়ে হয়ে অলকা যদি রাজনীতি নিয়ে মেতে থেকে রুদ্রকে ভুলতে পারে, তা হলে রুদ্রও চাকরি নিয়ে মেতে থেকে অলকাকে ভুলতে পারবে। তার মনের মণিকোঠায় যে স্থানটুকু এতকাল সে অলকার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল সেখানে সে অন্য একটি মেয়েকে এনে বসাবে। এমন

একটি মেয়ে হবে তার জীবন-সঙ্গিনী যে নাকি সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে হয়ে উঠবে তার সত্যিকারের ভরসা। তেমন একটি মেয়েকে নিয়েই ঘর বাঁধবে রুদ্রদেব। একটি ছোট্ট সুখী সংসার। স্টীল ফ্যাক্টরীর সংলগ্ন জমিতে সযত্নে লালিত একখানি সবুজ বাগানের মত পুলিশের কঠোর কঠিন কাজের আড়ালে সে অনুভব করবে একটি সুখী সংসারের হাতছানি।

মা-বাবার কাছে মনের কথা প্রকাশ করতেই চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ডাইরেক্ট আই-পি-এস অফিসার। চেহারায় বাস্তবিকই সুপুরুষ। আদর্শ চরিত্রের পিতার এমনি আদর্শ একমাত্র পুত্র বিয়ের বাজারে সত্যিই লোভনীয়। এমনিতেই পাত্রীর বাবারা জগদীশের কাছে ঘোরাফেরা করছিল। পাত্রের স্পষ্ট মতামত জানতে পারেন নি বলে জগদীশ কাউকেই এতদিন কোনরকম আশা দেননি। এবার পুত্রের সম্মতির কথা জানতে পেরে তারা সবাই প্রায় ছেঁকে ধরলো জগদীশকে। তাঁর কাছে এবেলা-ওবেলা যাতায়াত করতে লাগলো তারা। রুদ্র কিন্তু তার মাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সে নিজে পাত্রী দেখবে না। তার মা-বাবা দেখে শুনে যে পাত্রী পছন্দ করবেন সেখানেই সে বিয়ে করবে।

"ঘোষাল এ্যাণ্ড ঘোষাল" কলকাতার একটি বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম। সেই ফার্মের সিনিয়র পার্টনার সুবীর ঘোষাল নিজে বিলিতি ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনীয়ার। বালিগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর নিজস্ব বাড়ি। তাঁর একমাত্র কন্যা নবনীতার সঙ্গে রুদ্রর বিয়ের প্রস্তাব করে জগদীশের কাছে যখন চিঠি এলো তখন স্বাভাবিক কারণেই জগদীশ একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। দু'টি পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির ব্যবধানই ছিল তাঁর এই পিছিয়ে পড়ার কারণ। কিন্তু পাত্রী দেখার পরে রুদ্রর মা ধরে বসলেন জগদীশকে। বললেন, এমন লক্ষ্মীশ্রী পাত্রীকেই তিনি বধূরূপে ঘরে আনবেন। পাত্রী নবনীতা কেবল রূপেই লক্ষ্মী নয়, লেখাপড়ায়ও ভালো। পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ পড়ছে। জগদীশ স্ত্রীকে বলেছিলেন, দেখ, এমন মস্ত ধনীর একমাত্র মেয়ে এসে আমাদের এই ঘরে কি মানিয়ে চলতে পারবে?

জবাবে রুদ্রর মা বলেছিলেন, খুব পারবে। বিয়ের পরে মেয়েরা অনেক কিছুই পারে। তা'ছাড়া আমাদের এই বারাসাতের বাড়িতে এসে সে আর ক'দিন থাকবে? ওকে তো খোকার সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরতে হবে।

জগদীশ আর আপত্তি করেন নি। ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে জগদীশ এখানেই মত দিয়েছিলেন।

জগদীশের মত সুবীর ঘোষালও কিন্তু প্রথমটায় একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। :লেছিলেন, ভেবেছিলাম মেয়েটাকে এমন এক বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়াব াত্রের হাতে দেব যে নাকি ভবিষ্যতে আমার এই ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের হাল বতে পারবে। আমার অবর্তমানে সেই তো হবে এর মালিক। কিন্তু এমনই র্ভাগ্য যে তেমন একটি মনোমত পাত্র কিছুতেই পেলাম না। শেষ পযন্ত ।ুলিশের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হচ্ছে তাকে।

সুবীরের এক দূর সম্পর্কীয় কাকা বিলিতি আমলের ডিপার্টমেণ্টাল মাই-পি ছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। ভাইপো সুবীরের কথায় একটু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, ।ুলিশের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছো বলে মনে করো না যে কন্‌স্টেবল কিম্বা দাবোগার াঙ্গে বিয়ে দিচ্ছো। যদিও এ যুগটাই হচ্ছে অধঃপতনের যুগ, সেকালের আই-পি মাব একালেব আই-পি-এস-এর মধ্যে অনেক তফাত, তবুও মনে রেখ যে :তামার জামাতা একদিন পুলিশ সাহেব তো হবেই এমনকি তেমন করিতকর্মা হলে আরও ওপরে উঠতে পারে। জেলার পুলিশ সাহেবের যে কী ক্ষমতা তা' :তামার জানা নেই বলেই এরকম বলছো।

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টেব চাকরি সম্পর্কে সুবীরের জ্ঞান সীমিত। তাই তিনি তাব এই বৃদ্ধ কাকার কথার ওপর নির্ভর করেও আবাব বললেন, দেখুন কাকা, চাকবি চাকবিই। তা সে পুলিশের হোক কিম্বা অন্য কোথায়ও হোক। চাকরি করে সে ক'পয়সা আয় করবে? তাই ভাবছিলাম যদি একটি মনোমত ইঞ্জিনীয়ার পাত্র পেতাম—

—চেষ্টার তো ত্রুটি করো নি, জবাব দেন সেই বৃদ্ধ কাকা, কিন্তু তেমন একটি ভালো পাত্র কি জোটাতে পারলে? আরে বাপু, যেখানে যার হবাব সেখানে হবেই। আর, পয়সা-কড়ির কথা বলছো—?

কথাটা শেষ না করেই বৃদ্ধ এমন একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে থেমে যান াাব অর্থ বুঝতে সুবীরের কোনই কষ্ট হয় না।

পাত্রীকে দেখতে পাত্র নিজে আসে নি। কিন্তু পাত্রর ফটো দেখে সুবীর :ঘাষাল ও তাঁর স্ত্রীর মনের দ্বিধাটুকু আর রইলো না। পাত্র বাস্তবিকই সুপুরুষ, নবনীতার সঙ্গে চমৎকার মানাবে। অবশেষে সুবীরের এক ভাগ্নে রুদ্রদেবের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এসে পাত্র সম্পর্কে মামার কাছে যে সার্টিফিকেট পেশ করলো তাতে একমাত্র কন্যা সম্পর্কে একেবারেই নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। মনে মনে বললেন, হোক্ না পুলিশ, এখানেই সুখী হবে তাঁর মেয়ে। চাকুবে

হলেও তাঁর ভবিষ্যৎ জামাতার পজিশন তো মোটেই কম নয়। চাকরিতে ঢুকতে না ঢুকতেই একটা মহকুমার কর্ণধার। এর পরেই একটা জেলার পুলিশ কর্তা হবে—এটাও তো কম কথা নয়।

অবশেষে এলো সেই বিশেষ দিনটি। প্রজাপতির কারসাজিতে কলেজ জীবনের সেই রঙীন স্বপ্নকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে অলকার বদলে নবনীতাকে এনে ঘরে তুললো রুদ্রদেব।

প্রথম দর্শনে তার ভালই লাগলো নবনীতাকে। নবনীতা সত্যিই সুন্দরী। তার ওপর শিক্ষিতা। কথাবার্তায়ও বেশ চটপটে। অহেতুক লজ্জার ধার ধারে না সে। বিয়ের রাতে বাসরঘরে বান্ধবীদের হাসি-ঠাট্টায় উত্যক্ত হয়ে সে বলেই ফেললে, খুব সাবধানে এবার থেকে আমার সঙ্গে মিশবি, বুঝলি? আমি এখন কে জানিস তো? কথাটা বলেই সে একবার আড়চোখে তাকালো রুদ্রর দিকে।

নবনীতার কথার ধরনে একটা হাসির রোল উঠলো বাসরঘরে। তার এক অন্তরঙ্গ বান্ধবী হাসতে হাসতে বললে, ওরে বাবা, এ যে দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আর একটি বান্ধবী সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটে, একেবারে পতিগরবে গরবিনী। বলেই মেয়েটি তার হাইপাওয়ার লেন্সের ফাঁকে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আবার বলে ওঠে, আপনি কি বলেন, মশাই?

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রুদ্র। সেই মুহূর্তে সে যে কি চিন্তা করছিল তা বোধহয় সে নিজেই জানতো না। বিয়ের রাতে বাসরঘরে ফুলের গন্ধের সঙ্গে উপস্থিত একদল যুবতীর গায়ের সুবাস মিশে গিয়ে যে বিচিত্র গন্ধে ঘরখানি ম'-ম' করছিল তার মধ্যেই সম্ভবতঃ নিজের অজান্তে একটা বিশিষ্ট গন্ধের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল রুদ্র। দীর্ঘদিনের পরিচিত সেই গন্ধ যা নাকি মাউণ্ট আবুর পুলিশ ইনস্টিটিউটের প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়েও সময় সময় সে স্পষ্ট অনুভব করেছে কিম্বা ফিরে এসে সেই রাজনৈতিক দলের অফিসে অলকার সঙ্গে দেখা করার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত যে গন্ধটি তার নাকে লেগে থাকতো।

হাইপাওয়ার লেন্সের চশমা পরিহিতা সেই যুবতীর প্রশ্নে একটু চমকে উঠে মৃদু হেসে জবাব দেয় রুদ্র, আমি আর কি বলবো, বলুন।

—সেকি, এর মধ্যেই বলার কথা ফুরিয়ে গেছে? খিল খিল করে হেসে উঠে যুবতীটি বললে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় নবনীতার সেই অন্তরঙ্গ বান্ধবীটি, না—না, ফুরিয়ে যাবে কেন? বলার কথা এতই জমে গেছে যে ভদ্রলোক কিছুই বলতে পারছেন না।

বাস্তবিকই তাই। বলার কথা প্রচুর জমে গিয়েছিল রুদ্রর মনের মধ্যে। অবশেষে বিয়ের পরে সাতটি দিন ধরে সেই জমানো কথা উজাড় করে সে ঢেলে দিয়েছিল নবনীতার কাছে। বলা বাহুল্য তার মধ্যে অলকা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে গল্প করেছে তারা। গল্প গুজবের ফাঁকে ফাঁকে অলকা এসে হঠাৎ উপস্থিত হলেও রুদ্র জোর করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মনে মনে বলেছে, এ অন্যায়, এসব চিন্তা বাস্তবিকই অন্যায়। ভুলতে হবে অতীতকে। সম্ভাবনা থাকতেও যে এলো না, তার কথা চিন্তা করে যে এসে গেছে তার প্রতি এতটুকু অমনোযোগও ঘোরতর অপরাধ। সেই অপরাধে অপরাধী হতে রাজি নয় রুদ্রদেব। নিজের ইচ্ছায় নবনীতাকে যখন সে জীবন-সঙ্গিনী রূপেগ্রহণ করেছে তখন তার জীবনের সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই সে গড়ে তুলবে এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে। নবনীতা কেবল তার জীবন-সঙ্গিনীই নয়, সে হবে তার জীবনে ধ্রুবতারা।

বিয়ের জন্যে দশদিনের ক্যাজুয়েল লীভ দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে গেল। অবশেষে নবনীতাকে কলকাতায় রেখে রুদ্রদেব চলে এলো তার কর্মস্থলে।

সদরে গিয়ে এস-পি দিবাকর সেনের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি হেসে রুদ্রর সঙ্গে করমর্দন করে বলে ওঠেন, কনগ্রাচুলেশন ভট্চায। উইশ ইউ এ হ্যাপি ম্যারিড লাইফ।

স্মিত হেসে রুদ্রদেব বললে, বৌভাতে কিন্তু আপনাকে এক্সপেক্ট করেছিলাম, স্যার।

—আর বলেন কেন, বলতে থাকেন দিবাকর সেন, আই অলসো এক্সপেক্টেড সো। দুপুর পর্যন্ত আপনার ওখানে যাওয়াই ঠিক ছিল। একটু কাজও ছিল কলকাতায়। ভেবেছিলাম, বিকেলে কলকাতায় গিয়ে কাজটুকু সেরে ফেরার পথে বারাসাতে আপনার ওখানে এ্যাটেণ্ড করবো। ড্রাইভারকে সেইমত বলেও রেখেছিলাম। কিন্তু সবই ওলট-পালট হয়ে গেল। হঠাৎ খবর পেলাম যে সদর রাস্তার ওপর ঐ বড় ব্যাঙ্কে নাকি একটা ডাকাতি হয়েছে। ব্যাঙ্কের তিনজন কর্মচারী সিরিয়াসলি ইন্‌জিওর্ড। কলকাতার মত এখানেও সেই কালো এ্যামবাসেডর। পাঁচ-ছ'টি ছোকরা গাড়ি চেপে এসে বোমা ফাটিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম

সেখানে। ফিরে যখন এলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এরপরে কি আ
বৌভাতে যাওয়ার মুড থাকে?

দিবাকর সেন থামতেই রুদ্র বললে, পরের দিনের কাগজে খবরটা পড়েছি
ধরা পড়েছে নাকি কেউ?

চিন্তিত মুখে দিবাকর বললেন, নো—নো, নট এ সিঙ্গল ওয়ান। এদিকে
পুলিশ ডাইরেক্টরেট থেকে প্রায় প্রতিদিনই আই-জি'র একটা করে ফতোয়
আসছে। মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। শেষ পর্যন্ত তদন্তের ভার সি-আই
ডি নিয়েছে। এখন দেখা যাক ওরা কতটা কি করতে পারে। শুনছি নাকি
ওরা গ্যাংটাকে ট্রেস করতে পেরেছে।

—তাই নাকি? আগ্রহের স্বর ফুটে ওঠে রুদ্রর কণ্ঠে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু নিরাসক্ত স্বরে দিবাকর আবার বললেন, ওদে
ইন্সপেক্টরের কথায় তো তাই মনে হলো। তবে কতদূর কি করতে পা
সেটাই তো দেখার। এ তো আর সেই সাবেক কালের সি-আই-ডি নয় যখ
নাকি ওদের নাম শুনলে ডিস্ট্রিক্ট অফিসারেরা পর্যন্ত ঘাবড়ে যেত। তদন্তে
ভার সি-আই-ডি নিয়েছে শুনলে ক্রিমিন্যালদের চোখের ঘুম পর্যন্ত ছুটে যেত
শুনেছি সেকালে নাকি গোটা রাজ্য থেকে ঝাড়াই বাছাই করে অফিসারদে
নিয়ে আসা হতো সি-আই-ডিতে। তদন্তের ব্যাপারে সেকালের সেই সব বা
বাঘা সি-আই-ডি অফিসারেরা ছিল গোটা ডিপার্টমেন্টের এ্যাসেট। কিন্তু
রামও আর নেই সেই রাজত্বও নেই। একালে আর জেলাপুলিশ ও সি-আই
ডি'তে কোন পার্থক্যই নেই। সবাই এখন এক পথের পথিক।

দিবাকর থামতেই রুদ্র কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই দিবাক
তাকে থামিয়ে আবার বলে ওঠেন, ওসব কথা এখন থাক। এবার বলুন, কা
কর্ম সব ভালয়-ভালয় মিটলো?

স্মিত হেসে জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ স্যার।

একটু থেমে দিবাকর হালকা হেসে বললেন, বিয়ে যখন করেছেন তখন আ
একা একা থেকে লাভ কি, ভট্চায? এবার ওয়াইফকে নিয়ে এসে বেশ জাঁকি
সংসার পাতুন।

সলজ্জ হাসি হেসে জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ স্যার, ওদিকে একটু গোছ-গা
হলেই নিয়ে আসবো।

দিবাকর বেল টিপতেই দু'কাপ চা নিয়ে আর্দালী কনস্টেবল এসে হাজি
হলো। চা খেতে খেতে দিবাকর একসময় বললেন, আপনার সাবডিভিশনে

ন্টি সোস্যাল এলিমেন্টস্‌দেব এ্যাক্‌টিভিটি কিন্তু আবার বেড়ে উঠেছে। আমি ন্দন নন্দীকে বলে দিয়েছি কিছু প্রিভেন্টিভ স্টেপ নিতে। প্রয়োজনে কিছু ন্টুডিকে সাউণ্ড আপ করুন। ওদের বাড়তে দিলেই ক্রাইম বাড়বে।

—ইয়েস স্যার। ব্যাপারটা আমি দেখছি।

এস-পি দিবাকর সেনকে এই দেখার কথাটা বললেও নিজেব হেড কোয়ার্টারে ফ্রবার পথে গাড়িতে বসে সেই কথাই ভাবছিল রুদ্র। কতটুকু দেখতে হবে সে? কতটুকু দেখার শক্তি আছে তার? এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে ই বাউড়ি এলিমেন্টরা সমাজ-দেহে দুষ্ট ক্ষতের মত। এরা পূজো উপলক্ষে মাটা চাঁদা তোলে প্রায় জোর করেই। সেই টাকার একটা মোটা অংশ াগায় নিজেদের ভোগে। এরা রাস্তা-ঘাটে ছিনতাই করে, দল বেঁধে ডাকাতি রে, মেয়েদের উত্যক্ত করে, পয়সা-কড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের রো খুনোখুনী করে। পাড়ার লোকেরা এদের ভয় করে এদেব হাতে নিগৃহীত বার ভয়ে, রাজনৈতিক দাদারা এদের পাপাচারকে মনে মনে সমর্থন করে দেব দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। এদের সম্পর্কে খানিকটা উদাসীন াকলেই যে নিজেদেব লাভ এটা বুঝতে পেরেই বোধহয় দেশেব পুলিশ মহল দেব সম্পর্কে নিবাসক্ত। কাজেই এদের হাতে পড়ে পড়ে মাব খাওয়া ছাড়া সহায় নিরীহ জনসাধারণেব আর কোন উপায় নেই।

দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকাব ও সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে াজনৈতিক নেতাদেব সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে একেবারে তন্ময় থাকে ঠে রুদ্রদেব। মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও বেকারত্বেব সঙ্গে ক্রাইমেব ম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। একালের ক্রিমিন্যালেরা আর সেকালের মত অশিক্ষিত য। এদের অধিকাংশই শিক্ষিত কিম্বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত। একালের ক্রিমিন্যাল াংগুলোর স্থায়িত্বও অতি অল্প সময়ের জন্যে। অধিকাংশই ভুঁইফোড। াই এদের সঠিক হদিশ পাওয়া পুলিশের পক্ষে শক্ত। তার ওপর, একালে াজনৈতিক দাদাদের স্নিগ্ধ ছত্রচ্ছায়া তো আছেই। তাবই আড়ালে গা কা দিয়ে তারা অনায়াসেই ভালো কাপড় জামা পরে মোটব সাইকেল ড়িয়ে বীরদর্পে রাজপথে ঘুরে বেড়ায়। কেউ তাদের টিকিটিও স্পর্শ করতে রে না। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে পুলিশ মহলের যে দৃঢ়তা, যে নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধের প্রয়োজন তা তাদের মোটেই নেই। "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" মক আপ্তবাক্য স্মরণ করে পুলিশী প্রশাসনেব অধিকাংশ সেনাপতিরাই বলমাত্র চাকরিটুকু বজায় রেখে চলেছেন কোনক্রমে। সেই সঙ্গে সরকারী

পয়সায় কিছু সুযোগ সুবিধা আর বেসরকারী পয়সায় ভবিষ্যৎ জীবনের রসদ সংগ্রহের দিকেই অনেকের নজর। জনসাধারণের কথা ভাবতে কারওত মাথাব্যথা?

জীপের সীটে ঠেস দিয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রুদ্রদেবের। দেশের এই পরিস্থিতির জন্যে কে যে আসলে দায়ী তা যেন সে ঠিক করতে পারে না। তবে একটা বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ যে রাজনৈতিক নেতারা দেশের ক্রিমিন্যাল তথা মস্তানবাহিনীকে হাতে রেখে এক ঢিলে দুই পাখি মেরে চলেছেন। একদিকে এদের দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও অন্যদিকে এদের "চরে খেতে" দিয়ে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান। ইচ্ছেমত "চরে খাওয়ার" সুযোগ করে দেয়া বেকার সমাজের দেহে অনেকটা সেফ্‌টি ভাল্‌ভের মত। নইলে যে বেকার সমাজের দেহে বিস্ফোরণ ঘটে গিয়ে তার আগুন গোটা সমাজের দেহে ছড়িয়ে পড়তো। আর সেই আগুনে কপাল পুড়ে ছাই হয়ে যেত রাজনৈতিক নেতাদেরও।

সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে এল রুদ্র। জীপ থেকে নেমে একতলায় তার অফিস ঘরের দিকে না গিয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা চলে গেল দোতলায় তার নিজের কোয়ার্টারে। যাবার সময় জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে যে তার বিডার সুকুমার বক্সী তখনও তার সেই ছোট্ট ঘরে বসে নিজের মনে কাজ করে চলেছে।

দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে ধড়াচুড়ো ছেড়ে ফেলে রুদ্রদেব সাধারণ প্যাণ্ট ও হাওয়াই সার্ট গায়ে চড়িয়ে প্রস্তুত হতেই নেপালী চাকর বীরবাহাদুর এক কাপ চা এনে সামনে ধরতেই রুদ্র জিজ্ঞেস করে, চা কোত্থেকে পেলি রে, বাহাদুর? সকালে তো বললি একটু চাও নাকি নেই। যাওয়ার সময় আমিও চায়ের টাকা দিতে ভুলে গেছি। তা'হলে চা পেলি কোথায়?

বীরবাহাদুর এক গাল হেসে ভাঙা বাংলায় বললে, সত্যিই সাব, একটু চাও ছিল না। এদিকে আপনিও টাকা দিয়ে যান নি। মনে মনে ভাবলাম বিকেলে ফিরে এসে তো আপনি চা খেতে চাইবেন। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। বাজারের ওই বড চা দোকানে গিয়ে আপনার নাম করে বাকিতে চা নিয়ে এলাম।

কথাটা শুনেই মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে রুদ্রর। বললে, দোকানে গিয়ে বলতেই তারা তোকে বাকিতে চা দিয়ে দিলে?

—হ্যাঁ সাব বলতে থাকে বীরবাহাদুর, বললাম এস-ডি-পি-ও সাহেবের

নোকর আমি। কাল সকালে টাকা দিয়ে যাব। ব্যাস্ হয়ে গেল। আপনার নাম বলতেই পাঁচশো গ্রাম চা দিয়ে দিলে।

চা খেতে খেতে গম্ভীর মুখে রুদ্র জিজ্ঞেস করে, কত দাম?

—দশ টাকা। জবাব দেয় বীরবাহাদুর।

পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে বীরবাহাদুরের হাতে দিয়ে রুদ্র বললে, যা এক্ষুনি গিয়ে টাকাটা দিয়ে আয়।

প্রতিবাদের সুরে বীরবাহাদুর বললে, এখনই যেতে হবে সাব? আমি তো কাল সকালের কথা বলে এসেছি।

জবাবে রুদ্র দৃঢ় কণ্ঠে বললে, না, এক্ষুনি যা।

বীরবাহাদুর আর কিছু না বলে নোটখানা হাতে নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই রুদ্র তাকে ডেকে আবার তেমনি সুরে বললে, হ্যাঁ আর একটা কথা শোন্। আর কখনও কোন দোকান থেকে আমার নাম করে কোন কিছু বাকিতে আনবি না। মনে থাকে যেন।

বীরবাহাদুর এতক্ষণে বুঝতে পারে যে সাহেবের নাম করে বাকিতে চা আনায় সাহেবের গোসা হয়েছে। কিন্তু কেন যে হয়েছে তা' সে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরতে পারে না। এই এলাকার পুলিশের বড় কর্তা তার এই সাহেব। বাজারে যারা তাকে চেনে তারা তো এই সুবাদে বেশ একটু খাতিরই করে তাকে। দর-দামেও দু'চার পয়সা কমই নেয় তার কাছ থেকে। সে কথা একদিন সে সাহেবের কাছে বলেও ফেলেছিল। শুনে যদিও সাহেব সেদিন তাকে কিছু বলে নি, কিন্তু সে যে খুশি হয় নি তা সেদিন তার মুখ দেখেই ধরতে পেরেছিল বীরবাহাদুর।

বীরবাহাদুর চলে যেতেই চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় রুদ্র। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ছোট মহকুমা শহরের পথে-ঘাটে একটা দুটো করে আলো সবে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। পাশের বস্তির খোলার চালের ফাঁকে দেখা দিয়েছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী যা নাকি প্রতিদিনই এই সময় দেখা যায়। বস্তির ওপাশে বড়রাস্তা থেকে সাইকেল রিক্সার বেল্ ও ছোট হর্নের শব্দ ভেসে আসে। সেই সঙ্গে জেগে ওঠে মোটরগাড়ি কিম্বা লরীর আওয়াজ।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রুদ্রদেব। সেই মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানি সুন্দর মুখ—নবনীতার টানা টানা চোখদুটো যেন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আচ্ছা, এই মুহূর্তে নবনীতা তাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে বসে কি করছে? হয়তো তাদের সুন্দর সাজানো-গোছানো ড্রইংরুমে বসে কোন একটা মাসিকপত্র পড়ছে, কিম্বা হয়তো নিজেদের সেই সাদা মোটর গাড়িখানা নিয়ে একাই ড্রাইভ্ করে বেড়াতে বেরিয়েছে। এখানে চলে আসার দু'দিন আগে শ্বশুরবাড়িতে নবনীতা তাদের সেই সাদা মোটরগাড়িতে রুদ্রকে নিয়ে লেকের ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। ড্রাইভ করছিল নবনীতা। সেদিন তার সেই গাড়ি চালানোর ধরনটি ঠিক ভালো লাগে নি রুদ্রর। তার সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল মেয়েদের পক্ষে এমনি র‍্যাশ্ ড্রাইভিং মোটেই ভালো নয়। কথাটা নবনীতাকে বলতেই একখানা ট্যাক্সিকে ওভারটেক্ করতে করতে হেসে উঠেছিল সে। তারপর গাড়ির স্পীড্ একটু কমিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বলেছিল, নাগো না, আমি সচরাচর এমনিভাবে গাড়ি চালাই না।

—তবে আজ চালাচ্ছো কেন? জিজ্ঞেস করেছিল রুদ্র।

একটু সময় চুপ্ করে থেকে হেসে জবাব দিয়েছিল নবনীতা, তুমি পাশে আছো বলে।

—আমি পাশে আছি বলে এমনি করে গাড়ি চালাবে? কৃত্রিম গম্ভীর সুরে বলেছিল রুদ্র, বেশ, তোমাকে আর চালাতে হবে না। স্টিয়ারিং আমার হাতে দাও।

—তুমি ড্রাইভিং জানো নাকি?

—জানবো না কেন, বলতে থাকে রুদ্র, মাউণ্ট আবুর ট্রেনিং সেণ্টারে ড্রাইভিং ভালই শিখেছিলাম। তবে ইদানীং আর অভ্যেস নেই।

—তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

—না—তাও নেই। দরকার হয়নি বলেই লাইসেন্স করাই নি। নিজের যখন গাড়ি নেই, আর চাপি যখন সরকারী গাড়িতে তখন ড্রাইভার কন্‌ষ্টেবল থাকতে নিজে চালাতে যাই কেন?

—অভ্যেসটা রাখলেই পারতে। আজ না থাকলেও ভবিষ্যতে তো নিজের একখানা গাড়ি হতেও পারে।

—যেদিন হবে সেদিন না হয় অভ্যেসটা আবার ঝালিয়ে নেব, আর সেই সঙ্গে লাইসেন্সও করাবো।

—এই কলকাতার রাস্তায় বিনে লাইসেন্সে আমার কাছ থেকে স্টিয়ারিং নিজের হাতে তুলে নিতে চাইছো? নিজে পুলিশ হয়ে এমন বে-আইনী কাজ করবে? হাসতে হাসতে বলেছিল নবনীতা।

গাড়ির জানালার উইণ্ড স্ক্রীন দিয়ে পশ্চিম আকাশের অস্তগামী সূর্যের লাল আভা নবনীতার সুন্দর মুখখানাকে আরও অপরূপ করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে তার পাতলা ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিকটুকু রুদ্রর চোখে এমন ভঙ্গিতে ধরা দিয়েছিল যে সেই মুহূর্তে নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করেছিল সে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রুদ্রও তেমনি হেসে জবাব দিয়েছিল, কি যেন বলছিলে—পুলিশ হয়ে বে-আইনী কাজ? আইন-শৃংখলার যারা রক্ষাকর্তা তারা তো সব সময়ই আইনের ঊর্ধ্বে। শৃংখলার বাঁধা রাস্তা ধরে দেশের আইনকে টেনে নিয়ে চলাই পুলিশের কাজ। গাড়ি টানতে হলে ঘোড়াকে গাড়ির বাইরেই দাঁড়াতে হবে। গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তো আর ঘোড়া গাড়ি টানতে পারে না। তেমনি আইনকে টেনে নিয়ে যেতে হলে পুলিশকেও আইনের বাইরে থাকতে হয়। এবার বুঝলে?

কথাটা শেষ করে রুদ্র এমনভাবে হো—হো করে হেসে উঠেছিল যে রাস্তার অপস্রিয়মান পথচারীরা কৌতূহলী চোখে তাদেব দিকে না তাকিয়ে পারে নি।

রুদ্রব হাসি থামতেই নবনীতা হালকা সুবে বলে উঠেছিল, উপমায় তুমি দেখছি কালিদাসকেও হার মানাও।

রুদ্র সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত বাইবেব দিকে তাকিয়েছিল। নবনীতার কথাটা যেন শুনতে পায় নি সে। অবশেষে একসময় মুখ ঘুরিয়ে ম্লান কণ্ঠে বলেছিল, জানো নীতা, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর পুলিশ কিন্তু মনে করে যে তারা সত্যিই আইনের ঊর্ধ্বে। আমার নিজেব ধারণা জনসাধারণের কাছ থেকে পুলিশের দূরে সরে থাকার এটাও একটা মস্ত কারণ। ওরা বোঝে না যে জনসাধারণেরই একটা অংশ ওরা। বাকি জনসাধারণের চাইতে ওরা কোন অংশেই বড় নয়। গায়ের উর্দি খুলে ফেলে দিলেই সেটা অনায়াসে প্রমাণ হয়ে যায়।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নববিবাহিতা স্ত্রী নবনীতাব কথাই ভাবছিল নতুন এস. ডি. পি. ও রুদ্রদেব। সহসা তন্ময়তা ভেঙে যায় তার। নিজের মনেই হেসে ওঠে সে। ভাবে, এ যে দেখছি মেঘদূতের আধুনিক সংস্করণ শুরু হলো। যক্ষিনীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছে যক্ষ। মেঘের মাধ্যমে বার্তা পাঠাবার যুগ আব নেই। তার বদলে আজ রাতেই নবনীতাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রুদ্র নীচে নেমে এসে নিজের অফিস ঘরে বসতেই আর্দালী কনস্টেবল ঘরে ঢুকে একটা দীর্ঘ স্যালুট দিয়ে বললে, সেই বিকেল পাঁচটা থেকে একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে।

—তাই নাকি? লোকটি তার জন্যে এতক্ষণ বসে আছে বলে মনে মনে একটু লজ্জিত হয়ে রুদ্র বললে, ঠিক আছে, ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই সাদাসিধে ধরনের একজন মাঝবয়সী লোক ঘরে ঢুকে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে রুদ্রকে নমস্কার করে সামনে এসে দাঁড়াতেই রুদ্র সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললে, বসুন।

লোকটি তেমনি ভঙ্গিতে চেয়ারে বসতেই রুদ্র জিজ্ঞেস করে, বলুন, কী দরকারে আমার কাছে এসেছেন।

লোকটির চেহারাটি গোলগাল হলেও পোশাকের পারিপাট্য নেই। মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতির ওপরে আধময়লা সাদা একটি হাফশার্ট। মাথার পাতলা চুল অবিন্যস্ত। ফর্সা গায়ের রঙের জন্যে দু'তিন দিনের না কামানো মুখের দাড়ি বড়ই স্পষ্ট।

রুদ্রর প্রশ্নে লোকটি একটা ঢোক গিলে বললে, আমার নাম সত্যরঞ্জন সাধুখাঁ। বাজারে একটা রেশনের দোকান আছে আমার। বিপদে পড়ে স্যার আপনার কাছে এসেছি।

—কি বিপদ? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

ঘরের চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় লোকটি। তারপর নীচু কণ্ঠে কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ওঠে।

লোকটির এহেন আচরণে একটু বিব্রত বোধ করে রুদ্রদেব। মনে-মনে ভাবে, ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু গুরুতর।

—আপনি কাঁদবেন না, লোকটিকে আশ্বাস দেয় রুদ্র, আপনি নির্ভয়ে আপনার বিপদের কথা বলুন।

লোকটি তার ধুতির খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলতে থাকে, রেশন দোকানের লাইসেন্স পেয়ে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছি, স্যার। নামেই রেশন দোকানের মালিক। সৎপথে থেকে ব্যবসা চালালে তেমন কিছুই নেই এতে। মোটামুটি চলে যায় আর কি। তার উপর আপনাদের এনফোর্স-মেণ্টের ঝঞ্ঝাট তো লেগেই আছে। আজ এ-খাতা ঠিক নেই, কাল ও-খাতায় গলতি রয়েছে—এসব তো প্রায় রোজকার ব্যাপার। সত্যিকথা বলতে কি স্যার, ব্যবসা করতে বসে সব সময় সবদিকে নজর রাখাও কষ্টকর। কিন্তু আইন বলছে অন্য কথা। একটা সত্যিকথা বলছি, কিছু মনে করবেন না স্যার। এই সব ঝঞ্ঝাট এড়াতে প্রতিমাসেই এনফোর্সমেণ্টের বাবুদের পকেটে কিছু কিছু গুঁজে দিতে হয়। তার উপর খোদ রেশনিং ডিপার্টমেণ্টের বাবুদেরও খুশি

াখতে হয়, নইলে হয়তো লাইসেন্স-ই বাতিল হয়ে যাবে। তবুও স্যার, এই সবেই কোনরকমে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তা আর ব্যবসাই করা চলবে না। এরকম অরাজকতার কথা কোনদিন কল্পনাও করি নি, স্যার।

সত্যরঞ্জন একটু থামতেই গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে রুদ্র, এন্‌ফোর্সমেণ্ট বাবুদের সঙ্গে কি মাসিক বন্দোবস্ত?

সলজ্জ হাসি হেসে সত্যরঞ্জন বললে, ওসব কথা দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যার। আমাদের খাতাপত্রেও গলতি থাকে, আর বাবুরাও কিছু পেলে খুশি হন। তাছাড়া ব্যবসা করতে গেলে যে ওসব দিতে হবে তা জেনেই তো ব্যবসায়ে নেমেছি। তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না স্যার। কিন্তু যে উটকো বিপদ শুরু হয়েছে তাতে তো ব্যবসা করাই মুশকিল।

রুদ্র বললে, বেশ তো, সেই উটকো বিপদের কথাই বলুন না।

—হ্যাঁ স্যার, বলবো। বলবো বলেই তো বিপদ ঘাড়ে করেও এসেছি আপনার কাছে। জানি, একথা টের পেলে ওরা আর আমায় আস্ত রাখবে না। ওরা তো স্পষ্টই শাসিয়েছে যে এ নিয়ে হৈ-চৈ করলে ওরা নাকি আমার লাশ ফেলবে। বলতে বলতে লোকটির চোখ দুটো আবার ছল ছল করে ওঠে।

রুদ্র তাকে অভয় দিয়ে বললে, না—না, কোন ভয় নেই আপনার। আপনি বলুন।

—ভরসাই বা কোথায় স্যার? বলতে থাকে সত্যরঞ্জন, শত্রু আমার চারিদিকে। ওরা তো শত্রু বটেই, তার ওপর থানার বাবুরাও আমার ওপর বিরূপ। আমি এখন কি করি, কোথায় কার কাছে যাই?

রুদ্র আর কোন কথা না বলে কেবল একদৃষ্টে লোকটির অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সত্যরঞ্জন আবার বলতে থাকে, বাজার এলাকায় জনাকয়েক মস্তান আছে। ওদেরও খুশি রেখে আমাদের চলতে হয়। কি মাসেই কিছু কিছু দিতে হয় ওদের। আমি একা নয় স্যার, বাজারের প্রত্যেকটি দোকানদারকেই দিতে হয়। নইলে হয়তো একদিন দেখা যাবে দোকানের মালপত্র সব লোপাট হয়ে গেছে। মিথ্যে বলবো না স্যার, এতসব ঝক্কি ঝামেলা সামলাতে হলে যে সৎভাবে ব্যবসা করা সম্ভব নয় তা' বোধহয় আপনিও স্বীকার করবেন। কাজেই আমাকেও কিছু কিছু বে-আইনী কাজ করতে হয়। বিশ্বাস করুন স্যার, প্রাণের দায়েই তা' করি, অন্য কোন উপায় নেই বলেই করি।

দম নেয়ার জন্যে একটু থেমে সত্যরঞ্জন আবার বলতে থাকে, মাসখানেক আগের ঘটনা। ' বিকেলে দোকান বন্ধ করে ভেতরে বসে সারাদিনের বেচা কেনার হিসেব করছি। হঠাৎ ভেজানো দরজা ঠেলে এলাকার মস্তান সুকান্ত ও হারু এসে হাজির। ওদের মুখে মদের গন্ধ। আমি কিছু বুঝবার আগেই ওরা ছোঁ মেরে ক্যাশবাক্সের সামনে রাখা টাকার বাণ্ডিল দুটো হাতে তুলে নেয়। আমি বাধা দিতেই হারু একটা চক্‌চকে পিস্তল বের করে আমাকে শাসায়—টুঁ শব্দটি করেছ তো জান নিয়ে নেব, এই বলে রাখলুম। শালা চোরাকারবার যখন করিস তখন তার ভাগ আমাদের দিতে হবে।

সত্যরঞ্জন থামতেই রুদ্র বলে ওঠে, কত টাকা ছিল ওতে?

জবাব দেয় সত্যরঞ্জন, মোট আড়াই হাজার টাকা, স্যার। পরের দিন রেশনের কোটা তুলবো বলে টাকাটা গুছিয়ে রেখেছিলাম।

—তারপর কি হলো? থানায় গিয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

মাথা নেড়ে সায় দেয় সত্যরঞ্জন, হ্যাঁ স্যার, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

—বড়বাবু কী বললেন? মামলা নিলেন?

একটু ইতস্তত করে সত্যরঞ্জন জবাব দেয়, না স্যার। তিনি বললেন, ব্যবসা যখন করতে হবে তখন মামলা-মোকদ্দমা করে লাভ কি? তাছাড়া, সুকান্ত ও হারুর মত লোককে চটানোও ঠিক হবে না। তিনি আরও বললেন যে ওদের থানায় ডেকে এনে তিনি টাকাটা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। বড়বাবুর কথামত আমিও আর মামলা-মোকদ্দমা না করে ফিরে এলাম। এর মধ্যে বড়বাবুর সঙ্গে দু'তিন বার দেখাও করেছি। থানার যে দু'জন সেপাই প্রায়ই আমাদের ওখানে সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়ায় তাদের মারফতও বড়বাবুকে বলেছি। কিন্তু কোন ফল হয় নি। উল্টে রাস্তায় দেখা হলেই সুকান্ত ও হারু আমাকে শাসায়। বলে, শালা গিয়েছিলি তো থানায়, ফল কিছু হলো? সুযোগ পেলে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। আমি থানায় ছোটাছুটি করি। বড়বাবুকে সব কথা বলি, কিন্তু তিনি নির্বিকার। অবশেষে গতকাল থানার সেই সেপাইরা আমাকে বললে, মস্তানদের সঙ্গে লাগতে গেলে জান খতম হবে। তার চাইতে যা গেছে তো গেছে, এখন চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কথাটা শেষ করে সত্যরঞ্জন ছল-ছল চোখে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে থাকে।

জিজ্ঞেস করে রুদ্র, থানার সেই সেপাইরা আপনাকে এই কথা বলেছে?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সত্যরঞ্জন। রুদ্র ভাবতে থাকে, এই সেপাই দু'জনের

সঙ্গে সম্ভবত ওই মস্তান দুটোর যোগাযোগ আছে। ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর সঙ্গেও ওদের যোগাযোগ থাকতে পারে, কিম্বা কেস সাপ্রেস করতে গিয়েই রাজেন নন্দী ফার্স্ট ইন্‌ফর্মেশন রিপোর্ট নেয় নি।

রুদ্র জিজ্ঞেস করে, থানার ঐ সেপাই দু'জনকে আপনি চেনেন?

—হ্যাঁ স্যার, খুব চিনি। ওরা তো প্রায়ই আমাদের তল্লাটে ঘুরে বেড়ায়।

—ওদের নাম জানেন?

একটু চিন্তা করে সত্যরঞ্জন জবাব দেয়, ওদের মধ্যে বাঙ্গালী সেপাইটির নাম নন্দ, কিন্তু হিন্দুস্থানীটির নামটা ঠিক জানি না, স্যার। তবে লোকটা খুব ফর্সা আর লম্বা। চোখ দু'টো কটা।

একটু সময় চুপ করে থাকে রুদ্র। তারপর সে সত্যরঞ্জনকে বললে, ঠিক আছে, আপনি এবার আসুন। দেখছি আপনার জন্যে কি করতে পারি।

—হ্যাঁ স্যার, দেখুন। আমাকে বাঁচান স্যার। বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললে সত্যরঞ্জন।

লোকটি চোখ মুছতে মুছতে চলে যাবার পরেও নিজের চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকে রুদ্র। টেবিলের কাগজপত্রের দিকে মন বসে না তার। মনে মনে ভাবে, সেই সনাতন ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা। ঐ আড়াই হাজার টাকা থেকে সেপাই দু'টো নির্ঘাৎ ভাগ পেয়েছে। তাই তারা মস্তানদের হয়ে সত্যরঞ্জনের কাছে ওকালতি করেছিল। থানার ইন-চার্জ ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর এ ব্যপারে কতটা হাত আছে তা সেই মুহূর্তে সে বুঝতে না পারলেও একটু পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাজ্জব বনে যায় সে। থানা ফাঁড়িতে যে এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে পারে তা' ছিল তার ধারণারও অতীত। তবে, রুদ্রর ধারণাই বা কতটুকু? মাত্র তো কিছুদিন হলো সে চাকরিতে ঢুকেছে। এর মধ্যে এই ডিপার্টমেণ্টের কতটুকুই বা সে দেখেছে? তা'ছাড়া, গোটা দেশ জুড়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির যে জোয়ার বয়ে চলেছে তার মধ্যে পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি তো সামান্য একটা ভগ্নাংশ মাত্র। নদী-নালার বড় বড় মাছকে রেহাই দিয়ে একটা বিশেষ মাছের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ কি?

পাশের ছোট ঘরখানায় বসে কাজ করছিল রুদ্রর রিডার সুকুমার বক্সী। রুদ্র তাকে ডাকতেই মাঝবয়সী সুকুমার এসে দাঁড়ায় তার সামনে। পরণে তার এ-এস-আই'র পোশাক।

রুদ্র জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বক্সীবাবু, এখানকার থানায় কি নন্দ বলে একটি কনস্টেবল আছে?

নামটা শুনেই সুকুমারের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বললে, হ্যাঁ স্যার, আছে।

—আচ্ছা, বেশ লম্বা ফর্সা কটা চোখ এমনি চেহারার একজন হিন্দুস্থানী কনস্টেবল আছে?

একটু চিন্তা করে সুকুমার। তারপর বললে, কটা চোখ হিন্দুস্থানী কনস্টেবল তো একটিই আছে, নাম তার লগনরাম সিং।

একটু সময় কি যেন চিন্তা করে রুদ্র। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, ঐ নন্দর এগেনস্টেই না কিছুদিন আগে একটা দরখাস্ত এসেছিল যা নাকি ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর কাছে এনকোয়ারীর জন্যে পাঠিয়েছিলাম?

—হ্যাঁ স্যার, জবাব দেয় সুকুমার, এনকোয়ারী রিপোর্ট এখনও পাই নি। বোধহয় পাওয়াও যাবে না।

—তার মানে? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রুদ্রর।

একটু ইতস্তত করে সুকুমার। তারপর বললে, আপনি তো স্যার সবকিছু জানেন না। ঐ নন্দ দেবনাথ ও লগনরামকেই থানার ইন্সপেক্টরবাবু সবচাইতে বেশি পছন্দ করেন। থানার সেপাইদের মধ্যে ওরাই নাকি সব চাইতে তুখোড়।

—তাই নাকি? জিজ্ঞেস করে রুদ্র, সত্যিই কি ওরা ভাল কনস্টেবল?

সহসা কোন জবাব না দিয়ে সুকুমার কেবল মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। জিজ্ঞেস করে রুদ্র, ওকি হাসছেন কেন?

হাসি থামিয়ে এবার জবাব দেয় সুকুমার, অনেক কাল চাকরি হলে এই ডিপার্টমেণ্টে। দেখেছি শুনেছিও অনেক। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কে যে কার কাছে ভালো, আর কে যে কার কাছে মন্দ তা' বুঝতে পারা বোধহয় শিবেরও অসাধ্য। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না, স্যার। তবে ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীকে তো আপনিও চেনেন। থানায় কনস্টেবলদের ডিউটি চার্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন ঐ নন্দ ও লগনরাম মাসের অধিকাংশ দিনই পি-সি ডিউটি করে।

রুদ্র বললে, থানার কনস্টেবলদের প্লেনক্লথ ডিউটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো প্রায় ফাঁকিবাজি। যতদূর জানি, প্লেনক্লথ ডিউটির আড়ালে এদের অনেকেই অন্য ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায়।

—ঠিকই জানেন স্যার। ওরা দু'জন ডাকের কনষ্টেবল বলেই তো ওদের পি-সি ডিউটি দেওয়া হয়।

বিরক্তির সুরে রুদ্র বললে, ডাকের ডিউটি প্লেনক্লথে পরে হবে কেন? এস-পি'র স্পেসিফিক অর্ডার যে কনষ্টেবলকে পোশাক পরেই ডাক নিয়ে যাতায়াত করতে হবে।

রুদ্রর কথায় সুকুমার আবার হেসে উঠতেই রুদ্র জিজ্ঞেস করে, ওকি, হাসছেন কেন?

জবাবে সুকুমার বললে, কিছু মনে করবেন না, স্যার। হাসছি আপনার কথা শুনে। ডাকের কনষ্টেবল আর ডাক ডিউটির কনষ্টেবল এক কথা নয় স্যার।

—তবে? কৌতূহলের চিহ্ন রুদ্রর মুখে।

বলতে থাকে সুকুমার, এই ডাক মানে নীলামের ডাক। থানার কনষ্টেবলদের মধ্যে থানার এলাকা দিন কয়েকের জন্যে নীলাম হয়। যার ক্ষমতা বেশি সেই নীলাম ডেকে নেয়। ঐ নির্দিষ্ট দিন ক'টির জন্যে ঐ কনষ্টেবলকে দেওয়া হয় পি-সি ডিউটি। সে ছাড়া ঐ ক'টি দিন ঐ এলাকায় আর কেউ আদায়-উশুল করতে পারবে না। আদায় যা হবে তা থেকে নীলামের টাকা শোধ করে বাকিটা থাকবে তার। নীলামের টাকাটা তারপর হয় ভাগ বাঁটোয়ারা।

কথাটা যেন প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করতেই পারে না রুদ্র। এও কি সম্ভব? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জঙ্গল ইজারা দেওয়ার মত থানার এলাকা ইজারা দেওয়ার পদ্ধতিও যে কোন কোন থানায় প্রচলিত, এটা বাস্তবিকই এক নতুন খবর তার কাছে। পুলিশের মানসিকতা যাচাই করতে এই ডিপার্টমেন্টে এসে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে একটু একটু করে যে বস্তু সে সংগ্রহ করে চলেছে তার দিকে তাকিয়ে সময় সময় শিউরে ওঠে রুদ্র। কি ভয়ানক এদের মানসিক প্রবৃত্তি, কি বিশ্রী এদের লোভ-লালসা।

বিশ্ববিখ্যাত জার্নালিস্ট যোসেফ পুলিটজার একদা বলেছিলেন—There is not a crime, not a dodge, not a trick, not a swindle, not a vice which does not live by secrecy. Get these things out in the

open, describe them, attack them, ridicule them in the pre:
and sooner or later public opinion will sweep them away.

পুলিটজার সাহেবের এই উক্তিটি তাঁর নিজের দেশ আমেরিকায় যে প্রযোজ্য তার প্রমাণ ওয়াটারগেট কেলেংকারী-খ্যাত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্স সাহেবের বিদায় গ্রহণ। কিন্তু তাঁর উক্তিটি বোধহয় আমাদের দেশে প্রযোজ্য নয়। এদেশের কাগজপত্রে দুর্নীতি—দুর্নীতি বলে চিৎকারের তো মোটে কমতি নেই, দেশনেতারাও দেশের দুর্নীতি উচ্ছেদ করার জন্যে মাঝে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়েন, কিন্তু দীর্ঘদিনে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ তো দূরের কথা ক্যান্সারের মত তা' গোটা সমাজদেহে অপ্রতিহত গতিতে ছড়িয়েই পড়ছে। আসলে সর্ষের মধ্যেই যে রয়েছে ভূত, তাই ঢাক-ঢোল যতই পেটানো হোক না কেন ভূত তাড়ানো যে কোন মতেই সম্ভব নয়, একথা এদেশের একটি ছোট ছেলে বোধহয় জানে। কেবল জানে না কিম্বা জেনেও জানতে চায় না এদেশের একদল মানুষ যারা চিরকাল শাক দিয়ে মাছ ঢাকতেই অভ্যস্ত।

পরের দিন সকালেই নিজের অফিস ঘরে এসে টেলিফোন তুলে নেয় রুদ্রদেব ওপাশ থেকে ভেসে ওঠে থানার ইন্সপেক্টর ইন-চার্জের কণ্ঠস্বর—আমি রাজে বলছি, স্যার।

—হ্যাঁ বড়বাবু, বলতে থাকে রুদ্র, বাজারে রেশন শপের মালিক সত্যরঞ্জ সাধুখাঁকে আপনি চেনেন?

—সত্যরঞ্জন সাধুখাঁ? কয়েক মুহূর্ত চিন্তার ভান করে দ্রুত ব্যাপারটা আঁ করতে চেষ্টা করে রাজেন নন্দী। সেই বেটা বোধহয় খোদ এস-ডি-পি-ও'কে গিয়ে ধরেছে। তাই সে বললে, হ্যাঁ স্যার, চিনি তাকে। লোকটা এক নম্বরে পাজি স্যার। রেশনের জিনিসপত্র চড়াদামে বাইরে পাচার করে। এই নি ঐ এলাকার ছেলেদের সঙ্গে ওর একটা গণ্ডগোলও চলছিল, স্যার। লোক একদিন আমার কাছেও এসেছিল। আমি ওকে ব্যাপারটা নিজেদের মে মিটিয়ে নিতে বলেছিলাম, স্যার।

—ও তাই নাকি? বলতে থাকে রুদ্র, পাড়ার সেই ছেলেদের মধ্যে সুকা ও হারু নামে ঐ এলাকার দুই মস্তানও বোধহয় ছিল?

—হ্যাঁ স্যার, সেইরকমই যেন সে বলেছিল।

—আর কোন অভিযোগ সে করে নি?

বুদ্ধিমান রাজেন নন্দী বুঝতে পারে রুদ্রর কাছে আর কিছু গোপন নেই সেই ব্যাটা বোধহয় সব কিছুই তাকে বলেছে। হয়তো তার নামেও গি

গিয়েছে এস-ডি-পি-ও সাহেবের কাছে। তাই সে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, হ্যা স্যার করেছিল। বলেছিল যে সুকান্ত ও হারু নাকি পিস্তল দেখিয়ে তার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

—ও, তাহলে সব কিছুই আপনাকে বলেছিল, কিন্তু তবুও থানায় কোন কেস স্টার্ট হয় নি।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রাজেন, লোকটা আপনার কাছে গিয়ে বুঝি তাই বলেছে? এক নম্বর ধড়িবাজ লোকটা। থানায় এসে কিন্তু সেদিন কিছুতেই সুকান্ত ও হারুর বিরুদ্ধে এজাহার দিতে চাইল না। অনেক বোঝালাম তাকে, কিন্তু লোকটার সেই এক কথা—ওদের বিরুদ্ধে এজাহার লেখালে আমি আর ব্যবসা করতে পারবো না। তার চাইতে আপনি ওদের কাছ থেকে আমার সেই টাকাটা কেবল আদায় করে দিন, বড়বাবু। আমি আর কিছু চাই না।

—কিন্তু আমার কাছে যে খবর এসেছে এর মধ্যে আপনার থানার দুই কনস্টেবল নন্দ দেবনাথ ও লগনরাম সিং নাকি আছে।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে রাজেনের, তাই নাকি? আমি তো এসব কিছুই জানি না। ঠিক আছে স্যার, আমি এখনই সেই লোকটিকে ডাকিয়ে এনে এজাহার নিচ্ছি। রুজু করছি একটা ডাকাতি কেস। আর, ঐ কনস্টেবলদের ডেকেও ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করছি।

—হ্যাঁ তাই করুন। আর মামলাটার তদন্তের ভার আপনাদের মেজবাবু অমিত মুখার্জীকে দিন। তাকে বলুন সেই মস্তান দু'টোকে যেন ইমিডিয়েট্‌লি এ্যারেস্ট করে।

—ঠিক আছে স্যার, তাই করছি, বলতে থাকে রাজেন নন্দী, তবে একটা কথা, স্যার—

—বলুন।

এখানকার এম-এল-এ পরীক্ষিৎ তরফদারের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় আছে স্যার?

—হ্যাঁ, আছে।

টেলিফোনের মাধ্যমেই গলাটা একটু খাটো করে এবার রাজেন নন্দী বললে, ঐ সুকান্ত ও হারু নাকি তাঁর নিজের লোক। তাই ভাবছি স্যার, এ নিয়ে পরে আবার কোন হাঙ্গামা হবে না তো?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্র, হলে হবে। কিন্তু তাই বলে এজাহারে নাম দেওয়া আসামীদের এ্যারেস্ট না করলে চলবে কেন? ল উইল টেক ইট্‌স ওন্ কোর্স।

থানা স্টাফদের মধ্যে সুকান্ত ও হারুর শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই। এজাহার দেওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা খবর পেয়ে গেল যে তাদের নামে রবারি মামলা রুজু হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে উদ্বেগের কোনই লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল না। রাজেন নন্দী রুদ্রকে মিথ্যা বলেনি। পরীক্ষিৎ তরফদারের মত প্রভাবশালী এম-এল-এ'র দক্ষিণ হস্ত তারা। কাজেই পুলিশকে পরোয়া করতে তাদের বয়েই গেছে।

রাত তখন প্রায় আটটা। রোজকার মত সেদিনও সুকান্ত ও হারু তাদের দলবল নিয়ে সিনেমা হলের সামনের চা-দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। বেপাড়ার আর এক মস্তানকে নিয়ে কথা হচ্ছিল তাদের।

সুকান্ত হাসতে হাসতে এক সাকরেদকে বললে, কি রে জগা, সেদিন যে সবার সামনে খুব হেক্কড়ি নিচ্ছিলি শালা, আসলি কেলোর সময় তো ফুটে যাস্।

বিরক্ত কণ্ঠে জগা বললে, কি সব খররা কথা বলছো গুরু? এত সহজে ফুটে যাওয়ার ছেলে জগা নয়। খোচড়টাকে যুৎমত পেলে এক তমেচায় ও ব্যাটার খোবড় বাঁকিয়ে দিতাম না।

এই সময় দলের আর একটি ছেলে জগাকে বললে, কি বললি রে জগা, তুই ওর খোবড় বাঁকিয়ে দিতিস্? বলেই ছেলেটি হো-হো করে হেসে উঠতেই দলের আর সকলেও তাতে যোগ দেয়।

জগা আর কিছু না বলে অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে চুপ্ করে থাকে। দলের আর একটি ছেলে এবার হারুকে বললে, জানো গুরু, বহুত কিচাইন হয়েছে আজ। জগা তো নিজেকে খুব একটা ঘ্যাম ভেবেছিল। কিন্তু সেই খোচড়টা জগাকে একটা চুক্কি দিতেই ওর হয়ে গেল। তখন যদি একবার ওর খোমাটা দেখতে গুরু। ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে একটা ফটো তুলে নিতাম।

ছেলেটার কথা শেষ হতেই আবার একটা হাসির রোল পড়ে যায়। জগার মুখের অবস্থা দেখে সুকান্তর বোধহয় একটু মায়া হয়। সে তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে যেতে গিয়ে পটলাকে বললে, খুব যে খিল্লি খাচ্ছিস রে পটলা। ছাড়্ ওসব কথা। আজ রাতের খরচটা কিন্তু তোকে দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পটলা বলে ওঠে, মাপ করো গুরু। একটা পয়সাও আজ সঙ্গে নেই।

জগা এবার সুযোগ পেয়ে পটলাকে বললে, তোর কাছে তো কোনদিনই পয়সা থাকে না। চিরটা কালই তো কেবল ঢপ দিয়ে কাটালি।

জগার কথায় পটলা রেগে উঠে বললে, দেখ্ জগা, বাতেলা মারিস না। নিজে ক'টা দিন খরচা করেছিস একবার ভেবে দেখ।

ঝগড়া পাকিয়ে ওঠে দেখে হারু বললে, বেশ-বেশ, তোদের কাউকে আজ খরচ করতে হবে না। আজ রাতের খরচা আমার।

হারুর কথায় উপস্থিত সবাই আনন্দে গুরু-গুরু বলে চেঁচিয়ে ওঠে। হারুর পয়সায় রাতের প্রোগ্রামটা তাদের ভাল হবে বলেই এই আনন্দ।

জগা কিন্তু তবুও পটলার পেছনে লাগতে ছাড়ে না। হাতের সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে পটলার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখটিপে হেসে বললে, সেদিন হাতে অতগুলো টাকা পেলি। এর মধ্যেই সব ফিনিস করে দিয়েছিস ?

পটলা একটু সময় গুম্ হয়ে থাকে। তারপর সহসা জগার ওপর খিঁচিয়ে উঠে জবাব দেয়, পয়সা সব মায়ের ভোগে গেছে।

সুকান্ত এবার জগাকে ধমক্ দেয়, ওর পয়সা-কড়ির খবরে তোর দরকার কি ? তুই-ই তো পটলাকে চটিয়ে দিয়ে কেস বিলা করে দিলি। নইলে পটলাই আজ রাতের খরচ জোগাতো।

সুকান্তর কথা শেষ হতেই হারু কিছু বলার জন্যে মুখ তোলে। কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে যায় তার। ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা জিপ্ এসে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। আর চোখের পলকে দু'জন কন্‌স্টেবল সঙ্গে নিয়ে থানার মেজবাবু অসিত মুখার্জী দোকানে ঢুকে দলটিকে ঘিরে ধরে।

সহসা একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে সেখানে। চা-দোকানের মালিকের মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। দোকানের অন্য খদ্দেররা চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পুলিশ দলটির দিকে। কৌতূহলী পথচারীদের মধ্যেও দু'চারজন এসে ভিড় করে দাঁড়ায় দোকানের সামনে।

সুকান্ত ও হারুর দিকে তাকিয়ে অসিত বললে, তোমাদের দু'জনকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

সুকান্ত ও হারুর মধ্যে কি যেন কথা হয় চোখে চোখে। হারু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন থানায় যেতে হবে বলবেন, স্যার ?

অসিত আবার বললে, তোমাদের নামে একটা রবারি কেস হয়েছে।

—রবারি কেস ? কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলে ওঠে সুকান্ত, কোথায়—কখন কে কেস করলো আমাদের নামে ?

কঠিন সুরে অসিত বললে, থানায় গেলেই তা জানতে পারবে। এবার চলো

—আপনি কি আমাদের এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছেন, স্যার? প্রশ্ন করে হারু।

—হ্যাঁ, জবাব দেয় অসিত, তোমাদের এ্যারেস্ট করছি।

হারু ও সুকান্তর মধ্যে আর একবার চোখে চোখে কথা হয়। তারপর সুকান্ত বললে, কিন্তু রাত ন'টার সময় পরীক্ষিৎদা যে তাঁর বাড়িতে আমাদের দেখা করতে বলেছেন।

ভ্রু-কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে অসিত, কোন্ পরীক্ষিতের কথা বলছো? এম-এল-এ পরীক্ষিৎ তরফদার?

সুকান্ত মাথা নেড়ে সায় দিতেই অসিত আবার বললে, চিন্তা করো না সময় হলে তিনি সবই জানতে পারবেন। এবার চলো।

হারু ও সুকান্তকে নিয়ে অসিত থানায় আসতেই রাজেন নন্দী হেসে অসিতকে বললে, কোনরকম ঝামেলা করেনি তো?

—না স্যার, জবাব দেয় অসিত, বাধ্য ছেলের মত সুড় সুড় করে চলে এলো আমার সঙ্গে। খবরটা একবার এস-ডি-পি-ওকে জানাবেন নাকি, স্যার

খানিকটা উদাসীন ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দী বললে, জানাতে তো হবেই। সাহেব-সুবোর ব্যাপার। নইলে হয়তো আবার গোসা করবেন তা'ছাড়া বলতে গেলে মামলাটা তো উনিই রুজু করিয়েছেন। তোমাকে তদন্তের ভার দেওয়ার মূলেও উনিই।

—আপনি হলে বোধহয় এ ভার আমাকে দিতেন না, স্যার। ঠোঁটকাটা স্বভাবের অসিত সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে রাজেন নন্দীকে।

জবাবে রাজেন নন্দী বললে, আমি হলেও এমন একটা ইম্পর্টেন্ট কেস তোমাকেই দিতাম। কথা তা' নয়। ওঁর হুকুমে এটাই প্রমাণ হলো যে এই থানায় উনি একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর কোন দারোগাকে বিশ্বাস করেন না।

—তার মানে এস-ডি-পি-ও সাহেবের নেক নজরে রয়েছি আমি?

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

একটু হেসে অসিত আবার বললে, যাক্, এতদিনে বোধহয় একজন মুরুব্বি আমার জুটলো। চাইকি, প্রমোশনটাও আমার তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে।

অসিতের কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুরটুকু শুনেও যেন শুনতে পায় না রাজেন নন্দী এ নিয়ে ঠোঁটকাটা অসিতের সঙ্গে তর্ক না করাই ভালো। তাতে কেবল তিক্ততার পরিমাণ বেড়ে ওঠা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। ইতিমধ্যেই

দেব দলে এই বক অসিতকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যে রাজেন নন্দীর দ-পি'র কান ভারী করার খবর অনেকের মত অসিত নিজেও জানতে রেছে। এ নিয়ে রাজেন নন্দীর সঙ্গে দু'একবার কথা কাটাকাটিও হয়েছে সিতের। কথায় কথায় অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণাও করেছিল সিত যা নাকি রাজেন নন্দীর নিজের পক্ষে হজম করাও ছিল শক্ত, আবার তিবাদ করাও ছিল বিপদজনক। তাতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভাবনা ছিল বলেই এ নিয়ে আর তেমন একটা ঘাঁটাঘাঁটি করে নি রাজেন দী।

রাজেন নন্দী আর কিছু না বলে নিজের ঘরে এসে টেলিফোন তুলে নেয়। পর প্রান্ত থেকে রুদ্রর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই রাজেন নন্দী বললে, একটু াগে অসিত আসামী সুকান্ত ও হারুকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে এসেছে, স্যার।

—তাই নাকি? জিজ্ঞেস করে রুদ্র, কোত্থেকে এ্যারেষ্ট করলো?

—সিনেমা হলের সামনে থেকে।

—কোনরকম ঝঞ্ঝাট করেনি তো ওরা?

—না স্যার।

—অল্ রাইট। খবরটা এস-পিকে জানিয়ে রাখছি। বলা তো যায় না ম-এল-এ পরীক্ষিৎ তরফদার সেখানেও তদ্বির করতে পারে। বলেই রুদ্র ড়ে দেয় টেলিফোন।

রুদ্রর অনুমান ভুল নয়। একটু পরেই রাজেন নন্দীর টেলিফোন আবার ন্-ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে। এস-পি'কে না পেয়ে এস-ডি-পি-ও'কে পাশ কাটিয়ে াজা থানার ইন্সপেক্টরকেই পাকড়াও করেন পরীক্ষিৎ। রাজেন রিসিভার লতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে পরীক্ষিতের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

— আমি পরীক্ষিৎ তরফদার বলছি।

—বলুন স্যার। বিগলিত কণ্ঠে জবাব দেয় রাজেন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করেন, সুকান্ত ও হারু নামে দু'টো ইনোসেন্ট ছেলেকে কি আপনারা এ্যারেস্ট করেছেন?

—হ্যাঁ স্যার। একটা রবারি কেসের আসামী ওরা।

—তাই নাকি? মামলাটা রুজু করলো কে?

রাজেন বাদী সত্য সাধুখাঁর নাম বলতেই পরীক্ষিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে াকেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করেন, ওদের বিরুদ্ধে কোন ডাইরেক্ট ভিডেন্স আপনারা পেয়েছেন কি?

—তদন্ত শেষ না হলে তো কিছু বলা যাবে না, স্যার।

—বেশ, তদন্ত আপনারা যত খুশি করুন। তবে আমি জানি ওরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। দয়া করে ওদের জামিনে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

একটু ইতস্তত করে রাজেন নন্দী বললে, এই মামলাটা সম্পর্কে খোদ এস-ডি-পি-ও সাহেব খোঁজ খবর করছেন। ওদের জামিনের ব্যাপারে আপনি বরঞ্চ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন, স্যার।

বিরক্ত কণ্ঠে পরীক্ষিৎ বললেন, আমাদের ছেলে। ভেবেছিলাম আপনাকে বললেই জামিনের ব্যবস্থা হবে। তা' যখন হবে না তখন আপনাদের এস-ডি-পি-ওকে কেন, খোদ এস-পি-র সঙ্গেই যোগাযোগ করবো। বলেই অকস্মা টেলিফোন ছেড়ে দিলেন তিনি।

রাত তখন প্রায় দশটা। হাতের কাজটুকু শেষ করে উঠবো উঠবো করছিল রুদ্র। কিছুক্ষণ মাত্র আগে সুকুমারবাবুকে সে ছুটি দিয়েছে। ইতিমধ্যে চাকর বীরবাহাদুরও একবার নীচে নেমে রুদ্রর অফিসঘরে উঁকিঝুঁকি মেরে গেছে ঠিক এমনি সময় অফিসের সামনে একখানা জিপ এসে দাঁড়ায়। জিপ থেকে নেমে আসেন দীর্ঘদেহী পরীক্ষিৎ তরফদার। পরনে ধুতি, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি, পায়ে স্যাণ্ডেল। বাইরের আর্দালী কনস্টেবল সাহেবকে খবর দিতে ভেতরে ঢুকতেই পরীক্ষিতও তার পেছনে ঘরের মধ্যে ঢুকে বলে ওঠেন, অনুমতি পাওয়ার আগেই ভেতরে ঢুকলাম, কিছু মনে করবেন না, মি' ভট্টচায।

পরীক্ষিতের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল রুদ্রর। সদরে এস-পি দিবাকর সেনের ওখানেই আলাপ হয়েছিল একবার। সেই সূত্র ধরেই রুদ্র বলে ওঠে আসুন পরীক্ষিৎবাবু, বসুন।

পরীক্ষিৎ হাসেন খুব কম। আবার কোন কারণে হাসলেও সেই হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। গম্ভীর মুখে একখানা চেয়ার টেনে রুদ্রর মুখোমুখি বসেন। তারপর কোনরকম ভূমিকা না করেই সোজাসুজি কাজের কথা পেড়ে বললেন, আপনাদের এস-পি মিঃ সেনকে কয়েকবার ফোন করেও ধরতে পারলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ছুটে আসতে হল আপনার কাছে।

পরীক্ষিৎ তরফদারের এই সময় এখানে আসার কারণ রুদ্রর কাছে মোটেই অস্পষ্ট নয়। তবুও সে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার বলুন তো?

সারা মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে জবাব দেন পরীক্ষিৎ. এই তো সন্ধ্যা নাগাদ একটা জরুরী মিটিং সেরে কলকাতা থেকে ফিরলাম। এসেই শুনলাম

আপনাদের থানার মেজবাবু নাকি আমাদের দলের দু'টি ছেলেকে এ্যারেস্ট করেছে।

যেন জানে না এমনি ভঙ্গিতে রুদ্র বললে, তাই নাকি? কি নাম ছেলে দু'টির?

—সুকান্ত হালদার ও হারু পাল। জবাব দেন পরীক্ষিৎ।

—হ্যাঁ জানি, বলতে থাকে রুদ্র, একটা রবারি কেসে ওদের এ্যারেষ্ট করা হয়েছে। বাজারে একটা রেশন সপে ঢুকে মালিকের কাছ থেকে জোর করে আড়াই হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে বলে ওদের বিরুদ্ধে এজাহার হয়েছে।

একটু সময় চুপ করে থাকেন পরীক্ষিৎ তরফদার। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, আমার মনে হয় ব্যাপারটা সাজানো। এর পেছনে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমাদের ছেলেরা এ ধরনের কাজ কিছুতেই করতে পারে না।

শান্ত সুরে জবাব দেয় রুদ্র, অসম্ভব নয়, হতেও পাবে। তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই সঠিক বলা যায় না। তবে আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন আমাদের কাছে অভিযোগ এলে এ্যাক্‌শন না নিয়ে কোন উপায় থাকে না। বুঝলেন মিঃ তরফদার, আমরা তো হচ্ছি গিয়ে শাঁখের করাত। এ্যাক্‌শন নিলেও দোষ, না নিলেও দোষ।

কথাটা শেষ করে রুদ্র হেসে উঠলেও পরীক্ষিতের মুখে কিন্তু হাসি ফুটে ওঠে না, কিম্বা ফুটে উঠলেও তা' এতই সামান্য যে সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না।

পরীক্ষিৎ বললেন, যাক্ ওসব কথা, বিষয়টির গায়ে যখন রাজনৈতিক রঙ লেগে রয়েছে তখন আমরাও এর বিরুদ্ধে এ্যাক্‌শন নেব রাজনৈতিক ভাবেই। সে যা হয় পরে হবে। কিন্তু আমাদের দু'জন একনিষ্ঠ ওয়ার্কার যে একটা মিথ্যে অভিযোগের ফলে সারারাত হাজতে বসে ছট্‌ফট্ করবে তাও সহ্য হয় না। কাজেই দয়া করে ওদের জামিনে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, মিঃ ভট্টচায।

একটু সময় চিন্তা করে রুদ্র বললে, দেখুন মিঃ তরফদার, আড়াই হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে রয়েছে তাদের জামিন দেওয়া তো সম্ভব নয়। আপনারা বরঞ্চ কাল কোর্টে গিয়ে জামিন করিয়ে নেবেন।

রুদ্র কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষিৎ বলে ওঠেন, এসব আপনি কি বলছেন, মিঃ ভট্টচায? মিথ্যে রাজনৈতিক কারণে দুটো ছেলেকে আপনারা সারারাত গারদে রাখতে চান?

মৃদু হেসে রুদ্র বললে, মিথ্যে কি সত্যি, রাজনৈতিক রঙ লাগানো কিম্বা

সোজাসুজি ছিনতাই সে সম্পর্কে আমরা কিন্তু এখনও নিঃসন্দেহ হই নি, মিঃ তরফদার। তা'ছাড়া রবারি কেসে থানা থেকে জামিনও হয় না। আর আপনি যা-ই বলুন না কেন, ঐ দুটো ছেলে ঐ এলাকায় কুখ্যাত মস্তান বলেই পরিচিত। এর আগেও ওদের দু'একবার জেল হয়েছে।

—বিপরীত ক্যাম্পের লোকেরা সর্বদা তা-ই প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। ওসব কথা নিয়ে অবশ্য আপনার সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছে আমার নেই, মিঃ ভট্টচায। আপনি বলুন, আমি নিজে যদি ওদের হয়ে জামিন দাঁড়াই তাহলে কি আপনারা ওদের ছেড়ে দিতে পারেন ?

—আই এ্যাম সরি, মিঃ তরফদার। রবারি কেসের আসামীকে আমরা কিছুতেই থানা থেকে জামিন দিতে পারি না। এটা আইন-বিরুদ্ধ কাজ।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে গুম হয়ে বসে থাকেন পরীক্ষিৎ। তারপর হঠাৎ তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, এত রাতে কলকাতায় টেলিফোন করে কাউকে পাবো বলে মনে হয় না। তবে তা' যদি সম্ভব হতো তা'হলে কর্তৃপক্ষের হুকুমে এই মুহূর্তে ওদের ছেড়ে দিতে আপনারা বাধ্য হতেন। কথাটা শেষ করেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান পরীক্ষিৎ।

রুদ্রও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাসতে বৃথা চেষ্টা করে বললে, হুকুমের চাকর আমরা। কর্তৃপক্ষের হুকুমমত কাজ করতে আমরা বাধ্য। কিন্তু নিজে থেকে ওদের জামিনে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব, মিঃ তরফদার।

পরীক্ষিৎ আর কিছু না বলে এমনকি কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

বাইরে জিপের গর্জন মিলিয়ে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে ওঠে রুদ্রর। আশ্চর্য এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মধারা! দু'জন ছিনতাইবাজ মস্তানের জন্যে জনগণের নির্বাচিত একজন এ্যাসেমব্লি মেম্বার এ ধরনের ছুটোছুটি করতে মোটেই লজ্জাবোধ করে না। এ দেশের ক্ষেত্রে এ যুগটাই মস্তানের যুগ। সেকালের জমিদারেরা লেঠেল পুষতো, আর সেই লেঠেলদের সাহায্যেই জমিদারি রক্ষার নামে যতকিছু কুকর্ম করে বেড়াতো। একালের দেশ-নেতারা অনেকেই মস্তান পোষেন রাজনৈতিক সুপ্রিমেসি বজায় রাখার নামে, আর সেই মস্তান বাহিনীর বিরাট খরচ-খরচা জোগাড় হয় শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে। ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙা, চোলাই মদের ব্যবসা, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় থেকে শুরু করে মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা পর্যন্ত সব কাজেই জড়িয়ে থাকে এই মস্তান বাহিনী। আর এদের অধিকাংশেরই খুঁটির জোর কোন না কোন রাজনৈতিক

নেতা। পুলিশও এদের ঘাঁটায় না কিম্বা ঘাঁটাতে সাহস করে না। তা'ছাড়া ওদের মাধ্যমে যখন টু-পাইস হাতে আসে তখন ঝঞ্ঝাটে গিয়ে লাভ কি?

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢুকবার আগেও এসব কথা যে রুদ্র জানতো না তা নয়। তবে তখন কেবল শুনেই ছিল। বড় জোর পত্র-পত্রিকায় কখনো-সখনো চোখে পড়তো। ডিপার্টমেণ্টে ঢোকার পর থেকে এসব সে নিয়মিত প্রত্যক্ষ করছে। যতই দেখছে ততই হতাশ হয়ে উঠছে সে। শিউরে উঠছে পরিণতির কথা ভেবে। মনে মনে ভাবে, এককালে আমাদের দেশে জ্ঞানী, গুণীর আসন ছিল সমাজের প্রথম সারিতে। সেই সারি যখন দখল করে নিয়েছে রাজনৈতিক নেতারা তখন তো এরকম একটা অবস্থা অবধারিত। গুণ কিছু থাক চাই না থাক, দল থাকলেই যেখানে নেতা হওয়া যায় সেখানে এরকমটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

পরীক্ষিৎ তরফদার চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে একইভাবে বসে থাকে রুদ্র। ভাবতে থাকে, গোটা সমাজেরই যখন এমনি একটা অবস্থা তখন একমাত্র পুলিশের কাছেই সততা কেমন করে আশা করা যায়? দেশের মানুষকে যাঁরা লীড করেন সেই লীডারদের অধিকাংশেরই নৈতিক চরিত্রের মান যখন প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে তখন একটা জেলার পুলিশ বাহিনীকে যিনি লীড্ করেন সেই এস-পি'র নৈতিক চরিত্রের মান উঁচু থাকবে এটা কেমন করে আশা করা যায়? আর, যেখানে সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষরা অসৎ সেখানে একমাত্র মূর্খ ই আশা করতে পারে যে সাধারণ সৈনিকেরা সততার জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করবে। গোটা ব্যাপারটাই যে একটা চেন্-রিঅ্যাক্‌শনের মত। দেশের কর্ণধারেরা যে এটা বোঝেন না তা' নয়। কিন্তু বীজ আগে না ফল আগে, এই সমস্যার সমাধান এই দীর্ঘদিনেও করতে পারেন নি বলেই তাঁরা বুঝতে পারছেন না কোত্থেকে ঝাঁট দিতে শুরু করবেন। তা'ছাড়া, ঝাঁট দিয়ে আবর্জনার স্তূপ কোথায় ফেলবেন সেটাও তাঁদের কাছে একটা মস্ত সমস্যা। তাই দাবার ঘুঁটিকে ঘর বদল করিয়েই তাঁরা কেবল খুশি। এর বেশি কিছু করার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁদেরও নেই। তা'হলে যে নিজেদেরই ঘর বদলের সম্ভাবনা।

ভাবতে থাকে রুদ্র, দেবীপুরাণে দেবী দুর্গার সৃষ্টির বর্ণনা আছে। স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রত্যেকেরই সামান্য অংশ নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁকে। দেবতাদের গুণের সমষ্টিই হলেন সেই মহাশক্তি দুর্গা। কিন্তু অসুরের সৃষ্টি হয়েছিল কাদের দোষের সমষ্টি দিয়ে তার কথা কোথাও লেখা নেই।

তবে, যে অসুর এদেশের সমাজ-জীবনকে অপ্রতিহত গতিতে তছনছ কং শ্মশানে পরিণত করে দিতে চলেছে তার সৃষ্টির রহস্যের সমাধান যেন স্পষ্ট ফুট উঠেছে রুদ্রর চোখের সামনে। নৈতিকতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত একদ রাজনৈতিক নেতার শক্তি দিয়ে গড়ে উঠেছে সেই অসুরের মস্তিষ্ক, সমাজ বিরোধী ক্রিমিন্যালের শক্তি দিয়ে তৈরি হয়েছে তার মানসিক গঠন, আ পুলিশের শক্তিতে সে পেয়েছে তার শারীরিক বল। এই তিনের ত্র্যহস্পর্শে গোটা দেশেব সমাজ-জীবন আজ কলুষিত।

এতদিনে সত্যিকারের সংসারী হয়ে উঠলো রুদ্রদেব। গৃহিণীর আগমন গৃহাঙ্গন যেমন তার পূর্ণ হয়ে উঠলো তেমনি মনের অঙ্গনও তার ভরে উঠলে ফলে-ফুলে। চাকরি-জীবনেব হতাশাটুকু সে সারিয়ে তুলতে চায় নবনীতা প্রেমের ছোঁয়ায়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এস-ডি-পি-ও হিসেবে তার কা কর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। যে তাকে তেম একটা পছন্দ করে না সেও স্বীকার করে যে আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদে ভট্টাচার্য কেবল বুদ্ধিমানই নয়, অসাধারণ তার কর্মকুশলতা। জেলার পুলি সাহেব দিবাকর সেনেরও তাই অভিমত। মহকুমার দায়িত্ব রুদ্রদেবের ওপ ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। রুদ্রদেবের অফিস ইন্সপেকশন করে রাজ্যের খো ইন্সপেক্টর জেনারেলও সেই মনোভাবই বয়ে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি এস-পি দিবাকর সেনকে একান্তে ডেকে বললেন, ওয়েল দিবাকর, আ থিঙ্ক ইওর এস-ডি-পি-ও ইজ এ্যান এ্যাসেট অফ ইওর ডিস্ট্রিক্ট।

বিনীত স্বরে দিবাকর বললেন, ইয়েস স্যার।

আই-জি আবার বললেন, ওখানকার সেই জোড়া খুনের তদন্তকে যেভাবে গাইড করে নিয়ে গেছে তা বাস্তবিকই মার্ভেলাস। ভেবেছি, তদ গাইড করার একটা এক্জাম্পল হিসেবে ওটা পুলিশ গেজেটে ছাপিয়ে দেব এভ্রি বডি শুড নো ইট—ফলো ইট।

জবাব দেন দিবাকর, হ্যাঁ স্যার, এই অল্প সময়ের মধ্যেই ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম বেশ ভালোভাবে রপ্ত করে ফেলেছে।

—ইয়েস-ইয়েস, এ ইয়ং ম্যান অফ ব্রাইট ফিউচার। রুদ্র সম্পর্কে এই কথা ক'টিই যাবার সময় বলে গেলেন আই-জি।

আই-জি'র এই মন্তব্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়তেও বেশি সময় লাগলো না। পুলিশ সাহেব দিবাকর সেন তো একদিন বলেই ফেললেন, আপনি সত্যিই লাকি মিঃ ভট্চায। আই-জি'র মত খুঁতখুঁতে মানুষের মুখ থেকে এমন সার্টিফিকেট বড় একটা কেউ পায় না। আপনার উচিত আমাদের খাওয়ানো।

এস-পি'র পাশে সেই সময় বসেছিলেন এডিশনাল এস-পি। পুলিশ সাহেবের কথায় তিনিও হেসে সায় দেন।

লাজুক হাসি হেসে রুদ্র বললে, অল্ রাইট স্যার। কি খেতে চান বলুন, আনিয়ে দিচ্ছি।

আপাততঃ এক কাপ চা হলেই চলবে। এস-পি দিবাকর সেনের কথায় একটা হাসির রোল পড়ে সেখানে।

সংসারে এমন একদল লোক থাকে যারা নিজেরা কেবল অসৎ প্রকৃতিরই নয়, অন্যের সততাও তারা সহ্য করতে পারে না। ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দী তেমনি একজন অফিসার। মেজবাবু অসিত মুখার্জীর প্রতি তার মনোভাবই তার প্রমাণ। পুলিশ সাহেব দিবাকর সেনের প্রকৃতি কিন্তু তেমন নয়। নিজে সততার ধার না ধারলেও সৎ অফিসারকে কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা করেন তিনি।

কর্মদক্ষ অফিসার হিসেবে নিজের সুনাম চারিদিকে যতই ছড়িয়ে পড়ুক না কেন, মনের অশান্তি কিছুতেই ঘোচে না রুদ্রর। যে মন নিয়ে একদিন সে এই ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছিল সেই মন আর নেই। কর্মজীবনে সেই মন অভিজ্ঞতার রোদের তাপে সবে পোড় খেতে শুরু করেছে। তবুও কিন্তু প্রথমদিনের সেই আকাঙ্খাটি এখনও রয়েছে অমলিন হয়ে। পুলিশের মানসিকতার সঠিক খবরটি জোগাড় করতে হবে তাকে। বুঝতে হবে ওদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিযোগ, জানতে হবে ওদের দীনতা-হীনতা, অনাচার-অত্যাচার, অনুভব করতে হবে ওদের সেই বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি যার প্রভাবে ওরা নিজেদের নিয়ে তৈরি করেছে এক বিশেষ গোষ্ঠী। কিন্তু এই জানা, বোঝা ও অনুভবের পাকে-চক্রে পড়ে এই অল্পদিনেই যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে তার। নিজের সেই আকাঙ্খাকে জীইয়ে রাখাই যে কঠিন হয়ে উঠেছে। সময় সময় সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। মনের এই অশান্তি মনের মধ্যেই চেপে রেখে সে নিজের কাজ করে চলছিল এতদিন। নবনীতার আগমনে যেন সেই অশান্ত মনে সামান্য একটু প্রশান্তির প্রলেপ অনুভব করে রুদ্র। নবনীতা যেন একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে

একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস যা নাকি তাকে নবীন জীবন-রসের সন্ধান দেবে। নবনীতার প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার শীতল জল তার প্রতিদিনের পুলিশী জীবনের মালিন্যকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে তাকে সাহায্য করবে। নবনীতা তো কেবল তার স্ত্রী নয়, সে যে তার সহধর্মিনী।

বিয়ের মাস তিনেক পরে নবনীতা যেদিন প্রথম এখানে এলো সেদিন রুদ্রর এই অফিস-কাম-রেসিডেন্স দেখে একটু যেন হতাশ হয়েছিল সে। থাকার জন্যে উপরে মাত্র দু'খানি ছোট ছোট ঘর। তার সঙ্গে একফালি বারান্দা। অবশ্যি এতেও বোধহয় নবনীতার তেমন একটা আপত্তি হতো না যদি না এই বাড়িটির প্রায় সঙ্গেই ঐ নোংরা বস্তিটা থাকতো। বড়লোকের একমাত্র আদুরে কন্যা নবনীতার মনের কথা চেপে রাখার অভ্যেস কোন কালেই ছিল না। তাই সে রুদ্রকে বলেই ফেললে, এ কোথায় তুমি এনে তুললে আমাকে? এখানে কেউ থাকতে পারে নাকি?

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে রুদ্র জিজ্ঞেস করে, কেন, কি হয়েছে?

ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় নবনীতা, এই বস্তির মধ্যে থাকতে হবে আমাকে?

একটু যেন আহত হয় রুদ্র। নবনীতা কি এর চাইতে বেশি কিছু আশা করেছিল? নিজের মনের ভাব চেপে রেখে সে জবাব দেয়, বস্তির মধ্যে কোথায়? এ তো সবকারী দোতলা ভাড়া বাড়ি। এই বাড়িতেই তো বরাবর এস-ডি-পি-ও'রা থেকে আসছে।

—আশ্চর্য! কথাটা বলেই চুপ করে থাকে নবনীতা।

রুদ্র আবার বললে, নতুন জায়গা তো। প্রথম প্রথম তোমার হয়তো একটু অসুবিধে হবে। কিছুদিন থাকলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু বাঁকা হাসি হেসে নবনীতা বললো, সব হয়তো ঠিক হয়ে যাবে, কেবল আমি নিজেই বেঠিক হয়ে পড়বো। লক্ষ্য করে দেখেছো চারিদিকে কি ধুলো-ময়লা?

ম্লান হেসে রুদ্র বললে, মফঃস্বল সহর। এর চাইতে আর কি ভালো হবে? কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলকে তো তুমি আর এখানে আশা করতে পারো না।

রুদ্র যদিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বোঝাতেই বালিগঞ্জের উল্লেখ করেছিল, কিন্তু নবনীতার বাপের বাড়ি যে বালিগঞ্জে এবং এক্ষেত্রে নবনীতা যে কথাটার অন্য একটা অর্থ করতে পারে, তা' কিন্তু সেই মুহূর্তে রুদ্র ঠিক বুঝতে পারে নি।

রুদ্রর কথায় নবনীতা কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর সহজভাবে বললে, আমি কি সেকথা বলেছি? আমি বলেছি মফঃস্বল সহর হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে আপত্তি কি?

— আপত্তি অবশ্যি নেই, বলতে থাকে রুদ্র, তবে তোমার এই প্রশ্নের জবাব আমার চাইতে এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানই ভালো দিতে পারবেন।

কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড বীরবাহাদুরের সহায়তায় রুদ্রর ছোট্ট সংসার মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। বীরবাহাদুরই বাজারহাট করে, ফাই-ফরমাস খাটে, আবার রান্না-বান্নাও করে। সারা সপ্তাহে একমাত্র রবিবারেই রুদ্র নিজে বাজারে যায় বীরবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে।

সত্যি বলতে কি, নবনীতা ধারণাই করতে পারে না যে একজন আই-পি-এস অফিসার যে নাকি একটা মহকুমার পুলিশ বাহিনীর অধিকর্তা, তার অফিস ও কোয়ার্টারের চারিদিকে এমন একটা নোংরা পরিবেশ থাকতে পারে। আসলে মফঃস্বল সহর সম্পর্কে নবনীতার তেমন কোন ধারণাই কোনকালে ছিল না। সহর কলিকাতার অভিজাত পাড়ায় তার জন্ম, সেখানেই মানুষ। মাঝে মধ্যে প্লেনে কিম্বা রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীতে চেপে ভ্রমণ ভারতের শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় সহরগুলোতে কিম্বা দার্জিলিং, সিমলা, উটকামণ্ড প্রভৃতি শৈলাবাসে।

সরকারের ভাড়া নেওয়া এই বাড়িটা দোতলা হলেও পুরানো আমলের। সামনে একফালি উঠোন। তার একদিকে একটা ভাঙ্গা পরিত্যক্ত গ্যারেজ, আর তার ঠিক সামনে দিয়েই চলে গেছে বাড়ির নর্দমা। বাড়িটা যদিও দেওয়াল ঘেরা কিন্তু কোন্ বিশেষ কারণে যে বাড়ির মালিক দক্ষিণের দেওয়ালটা প্রায় জেল-খানার সমান উঁচু করে আলো হাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন তা' বোঝা একান্তই শক্ত। পূবদিকের দেওয়ালে ছোট একটি গেট, তার সামনেই বড় রাস্তা। আর পশ্চিমদিকেই রয়েছে সেই বস্তি সকাল সন্ধ্যায় যার ধোঁয়া নিয়মিত এসে গোটা বাড়িটাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলে। এ যেন ঈর্ষা-কাতর বস্তির পাকা বাড়িটাকে বিপাকে ফেলার মতলব।

বাসস্থানের চারিদিকে এমন একটা পরিবেশ নবনীতার একান্তই অপরিচিত। কাজেই দশ পনেরো দিনের মধ্যেই সে এখানে হাঁপিয়ে ওঠে। তা'ছাড়া রাত-দিন বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার মত একঘেয়ে জীবনেও সে অনভ্যস্ত। বিয়ের আগে তার ছিল প্রচুর স্বাধীনতা। অর্থের প্রাচুর্যের মাঝে সেই স্বাধীনতাকে সে পুরোপুরি ভোগ করেছে। নিয়মিত টেনিস খেলতো, পার্টিতে যেত, বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে নিজে ড্রাইভ করে ডায়মণ্ডহারবার কিম্বা অন্য কোথাও যেত পিকনিক করতে।

রুদ্র কিন্তু বুঝতে পারতো যে এই পরিবেশে থাকতে নবনীতার খুব কষ্ট-

হচ্ছে। কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজে পেত না। মনে মনে ভাবতো, উঁচু মহলে লেখালেখি করে এই বাড়িটার কিছু কিছু সংস্কার হয়তো সে করাতে পারে, কিন্তু এখানকার এই পরিবেশ সে পাল্টাবে কেমন করে?

রুদ্র যেদিন নাইট-রাউণ্ডে বেরোত সেদিনটাই সব'চাইতে খারাপ লাগতো নবনীতার। বাড়িতে একা থাকতে হতো তাকে। যদিও সে জানতো এক তলায় পুলিশ গার্ড আছে, আর দোতলায় সিঁড়ির পাশে শুয়ে আছে বীরবাহাদুর তবুও সেদিন দু'চোখের পাতা এক করতে পারতো না নবনীতা। কেমন যেন একটা গা ছম-ছম অনুভূতির মধ্যে বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকতো। শুয়ে শুয়ে রাতভর বস্তির কুকুরের ডাক কিম্বা রাস্তায় কোন মাতালের প্রলাপ শুনতো। শুনতে শুনতে বিরক্তিতে ভরে যেত তার মন। নিদ্রাহীনতার অবসাদ নিয়ে ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেও কিন্তু বিরক্তিটুকু ঝেড়ে ফেলতে পারতো না। উল্টে তা' তার মনখানাকে যেন আষ্টেপৃষ্টে আরও জড়িয়ে ধরতো। সারারাত জেগে নাইট রাউণ্ড সেরে বাড়ী ফিরে নবনীতার গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে একটা অস্বস্তি অনুভব করতো রুদ্র। একই টেবিলে নবনীতার সঙ্গে পাশাপাশি বসে চা খেতে খেতে রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলতো তাকে। হালকা কথায় নবনীতাকে হাসাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু নবনীতা কিছুতেই হাসতো না। সীমাহীন বিরক্তির মধ্যে যে ডুবে রয়েছে তার মুখে হাসি ফুটবে কেমন করে?

একদিন আর নিজেকে সামলাতে না পেরে নবনীতা বলেই ফেললে, আগে জানলে বাবা বোধহয় এখানে আমার বিয়েই দিতেন না। স্ত্রীর মুখে এ ধরনের কথা কেবল শ্রুতিকটুই নয়, যে-কোন স্বামীর পক্ষেই অপমানজনক। কিন্তু নবনীতার মনটাকে হালকা করে তুলবার বাসনায় কথাটা গায়ে না মেখে রুদ্র হেসে জবাব দেয়, বেশ তো, ফিরিয়ে নাও না।

—পারলে বোধহয় বাবা তাই করতেন। সেদিন ঘণ্টাখানেকের জন্যে এখানে এসে সবকিছু দেখেশুনে কেমন যেন একটা অনুতাপের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে যা নাকি আমার চোখ এড়ায় নি। কথাটা শেষ করে ঠক্ করে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে নবনীতা।

সত্যিই তাই। সপ্তাহখানেক আগে সুবীর ঘোষাল নিজের গাড়ি নিয়ে মেয়েকে দেখতে কলকাতা থেকে সোজা এখানে এসেছিলেন। বাড়িতে ঢুকে নবনীতার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলেন তিনি, এই ক'টা দিনে এ কি চেহারা হয়েছে তোর? তাঁর কথার মধ্যে বিস্ময় যেন ফেটে পড়ছিল। রুদ্র

তখন বাড়ি ছিল না। থাকলে বোধহয় মনে দারুণ আঘাত পেত। সুবীর কলকাতায় ফিরে যাবার কয়েক মিনিট মাত্র আগে রুদ্র এসে হাজির হয়েছিল। সুবীর একটু ম্লান হাসি হেসে জামাতাকে কেবল বলেছিলেন, নবুর দিকে একটু নজর রেখো বাবা, ওর ভালো-মন্দ তো এখন তোমার হাতে।

নবনীতার কথাটা কিন্তু এবার গায়ে না মেখে পারে না রুদ্র। নবনীতার নিজের কথা হলে বোধহয় এবারেও সে সেটাকে হালকাভাবেই গ্রহণ করতো। কিন্তু সুবীর ঘোষালের অনুশোচনা করাব মত খবরটা তারই মেয়ের মুখে শুনে মনে ভয়ানক আঘাত পেল সে। আহত কণ্ঠে সে বললে, আমরা তো তোমাদের কাছে কিছুই গোপন করি নি, নীতা। সবকিছু জেনে-শুনেই তো তোমার বাবা এখানে তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর অনুশোচনা করার স্কোপ কোথায়?

—হ্যাঁ, তা ঠিক, বলতে থাকে নবনীতা, বাবার বরাবরই একটু খুঁতখুঁতি ছিল, কিন্তু তাঁর এক দূর সম্পর্কীয় কাকা যিনি নাকি এককালে তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে ডি-আই-জি ছিলেন, তাঁব কথাতেই বাবা শেষ পর্যন্ত খুঁতখুঁতিটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাজি হয়েছিলেন।

রুদ্র এইসময় হঠাৎ প্রশ্ন করে, বিয়ের আগে তোমার বাবা তোমার নিজের কোন সম্মতি নেন নি?

একটু সময় চুপ করে থাকে নবনীতা। দেখতে দেখতে তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে একটা বেদনার ছায়া। মাত্র তিনটি বছর আগে তার জীবনে যা ঘটেছিল সে খবর তো রুদ্র জানে না। জানবেও না বোধহয় কোনদিন। আর জানে না বলেই সে আজ তাকে এই প্রশ্ন করছে।

নবনীতার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সেদিন জানতো যে সুবীরের ঘনিষ্ট বন্ধুব ছেলে অনিমেষই নবনীতার জীবনে একমাত্র পুরুষ। তার কুমারী মনখানি সে বাঁধা দিয়ে রেখেছে তারই কাছে। কৃতী ছাত্র অনিমেষের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই উজ্জ্বল। সময়মত একমাত্র কন্যাকে অনিমেষেব হাতে তুলে দিতে সুবীর নিজেও ছিলেন উৎসাহী। নবনীতা তখন পার্ট ওয়ানের ছাত্রী। হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত। লরীর চাকার তলায় অনিমেষের নতুন স্কুটারখানা ভেঙে দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে আরোহীও। অকালে ঝরে পড়লো একটি সম্ভাবনাময় জীবন।

নবনীতা প্রথম কিছুদিন কাঁদলো, মাসখানেক নিজেকে আটকে রাখলো বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে। অবশেষে সে আবার যেতে শুরু করলো কলেজে।

সময়ের ব্যবধান ভুলিয়ে দিলে তার নারী-জীবনের দুঃখ। তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো যে সে আর কোনদিন বিয়ে করবে না।

মেয়ে যতই কেন না প্রতিজ্ঞা করুক, মা-বাবা মেয়েকে সংসারী না করিয়ে শান্তি পায় না। নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে থাকতে পারলো না নবনীতা। মা-বাবাকে বললো, নিজের ইচ্ছেয় আর নয়। তোমরা দেখে-শুনে যেখানে আমার বিয়ে দেবে সেখানেই আমি রাজি।

রুদ্রর প্রশ্নে নবনীতা ছোট্ট একটা নিশ্বাস চেপে বললে, এখন আর ওসব প্রশ্ন তুলে লাভ কি বলো? যাক্ গে ওসব কথা। তুমি কি এখন নীচে যাবে?

স্বাভাবিক কণ্ঠে রুদ্র বললে, হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক অফিসে কাজ করবো। তারপর পোশাক পরে গভর্নরের ডিউটিতে যেতে হবে।

—গভর্নর আসবেন নাকি? জিজ্ঞেস করে নবনীতা।

জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ, বেলা দশটায় এখানে একটা মেয়েদের স্কুল ওপেন করতে আসবেন তিনি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি। শুরুতে ভয়ানক হলেও লঘুক্রিয়ায় তার শেষ। রুদ্রর চরিত্রই এমনি। নবনীতার কথায় মনে যে ব্যথাটুকু সে পেয়েছিল তা' থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় মনে মনে সে ছটফট করছিল। ব্যথার নিরাময়ই সে কামনা করেছিল। নবনীতার বেদনাতুর কণ্ঠস্বর সেই সুযোগ এনে দিলে তাকে। এই বিয়েতে নবনীতার নিজের মত ছিল কিনা, কিংবা থাকলেও কতটা ছিল এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর আর প্রয়োজন রইলো না তার। তাই নবনীতার পরবর্তী স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব সে স্বাভাবিক ভাবেই দিয়ে ব্যথার নিরাময় করতে চাইলে।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে একদিন দুপুরে রুদ্র নবনীতাকে বললে, আই ফিল্ ফর ইউ, নীতা। বুঝতে পারছি এখানে একা একা তোমার খুব বোরিং লাগছে। মাঝে মধ্যে তো মিঃ ব্যানার্জীর ওখানে গেলেও পারো। মিসেস ব্যানার্জী তো সেদিন কত করে তোমাকে যেতে বলে গেলেন।

মিঃ ব্যানার্জী অর্থাৎ সমর ব্যানার্জী এখানকার এস-ডি-ও। রুদ্রর চাইতে বয়সে কিছু বড় হলেও অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। মিসেস ব্যানার্জীও বেশ হাসিখুশি। সমর ব্যানার্জী স্টেট সার্ভিসের লোক। সবে এস-ডি-ও'র চার্জ পেয়েছেন। এঁদের সরকারী কোয়ার্টারও কাছাকাছি।

রুদ্রর কথায় নবনীতা মুখে কিছু না বলে নিজের পাতলা ঠোঁট দু'খানি চেপে

এমন একটা ভঙ্গি করে যার সঠিক অর্থ সেই মুহূর্তে ধরতে না পেরে রুদ্র কেবল তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। পরে আর একদিন মিসেস ব্যানার্জীর প্রসঙ্গ উঠতেই নবনীতা বলে ওঠে, মিশতে বললেই কি যার-তার সঙ্গে মেশা যায় ?

নবনীতার মনের আসল কথাটি বুঝতে চেষ্টা করে রুদ্র একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর বললে, যার-তার বলছো কাকে ? এখানকার এস ডি-ও'র স্ত্রী কি মেলামেশা করার পক্ষে উপযুক্ত নয় ?

ঠোঁট চেপে মৃদু হেসে জবাব দেয় নবনীতা, হয়তো উপযুক্ত, কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

—তার মানে ? বাইরে থেকে দেখে মহিলাকে তো বেশ ভালো বলেই মনে হলো। তবে, তোমাদের মেয়েদের চোখ। তোমরা তার মধ্যে আবার কি আবিষ্কার করে বসলে তা তোমরাই জানো।

—কিছুই তেমন আবিষ্কার করি নি। ভদ্রমহিলা সেদিন আমাদের এখানে যতটুকু সময় ছিলেন তার প্রায় সবটুকু সময়ই তিনি খরচ করেছিলেন শাড়ি গয়না ও সংসারের কথা বলে। মনে হলো মহিলাটি বোধহয় তেমন একটা লেখাপড়াও জানেন না।

—ও, তাই নাকি ? বলে ওঠে রুদ্র, তা' হয়তো হবে। এম-এ পড়তে পড়তে তোমার বিয়ে হয়েছে আর ঐ মহিলা হয়তো স্কুলফাইন্যালের গণ্ডিই পার হতে পারেন নি। কিন্তু বুঝতে পারছি না তাই বলে মেলামেশা করতে আপত্তি কোথায়।

জবাব দেয় নবনীতা, ভুল করছো তুমি। আপত্তি লেখাপড়ার ব্যাপারে নয়, আপত্তি মনের ব্যাপারে। দৃষ্টিভঙ্গির মিল না হলে কি মেলামেশা করতে ভালো লাগে ?

একদিন কিন্তু নবনীতা নিজে থেকেই এসে রুদ্রকে বললে, আজ ভাবছি তোমাদের এস-ডি-ও সাহেবের গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

খুশি হয়ে রুদ্র জবাব দেয়, বেশ তো, যাও না।

—তোমার জিপ গাড়িটা কি একবার পাওয়া যাবে ? জিজ্ঞেস করে নবনীতা। সঙ্গে সঙ্গে আবার বললে, না-না, ভয় নেই তোমার। আমি নিজে ড্রাইভ করবো না। তোমার ড্রাইভারই চালিয়ে নিয়ে যাবে।

রুদ্র সহসা কোন জবাব দেয় না। নবনীতা বললে, ও-কি, চুপ করে রইলে কেন !

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্র, তুমি বরঞ্চ একটা রিক্সা করেই চলে যাও।

—কেন, কোথাও বেরোবে নাকি তুমি?

আবার একটু সময় চুপ করে থাকে রুদ্র। তারপর শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, দেখ নীতা, আমি যদিও এখন কোথাও বেবোব না, কিন্তু সরকারী গাড়ি চেপে তুমি কোথাও বেড়াতে যাও তা-ও আমি ঠিক পছন্দ করি না।

নীচের ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরে কয়েক মুহূর্ত সেখানেই স্থির হয়ে থাকে নবনীতা। তারপর কণ্ঠস্বরে একটু শ্লেষের সুর মিলিয়ে বলে ওঠে, তোমাব সরকারী গাড়িতে আমি চেপেছি শুনলে তোমাদের পুলিশ সাহেব রাগ করবেন বুঝি?

নবনীতার শ্লেষটুকু গায়ে না মেখে শান্ত কণ্ঠে রুদ্র জবাব দেয়, না, তা নয়। পুলিশ সাহেবের রাগের প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নিজে এসবে অভ্যস্ত। শুনেছি তাঁর খাস অর্ডারলি নাকি সবকাবী তেল পুড়িয়ে সাহেবেব বাজাব পর্যন্ত করে থাকে।

—তবে? রুদ্রর চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে থাকে নবনীতা।

জবাব দেয় রুদ্র, রাগ করবে আমার বিবেক। বিশ্বাস করো নবনীতা নিজেব বিবেককে আমি দারুণ ভয় করে চলি। ওর দংশন আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। তাই বলছিলাম, রাস্তায় তো কতই রিক্সা রয়েছে। ওর একটায় চেপেই চলে যাও না।

নিজেকে আর সামলাতে না পেবে এবার তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুর ঝলকে ওঠে নবনীতার কণ্ঠে, যাক বাঁচা গেল। তবুও যে বলো নি এইটুকু পথ পায়ে হেঁটেই চলে যাও।

নবনীতার শ্লেষের আঘাতে মনটা সেই মুহূর্তে টনটন করে ওঠে রুদ্রর। খানিকক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারে না। এই কি তার সেই জীবন-সঙ্গিনী যার কাছ থেকে জীবন-যুদ্ধের রসদ জোগাড় করে নেবে বলে সে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে? এই কি সেই নারী যে নাকি ক্লান্ত রুদ্রদেবকে আশার বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলে তাকে তার লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে?

এতদিন পরে কেন যেন আর একটি নারীর একখানা মুখ ভেসে ওঠে রুদ্রর চোখের সামনে যে নাকি একদিন তার সেই মাঝে মধ্যে মদ খাওয়ার ব্যাপারেও কোন বাধা না দিয়ে কেবল বলেছিল—খাবার সময় কেবল আমাকে মনে করো। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে রুদ্র, তাহলে অলকাই কি ছিল তার উপযুক্ত যে নাকি নিজেকে রুদ্রর জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে পারতো?

পরক্ষণেই কিন্তু সতর্ক হয়ে ওঠে রুদ্র—না, অলকার কথা সে আর কখনও চিন্তা করবে না। ওর কথা কেবলমাত্র চিন্তা করাও অপরাধ—স্ত্রী নবনীতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। অলকা একটা স্বপ্ন—বড়জোর একটা সুখস্বপ্ন। তার বেশি কিছু নয় রুদ্রর জীবনে।

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে নবনীতা আবার বললে, কি, চুপ করে রইলে কেন?

নিজেকে ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে রুদ্র। গম্ভীর স্বরে সে এবার জবাব দেয়, তোমার হাঁটার অভ্যেস নেই বলেই রিক্সায় যেতে বলেছি। তুমি ঠিকই বলেছ নীতা, অভ্যেস থাকলে এটুকু পথ তোমাকে হেঁটে যেতেই বলতাম। এস-ডি-পি-ও'র স্ত্রী রাস্তায় হেঁটে গেলে তার নিজের কিম্বা তার স্বামীর কোনরকম সম্মান হানি হয় বলে আমি মনে করি না।

একটু থেমে রুদ্র আবার বললে, আর একটা কথা শুনে রাখো নীতা। বিয়ের আগে তোমরা হয়তো শুনেছ যে বর যখন একজন ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের লোক তখন তার বাড়িতে থাকবে গণ্ডা গণ্ডা পুলিশ কন্‌স্টেবল যারা নাকি দু'বেলা রান্না করে সাহেবকে খাইয়ে তৃপ্ত করবে, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করে মেমসাহেবকে তুষ্ট করবে, ফাই ফরমাস খেটে পরিবারের সকলের মনোরঞ্জন করবে, বাগানে ফুল ফুটিয়ে সাহেবের মেজাজ সরিফ রাখবে। সরকারী পয়সায় প্রতিপালিত কর্মচারীরা যেন সাহেবের জমিদারির প্রজা। তিনি যেন যা ইচ্ছে তা-ই করাতে পারেন এদের দিয়ে। পরিবার পরিজনের জন্যে পারেন ইচ্ছেমত সরকারী পেট্রোল খরচ করতে। বিয়ের আগে সম্ভবতঃ তোমাদের পরিবারের সবাই এমন একটা অবস্থার কথাই ভেবেছিলেন। হয়তো তোমরা আরও ভেবেছিলে যে সেই জমিদারি থেকে যে মোটা আয় হবে তার একটা বড় অংশও আসবে সাহেবের হাতে। একেবারে যে মিথ্যে ভেবেছিলে তা কিন্তু বলতে পারি না। এ দেশে কোথাও কোথাও এরকমটা এখনও যে চলছে না তা নয়। কিন্তু আমার বেলা হিসেবে একটু ভুল করেছিলে তোমরা। বিবেককে অন্য কোথাও বাঁধা রেখে চাকরি করতে আসি নি আমি। ম্যান পাওয়ারের এমন অপচয় ঘটতে দিলে নিজের সেই বিবেকের কাছেই নিজেকে দায়ি হতে হবে বলে মনে করি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নেবার জন্যে একটু থামে রুদ্র। তারপর আবার বলতে থাকে, আমি বুঝতে পারছি এখানে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। সেদিন তোমার বাবার কথায় মনে হলো, এখানে তোমার যত্নের যথেষ্ট

ত্রুটি হচ্ছে। কথাটা মিথ্যেও নয়। কিন্তু আমি নিরুপায়। এর বেশি সামর্থ্য তো আমার নেই। যদি একান্তই মনে করো যে এখানে এর মধ্যে বাস করা তোমার পক্ষে অসম্ভব তা'হলে তুমি অনায়াসেই তোমার বাবার ওখানে চলে যেতে পারো। নিজের অক্ষমতার লজ্জা নিজের কাঁধে নিয়ে একাই থাকবো আমি।

রুদ্রর কথা শুনতে শুনতে অভিমানে ভারি হয়ে উঠছিল নবনীতার মুখখানা। তার টানা টানা চোখের কোণ দু'টো চিক চিক করছিল। রুদ্র থামতেই সে বললে, তুমি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছো?

—না নীতা, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রুদ্র, আমার কথার অন্য কোন অর্থ করো না। তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলার মত স্পর্ধা আমার নেই। তোমাকে বিয়ে করে তোমার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। নিষ্ঠার সঙ্গে আমি সেই দায়িত্ব পালন করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি বিয়ের পরে স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকে নিজের অধিকারে, স্বামীর দয়ায় নয়। সেই অধিকার যখন তোমার রয়েছে তখন তোমাকে চলে যেতে বলার ক্ষমতা আমার কোথায়? কিন্তু এখানে তোমাকে এর চাইতে বেশি সুখে রাখার ক্ষমতা তো আমার নেই। আই-পি-এস হই কিম্বা যা-ই হই না কেন, কেমন করে ভুলে যাবো যে আমি একজন সরকারী কর্মচারী? সীমাবদ্ধ আয় নিয়েই যে আমাকে চলতে হবে। একটা মহকুমার পুলিশের কর্তা হিসেবে আমার ক্ষমতা হয়তো যথেষ্ট, কিন্তু সেই অনুপাতে তো আমার উপার্জন নয়। আমি জানি, তোমার বাবার অফিসের একজন সাধারণ কর্মচারীও হয়তো আমার চাইতে বেশি আয় করে। কিন্তু তা নিয়ে হা-হুতাশ করে তো কোন লাভ নেই। জেনে-শুনে চাকরি যখন নিয়েছি তখন এতেই আমাকে খুশি থেকে কাজ করতে হবে।

রুদ্রর সংসারে খরচ পত্র, হাল-চাল দেখে প্রথম থেকেই মনটা বিরূপ হয়েছিল নবনীতার। বাইরে খানিকটা নির্বিকার ভাব দেখাতে চেষ্টা করলেও দিনে দিনে ভেতরের সেই বিরূপতা বাড়ছিল বৈ কমছিল না। ধনীর দুলালী নবনীতা অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা কোনদিনই পায় নি। তার প্রয়োজনও হয় নি কখনও। রূপোর চামচ মুখে নিয়েই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। বড়ও হয়েছিল সেই ভাবেই। তা'ছাড়া এখানে আসা অবধি নিজেকে বন্দী বলেই ভাবছিল সে। এই ক'টা দিনেই নিজের সেই বন্দীত্ব অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার কাছে। ভেবে ভেবেও এ থেকে পরিত্রাণের কোন পথ সে খুঁজে পায় নি। কিন্তু রুদ্র তাকে তার বাবার কাছে চলে যাবার কথা বলতেই তার একরোখা মনটি সেই

কথাটাকেই একান্তভাবে লুফে নিলে। হ্যাঁ, সে তার বাবার কাছেই চলে যাবে। এখানে এভাবে বাস করা সম্ভব নয়। আজই সে তার বাবাকে খবর পাঠাবে।

রুদ্র থামতেই রুদ্ধ কণ্ঠে নবনীতা বললে, তোমার কথা বুঝতে আমার বাকি নেই। চলেই যাবো আমি বাবার কাছে।

দিন চারেক পরেই একদিন গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির হলেন স্থবীর ঘোষাল। পরনে সাহেবী পোশাক। মুখে চুরুট। নিজের পাতলা চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে তিনি রুদ্রকে বললেন, বারাসাতে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। নবু আপাততঃ আমার ওখানেই থাকবে। সী অলসো লাইক্‌স ইট।

রুদ্র কিন্তু একটা কথাও বলে নি। স্থবীর ঘোষাল মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। যাবার আগে নবনীতা দরজার কাছে এসে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে কেবল বলেছিল, চলি। হ্যাঁ—না, কোন জবাবই সেই মুহূর্তে দেয় নি রুদ্র। বোধহয় দিতে পারে নি। বাইরে গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কয়েক মুহূর্ত জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর বীর-বাহাদুরকে ডেকে বললে, আমার জুতো জোড়া একটু ব্রাশ করে দে। এখনই আমাকে একবার বেরোতে হবে।

—এত বেলায় না খেয়ে যাবেন? জিজ্ঞেস করে বীরবাহাদুর।

—একটা কেস স্থপারভিশনে এখনই যেতে হবে। বড় দেরী হয়ে গেছে। সময় পাই তো ফিরে এসে খাবো। তুই সময়মত খেয়ে নিস্। আমার জন্যে শুধু শুধু বসে থাকিস না।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও কিন্তু যায় না বীরবাহাদুর। একটু সময় তাকিয়ে থাকে রুদ্রর মুখের দিকে। এই ক'মাসের মধ্যেই এই লোকটির ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে তার। রাগ হয় মেমসাহেবের ওপর। সাহেবকে একা ফেলে রেখে দিব্বি চলে গেল বাপের সঙ্গে! এতই যদি হবে তা'হলে বিয়ে দেওয়া কেন? সে নিজে অবশ্যি আছে। সাহেবের কোন অস্থবিধে না হয় সেদিকে সে ঠিকই নজর রাখবে। তবুও মেমসাহেব কাছে থাকলে সাহেবের স্থবিধে অনেক। এসব জানা সত্ত্বেও মেমসাহেব চলে গেল বাপের সঙ্গে। তাদের সমাজে কিন্তু এসব চলতো না। দরজা বন্ধ করে বৌকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতো। চালাকি নাকি, বিয়ে যখন হয়েছে তখন যাই বললেই কি যাওয়া যায়?

অপরাধ – অপরাধ বলে আসমুদ্র হিমাচল যতই কেন না সোরগোল উঠুক, এদেশে অপরাধের সংখ্যা কমিয়ে আনা কি এতই সহজ? যে সমাজ-ব্যবস্থা অপরাধী সৃষ্টি করে সেই ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুলিশ বাহিনীকে নিয়োগ করেও অপরাধ দমন করা যাবে না। তবে দেশের মধ্যে যদি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায় যাতে অপরাধী বুঝতে পারে যে অপরাধ করে পার পাওয়ার সম্ভাবনা কম তা'হলে হয়তো সে নিজেকে পুরোপুরি না হলেও খানিকটা নিবৃত্ত করতে পারে। কিন্তু এদেশে তো সবই উল্টো। এদেশে অপরাধ করে পার পাওয়াটাই নিয়ম, শাস্তি পাওয়াই ব্যতিক্রম। আর এই ব্যতিক্রমের জন্যে দেশের পুলিশ বাহিনী যতটা দায়ী, অসৎ রাজনৈতিক নেতারা বোধহয় তার চাইতে বেশি দায়ী। অপরাধী মনে করে যে চাঁদির জুতো মেরে পুলিশকে হাতের মুঠোয় পুরবো, আর রাজনৈতিক দলবাজি, গোষ্ঠীবাজি ও ভোট-যুদ্ধে দাদাদের হাতিয়ার হয়ে তাদের নেক-নজরে থাকবো। কাজেই মাভৈঃ, চালাও লুঠপাট।

পাটখালি একটা ছোট থানা। এই থানা এলাকায় প্রচুর ধান জন্মে। কাজেই, স্বাভাবিক নিয়মে গোটা কয়েক বড় চালকল আছে এখানে। এখানকার সবচাইতে বড় চালকল দুটোর মালিক বিনোদ পাল ও জগৎ সরকার। প্রচুর পয়সা-কড়ির মালিক ওরা। সেই সূত্রে এলাকায় প্রতিপত্তিও তাদের যথেষ্ট।

অফিসে বসে কাগজপত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ একখানা কাগজের দিকে নজর পড়ে রুদ্রর। কাগজখানা পাঠিয়েছে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার। জেলার এস-পি'র হাতে ঘুরে কাগজখানা এসেছে রুদ্রর কাছে। তাতে রয়েছে ঐ বিনোদ পাল ও জগৎ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ। সরকারী নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরকারী লেভি ফাঁকি দিয়েছে তারা। কাজেই ওদের বিরুদ্ধে পুলিশ এ্যাক্‌শন প্রয়োজন।

সাধারণতঃ এসব কাজ জেলার এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের আওতায়, যার কর্তা জেলার এস-পি স্বয়ং। রুদ্র বুঝতে পারে না, এমন একটা কাগজ সেই এনফোর্স-মেণ্টকে না দিয়ে পুলিশ সাহেব দিবাকর সেন তার কাছে পাঠালেন কেন? তবে

কি এর মধ্যে কোন চাতুরি আছে? দিবাকর সেন মুখে যতই মিষ্টি হোন না কেন, মানুষটি যে তেমন সহজ নয় তা' এতদিনে টের পেয়েছে রুদ্র।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই রুদ্রর কাছে রহস্যের সমাধান হয়ে যায়। দিবাকর সেন পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি ছুঁড়তে চাইছেন। তিনি ভালই জানেন বিনোদ পাল ও জগৎ সরকারের প্রতিপত্তি কেবল ঐ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, কলকাতার রাজনৈতিক উঁচু মহলেও তা প্রসারিত। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেণ্টকে দিয়ে এ্যাক্‌শন নেওয়ালে তার দায়-দায়িত্ব সরাসরি এসে তাঁর ঘাড়েই পড়বে। এদিকে এই কাগজের ওপর এ্যাক্‌শন না নেওয়ালেও নয়। কাজেই তিনি এটা শেষ পর্যন্ত রুদ্রর ঘাড়ে ফেললেন।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই নিজের মনে একটু হাসে রুদ্র। একবার মনে হয়, টেলিফোন তুলে এস-পি'র সঙ্গে একটু কথা বলে। পরক্ষণেই কি মনে করে নিরস্ত করে নিজেকে—না, দরকার নেই। দায়িত্ব যখন তিনি তার ঘাড়ের ওপরই চাপিয়েছেন তখন নিজের বিবেচনার ওপরই বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া ভালো।

রুদ্র কাগজটার ওপর ঐ এলাকার সার্কেল ইন্সপেক্টরের নাম লিখে তাকে নির্দেশ দেয় যে পাটখালি থানায় যেন এখনই একটা কেস স্টার্ট করে আসামীদের এ্যারেস্ট করা হয়। লেখার শেষেও কিন্তু রুদ্রর মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে। ঐ থানার ও-সি রাধামাধব ঘোষ একটু শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোক বিষয়টি নিয়ে কতটা জল ঘোলা করতে পারে, আর সেই ঘোলা জলের ছিটে কতটা দূর পর্যন্ত যেতে পারে তাই চিন্তা করতে থাকে সে।

দিন কয়েক পরে সার্কেল ইন্সপেক্টরকে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সে জবাব দেয়, হ্যাঁ স্যার, রাধামাধব কেস স্টার্ট করেছে।

—আসামীদের এ্যারেস্ট করা হয়েছে? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দেয় সার্কেল ইন্সপেক্টর, বোধহয় না।

—বোধহয় কেন? বিরক্তির স্বরে প্রশ্ন করে রুদ্র, আপনার সার্কেলের খবর আপনি বলতে পারেন না?

একটু সময় চুপ করে থেকে সার্কেল ইন্সপেক্টর জবাব দেয়, গিয়েছিল এ্যারেস্ট করতে, কিন্তু পারে নি।

—কেন পারে নি? তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি?

—না স্যার, পালিয়ে বেড়াবার মত লোক নয় তারা। এম-এল-এ পরীক্ষিৎ তরফদারের হস্তক্ষেপেই তাদের এ্যারেস্ট করা যায় নি।

পরীক্ষিতের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্রর মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। এই

একটি নেতা যে নাকি নিজের নেতৃত্ব অটুট রাখার জন্যে ভবিষ্যৎ ভোট যুদ্ধের দিকে নজর রেখে নীচু স্তরের মস্তান থেকে উঁচু স্তরের সমাজদ্রোহী পর্যন্ত প্রত্যেককেই আড়াল করে দাঁড়াতে অভ্যস্ত। প্রতিদানে এরাই পথে-ঘাটে পরীক্ষিতের জয়গান করে বেড়ায়। পরীক্ষিৎ তরফদারের রাজনৈতিক জীবনের জীবন্ত বিজ্ঞাপন এরাই। কিছু লোক হয়তো তার ওপর মনে মনে ক্ষুব্ধ, কিন্তু মনের ক্ষোভ প্রকাশ করার মত সাহস নেই তাদের। আর অধিকাংশ মানুষই নির্বিকার। দু'মুঠো পেটের অন্ন জোগাড় করতেই তারা শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। কাজেই এদেশে পরীক্ষিতের মত মানুষদেরই জয়জয়কার।

দেখতে দেখতে রুদ্রর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। একটা কিছু করার জন্যে হাত দু'টো তার নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে। চোখের সামনে বহাল তবিয়তে থেকে মানুষ দেশের আইন ভাঙবে এ তার কাছে অসহ্য। কিন্তু উপায় কি? যে বিনোদ পাল ও জগৎ সরকারকে খোদ পুলিশ সাহেব পর্যন্ত সমীহ করেন, যাদের পাশে রয়েছে পরীক্ষিৎ তরফদারের মত প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, তাদের এ্যারেস্ট করার মত ক্ষমতা রুদ্রর কোথায়? ঠিক সেই মুহূর্তে রুদ্র বুঝতে পারে পুলিশ কত অসহায়। সমাজ তাকে দিয়েছে অপরাধীকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা, কিন্তু দেয় নি সুযোগ। এ থেকেই ধীরে ধীরে তার মনে দেখা দেয় উদাসীনতা যা নাকি শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় অকর্মণ্যতায়। অবশেষে সে কেবল নিজের আখের গুছোতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঘুরে বেড়ায় পয়সার ধান্ধায়। আর, অসৎপথে পয়সা উপার্জনের এমনই একটা মোহ যা নাকি একবার ধরলে ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। জঙ্গলের বাঘ যদি একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় তাহ'লে বরাবর সে কেবল মানুষই খাবে। অন্য কিছুতে তখন আর রুচি থাকে না তার।

গম্ভীর মুখে রুদ্র সার্কেল ইন্সপেক্টরকে বললে, ও-সি রাধামাধবকে বলুন যে করেই হোক ঐ বিনোদ পাল ও জগৎ সরকারকে এ্যারেস্ট করে কোর্টে চালান দিতে হবে। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে দেশে আইন-কানুন বলে একটা পদার্থ এখনও আছে, ধনী কিম্বা প্রতিপত্তিশালী হলেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো চলে না।

—ঠিক আছে, স্যার। আমি খবর পাঠাচ্ছি। বলেই সার্কেল ইন্সপেক্টর রুদ্রকে স্যালুট করে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই রুদ্র আবার তাকে ডেকে বললে, রাধামাধবকে বলবেন সে নিজে যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে খবর দেয়।

—আচ্ছা স্যার। বলেই সার্কেল ইন্সপেক্টর চলে যায় সেখান থেকে। রুদ্র আবার টেবিলের কাগজপত্রের দিকে মন দেয়।

হঠাৎ ঝন্-ঝন্ শব্দে পাশের টেলিফোন বেজে উঠতেই রুদ্র রিসিভার তুলে নেয়। অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে ওঠে একটা ত্রস্ত কণ্ঠস্বর, স্যার, আমি এ-এস-আই যতীন চক্রবর্তী থানা থেকে বলছি।

—হ্যাঁ, বলুন।

—এইমাত্র খবর পেলাম যে শীতলাতলার মোড়ে নাকি ভয়ানক গণ্ডগোল হচ্ছে। একটা লরি একটা ছোট মেয়েকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যেতেই ওখানকার মানুষ ক্ষেপে গিয়ে রাস্তার যানবাহনের ওপর হামলা শুরু করেছে। রাস্তায় লরি, বাস, প্রাইভেট কার যা দেখছে তার ওপরই ইটপাটকেল ছুঁড়ছে। একখানা প্রাইভেট কারের মালিক প্রতিবাদ করতেই তাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেদম মার দিয়েছে। লোকটি নাকি জ্ঞান হারিয়ে রাস্তার পাশেই পড়ে আছে।

—তাই নাকি? বলে ওঠে রুদ্র, বড়বাবু কোথায়?

তেমনি ত্রস্ত কণ্ঠে জবাব দেয় যতীন, তিনি তো একদিনের পারমিশন লীভ নিয়ে কলকাতায় গেছেন।

—মেজবাবু?

—তদন্তে বেরিয়ে গেছেন।

—থানার চার্জে কে আছে?

—আমি আছি, স্যার।

—অন্য দারোগাবাবুরাও কেউ নেই?

—একমাত্র সনাতনবাবু আছেন।

কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করে রুদ্র। সনাতনবাবুর থাকা না-থাকা একই কথা। রোগা পটকা সনাতন রায়ের বয়স হয়েছে। তার ওপর এই তো কিছুদিন আগে ভদ্রলোক প্লুরিসি থেকে সেরে উঠে কাজে জয়েন করেছে। রাস্তার ভায়োলেণ্ট মবের সামনে তাকে পাঠানো প্রায় বাঘের মুখে পাঠানোর সামিল। রুদ্র জবাব দেয়, ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনি থানার ফোর্স রেডি করুন। আমি যাচ্ছি।

থানার সঙ্গেই কনস্টেবল ব্যারাক। সেখানে তখন রান্নাবান্নার আয়োজন চলছিল। নাইট-ডিউটি ফেরত কয়েকজন কনস্টেবল ব্যারাকের লোহার খাটিয়ায় অকাতরে ঘুমুচ্ছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এদের সবাইকে ডেকে

পোশাক পরিয়ে তৈরি করা একান্তই অসম্ভব। তার ওপর ঝঞ্ঝাটের গন্ধ পেলে 'তবিয়ৎ খারাপ হ্যায়' বলার মত সেপাইও সর্বত্রই আছে।

ঝড়ের বেগে জিপ চালিয়ে রুদ্র কিন্তু সময় মতই এসে হাজির হলো থানায়। গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই সে শুনতে পেল অসহায় যতীনের কণ্ঠস্বর—হো চৌবেজী, একটু তাড়াতাড়ি করো, দাদা। সাহেব এদিকে এসে পড়লেন বলে। এই অজয়, তুই এখনও পোশাক পরিস নি? জবাবে প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে অজয়—পোশাক পরার সময় দিলেন কোথায়? এই তো পায়খানা থেকে এলাম।

রুদ্র থানায় ঢুকে ইচ্ছে করেই চেঁচিয়ে যতীনকে বললে, কৈ যতীনবাবু, আপনার ফোর্স কোথায়?

—এই তো স্যার, তৈরি হয়ে সব আসছে।

রুদ্রর কণ্ঠস্বরে খানিকটা কাজ হলো। একটু হাত চালিয়ে তৈরি হয়ে সবাই এসে হাজির হলো। শত হলেও এস-ডি-পি-ও সাহেব—আই-পি-এস অফিসার।

থানার একমাত্র ভ্যানটি গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সেপাইরা ঝপাঝপ তাতে চড়তেই রুদ্র নিজের জিপে চেপে ভ্যানের ড্রাইভারকে হুকুম দেয়, আমার পিছে পিছে আসুন।

শ'খানেক গজ এগিয়ে যায় রুদ্রর জিপ। রুদ্র পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে যেখানকার ভ্যান সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

কি ব্যাপার? ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে কেন? বিরক্তি ও উত্তেজনায় রুদ্রর ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে ভ্যানের কাছে আসতেই ম্লানমুখে ড্রাইভার কনস্টেবল বললে, স্টার্ট নিচ্ছে না, স্যার।

রাগে ফেটে পড়ে রুদ্র। চেঁচিয়ে বলে ওঠে, কেন স্টার্ট নিচ্ছে না? গাড়ি চেক্ করেন নি কেন? আপনার প্রসিডিং করবো আমি, সাসপেণ্ড করবো।

একটা ঢোক গিলে ড্রাইভার কনস্টেবল বললে, একটু আগেই তো স্টার্ট নিচ্ছিল, স্যার। এখনই কি যেন হলো। গাড়িটা তো সবে কাল গ্যারেজ থেকে এসেছে।

কথাটা রুদ্রর প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল—গ্যারেজে কি আর সরকারী গাড়ির কাজ হয়? চারিদিকেই তো ভাগের বন্দোবস্ত। সত্যিকারের রিপেয়ারই যদি হবে তা'হলে প্রতিমাসে মোটা অংকের বিল হবে কেমন করে?

নিজেকে সামলে নিয়ে কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে রুদ্র। তারপর সেপাইদের মধ্যে কয়েকজনকে নিজের জিপে তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে সে চলে যায়

ঘটনাস্থলের দিকে। যাবার আগে এ-এস-আই যতীন চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়ে যায় যে পুলিশ ভ্যান ঠেলে স্টার্ট করিয়ে বাকি সেপাইদের যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রুদ্রর জিপ যখন ঘটনাস্থলে পৌছয় তখন সেখানকার নাটকের শেষ অংক অভিনীত হচ্ছিল। জনতার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অংশের হস্তক্ষেপে হামলাকারী বীরপুঙ্গবেরা আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছে। নিহত সেই মেয়েটিকে রাস্তার একপাশে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রাইভেট গাড়ির সেই আহত মালিককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। ইটের টুকরো ও গাড়ির ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। সেই প্রাইভেট গাড়িখানাও ভাঙা অবস্থায় রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশ কাটিয়ে অতি মন্থর গতিতে যানবাহন অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই যাতায়াত করছে তখন।

পুলিশ দেখেই আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে জনতা। এবারের চঞ্চলতার কারণ নাটকের যবনিকা পতনের পরে পুলিশের উপস্থিতি। ভিড়ের মধ্য থেকে জেগে ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে নানারকম মন্তব্য ও টিটকারি। একজন প্রৌঢ়কে শোনা যায় মন্তব্য করতে—এই যে, এতক্ষণে দাদাদের আসার সময় হলো। এবার জনাকয়েক নিরীহ মানুষকে পাকড়াও করে বীরবিক্রমে নিয়ে যাবে নিজেদের ডেরায়—যত্তসব অকর্মণ্যের দল!

শুনেও যেন কথাগুলো কানে যায় না রুদ্রর। জনসাধারণের এ ধরনের মন্তব্য গায়ে মাখলে পুলিশের চলে না। তা'ছাড়া, জনসাধারণকেও দোষ দিয়ে লাভ নেই। পুলিশের কাছ থেকে তারা আশা করে প্রম্প্‌ট এ্যাক্‌শন। সেই এ্যাক্‌শন নিতে গেলে পদে পদে পুলিশের যে প্রতিবন্ধকতা তা' তো সাধারণের জানার কথা নয়।

রুদ্রর কানে কিন্তু বাজতে থাকে সেই প্রৌঢ় লোকটির মন্তব্য, বিশেষ করে তাঁর সেই কথাটি—পাকড়াও করে নিয়ে যাবে নিজেদের ডেরায়। সেই মুহূর্তে রুদ্রর মনে হয় পুলিশের সঙ্গে এই 'ডেরা' শব্দটির সংযোগ বিশেষ অর্থবহ। বাংলা ভাষায় 'ডেরা' শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। চোর ডাকাতের ডেরা—ক্রিমিন্যালের ডেন অর্থাৎ ডেরা। ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোক থানাকে ডেরা বলেই চিহ্নিত করলেন অর্থাৎ পুলিশ নিজেই যেন ক্রিমিন্যাল, আর থানা হচ্ছে তাদের ডেন অর্থাৎ ডেরা। রুদ্রর মনে পড়লো, পুলিশের দুর্নীতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একজন সাংবাদিক একবার খবরের কাগজে লিখেছিলেন—ক্রিমিন্যাল ও পুলিশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে ক্রিমিন্যালের ক্রাইম করার লাইসেন্স নেই, কিন্তু

পুলিশের তা' আছে। কথাটা হয়তো একটু অতিরঞ্জিত ও রূঢ় কিন্তু একেবারে মিথ্যে যে নয় তার প্রমাণ পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের মধ্যেই একদল "ব্ল্যাক শিপের" অস্তিত্ব যারা নাকি ক্রিমিন্যালদের প্রধান সহায়। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গোমূত্রের মত গোটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে মুষ্টিমেয় এই ব্ল্যাক শিপগুলোই ডিপার্টমেণ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় দুর্নামের বোঝা। এদের নিয়ে দেশের সরকার বিব্রত, পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট বিপন্ন এবং জনসাধারণ বিস্মিত। এমনিতেই তো এই ডিপার্টমেণ্টে ঘুষের বদনাম, তার ওপর এই লাইসেন্সড ক্রিমিন্যালেরা গোটা ডিপার্টমেণ্টের মুখে লেপে দেয় এমন চূণকালি যা নাকি পুলিশের শত সহস্র ভালো কাজও ধুয়ে ফেলতে পারে না।

সেই মুহূর্তে সেই ঘটনাস্থলে তেমন কোন কাজ ছিল না রুদ্রর। জনসাধারণ শান্ত, আর কোন ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা নেই। তবুও ফোর্স নিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করে সে।

একটু পরেই সেই পুলিশ ভ্যান এসে হাজির হয় সেখানে। সঙ্গে থানার মেজবাবু অসিত মুখার্জী ও একজন এ-এস-আই।

পুলিশের কাজ তখনও শেষ হয় নি। হতভাগ্য সেই মেয়েটির মৃতদেহকে সেখান থেকে সরাতে হবে, পাঠাতে হবে মর্গে। শুরু করতে হবে তদন্ত। কিন্তু এসব কাজ রুদ্রর নয়। তাই সে অসিতকে যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে জিপ নিয়ে চলে যায় সেখান থেকে।

ফিরে এসে রুদ্র একতলায় নিজের অফিসে বসতেই চাকর বীরবাহাদুর ওপর থেকে নেমে এসে বললে, কলকাতা থেকে মেমসাহেবের বাবা এসেছেন।

কথাটা কানে যেতেই রুদ্র নিজের বুকের মধ্যে একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করে। তবে কি নবনীতাও সঙ্গে এসেছে? হয়তো এসেছে। কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল বীরবাহাদুরকে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে কেবল জিজ্ঞেস করে, কখন এলেন?

— আপনি বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

— কিছু খেতে দিয়েছিস?

— বলেছিলাম, কিন্তু উনি কিছুই খেতে চাইলেন না। শুধু এক কাপ চা চাইলেন। তাই দিলাম।

মনটা দারুণ দমে যায় রুদ্রর। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে নবনীতার বাবা একাই এসেছেন। মেয়েকে সঙ্গে আনেন নি। হয়তো নবনীতা নিজেই আসতে চায় নি।

একটু সময় চুপ করে থাকে রুদ্র। তারপর বীরবাহাদুরকে বললে, তুই যা, আমি যাচ্ছি।

দোতলায় বসার ঘরে সুবীর ঘোষাল একখানা ইজি-চেয়ারে শুয়ে চুরুট টানতে টানতে সেদিনের খবরের কাগজ দেখছিলেন। ধড়াচুড়ো ছেড়ে পাজামা ও গেঞ্জি পরে রুদ্র সেই ঘরে এসে সুবীরের পায়ের ধুলো নিতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসতে বসতে বললেন, ভালো আছো তো?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রুদ্র তেমনি দাঁড়িয়েই থাকে।

—ওকি, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—হ্যাঁ বসছি। বলে রুদ্র একখানা চেয়ারে বসতেই সুবীর ঘোষাল মুখের চুরুট হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার চাকরের কাছে শুনলাম যে কোথায় নাকি ভয়ানক ঝঞ্ঝাট হয়েছে। সেখানেই নাকি ছুটেছিলে তুমি।

—হ্যাঁ, একটা লরি একটি মেয়েকে চাপা দিয়ে পালিয়েছে। তাই নিয়েই একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে।

—ঠিক হলেই ভালো। যা দিনকাল পড়েছে। আর, এই লরির ড্রাইভারগুলোও তেমনি। স্টীয়ারিং হাতে পড়লে আর ওদের মাথার ঠিক থাকে না। এদের দৌরাত্ম্যে পথচারীকে প্রাণ হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তোমরা সব এত পারো, ঐ লোকগুলোকে একটু শায়েস্তা করতে পারো না?

কোন জবাব না দিয়ে রুদ্র কেবল একটু হাসে। সেই মুহূর্তে ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল সুবীর ঘোষালের এই হঠাৎ আগমনের কারণটি জানার জন্যে।

রুদ্র এবার জিজ্ঞেস করে, বাড়িতে সবাই ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নবু ও তার মা ভাল আছে।

—আপনি গাড়ি নিয়ে আসেন নি? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

রুদ্রর প্রশ্নে একটু হাসেন সুবীর ঘোষাল। তারপর বললেন, হঠাৎ ইচ্ছে হলো, ট্রেনে চেপে আসতে কতটা সময় লাগে পরীক্ষা করে দেখতে। তাই এবার ট্রেনেই এলাম। স্টেশন থেকে এটুকু অবশ্যি রিক্সাতেই এসেছি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, নবু সম্পর্কে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতেই এসেছি আমি। ভেবে দেখলাম—। কথাটা শুরু করেই থেমে যান তিনি। তারপর আবার বললেন, তোমার লাঞ্চ হয়েছে তো?

নবনীতা সম্পর্কে কথার চাইতে তার খাওয়াটা বেশি নয়। তাই রুদ্র বললে, সে হবেখন। আপনি বলুন।

—নো—নো, মাই বয়। তা হয় না। বেলা দেড়টা বেজে গেছে। আগে তুমি লাঞ্চ সেরে এসে সুস্থ হও। তারপর না হয় বলা যাবে। ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরী নয় যে এই মুহূর্তেই না বললে চলবে না।

—আপনারও তো লাঞ্চ হয়নি।

—আমি তো কোনদিনই দুপুরে লাঞ্চ করি না। এটা আমার ত্রিশ বছরের অভ্যেস। সকালে ন'টা নাগাদ আমাকে অফিসে যেতে হয়। একটা হেভি ব্রেকফাস্ট করে আমি বেরোই। সারাদিন অফিসে বার চারেক চা খাই মাত্র। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই ডিনার সেরে নিয়ে তারপর নিজের কাজকর্ম করি।

—তা'হলে আপনাকে আর এক কাপ চা করে দিক্।

—তা' অবশ্যি দিতে পারো।

খেয়ে উঠে একটা সিগারেট না হলে চলে না রুদ্রর। নিজের ঘরে ঢুকে সিগারেট ধরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় সে। নবনীতা সম্পর্কে তার বাবা কি বলতে এসেছেন তা তিনিই জানেন। মুখে বলছেন যে ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরী নয়, আবার অফিসে না গিয়ে তিনি সোজা ছুটে এসেছেন এখানে। সঙ্গে গাড়িও আনেন নি আজ।

সিগারেটে মাত্র কয়েকটি টান দিয়ে সেটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে রুদ্র পাশের ঘরে এসে বসতেই সুবীর ঘোষাল ইজিচেয়ারে আবার সোজা হয়ে বসেন। তারপর মুখের চুরুট সরিয়ে নিয়ে নিজের মাথার পাতলা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, একটা কথা বলছি, কিছু মনে করো না, মাই বয়। নবু যেভাবে মানুষ হয়েছে তাতে তার পক্ষে এখানে থাকা যে একটু কষ্টকর তা' বোধহয় তুমিও স্বীকার করবে। বাই গড্‌স গ্রেস পয়সা-কড়ির আমার অভাব নেই। নবুই আমার একমাত্র সন্তান। তোমাদের চালাতে হয় বাঁধা-ধরা মাইনের ওপর। নবুর মত মেয়েব পক্ষে এরকম একটা অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো খুবই শক্ত।

সুবীর ঘোষালের কথা শুনতে শুনতে রুদ্রর মুখখানা একটু একটু করে শক্ত হয়ে উঠছিল। সেইদিকে নজর পড়তেই সুবীর তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, ওয়েল, নো—না, কিছু মাইণ্ড করো না তুমি। আমি স্বীকার করি হাজব্যাণ্ডের সংসারে এসে মেয়েদের খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই উচিত। দ্যাট ইজ ডিজায়ারেব্‌ল। কিন্তু বুঝতেই তো পারছো, ওর মত মেয়ের পক্ষে এটা যে কত কষ্টকর—।

রুদ্র এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। সুবীর কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে থেমে যেতেই সে মৃদু কণ্ঠে বললে, এ নিয়ে আপনি আমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছিলেন কি ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বলেছি, তাড়াতাড়ি জবাব দেন সুবীর। তারপর জগদীশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলতে থাকেন, হি ইজ রিয়েলি এ গুড্ সোল—অতি ভাল মানুষ। আমার যুক্তিগুলো উনি এপ্রিসিয়েট করলেন। তারপর বললেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে। আফ্টার অল, ইউ আর এ গ্রোন-আপ বয়।

হ্যাঁ, গ্রোন-আপই বটে ! রুদ্র ভেবে দেখলো তার বাবা জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে অন্ততঃ সে বাস্তবিকই সাবালক হয়ে উঠেছে। তাঁর আচরণে অসঙ্গতির কিছুই নেই। ইউনিভার্সিটির পড়া ছেড়ে দিয়ে কম্পিটেটিভ পরীক্ষা দেওয়া থেকে শুরু করে রুদ্রর কোন ব্যাপারেই তিনি আর মাথা গলাতে রাজি নন। এমনকি তার বিবাহিত জীবনের এই সংকট মুহূর্তেও তিনি ব্যাপারটা রুদ্রর ওপরই চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে রইলেন। নিজের বাবার কাছ থেকে বরাবর সরে থেকে নিজের ছেলেকেও তিনি এমনিভাবে দূরে দূরে রাখতে চাইছেন। ছেলে সাবালক হয়েছে বলে বাবা তার সম্পর্কে একটি কথাও বলতে রাজি নয়। কিন্তু কেন ? জগদীশ নিজে ব্যাপারটার মধ্যে মাথা না গলিয়ে সব দায়-দায়িত্ব রুদ্রর ওপর চাপিয়ে কেন উদাসীন হয়ে রইলেন ? সেই মুহূর্তে জগদীশের ওপর দারুণ রাগ হয় রুদ্রর। সাবালক হলেই কি সবাই অভিভাবকহীন হয়ে ওঠে ? জগদীশ কি রুদ্রর অভিভাবক নন ?

সুবীর ঘোষাল এবাব তাঁর জ্বলন্ত চুরুট ঠোঁটে চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমার সম্পর্কে নবুর কাছে সব শুনেছি। আই অ্যাডমায়ার ইওর অনেস্টি। সত্যিই তো, সরকারী কাজ ছাড়া সরকারী গাড়ি ব্যবহার হবে কেন ? কিন্তু নবুর ছেলেবেলা থেকে যে অভ্যেস সেটা তার পক্ষে চট্ করে ছাড়াও তো সম্ভব নয়। তাই আমি সাজেস্ট করছিলাম যে বিয়ের আগে নবু যে গাড়িখানা নিজে ব্যবহার করতো সেখানা এনে তুমি নিজের কাছে রেখে দাও। দরকার মত তোমরা ব্যবহার করবে।

সোজা কথায় সুবীর তার মেয়েকে একখানা গাড়ি দিতে চাইছেন। দোষের কিছু নেই এতে। বাপ তাঁর মেয়েকে কোন কিছু দিতে চাইলে জামাইয়ের বাদ সাধা ঠিক নয়। অবশ্যি তেমন কোন বস্তু হলে রুদ্র হয়তো রাজিই হতো। কিন্তু এই বাজারে একখানা গাড়ি রাখা হাতি পোষার

চাইতেও কঠিন। বিশেষ করে রুদ্রর যা মাসিক আয় তাতে তার নিজের গাড়ি রাখা চলে না। পেট্রোল খরচেই তো তাকে ফতুর হতে হবে। নিজে গাড়ি রাখলে সরকারী এলাউন্স হয়তো কিছু পাবে, কিন্তু সে আর কতটুকু।

কিন্তু এ'কথা সে নিজের মুখে সুবীরকে কেমন করে বলবে? কেমন করে স্বীকার করবে যে, এই মাইনেতে গাড়ি রাখা চলে না। তাই সে কেবল শান্ত স্বরে বললে, আমি তো বুঝতে পারছি না, এখানে আপনার মেয়ে গাড়ি দিয়ে কি করবে। সামান্য এখানে-ওখানে যাতায়াত তো রিক্সাতেই চলতে পারে।

—হ্যাঁ, তা' পারে—অনায়াসেই পারে, বলতে থাকেন সুবীর, তবে কিনা রিক্সা-টিক্সায় চড়া তো ওর ঠিক অভ্যেস নেই। তা'ছাড়া এই ধরো মাঝে-মধ্যে আমাদের দেখতে কলকাতায় যাবে। তুমি হয়তো ট্রেনে যেতে বলবে। সে কথা ভেবেই আমি আজ ইচ্ছে করেই ট্রেনে এসেছি। হরিব্‌ল্ জার্নি। লোকাল ট্রেনে ভদ্রভাবে কেউ চলাফেরা করতে পারে না আজকাল। নিজের চোখে বোনাফাইড্ ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেনজারদের দাঁড়িয়ে আসতে দেখলাম। সীটে আরাম করে বসে আছে বিনে টিকিটের যাত্রী। এর মধ্যে নবুর মত মেয়ের পক্ষে যাতায়াত করা একেবারেই অসম্ভব।

রুদ্র আর কিছু বলে না। তার বলার কথা সে বলেই দিয়েছে। তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখের চুরুটে খানিকক্ষণ ধোঁয়া ছাড়েন সুবীর ঘোষাল। মস্ত বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনি। লোক চরিয়ে খেতে হয় তাঁকে। রুদ্রর আপত্তির কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না তাঁর। মনে মনে এর একটা সমাধান তিনি করেই রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, গাড়ির যাবতীয় খরচ মায় ড্রাইভারের মাইনে পর্যন্ত তিনিই দেবেন। কিন্তু কথাটা রুদ্রর কাছে কিভাবে পাড়া যায় সেটাই একটা সমস্যা। রুদ্রর যা প্রকৃতি তাতে সে ব্যাপারটা কিভাবে নেবে সেটা অনুমান করতে না পেরেই তিনি বিষয়টি নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

অবশেষে একসময় তিনি বললেন, ওয়েল রুদ্র, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। উড্ ইউ মাইণ্ড, যদি আমি দশ-বিশ হাজার টাকা দিয়ে নবুর নামে এখানকার ব্যাঙ্কে একটা একাউণ্ট খুলে দিই?

একটু সময় চিন্তা করে গম্ভীর স্বরে রুদ্র জবাব দেয়, আপনার মেয়েকে আপনি টাকা দেবেন তাতে আমার মাইণ্ড করার কী আছে? তবে সেই টাকাটা সে এই সংসারের পেছনে খরচ করলে আমার মাইণ্ড করার যথেষ্টই কারণ ঘটবে।

—না—না, ধরো কিছু সখের জিনিসপত্র কেনাকাটি করা কিম্বা গাড়ির খরচপত্র করা—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যান তিনি।

গোটা ব্যাপারটাই সাংঘাতিক বিসদৃশ লাগছিল রুদ্রর। আর সেই সঙ্গে মনে মনে বিরক্তও হচ্ছিল সে। এ যেন তার পৌরুষের প্রতি অপমান। স্বামী তার স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারছে না বলেই শ্বশুর তাঁর টাকার থলি নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। কথাটা কেবলমাত্র ভাবতেই ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে তার। সুবীর ঘোষালের দিকে একবার তাকায় সে। তারপর প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে সে বললে, দেখুন, আপনার মেয়ে যদি এখানে থাকে তা'হলে আমার পয়সার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই তাকে থাকতে হবে। এর বেশি আর কিছু আমার বলার নেই। কথাটা শেষ করে জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই সেখান থেকে উঠে যায় রুদ্র।

একটু অপমানিত বোধ করেই সেদিন কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন সুবীর ঘোষাল।

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে তারপর। রুদ্রর পুলিশী জীবন নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে কেটে যাচ্ছিল। অপরিণত পুলিশী জীবনে সেই অভিজ্ঞতা ফলের ভারে নুয়ে পড়া সরু লিকলিকে একটি গাছের মত। ভেঙে পড়ার আশঙ্কাই বেশি। পরিণত হলে আর ততটা ভয় থাকে না। মনের তেমন একটি অস্বস্তিকর অবস্থা নিয়েই একদিনের পারমিশন লীভ নিয়ে রুদ্র গিয়েছিল বারাসতে নিজের মাকে দেখতে।

সারাটা দিন বাড়িতে কাটিয়ে ফিরে আসার জন্যে রুদ্র যখন তৈরি হচ্ছিল হঠাৎ বৈঠকখানা ঘরে জগদীশ ডেকে পাঠালেন তাকে।

রুদ্র এসে কাছে দাঁড়াতেই জগদীশ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তারপর নিজের দর্শনশাস্ত্রের বইখানার ওপর দৃষ্টি রেখেই তেমনি গম্ভীর স্বরে বললেন, দিনকয়েক আগে বৌমার বাবা এখানে এসেছিলেন। বৌমার পক্ষে তোমার ওখানে থাকা নাকি একান্তই অসম্ভব। তাঁর ইচ্ছে এই আই-পি-এস চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।

কোন জবাব না দিয়ে স্থির হয়ে থাকে রুদ্র। একটু থেমে জগদীশ আবার বলতে থাকেন, তাঁর নিজের ফার্মে একটা উঁচু পোস্ট নাকি হঠাৎ খালি হয়েছে। ওঁর ইচ্ছে এই পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি ওটা নাও। এতে নাকি তাঁরও সুবিধে, তোমারও সুবিধে।

রুদ্র বুঝতে পারে সুবীর ঘোষাল তার কাছে প্রোপোজালটা পাড়তে সাহস

করেন নি বলেই তার বাবাকে এসে ধরেছেন। একটু ভেবে নম্র কণ্ঠে সে বললে, এতে আপনার কি মত?

—আমার কিছু মত নেই। নিজের ভালোমন্দ বোঝার মত বয়স তোমার হয়েছে। নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে নিজের জীবন। কত ঝড়ঝাপ্টা আসবে, কত বাধা-বিপত্তি আসবে, তোমাকেই সে সব ঠেকাতে হবে। কাজেই এখানে আমার মত একান্তই মূল্যহীন।

জগদীশের ওপর মনে মনে চটছিল রুদ্র। সেই একই উদাসীন আচার-আচরণ। সমস্ত দায়-দায়িত্ব যেন তার একার। কিন্তু কেন তা' হবে? সাংসারিক যে সমস্যার মধ্যে আজ সে জড়িয়ে পড়েছে তার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তা'হলে তাঁরা হচ্ছেন তার মা-বাবা। তাঁরাই তো দেখে শুনে পাত্রী নির্বাচন করেছিলেন। তেলে জলে যে মেশে না তা' কি তাঁরা জানতেন না? এখন উদাসীন হয়ে থাকলে চলবে কেন?

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে জগদীশ আবার বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার। নইলে, বিয়ের পরে সাংসারিক সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছো না কেন? একা একা কেন জীবন কাটাতে হচ্ছে তোমাকে? ভাগ্য—তোমার ভাগ্যই তোমাকে নিয়ে চলেছে এই পথে। মানুষ কতটুকু কি করতে পারে? হাতের বইখানার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলো বলে চুপ করেন জগদীশ।

সেই মুহূর্তে জগদীশকে বড়ই স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছিল রুদ্রর। তিনি যেন নিজের দোষ ত্রুটি রুদ্রর ভাগ্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়তে চাইছেন। এমনকি রুদ্রর এই দুর্ভাগ্যের জন্যে তিনিও যে ব্যথিত তাও তাঁর কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল না। তিনি যেন হিতোপদেশ দিয়েই নিজের কর্তব্য সমাধান করতে চান। দরদী মনের উষ্ণতায় পুত্রের দুঃখ লাঘব করার কোন আকাঙ্ক্ষাই যেন তাঁর নেই।

মুখের কাছে একটা কড়া জবাব আসছিল রুদ্রর। পাষাণ প্রাণে পাষাণের মত ভারি কথাই তো খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মুখের কথা মুখেই রইলো তার। সহসা তার চোখ পড়ে জগদীশের হাতের বইখানার দিকে। টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়া কয়েক ফোঁটা চোখের জলে বইখানার পাতাটা ভিজে উঠছিল সেই মুহূর্তে।

নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র মনে হয় রুদ্রর। চাপা প্রকৃতির জগদীশ ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না। বাইরে প্রশান্ত কিন্তু ভেতরে উত্তাল। বাইরে স্থির কিন্তু ভেতরে অস্থির। আর সেই অস্থিরতাকে ঢাকবার কি নিদারুণ প্রয়াস।

রুদ্রর বুকের মধ্য থেকে একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। কাঁপা গলায় সে কেবল বললে, আপনি ওঁকে বলে দেবেন, যে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছি তার প্রায় সবটাই এখনও বাকি। কাজেই আমার পক্ষে এই চাকরি ছাড়া কোনমতেই সম্ভব নয়। উনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। কথাটা বলেই আর সেখানে দাঁড়ায় না রুদ্র। তাকায়ও না জগদীশের দিকে। হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। সেই মুহূর্তে একবার ঘাড় ফেরালে রুদ্র দেখতে পেত জগদীশ জলভরা চোখে তাকিয়ে আছেন তাঁর একমাত্র পুত্রের গমন পথের দিকে। সেই চোখের জল ছাপিয়ে তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে কেমন এক গভীর তৃপ্তি ও গর্বের চিহ্ন।

নিস্তব্ধ একখানি গ্রাম। মানুষজনের সাড়া শব্দ নেই কোথাও। মেটে রাস্তার পাশে কয়েকখানা বাড়ি। বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতরের লোকগুলো বোধহয় অকাতরে ঘুমুচ্ছে। একপাশে একটা পুকুর, আর সেই পুকুরের পাড়ে কয়েকটা ঝাকড়া গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ সেই গাছের আড়ালে দেখা গেল একটি লোককে। মালকোচা দিয়ে পরা তার ধুতি প্রায় হাঁটু অবধি উঠে এসেছে। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি, হাতে তেল চক্‌চকে একখানা লাঠি। একটু পরেই তার পাশে এসে দাঁড়ালো আর একটি লোক। এর পোশাক-পরিচ্ছদও প্রথম লোকটির মত। তবে এর কোমরে গোঁজা একখানা ছোরা, আর মাথায় বাঁধা একটা কাপড়ের ফেট্টি। এর পরে আরও একজন এলো সেখানে, তারপরে আরও একজন। এমনি করে সাতজনের একটি দল এসে জড়ো হলো সেখানে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন আলোচনা করলো তারা। নজর কিন্তু তাদের রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর মধ্যে একখানার দিকে।

একটু পরেই দলটি সতর্কভাবে এগোতে থাকে। বাড়িটার প্রায় কাছাকাছি এসেই একজন রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে পড়ে, আর বাকিরা এগিয়ে যায় দরজার দিকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি হাতের টর্চ জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক আলো ফেলতে থাকে। দলের মধ্যে একজন বন্ধ দরজার ওপর জোরে লাথি

মেরে চিৎকার করে ওঠে, দরজা খোল্! ভেতর থেকে কিন্তু কোন সাড়া শব্দ ভেসে আসে না।

এবার একসঙ্গে দু'তিন জন দরজার ওপর আরও জোরে লাথি মারতে মারতে চিৎকার করতে থাকে, দরজা খোল্ বলছি, নইলে ভেঙে ফেলবো!

তবুও কিন্তু দরজা খোলে না।

বাইরের দলটি এবার মারমুখী হয়ে ওঠে। দরজার ওপর দমাদম্ পড়তে থাকে লাথির পর লাথি। সাধারণ কাঠের দরজা থর থর করে কাঁপতে থাকে। এখনই বুঝি ভেঙ্গে পড়বে।

হঠাৎ সেই ঘরের মধ্যে জেগে ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলো লোকের আর্তনাদ, বাঁচাও—বাঁচাও—ডাকাত পড়েছে—ডাকাত!

ঘরের মধ্যে সেই চিৎকারে ডাকাত দলটি যেন একটু থম্‌কে দাঁড়ায় মুহূর্তের জন্যে। অনেকগুলো টর্চের আলো সতর্কভাবে বাড়িটির এদিক-ওদিক পড়তে থাকে। পরক্ষণেই সেই দরজার ওপর আবার নতুন করে পড়তে থাকে লাথির পর লাথি। অবশেষে সেই লাথির বেগ সহ্য করতে না পেরে দরজাটা ভেঙ্গে পড়তেই ভেতরে জেগে ওঠে আরও জোরে চিৎকার, বাঁচাও—বাঁচাও—ডাকাত—ডাকাত—।

ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ডাকাত দলটি ঘরের ভেতর ঢুকতে যাবে, সহসা একটু দূরে পুকুরের অন্য পাড়ে বেজে ওঠে বাঁশির শব্দ, আর সেই সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠের চিৎকার, ডাকাত—ডাকাত—! চিৎকারটা যেন ছুটে আসছে এদিকেই। পরক্ষণেই এপাশের রাস্তায়ও তেমনি বাঁশির শব্দ ও চিৎকার, ডাকাত—ডাকাত—!

এতক্ষণে হুঁস হয় ডাকাত দলটির। গাঁয়ের লোকেরা জেগে উঠেছে। এদিকেই ছুটে আসছে তারা। না, মাঠে মারা গেল এবারের পরিশ্রম। এবার ভালয় ভালয় কেটে পড়তে পারলেই মঙ্গল।

ডাকাতি করা আর হলো না। দরজা ভাঙ্গার পরিশ্রমটাই মাটি। বিদ্যুৎ গতিতে ডাকাত দলটি লাফিয়ে পড়লো রাস্তায়। ওদের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিল সেও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। এক হাতে টর্চ ও অন্য হাতে লাঠি কিম্বা ছোরা বাগিয়ে ধরে দলটা তখন ছুটছে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে।

কিন্তু যাবে কোন্ পথে? সামনেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ ও সেই সঙ্গে চিৎকার, ডাকাত—ডাকাত!

নাঃ, এই পথে পালানো যাবে না। উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়ায় দলটি। তারপর ছুটতে থাকে ঊর্দ্ধশ্বাসে। কিন্তু না, এদিকেও তেমনি চিৎকার ও পায়ের শব্দ। অনেকগুলো লোক ছুটে আসছে এদিকে।

এতক্ষণে ডাকাত দলটি নিজেদের বিপদ বুঝতে পারে। সামনে পেছনে কোনদিকে পালাবার পথ নেই। এখন তবে উপায়? নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হবে এবার। তারপর থানা-পুলিশ।

হঠাৎ একদল গ্রামবাসী পুকুরের পাড দিয়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ে ডাকাত দলের ওপর। হাতে তাদের লাঠি ও সড়কি। ওপাশ থেকে অন্য দলটিও ততক্ষণে এসে পড়েছে সেখানে। শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। গ্রামবাসীদের লাঠির ঘায়ে কয়েকটা ডাকাত লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। গ্রামবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ জখম হয় ডাকাত দলের হাতে। ভিড়ের মধ্যে ডাকাত দলের কয়েকজন সমর্থ হয় পালিয়ে যেতে। গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে তিনজন।

সহসা ভোজবাজির মত মাটিতে লুটিয়ে পড়া ডাকাত ও গ্রামবাসীরা উঠে দাঁড়াতেই কিছু দূরে সামিয়ানার নীচে বসে থাকা দর্শকেরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায় গোটা দলটিকে।

ঘটনাটা রাতে ঘটেনি, ঘটেছে দিনে, পরিষ্কার দিনের আলোয়। ডাকাত ও গ্রামবাসীদের হাতের টর্চের আলো কেবল অভিব্যক্তি মাত্র। সত্যিকারের ডাকাতি নয়। এটা হচ্ছে আর. জি. পার্টির র‍্যালে অর্থাৎ গ্রামরক্ষা বাহিনীর মহড়া। গাঁয়ে ডাকাত পড়লে রক্ষীবাহিনী তাদের কেমন করে ঠেকাবে তারই রিহার্সাল।

আশে-পাশের তিন-চারখানা গ্রামের রক্ষীবাহিনীকে নিয়েই এই মহড়া। মস্ত বড সামিয়ানার নীচে ছাড়াও চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গ্রামের দর্শকবৃন্দ। মহড়া তো নয়, যেন একটা উৎসব। উৎসবই বটে। রক্ষীবাহিনীর এই মহড়া ছাড়াও আজকের এই অনুষ্ঠানের আর একটি আকর্ষণ রাজ-দর্শন অর্থাৎ মন্ত্রী-দর্শন।

রাজ্যের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ভাস্কর বোস। অনেক চেষ্টা তদ্বিরের পরে তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। অবশ্য, তাঁকে রাজি করানোর সবটুকু কৃতিত্বই এখানকার এম-এল-এ পরীক্ষিৎ তরফদারের।

মন্ত্রী ভাস্কর বোসের একেবারে গা-ঘেঁসে বসে আছেন পরীক্ষিৎ। অন্য পাশে এখানকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের একজন কর্মকর্তা। আর, তাঁর পাশেই এই অঞ্চলের ধনী চালকল মালিক সেই জগৎ সরকার ও বিনোদ পাল। জেলার

এস-পি দিবাকর সেন ও এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেব ভট্টাচার্যের স্থান হয়েছে দ্বিতীয় সারিতে।

প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বিসদৃশ ঠেকছিল রুদ্রর চোখে। লেভির চাল ফাঁকি দেওয়ায় যে জগৎ সরকার ও বিনোদ পালের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে- তাদের স্থান হয়েছে কিনা মন্ত্রীর সঙ্গে একই সারিতে। তা'ছাড়া পরীক্ষিতের স্নেহধন্য সেই সুকান্ত ও হারু তো আছেই। এই দুই মস্তান অবশ্য মন্ত্রীর পাশে বসার সুযোগ পায় নি, কিন্তু তাঁর আশেপাশেই ঘুর ঘুর করছে পরীক্ষিতেব নির্দেশে। রুদ্রর মনে হলো, এটা যেন তার বিরুদ্ধে পরীক্ষিতের একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ। তিনি যেন বলতে চান—শত হলেও তুমি একজন সরকারী কর্মচারী, আর আমি হচ্ছি পাব্লিক ম্যান্। তোমায় আমায় ফারাক অনেক। ফারাক যে অনেক তা' রুদ্রও জানে। কিন্তু তাই বলে যে তাকে পরীক্ষিতের ইচ্ছেমত চলতে হবে তা' সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

ইউনিফর্ম-পরে পাশাপাশি বসে আছে দিবাকর সেন ও রুদ্রদেব। দিবাকরের মুখ দেখে মনে হয় না যে এসব তিনি লক্ষ্য করছেন। কেমন যেন এক নির্বিকার ভাব তাঁর। পরীক্ষিৎ মন্ত্রীর সঙ্গে নীচু কণ্ঠে কি যেন আলোচনা করছেন, আর মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দিবাকরকে কিছু জিজ্ঞেস করতেই দিবাকর ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে, কখনও বা উঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে জবাব দিচ্ছেন। সেই মুহূর্তে রুদ্রর মনে হলো দিবাকর যেন নিজেকে মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরার জন্যে একটু বেশী পরিমাণে তৎপর।

আজকের এই অনুষ্ঠানে জগৎ সরকার ও বিনোদ পালের যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে তা' রুদ্রর অজানা নয়। দিবাকর সেনের নির্দেশে গ্রামরক্ষা বাহিনীর এই মহড়ার আয়োজন করেছে এখানকার থানার ও-সি। এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচপত্রের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে ঐ দুই ধনী ব্যবসায়ী। কাজেই তাদের বসার আসন সামনের সারিতে হওয়াই তো স্বাভাবিক। দেশের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হলেও এরা দু'জন যে আজ সত্যিই ভি-আই-পি। জেনে হোক কিম্বা না জেনে হোক স্থানীয় এম-এল-এ'র মাধ্যমে খোদ মন্ত্রীরও যে এতে সায় রয়েছে। এ নিয়ে রুদ্রর মত একজন নতুন পুলিশ কর্মচারী প্রশ্ন তুললে চলবে কেন? রুদ্রর সবচাইতে বিরক্তি লাগছিল জেলার এস-পি দিবাকর সেনের আচরণে। জেনেশুনে ভদ্রলোক এ ধরনের একটা ব্যবস্থায় রাজি হতে গেলেন কেন? তিনি তো অনায়াসেই বলতে পারতেন, দেশের অনিষ্টকারী ঐ দু'জন চালকল

মালিকের পয়সা ছাড়া যদি এই মহড়ার ব্যবস্থা না হয় তো না হোক। কিন্তু তিনি তা বললেন না। হয়তো পরীক্ষিৎ তরফদারই তাঁকে তা বলতে দেন নি। হয়তো বিশেষ কোন কারণে পরীক্ষিৎ নিজেই দিবাকর সেনকে দিয়ে এই মহড়ার আয়োজন করিয়েছেন। রুদ্রকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে দেন নি তিনি।

দিবাকর সেনের জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখও হয় রুদ্রর। একটা জেলার পুলিশ সাহেব তিনি। সর্বভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের লোক। সামান্য কিছু আর্থিক সুবিধা কিম্বা একটা ভালো পোস্টিংয়ের জন্যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে তিনি পরীক্ষিতের মত একজন মানুষের সঙ্গে মাখামাখি করছেন! মন্ত্রীর নেকনজরে পড়াব লোভে ঐ অসৎ চালকল মালিকদের জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। কিন্তু এতে তাঁর নিজের সম্পর্কে সাধারণের কি ধারণা হলো তা' কি একবারও ভেবে দেখলেন না তিনি? এই এলাকার সবাই জানে যে পুলিশের প্রচেষ্টায় এই গ্রামরক্ষী বাহিনীর মহড়া হচ্ছে। জেলার পুলিশ প্রধান হিসেবে তাঁর নিজের ভূমিকার কথাও কারুর অজানা নয়, আর তাদের কাছে এটাও নিশ্চয়ই গোপন নেই যে এর জন্যে যা পয়সা-কড়ি লাগছে তার সবটাবই জোগান দিচ্ছে ঐ দু'জন অসৎ চালকল মালিক। এর ফলে কেবল এস-পি দিবাকর সেনের ওপর কেন, এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে এই জেলার প্রতিটি পুলিশ কর্মচারীদের ওপরই যে জনসাধারণের একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে তা' কি তিনি বুঝতে পারছেন না?

এক সময় দিবাকর উঠে মন্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ান। কি-যেন কথা বলেন তাঁর সঙ্গে। পরক্ষণেই ইঙ্গিতে রুদ্রকে ডাকতেই রুদ্র এগিয়ে এসে দাঁড়ায় মন্ত্রীর সামনে।

মন্ত্রী ভাস্কর বোস একবার রুদ্রর দিকে একপলক তাকিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে পরীক্ষিৎকে বললেন, তা'হলে তুমি বলছো এঁর চেষ্টাতেই ঐ ছেলেদুটোর মামলায় চার্জসীট হয়েছে?

—একজ্যাক্টলি ভাস্করদা। বলতে গেলে একরকম জোর করেই চার্জসীট দেওয়া হয়েছে। জবাব দেন পরীক্ষিৎ।

একটু সময় চিন্তা করেন ভাস্কর বোস। তারপর আবার বললেন, সাফিসিয়েণ্ট এভিডেন্স না থাকলে পুলিশ চার্জসীট দেয় কেমন করে?

পরাক্ষিৎ একবার রুদ্রর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, এদের অসাধ্য কিছুই নেই, ভাস্করদা। তবে আমি জানি ওদের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণই নেই।

মন্ত্রী ভাস্কর বোস মৃদু হাসেন। তারপর বললেন, এভিডেন্স না থাকলে তো আদালত থেকেই ওরা ছাড়া পাবে। তা'হলে এত ভাবনার কি আছে?

মন্ত্রীর কথায় পরীক্ষিৎ যে তেমন খুশি হতে পারেন নি তা' তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। তবুও তিনি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার চলুন ভাস্করদা, লাঞ্চ রেডি।

—হ্যাঁ চলো। বলে মন্ত্রী ভাস্কর বোসও উঠে দাঁড়ালেন।

মাঠের একপ্রান্তে একটা স্কুল। ছুটির দিনে এই স্কুলের মাঠেই মহড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। লাঞ্চের ব্যবস্থাও হয়েছে স্কুলের মধ্যে।

বিরাট খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। কলকাতা থেকে মন্ত্রীর সঙ্গেই এসেছেন ছয়-সাত জন ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রীর সি-এ, তাঁর গার্ড ও ড্রাইভার এবং দলের কিছু কর্মী। তা'ছাড়া, গাঁয়ের কিছু গণ্যমান্য মাতব্বরও নিমন্ত্রিত। তার ওপর জেলার এস-পি এবং এস-ডি-পি-ও সমেত আরও পাঁচ-সাতজন পুলিশ অফিসারও লাঞ্চে যোগ দেবেন।

আর-জি-পার্টির র‍্যালিতে স্বয়ং মন্ত্রী যোগ দেবেন। কাজেই আগে থেকেই তাঁর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। জনা চল্লিশেক কন্‌স্টেবল সেই শেষরাত থেকে স্কুলবাড়ি, মাঠ ও গ্রামের রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিল। সদলবলে মন্ত্রী এবার এগিয়ে চললেন স্কুল বাড়ির দিকে।

দলটি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই এস-পি দিবাকর সেন তাঁর হাতের ব্যাটনখানা বগলে রেখে রুদ্রকে বললেন, ওয়েল ভট্‌চায, লেট আস অল্‌সো প্রসিড্।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে রুদ্র। ঐ চালকল মালিকদের পয়সায় আয়োজিত ভোজসভায় সে যোগ দেবে কিনা তাই বোধহয় মনে মনে চিন্তা করে। পরক্ষণেই তার মনে হলো, এমন একটা পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকাই ভালো। তাই সে দিবাকরকে বললে, হ্যাঁ স্যার, চলুন।

মন্ত্রীকে মধ্যে রেখে দলটি এগিয়ে চলেছে। দলের পেছন দিকে চলেছেন পোশাক পরা এস পি এবং এস-ডি-পি-ও। তারও পরে এই এলাকার সার্কেল ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা।

স্কুল বাড়ির সামনে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা কনস্টেবলরা দাঁড়িয়ে। হাতে তাদের ছোট লাঠি। দলের মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রী ও সেই সঙ্গে জেলার এস-পি এবং মহকুমার এস-ডি-পি-ও। কাজেই দলটি কাছে আসতেই কন্‌স্টেবলেরা অ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। প্রখর রোদের তাপে তাদের মুখগুলো

শুকিয়ে উঠেছে। মাথার ব্যারেট ক্যাপের ফাঁকে কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।

স্কুল বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দলটি ওপরে উঠতেই রুদ্র পাশ কাটিয়ে একজন কনস্টেবলের সামনে এসে দাঁড়ায়। দিবাকর জিজ্ঞেস করেন, কি হল ভট্চায?

—তেমন কিছু নয় স্যার, আপনি যান, আমি আসছি। জবাব দেয় রুদ্র।

এস-পি দিবাকর সেন ভাবলেন যে কনস্টেবলটির পোশাক পরিচ্ছদে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করেই বোধহয় এস-ডি-পি-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাই তিনি আর কিছু না বলে দলটিকে অনুসরণ করেন।

এস-ডি-পি-ও সাহেবকে নিজের সামনে থমকে দাঁড়াতে দেখে কনস্টেবলটি বাস্তবিকই ঘাবড়ে যায়। সে কেবল আরও শক্ত হয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। পেছনের পুলিশ অফিসারের দলটিও এসে দাঁড়ায় রুদ্রর পেছনে।

রুদ্র কনস্টেবলটিকে জিজ্ঞেস করে, কি নাম আপনার?

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় কনস্টেবল, পতিতপাবন সরকার।

—কখন থেকে ডিউটিতে আছেন?

এবার কনস্টেবলটি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, সেই ভোর থেকে, স্যার।

রুদ্র আর কিছু না বলে নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। বেলা তখন দুটো।

রুদ্র এবার পেছনে দাঁড়ানো সার্কেল ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞেস করে, ফোর্সের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও এরা করেছে নাকি?

—না স্যার, তেমন কিছু তো শুনি নি। জবাব দেয় ইন্সপেক্টর।

—ও—আচ্ছা। কথাটা বলে রুদ্র সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। তাকে অনুসরণ করে অন্য অফিসারেরা।

পরীক্ষিৎ তরফদার সতর্ক মানুষ। চারিদিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। রুদ্রকে দেখতে না পেয়ে বাইরে আসছিলেন তিনি। বারান্দায় তাকে দেখেই তিনি বলে ওঠেন, এই যে এস-ডি-পি-ও সাহেব। আপনাকেই খুঁজছি আমি।

—কেন বলুন তো? মিনিস্টার আবার তলব করেছেন নাকি?

রুদ্রর কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন খোঁচাটুকু ছিল সেটুকু না বোঝার মত বোকা পরীক্ষিৎ নন। মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে তাঁর। একটু সময় চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আপনি বোধহয় মনে করেছেন আমি মিনিস্টারের কাছে আপনার সম্পর্কে বলেছি। কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই তা নয়। তবে এটা ঠিক, আপনি আমাদের সঙ্গে তেমন একটা সহযোগিতা করছেন না।

শান্ত কণ্ঠে রুদ্র বললে, সহযোগিতা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন

আমি জানি না। তবে সহযোগিতার অর্থ যদি আপনাদের কথামত চলাকে বোঝায় তা'হলে আমি স্পষ্টই বলছি যে তেমন সহযোগিতা আপনারা আমার কাছ থেকে পাবেন না।

—পুলিশ বিভাগে চাকরি করে আপনি বলছেন যে আমাদের সহযোগিতা চান না?

—নিশ্চয়ই চাই। তবে বে-আইনী পথে নয়।

রুদ্রর কথার ধরনে পরীক্ষিৎ মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। রুদ্র থামতেই তিনি একটা কড়া কথা বলতে গিয়েও কিন্তু শেষ পযন্ত নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর পাকা অভিনেতার মত বললেন, এই দেখুন, এই খাওয়ার সময় আপনার সঙ্গে দিব্বি তর্ক জুড়ে দিয়েছি। কিছু মনে করবেন না মিঃ ভট্চায। চলুন, চলুন, আগে খেয়ে-দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করুন, তারপর তর্ক করা যাবে। আরে মশাই, আপনারা যে আজ আমাদের গেস্ট।

প্রচুর আয়োজন করেছে চালকল মালিকেরা। লম্বা টেবিলের মাঝখানে বসেছেন মিনিস্টার। ডাইনে বাঁয়ে তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা। মন্ত্রীর পাশেই পরীক্ষিতের আসন। তাঁর মুখোমুখি টেবিলের উল্টো দিকে বসেছেন দিবাকর ও রুদ্র।

এস-পি দিবাকর সেন বরাবরই খাওয়া-দাওয়া করতে ভালোবাসেন। এখানকার আয়োজন দেখে তিনি খুবই খুশি। নীচু কণ্ঠে রুদ্রর সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাদ্য-বস্তুর ওপর চোখ রেখে তিনি একটার পর একটা আইটেম খেয়ে চলেছেন।

হঠাৎ রুদ্রর দিকে নজর পড়তেই তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, ওকি ভট্চাজ, আপনি যে এখন পর্যন্ত খেতেই আরম্ভ করেন নি, ব্যাপার কি?

বাস্তবিকই তাই। মনটা ভারি হয়ে থাকলেও লোক দেখানো গোছের সামান্য কিছু মুখে দেবার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু সহসা সেই কন্স্টেবল পতিত পাবন সরকারের শুকনো মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আর কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে হলো না। এ কেমন ব্যবস্থা! অফিসারেরা এখানে বসে রকমারি মুখরোচক খাবার দিয়ে খিদে মেটাচ্ছে, আর ওদিকে একদল কন্স্টেবল পেটের খিদে পেটেই চেপে রেখে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে। সেই সাত সকালে ডিউটিতে এসে এখন পর্যন্ত এক ফোঁটা চা-ও বোধহয় কারুর পেটে পড়েনি। এখানে এত লোকের আয়োজন হয়েছে কিন্তু বাইরের ঐ নীচুতলার কর্মচারীদের কথা কেউ ভাবে নি। এমন কি জেলার খোদ পুলিশ সাহেবও

নন। তিনি নিজে দিব্বি মনের আনন্দে খেয়ে চলেছেন। ইনিই হচ্ছেন জেলার পুলিশ বাহিনীর কর্তা। এঁকেই শ্রদ্ধা করবে তারা, এঁকেই মান্য করবে। এঁর আদেশ শিরোধার্য করেই তাবা ঝাঁপিয়ে পড়বে বিপদসংকুল কাজে। ইনিই প্রয়োজন হলে তাদের শাসন করবেন, তাদের শাস্তি দিয়ে ফোর্সের ডিসিপ্লিন বজায় রাখবেন।

রুদ্রর ধারণা, জেলার যে পুলিশ সাহেব তার বাহিনীর কর্মীদের সুখ দুঃখের কথা ভাবেন না, তাঁর কোন এক্তিয়ার নেই তাদের শাসন করার, তাদের শাস্তি দেওয়ার। শাস্তি দেওয়ার অধিকার কেবল তারই আছে যে নাকি ভালোবাসতে পারে। এই ডিপার্টমেণ্টে কোথায় সেই ভালোবাসা?

দিবাকরের প্রশ্নে নিজের ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে রুদ্র তাকায় দিবাকরের মুখের দিকে। লক্ষ্য করে, টেবিলের অপর প্রান্তে পরীক্ষিৎও খেতে খেতে আড চোখে তার দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ রুদ্র একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলে ফেলে। বললে, আজ সকাল থেকেই শরীরটা ভালো নেই, স্যার। এখন এই খাবার দেখে কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠছে। এক গ্লাস জল ছাড়া আব কিছুই খাবো না আমি। বলেই রুদ্র গ্লাসের জলটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, এক্সকিউজ মী স্যার, ফিলিং এক্সট্রিম্লি আন-ওয়েল। আপনার অনুমতি নিয়ে একটু বাইরে যাচ্ছি।

মন্ত্রী খেতে খেতে রুদ্রর দিকে তাকান। রুদ্রও আর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। মন্ত্রী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে এস্‌-পি'র দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই দিবাকর তাড়াতাড়ি জবাব দেন, আই সাপোজ, হি ইজ আন-ওয়েল, স্যাব।

— ও, আই সী। বলেই মন্ত্রী আবার নিজের খাবাবের দিকে মন দেন। কেবল পরীক্ষিতের ঠোঁটের কোণে একটু বিচিত্র হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। তার সেই মুহূর্তে মনে হয়, একটু আগে রুদ্রর সঙ্গে তাঁর সেই বাক-বিতণ্ডাই রুদ্রর এই না খেয়ে এখান থেকে উঠে যাওয়াব কারণ।

চাকরির একেবারে প্রথম দিকে পুলিশের উঁচু মহলের দুর্নীতির কথা যখন রুদ্রর কানে যেত তখন সে দুঃখিত হতো। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতো—ইফ গোল্ড রাস্ট্‌স হোয়াট্ শ্যাল আয়রন ডু? কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো দুর্নীতির মহলে জাত বিচার নেই। এ যুগে কেবল লোহাতেই নয়, পৃথিবীর যাবতীয় ধাতুতেই মরিচা পড়ে। লোহার বেলায় যেখানে দশে কাজ হয় সোনার বেলায় সেখানে হয়তো লাগে তার একশো গুণ অর্থাৎ হাজার। তফাৎ কেবল এটুকুই। তবে এ যুগে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা এমনই বিচিত্র যে বড়দের কথা সহসা পাঁচ কান হয় না, ছোটদের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত। তাই তো সেই ইংরেজি প্রবাদটির সৃষ্টি—"ছিন্ন-মলিন বেশ-বাসেব ফাঁকে ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি সহজেই বেরিয়ে আসে, কিন্তু দামী বেশভূষা বড় বড় অন্যায়কেও অতি সহজেই ঢেকে রাখে।"

রুদ্রর চারিত্রিক কাঠামোটা এযুগের পক্ষে বাস্তবিকই বেমানান। সেকালেব ঘুষখোর দাবোগা সোমেশ্বব ভট্টাচাযের পৌত্র হয়ে কেমন করে যে সে এমন একটা চরিত্রের অধিকারী হলো সেটাই আশ্চয। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় কৃতকায হয়ে যারা আই-পি-এস হয়ে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢোকে তারা নিশ্চয়ই ঘুষ খাওয়ার মতলব নিয়ে প্রথমটায় আসে না। পরিপার্শ্বিকতার চাপে কিম্বা লোভেব বশবর্তী হয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তরকালে এক একটি রাঘব বোয়ালে পরিণত হয়। চারিত্রিক দৃঢ়তায় যারা সেই লোভ জয় করে জীবনভোর সৎভাবে চাকরি করে যায় তাদের অধিকাংশই অন্যের অসততার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। প্রশাসনের পবিত্রতার দিক থেকে এটাকে বলা যায় তাদের নেগেটিভ এ্যাপ্রোচ। পরিস্থিতির চাপে নেগেটিভ এ্যাপ্রোচ নিতে বাধ্য হয় তারা। মনে মনে তারা অসহায় বোধ করে। ক্ষেত্রবিশেষে চেষ্টা করেও তারা লোহার মরিচা ঘষে মেজে তুলে ফেলে দিয়ে লোহাকে চকচকে করে তুলতে পারে না। কিন্তু এ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না তারা। পজেটিভ এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে না। তাদের সঙ্গে রুদ্রর পার্থক্য এখানেই। রুদ্র কিন্তু সময় পেলেই এ নিয়ে ভাবে—খুঁজে বেড়ায় পজেটিভ এ্যাপ্রোচ গ্রহণ

করার রাস্তা। পুলিশের মানসিকতার খোঁজ করতে এসে এ কী পাগলামিতে পেয়ে বসলো তাকে? সে কি জানে না যে পুলিশ হচ্ছে একটা দেশের জনসাধারণের আসল দর্পণ। পুলিশের সততা, কর্মনিষ্ঠার ব্যারোমিটারে একটা দেশের মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করা চলে? সে কি বোঝে না যে বর্তমান সমাজে যেখানে চারিদিকেই অসততার ঢেউ, সেখানে প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুলিশকে সৎ থাকতে বলার অর্থই হলো একজনের মুখে একখণ্ড মিশ্রি পুরে দিয়ে তাকে হুকুম দেওয়া—চুষবে, কিন্তু সাবধান, রস গিলতে পারবে না।

সমাজদেহে ঘুষ এমন একটা ব্যাধি যা নাকি অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে, আর ভবিষ্যতেও থাকবে। সমাজবিদরা যুগে যুগে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পান নি। কিন্তু পান নি বলে হাল ছেড়ে দেন নি তাঁরা কখনও। এই ব্যাধিকে দমন করে রাখতে তাঁরা চেয়েছিলেন। এখানেই রুদ্রদেবের প্রশ্ন। বর্তমান সমাজে এই ব্যাধিকে দমন করে রাখতে সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা কোথায়?

ঘুষ—উৎকোচ—নজরানা, যে নামেই একে ডাকা হোক না কেন এ জিনিসের প্রচলন বহুকালের। ভারতবর্ষে মুগল বাদশাদের আমলে নজরানা কিম্বা উপঢৌকন ছাড়া খাঁটি ঘুষও প্রচলিত ছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুখে যতই কেন না ধর্মের বুলি আওড়াতেন, ঐতিহাসিক নিকোলাও মানুচির মতে তিনি কেবল ঘুষই নিতেন না, প্রিয়পুত্র শাহ আলম দেশের আমীর ওমরাহদের উপকার করার বদলে যে ঘুষ পেতেন তার অংশও তিনি গ্রহণ করতেন অম্লান বদনে। ঔরঙ্গজেব তো মাত্র সেদিনের, পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় আজ থেকে প্রায় দু'হাজার সাতশো বছর আগে আসিরিয়ার শাসক অসুর-বানি-পাল ইলামাইট্সদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ কালে স্রেফ ঘুষের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কিন্তু তাই বলে অতীতে এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চেষ্টারও কোন ত্রুটি ছিল না। আজ থেকে প্রায় চার হাজার দু'শো বছর আগে ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন হাম্মুরাবি। তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, অর্থ কিম্বা শস্য ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করে কেউ যদি কোন মামলায় মিথ্যে সাক্ষ্য দেয় তা'হলে সেই মামলার নির্ধারিত শাস্তি তাকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রায় তিন হাজার চারশো বছর আগে ইজিপ্টের সম্রাট হার্মহাবের নির্দেশ ছিল, বিচারের কাজে কোন সরকারী কর্মচারী কিম্বা কোন পুরোহিত যদি উৎকোচ গ্রহণ করে তা'হলে তাকে গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুদণ্ড।

সেকালের এই সব রাজা বাদশারা ঘুষের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেও

কতটা সফল হয়েছিলেন সেকথা কিন্তু কোথাও লেখা নেই। ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন, কিন্তু সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেউ যদি সাক্ষ্য দিতে রাজি না হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান তিনি দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

ঘুষের মত মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া নিয়ে প্রশাসনের বিপদ চিরকালের। সাজানো সাক্ষীর সাহায্যে নিরপরাধের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে শাস্তি পাওয়ার ঘটনা এদেশে মোটেই বিরল নয়। এই বিদ্যায় পুরানো দিনের কিছু কিছু পুলিশ অফিসার যথেষ্টই পারদর্শী ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁদের যুক্তিও ছিল বড়ই অদ্ভুত। একটা লোক দিনের পর দিন অপরাধ করে চলেছে, কিন্তু পুলিশ চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারছে না। কাজেই এবার তাকে মিথ্যে সাক্ষ্যের জালে জড়িয়ে পাঠাও শ্রীঘরে। আইনের পথে ক্রিমিন্যালের কাছে পুলিশ যখন পরাজিত, তখন বে-আইনী পথে তার মোকাবিলা করো—এই ছিল সেকালের সেই পুলিশ অফিসারদের মনোভাব। কিন্তু তাঁরা ভুলে যেতেন যে অন্যায় দিয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা কোনকালেই চলে না। তাতে কেবল অন্যায়ের মাত্রাই বেড়ে চলে। একালেও যে দু'চারজন তেমন অফিসার ডিপার্টমেণ্টে নেই তা' নয়। তবে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। এর একটা কারণও আছে—সেকালে পুলিশের মধ্যে কাজের প্রতি খানিকটা নিষ্ঠা অন্ততঃ ছিল। সুখ্যাতির জন্যেই হোক, প্রমোশনের জন্যেই হোক কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হোক কোন হার্ড ক্রিমিন্যালকে কব্জা করতে না পারলে সেকালে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার মনে মনে লজ্জা বোধ করতেন। তাই বিফলতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তিনি মিথ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারস্থ হতেন। একালে ওসব লজ্জা কিম্বা বিফলতার গ্লানির বালাই প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই 'প্ল্যাণ্টেড এভিডেন্স' কথাটা এখন প্রায় উঠেই গেছে। সেকালে তাঁরা অন্যায় দিয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, আর একালের অধিকাংশ অফিসারদের মধ্যেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন মাথা ব্যথাই নেই।

সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবলের প্রয়োজন। দুর্বলকে দিয়ে সত্যকে তুলে ধরা যায় না। সাধারণভাবে বলতে গেলে এদেশের জনগণ চিরকালই সত্যবাদী। যদি পেছনে সবল রাজশক্তির সমর্থন থাকে তাহ'লে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তারা সত্য সাক্ষ্য দিতে ভয় পায় না। সেকালে সবল রাজশক্তির সমর্থন নিয়ে তারা ক্রিমিন্যালের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সাক্ষ্য দিতো। এ কালের অবস্থা প্রায় উল্টো। রাজশক্তি অর্থাৎ পুলিশের শক্তির চাইতে

ক্রিমিন্যালের শক্তিকে তারা সমীহ করে বেশি। বিশেষ করে সেই ক্রিমিন্যালেরা যদি পাড়ার মস্তান বাহিনীর সদস্য হয় তা'হলে তো কথাই নেই। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে একালে পাড়ায় বাস করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। পুলিশ একেবারেই শক্তিহীন। কাজেই দেখা যায় এই মস্তান-বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখতেই পাড়ার অধিবাসীরা ব্যগ্র। সাধারণ গৃহস্থ সার্বজনীন পূজোর নামে এদের স্ফূর্তির জন্যে চাঁদা জোগায়। 'চাঁদার ব্যাপারে জুলুম হলে থানায় খবর দিন' — প্রভৃতি পুলিশের ফাঁকা বুলিতে কর্ণপাত করে না তারা। ব্যবসাদার শান্তিতে ব্যবসা করার গ্যারান্টি পায় এই মস্তান বাহিনীর কাছ থেকেই। প্রতিদানে প্রতি মাসে নিয়মিত একটা মোটা টাকা দিতে হয় এদের। ভাড়াটে উচ্ছেদের জন্যে বাড়িওয়ালা বছরের পর বছর ধরে কোর্ট কাছারিতে জলের মত অর্থব্যয় না করে কিছু টাকার বিনিময়ে এদের সাহায্যেই ভাড়াটে উচ্ছেদ করে অনায়াসে। পাড়ার বাসিন্দাদের ওপর পুলিশের চাইতে এদের প্রভাব অনেক বেশি। বলতে গেলে, এলাকার একটা প্যারালাল পুলিশবাহিনী এরা। এদের ঠাট-বাট, চাল-চলন ও অর্থ সামর্থ্যের প্রাচুর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতি বয়সের ছেলেরাও এদের অনুকরণ করার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। এছাড়া রাজনৈতিক দাদাদের এদের ওপর নেকনজর তো আছেই।

দেশের এই পরিস্থিতিতে রেশন দোকানের মালিক সত্য সাধুখাঁর অভিযোগ যে আদালতে প্রমাণিত হবে না সে তো জানা কথা। থানার মেজবাবু অসিত মুখার্জী তদন্তের ব্যাপারে একটুও গাফিলতি করে নি। চারিদিকে আট-ঘাট বেঁধেই সে মামলায় চার্জসীট দিয়েছিল। কিন্তু বিচারের সময় আদালতে দেখা গেল সাক্ষীরা গোলমাল করছে। এই গোলমাল যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে পুলিশ প্রসিকিউটরের দেরি হলো না, কিন্তু তিনি অসহায়। কাজেই পরীক্ষিৎ তরফদারের স্নেহধন্য সুকান্ত ও হারু সসম্মানে খালাস পেল। খবরটা কানে যেতেই ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দী মেজবাবু অসিতকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, আমি জানতাম, এ মামলা টিঁকবে না। এই মামলাটা নিয়ে এস-ডি-পি-ও সাহেব ঝুটমুট ঝামেলা পাকিয়েছিলেন। চুনকালি পড়লো তো পুলিশের মুখে!

রাজেন নন্দীর কথায় মনে হচ্ছিল এলাকার ক্রাইম চাপা দিয়ে পুলিশ সাহেবের মনোরঞ্জন করার পারদর্শীতায় ও রাজেন নন্দীর ছত্রচ্ছায়ায় থানার অন্য অফিসারদের আপন আপন পকেট ভারি করে তোলার প্রচেষ্টায় পুলিশের মুখে চুনকালি পড়তে যেন কিছু বাকি ছিল।

খবরটা শুনেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো রুদ্রদেব। সে স্পষ্ট বুঝতে

পারলে এই খবরে একমাত্র সে নিজে ও মেজবাবু অসিত মুখার্জী ছাড়া পুলিশ বিভাগে আর কেউ দুঃখিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই যখন অবস্থা তখন এই ডিপার্টমেন্টের ভালো মন্দ নিয়ে তার পক্ষে মাথা ঘামানো একেবারেই অর্থহীন। সীমিত ক্ষমতায় সে একা কি করতে পারে? একটা প্রচণ্ড তমসার ঘোরে অন্ধ হয়ে রয়েছে এই বিভাগের অধিকাংশ মানুষ। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলেছে তারা। ছোট বড় প্রত্যেকেই আপন আপন চাকরি বাঁচাতেই ব্যস্ত। এর বেশি ভাববার মত মানসিকতা তাদের নেই।

সময় সময় রুদ্রর নিজের ওপরই নিজের রাগ হয়। এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে লাভ কি তার? চাকরি করতে এসেছে, সৎভাবে চাকরি করে গেলেই তো তার চলে। এর বেশি তো কেউ কিছু তার কাছে প্রত্যাশা করে না। জনসাধারণও নয়, সরকারও নয়। পুলিশ বিভাগ তো নয়ই। এসবের জন্যে দেশে পলিসি-মেকারের অভাব নেই। সেই নব-চৈতন্যদেবেরা চিন্তা করবেন কেমন করে এই ডিপার্টমেণ্টটাকে পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে টেনে তোলা যায়।

অভিমানে মনটা ভারি হয়ে ওঠে রুদ্রদেবের। এ অভিমান যে ঠিক কার ওপর তা' কিন্তু সে বুঝতে পারে না। মাসখানেক একেবারে চুপচাপ থাকে সে। নিয়মিত কাজটুকু ছাড়া আর কোনদিকে সে মন দেয় না। কিন্তু যার মনের কাঠামোটাই ন্যায় নিষ্ঠা ও কর্তব্যের উপাদানে তৈরি, যে সত্যিকারের সুন্দর ও মঙ্গলের পূজারী তার পক্ষে কেবলমাত্র নিয়মিত কাজটুকুর মধ্যে নিজেকে আটকে রাখা বেশিদিন সম্ভব নয়।

জেলার পুলিশী প্রশাসন চলছে পুলিশ সাহেবের নির্দেশে। থানার এলাকাগুলোর শান্তি শৃঙ্খলার ভার থানায় যারা চার্জে রয়েছে তাদের ওপর। এর মধ্যে সার্কেল ইন্সপেক্টর কিংবা এস-ডি-পি-ও প্রভৃতি পোস্টগুলোর ভূমিকা অনেকটাই গৌণ। সুপারভাইজিং অফিসার এরা। নিজেরা যতটা কাজ করে তার চাইতে অন্যের কাজের তদারকি করতে হয় বেশি। নৈবেদ্যের কলার মত না হলেও মালিকের পক্ষে কুলীর সর্দারী করার মত। সব কাজে এগিয়ে গিয়ে নিজের কাঁধে দায়িত্ব না নিলেও চলে।

কিন্তু রুদ্রর পক্ষে তা' সম্ভব নয়। এটা তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান। তাই এই এলাকায় সাট্টাখেলা ও মদের আড্ডার খবর যখন তার কানে আসে তখন বিষয়টা ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর ওপর ছেড়ে দিয়ে চুপ করে সে থাকতে পারে না। তা'ছাড়া রাজেন নন্দীকে বলেও যে কোন লাভ নেই তাও রুদ্র

জানে। থানার অফিসারেরা সত্যিকারের এ্যাকৃটিভ হলে কোন থানা এলাকায় এসব যথেচ্ছভাবে চলতে পারে না। রাজেনের এই ইন্‌এ্যাকশন যে ইচ্ছাকৃত তাও জানে রুদ্র। প্রতি সপ্তাহে যেখান থেকে মোটা টাকা এসে জমা হয় থানার তহবিলে সেখানে রাজেনের মত অফিসার যে কোনকালেই খোঁচাখুঁচি করতে যাবে না, এ তো জানা কথা।

কিন্তু তাই বলে রুদ্র চুপ করে থাকতে পারে না। ইতিমধ্যেই সে নিজে কয়েকজন সোর্স ঠিক করে ফেলেছে। এরা তার একান্তই নিজস্ব সোর্স। এদের মাধ্যমে সে এলাকার অনেক খবরই জোগাড় করে।

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার করা বড়ই কঠিন। ক্রাইম ও ক্রিমিন্যাল নিয়ে যাদের কারবার তাদের ব্যাপারে হিসেব-নিকেশও একটু ভিন্ন ধরনের। এই সোর্স অর্থাৎ সাদা কথায় গুপ্তচরের ব্যাপারটাই তার একটা প্রমাণ। পুলিশের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যারা সোর্সের কাজ করে তাদের সংখ্যা খুবই কম। পুলিশ আর তাদের ক'টা পয়সা দিতে পারে? অধিকাংশই দলের খবর পুলিশকে জানিয়ে দেয় রেষারেষির পরিণতিতে। পুলিশ বিভাগে এই ধরনের সোর্সরা সময় সময় অনেক মূল্যবান খবর দিয়ে পুলিশকে সাহায্য করে। পুলিশী কাজ-কর্মের সফলতার আসল চাবিকাঠি এরাই। যে অফিসারের হাতে যত ভালো সোর্স থাকে, কাজ-কর্মে সেই অফিসারই তত সাকসেসফুল। গোটা এলাকাটা থাকে তার নখদর্পণে। এমন যে মূল্যবান সোর্স, সে তার কাজের বিনিময়ে পুলিশের কাছ থেকে কি কেবলমাত্র গোটাকয়েক টাকা পেলেই সন্তুষ্ট? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নয়। সে চায় কিছু লাইসেন্স—ক্রাইম করার কিছু সুবিধা। সেকালের পুলিশ অফিসারেরা তাদের সেই লাইসেন্স দিতেন। সোর্সকে একটা ক্রাইম করার সুযোগ দিয়ে দশটা ক্রাইমের মূল্যবান খবর জোগাড় করতেন তাঁরা। এমনিভাবে সোর্স ট্যাকল করতে বুকের পাটার দরকার হতো। একালের অফিসারদের তেমন বুকের পাটা নেই। সোর্স ক্রাইম করলে তাকে শেলটার দিতে যে বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার প্রয়োজন তা তাদের নেই। আর থাকলেও সেসব ঝঞ্ঝাটে তারা যেতে চায় না। তাছাড়া এযুগে নিত্য নতুন ক্রিমিন্যাল গ্যাংয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। ফ্লোটিং ক্রিমিন্যাল অর্থাৎ ভ্রাম্যমান অপরাধীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। কাজেই সেকালের মত একালের পুলিশ ক্রিমিন্যালদের সঠিক কোন খবরই রাখে না। আর, রাখলেও তাদের পাকড়াও করে বিচারের জন্যে আদালতে পাঠানো ও তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে একালে নানা ধরনের দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়

যা নাকি সেকালে ছিল না। তার বদলে কিছু না করেও যেখানে চাকরি বজায় থাকে এবং নানা ভাবে পকেট ভারি করার ব্যবস্থাও অটুট থাকে, সেখানে সেই পথে যাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। সেই কাজই করে চলেছে একালের অধিকাংশ পুলিশ। আই-পি-এস পুলিশ সাহেব থেকে শুরু করে নীচের কনস্টেবলটির মনোভাব পর্যন্ত এই একই সূত্রে বাঁধা। এর বাইরে মুষ্টিমেয় যে ক'জন আছেন তাঁরা ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু নন। এই ব্যতিক্রমদের অন্যেরা সমীহ করে চললেও মনে মনে কিন্তু এদের বোকা বলেই ভাবে। এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেব ভট্টচার্য এই বোকাদেরই একজন।

সোর্সকে ক্রাইম করার সুযোগ দিয়ে তার কাছ থেকে খবর আদায় করার ব্যবস্থাকে কিন্তু সমর্থন করতে পারে না রুদ্রদেব। এক্ষেত্রেও কিন্তু তার সেই একই যুক্তি। অন্যায়ের সাহায্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সোর্স তার কাজের জন্যে পুলিশের কাছ থেকে অন্য কোন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে ক্রাইম করতে দেওয়া পুলিশের পক্ষে ঘোরতর অন্যায়। আপাতদৃষ্টিতে এর কিছু ভাল ফল হলেও পরিণাম এর কিছুতেই ভালো হতে পারে না। অসৎ অথচ কর্মঠ ব্যক্তি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের মুখ যতই গৌরবোজ্জ্বল করে তুলুক, পরিণামে কিন্তু সে সৎ অথচ অকর্মণ্য পুলিশের চাইতে ডিপার্টমেণ্টের বেশি ক্ষতিই করে থাকে। শুধু ডিপার্টমেণ্টের কেন গোটা সমাজেরই ক্ষতি করে সে। অসততা রূপ বিষের তীব্রতা বড়ই ভয়ঙ্কর। মানবদেহে ক্যান্সারের মত এই বিষ অতি দ্রুতগতিতে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সমাজদেহে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। কর্মনৈপুণ্যের আবরণে অসততার বিষকে ঢেকে রাখা যায় না।

সোর্সের মাধ্যমে সাট্টা খেলা ও মদের আড্ডার খবর কানে যেতেই মনটা আন্‌চান্ করে ওঠে রুদ্রদেবের। থানায় কোন খবর না দিয়ে রুদ্রদেব সোজা মহকুমার আর্মড ফোর্স থেকে একজন সুবেদার ও কিছু কনস্টেবল নিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আড্ডায়। এমনিভাবে মাঝে মাঝেই সে হামলা চালাতে শুরু করে সেই মদের আড্ডা ও সাট্টার জুয়ারীদের ওপর।

সোরগোল পড়ে যায় সেই অন্ধকারের কারবারীদের মধ্যে। এমনিভাবে চললে যে ব্যবসা লাটে উঠবে। পয়সা-কড়ি ছড়িয়ে থানাকে ঠাণ্ডা রাখতে পারলেও এই ছোকরা এস-ডি-পি-ওকে ঠাণ্ডা করা যাবে কেমন করে?

রুদ্র প্রথমদিন বেশ কিছু ছোকরাকে সাট্টা খেলার অপরাধে ধরে নিয়ে থানায় এসে ঢুকতেই ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর টনক নড়ে ওঠে। সর্বনাশ, এখন-

উপায়? এই লোকটির জ্বালায় যে ধনে-প্রাণে মরতে হবে তাদের। সে যদি এদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাই করতে না পারলো, তা'হলে তারা সপ্তাহান্তে নোটের গোছা নিয়ে থানায় আসবে কেন? ছোকরাদের মধ্যে শহরের দু'চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তির ছেলেরাও ছিল। তারা মুখে কিছু না বলে প্রায় কৈফিয়ৎ তলবের ভঙ্গিতেই রাজেন নন্দীর দিকে তাকায়। তারা যেন বলতে চায়—এই জন্যেই কি আপনাদের নিয়মিত ভেট দিয়ে আসছি?

বিব্রত ভঙ্গিতে রাজেন নন্দী চোখের ইশারায় তাদের আশ্বাস দেয়। তারপর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মুখের ওপর জোর করে একটু হাসির রেখা টেনে বললে, কোত্থেকে এদের পেলেন, স্যার? আমরা তো চেষ্টা করেও এতদিন এদের ধরতে পারি নি।

—পারবেন কি করে বড়বাবু? আপনার থানার স্টাফ যে এদের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকতেই অভ্যস্ত। চক্ষুলজ্জার খাতিরেই রুদ্র থানা স্টাফের সঙ্গে রাজেন নন্দীকে যুক্ত করে না।

সঙ্গে সঙ্গে রাজেন নন্দী জবাব দেয়, ঠিক বলেছেন, স্যার। এদের নিয়ে কি করে যে চাকরি করছি তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

সেই মুহূর্তে রুদ্রর বলতে ইচ্ছে করছিল—একমাত্র ঈশ্বর কেন, আমি নিজেও জানি। কিন্তু কোন কথা না বলে রুদ্র কেবল মনে মনে একটু হাসে।

রুদ্র থানা ছেড়ে চলে যাবার আগে এই সাট্টার জুয়াড়ীদের পরের দিন আদালতে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে যায়। রাজেন নন্দীও সেই মুহূর্তে রুদ্রর সামনে এমন ভাব দেখায় যে এদের যথারীতি কোর্টে চালান দেওয়ার জন্যে সে নিজেও কতই না আগ্রহী।

রুদ্রদেব থানায় উপস্থিত থাকা পর্যন্ত থানার অন্যান্য কর্মচারীরা মুখ বুজেই ছিল। আমদানীর সূত্র বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল তারা। রুদ্র থানা ছেড়ে চলে যেতেই তারা নীচু কণ্ঠে রুদ্রর মুণ্ডপাত করতে শুরু করলে। একজন এ-এস-আই চাপা কণ্ঠে আর একজনকে বললে, ডিপার্টমেন্টে কত সতীই দেখলাম! এই শালা আবার এসেছে সতীপনা দেখাতে।

জবাবে অন্যজন বললে, আসল মতলব হচ্ছে ভাগ বসানো। তা' বাপু খোলাখুলি বললেই তো হয়। ছেলেগুলোকে ধরে এনে শুধু শুধু চালান দেওয়া কেন?

রুদ্র চলে যেতেই রাজেন নন্দীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে বিরক্ত ভঙ্গিতে চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে চাপা কণ্ঠে কেবল উচ্চারণ করে,

স্কাউণ্ড্রেল! আর, নিজের টেবিলে কাজ করতে করতে থানার মেজবাবু অসিত মুখার্জীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

সাট্টার পরে বে-আইনী মদের আড্ডা। তারপরে তাসের জুয়ো। রাজেন নন্দীকে না জানিয়ে একটার পর একটা আড্ডায় হামলা চালিয়ে অন্ধকারের কারবারীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে চলে রুদ্রদেব। সামাল—সামাল রব ওঠে চারিদিকে। অবশেষে আসরে আগমন ঘটে রাজনৈতিক দাদাদের। এবার আর পরীক্ষিৎ তরফদার নয়, পর্দার আড়াল থেকে চাপ আসতে থাকে। খোদ্ কলকাতা থেকে পুলিশ সাহেব দিবাকর সেনের মাধ্যমে রুদ্রর ওপর চাপ পড়তে শুরু করে। রুখে দাঁড়ায় রুদ্রদেব। না, কিছুতেই না, অন্যায়কে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। প্রশাসনের উঁচু মহলে তার নামে লাগিয়ে ভাঙিয়ে হয়তো তাকে এখান থেকে বদলি করিয়ে দেবে। বেশ তো, দিক্ না বদলি করে। বদলির চাকরি যখন, তখন বদলি তো হতেই হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এখানকার প্রশাসনিক দায়িত্ব তার ওপর রয়েছে ততক্ষণ সে এই বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে।

এই ব্যাপার নিয়ে রুদ্রদেবকে একদিন পুলিশ সাহেব সদরে ডেকে পাঠালেন। বললেন, চারিদিক থেকে বড়ই প্রেশার আসছে ভট্চায, একটু সামলে না চললে যে আর চলছে না।

দিবাকরের চোখে চোখ রেখে রুদ্র জবাব দেয়, মাপ করবেন স্যার, আমার এলাকায় এসব বে-আইনী কাজ কারবার চলবে আর আমি কেবল চোখ বন্ধ করে থাকবো তা' আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মৃদু হেসে দিবাকর বললেন, এসব ব্যাপারে আপনার মাথা গলাবার প্রয়োজন কি, ভট্চায? থানার চার্জে রাজেন রয়েছে, তার ওপরই ব্যাপারটা ছেড়ে দিন না।

—সে তো এতকাল চোখ বুজেই ছিল, আর ভবিষ্যতেও তেমনিই থাকবে। তাকে বিশ্বাস করা শক্ত।

—কিন্তু এতে যদি ভবিষ্যতে কোন কমোশন সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু ডিপার্টমেন্ট আপনাকেই ট্যাক্টলেস বলবে।

এস-পি'র কথায় রুদ্র একটু ম্লান হেসে বললে, অন্যায়ের দিকে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে আপনারা যদি আমাকে ট্যাক্টফুল বলেন, তা'হলে আমি স্পষ্টই বলছি স্যার, তেমন ট্যাক্টফুল অফিসার আমি হতে চাই না।

—এর ফলে ভবিষ্যতে আপনার সার্ভিস রেকর্ডে যদি কালো দাগ পড়ে?

—এর জন্যে তো পুলিশ বিভাগের কর্মীরা নিজেরাই দায়ী।

—হ্যাঁ স্যার, তারা তো দায়ী বটেই। তারা অকর্মণ্য, অপদার্থ, ঘুষখোর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন তারা এমন অকর্মণ্য হয়ে উঠলো, কেন তারা ঘুষখোর? কে তাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে? কেন দিয়েছে? মানুষ যেমন পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তেমনি এই ডিপার্টমেণ্টে এসেই একজন কর্মচারী অকর্মণ্য কিম্বা ঘুষখোর হয়ে ওঠে না।

—তা' ঠিক, বলতে থাকেন দিবাকর, আপনার মতে তবে এর জন্যে কে দায়ী?

—দায়ী এদেশের সমাজ, দায়ী এদেশের কর্ণধারেরা, আর—

—চুপ করলেন কেন ভট্চায, বলুন।

—আর দায়ী এই ডিপার্টমেণ্টের উঁচু মহল যারা নাকি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার পুলিশ কর্মীর সামনে কোন উঁচু আদর্শ তুলে ধরতে পারেন নি।

একটু হেসে দিবাকর বললেন, বেশ ভট্চায, আপনার কথাই না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন তাঁরা পারেন নি?

একটু থেমে রুদ্র বললে, জবাবটা অতি সহজ, স্যার। অতীতেও তাঁরা ছিলেন অনুপযুক্ত, আর এখনও তাই।

—কি বলছেন ভট্চায? তাঁরা সবাই অনুপযুক্ত? বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন দিবাকর।

—হ্যাঁ স্যার, স্পষ্ট জবাব দেয় রুদ্রদেব, আমি তাঁদের তাই মনে করি। কর্মী হিসেবে তাঁরা হয়তো উঁচুদরের, পুলিশের কাজে তাঁরা হয়তো বাস্তবিকই যোগ্য, কিন্তু গোটা বাহিনীর সামনে একটা আদর্শ সৃষ্টি করার অনুপযুক্ত তাঁরা। একটা মহান্ আদর্শ সৃষ্টি করতে হলে মানুষের সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন তা' তাঁদের সেকালেও ছিল না, একালেও নেই।

—কি সেই গুণ? কৌতূহলী হয়ে ওঠেন দিবাকর।

শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্রদেব, ভালোবাসা—ডিপার্টমেণ্টকে সত্যিকারের ভালোবাসা। এর ভালো-মন্দ, সুনাম-দুর্নামের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তোলা। ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি কর্মীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার ঐকান্তিকতা।

দিবাকর আর কোন প্রশ্ন করেন না। রুদ্রও চুপ করে থাকে। বাইরের জানালা দিয়ে একফালি পড়ন্ত রোদের আলো এসে পড়ে দেয়ালে টাঙানো

নেতাজীর একখানা ছবির ওপর। সামরিক পোশাকে নেতাজী অভিবাদন করছেন কাকে? সম্ভবতঃ তাঁর প্রাণের চাইতেও প্রিয় আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে —বাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে যারা নাকি একদিন তাদের প্রিয় নেতার সামান্য ইঙ্গিতে হাসতে হাসতে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারতো।

রুদ্র একসময় নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, ইফ্ ইউ পারমিট, আমি এবার উঠি, স্যার?

চম্‌কে দিবাকরও সোজা হয়ে বসেন। তারপর একটু হাসতে চেষ্টা করে বললেন, ইয়েস—ইয়েস। আপনি এবার আসুন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্র আবার বললে, সবদিক সামলে চলতে চেষ্টা করবো, স্যার।

—থ্যাঙ্ক ইউ, ভট্‌চায।

হাতের টুপি মাথায় পরে সোজা হয়ে দিবাকরের সামনে দাঁড়ায় রুদ্রদেব। তারপর তাঁকে স্যালুট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। দিবাকর কয়েক মুহূর্ত তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে কাগজপত্রের দিকে মন দেন।

মাঝে মাঝে নিজেকে বড়ই একা মনে হয় রুদ্রর। সংসারে সে বাস্তবিকই একা। নবনীতা সেই যে চলে গেছে আর ফিরে আসে নি। ধনী বাপের একমাত্র আদুরে মেয়ে এই পরিবেশের মধ্যে বাস করতে ফিরে আসবেই বা কেন? মোহভঙ্গ ঘটেছে তাদের। হয়তো ভেবেছিল, ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের অফিসার যখন, তখন নিশ্চয়ই হোমরা-চোমরা কেউ-কেটা গোছের একজন হবে। সামনে লনওয়ালা মস্ত সরকারী কোয়ার্টার, গণ্ডা গণ্ডা আর্দালি কনস্টেবল রাতদিন খিদমতগারিতে ব্যস্ত। সাহেবের জন্যে তো বটেই, এমনকি মেমসাহেবের জন্যেও সরকারী গাড়ির ঢালাও ব্যবস্থা। আর অর্থের অনটন তো কোন কালেই হবে না। সাহেবের অঙ্গুলি হেলনে বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসারেরা সাহেবের ইচ্ছা-পূরণে ছোটাছুটি শুরু করে দেবে। মেমসাহেব যখন কোথাও যাবেন তখন ড্রাইভারের পাশে থাকবে ঝকঝকে তকমাওয়ালা

পুলিশ গার্ড—সেকালের জমিদার গৃহিণীর ঘোড়ার গাড়ির পেছনে দাঁড়ানো চাপরাশির মত একেবারে রাজসূয় ব্যাপার। কাজেই রুদ্রদেবের এই কোয়ার্টারে এসে নবনীতার মোহভঙ্গ হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তার ব্যবসায়ী বাবাকে রুদ্রদেব একেবারেই নিরাশ করেছে। কাজেই তাঁর পক্ষে কন্যাকে এখানে পাঠানো তো একেবারেই অসম্ভব।

কেবল পারিবারিক ক্ষেত্রে নয় চাকরির ক্ষেত্রেও নিজেকে বড়ই একা বলে মনে হয় তার। চারিদিকে এত পুলিশ বাহিনীর কর্মী, কিন্তু তবুও যেন রুদ্র একা। মনের দিক থেকে এদের অধিকাংশের সঙ্গেই তার মেলে না। মিশতে চাইলেও মিশতে পারে না তাদের সঙ্গে। এর জন্য রুদ্র নিজেকেই দায়ী মনে করে। দোষ সম্পূর্ণ তার নিজের। এরা তাকে বিশ্বাস করে না ঠিকই, কিন্তু সে নিজে কি তাদের বিশ্বাস করে? তার কেবলই ভয়, এরা তার বিশ্বাসের মর্যাদা দেবে না। হয়ত ঠিকই তাই। কিন্তু তবুও তাদের বিশ্বাস করতেই হবে। বিশ্বাস না করলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। বিশ্বাসের অমর্যাদা ঘটলে রুদ্র মনে ব্যথা পাবে ঠিকই, তবুও মনের ব্যথা-বেদনা মনেই চেপে রেখে নির্ভর করতে হবে তাদের ওপর। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে চলবে না। ভুললে চলবে না পুলিশ বিভাগের এই কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশ অসৎ হলেও তারা সবাই মানুষ। অন্যায়ের কুয়াশায় আবৃত তাদের মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস ও নির্ভরতার আলোয় জাগিয়ে তুলতে হবে। আসবে অনেক ঝড় ঝাপটা, আসবে প্রচণ্ড প্রতিরোধ, কিন্তু পিছু হটলে চলবে না। অবশেষে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে তাকে, নির্ভর করতে পারবে তার ওপর। প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে সেদিন। সেদিন আর তাদের উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না যে তোমরা জনগণের সেবক, জনসাধারণের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে তোমাদের। সেদিন আর তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না যে জনসাধারণের পয়সায় তোমরা প্রতিপালিত। সেদিন তারা নিজেরাই এসে দাঁড়াবে তাদের পাশে। বুকের রক্ত ঢেলে তারা দুর্বলকে রক্ষা করবে, আঘাত করবে দুর্জনকে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে সমাজকে করে তুলবে কলঙ্ক মুক্ত। সেদিন আসবেই। সেকালের ঘুষখোর দারোগা সোমেশ্বর ভট্টাচাযের নাতি একালের আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তেমন দিন আসবে।

তবুও কিন্তু মাঝে মধ্যে অনুশোচনার সূক্ষ্ম বাষ্পের এক মিহি আবরণ তার মনটাকে ঘিরে ধরে দুর্বল করে ফেলতে চেষ্টা করে। সন্দেহ জাগে নিজের ওপর।

তা'হলে কি সে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢুকে ভুল করেছে? এই বিভাগে চাকরিই তো তার ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তির কারণ।

কিন্তু তেমন কোন বেশি আশা তো সে কোনদিন করে নি। সহপাঠিনী অলকাকে সে আপন করে পেতে চেয়েছিল। পেতও হয়তো, যদি সে এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের চাকরি ছাড়া সরকারী বে-সরকারী অন্য যে-কোন বিভাগে চাকরি করতো। অন্ততঃ অলকা সেদিন একথাই বলেছিল। রাজনৈতিক নেত্রী একমাত্র পুলিশ বিভাগ ছাড়া অন্য যে-কোন বিভাগের একজন পুরুষের সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। তারপর এলো নবনীতা। রুদ্রদেব ভেবেছিল নবনীতাকে নিয়েই সে সুখের সংসার গড়ে তুলবে। কাজকর্মে সে রুদ্রকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ জোগাবে। কিন্তু তাও হলো না। পুলিশ বলে নয়, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাতে সে নারাজ বলেই নবনীতা চলে গেল তার বাবার কাছে। রুদ্রর কথা একবার চিন্তাও করলো না।

বেশ তো, কাউকেই চাই না তার। জীবনটাকে সে একাই নিজের লক্ষ্য-পথে টেনে নিয়ে যাবে। কারুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। পুলিশ বিভাগের চাকরি ছেড়ে দিলে হয়ত সে অলকাকে পেতে পারতো। আবার নবনীতার বাবার কথায় সায় দিয়ে চাকরিতে রেজিগ্‌নেশন দিলে সে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন কেউকেটা হয়ে বসতেও পারতো। পুলিশ বিভাগের এই চাকরিটাই যেন তার জীবনের দুষ্টগ্রহ। কিন্তু না, কিছুতেই না। এই দুষ্টগ্রহকে নিয়েই সে থাকবে। দেখবে দুষ্টগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রকোপ এড়িয়ে সে জীবনের পথে চলতে পারে কি না।

পুলিশ বিভাগে ট্র্যাফিক পুলিশের কাজই বোধহয় সব চাইতে বেশি থ্যাঙ্ক্‌লেস। শীত-গ্রীষ্ম, রোদ-বর্ষা কিম্বা ঝড়-ঝঞ্ঝায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে ট্র্যাফিক কনস্টেবল ডিউটি করে তার ওপর পথচারীদের মধ্যে কিম্বা রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার মালিক, ড্রাইভার কিম্বা আরোহীদের মধ্যে কেউ কখনও খুশি হয়েছে বলে বড় একটা শোনা যায় না। পথচারীকে রাস্তার বদলে ফুটপাথ ধরে চলতে কিম্বা জেব্রা ক্রসিংয়ে রাস্তা পার হতে অনুরোধ করলে অনেকেই মনে মনে গালাগালি দিয়ে বলে ওঠে—হুঁ, ব্যাটা জ্ঞান দিতে এসেছেন! ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গকারী গাড়ির নম্বর টুকতে দেখলে অনেকেই তার দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে মারে—পয়সা পায় নি বলেই ব্যাটা নম্বর টুকছে। এমনকি বে-আইনী মালের পাহাড় দিয়ে লরী বোঝাই করে এবং একহাতে স্টিয়ারিং ও অন্যহাতে প্রতিটি ট্র্যাফিক পোস্টে একখানি করে সিকি ছড়াতে ছড়াতে যে ড্রাইভার পুলিশের হাত থেকে

নিষ্কৃতি লাভ করে এগিয়ে যায় সে-ও কিছুদূর গিয়েই গালাগাল দেয় পুলিশের উদ্দেশে। চৌ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে কনস্টেবল ট্র্যাফিক কণ্ট্রোল করে, অধৈর্য বাস-যাত্রীরা তার কাজেও মন্তব্য করতে ছাড়ে না—ব্যাটা হাত তুলেছে তো আর নামাবার নাম করে না! ব্যাটাদের কাণ্ডকারখানাই এমনি! বিরক্ত যাত্রীরা এটুকু বোঝে না যে সেই মুহূর্তে ট্র্যাফিক কনস্টেবল অন্য যে গাড়িগুলোকে পাস করাচ্ছে সে গাড়িতেও তাদের মত যাত্রীই রয়েছে।'

এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেবের এই ছোট মহকুমা শহরে কলকাতার মত ট্র্যাফিক সমস্যা না থাকলেও হাইওয়ে দিয়ে প্রচুর প্রাইভেট গাড়ি ও লরী যাতায়াত করে। সেগুলোকে কণ্ট্রোল করার জন্যে ট্র্যাফিক পয়েণ্টও রয়েছে অনেকগুলো।

তেমনি একটা পয়েণ্টে ডিউটি করছিল একজন কনস্টেবল। মাথার ওপর সাদা কাপড়ের একটা ছাতা থাকলেও প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাপটে বেচারার গায়ের খাকি জামাটা ঘামে ভিজে উঠেছিল। চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ির স্রোত। দু'হাত উঠিয়ে-নামিয়ে ডিউটি করছিল কনস্টেবলটি। বয়সে লোকটি প্রবীন। লাল ব্যারেট ক্যাপের ফাঁকে পেছন দিকে বেরিয়েছিল তার মাথার চুল যার অধিকাংশই সাদা। চাকরির মেয়াদ হয়তো শেষ হয়ে এসেছে তার। সারা মুখে-চোখে ক্লান্তির চিহ্ন। আসন্ন রিটায়ারের দিনে বিশ্রামের কথা ভাবতে ভাবতেই বোধহয় ডিউটি করছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে সে চিরবিশ্রাম নিতে চলেছে তা বোধহয় সে কল্পনাও করতে পারে নি।

হঠাৎ তিনটি যুবক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কনস্টেবলটির ওপর। বেচারা কিছু বুঝতে পারার আগেই যুবকেরা একসঙ্গে এলোপাথাড়ি ছুরি চালাতে থাকে তার সর্বাঙ্গে।

অসহায় কনস্টেবল পড়ে যায় রাস্তার ওপর। মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করার সুযোগও সে পায় না। তাজা রক্তে ভেসে যায় রাস্তা। গাড়ির আরোহী ও পথচারীদের নজর সেইদিকে পড়তেই তারা হৈ-চৈ করে ওঠে। কিন্তু তার আগেই যুবকেরা তাদের কাজ শেষ করে সেখান থেকে সরে পড়েছে। কেবল রেখে গেছে, কাগজে লেখা শ্রেণীশত্রু খতমের বিজ্ঞপ্তি।

এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি কিছুদিন আগে থেকেই ছড়িয়ে পড়ছিল সারা শহরে। লাল কালিতে লেখা এ ধরনের পোস্টার বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে। খাস কলকাতাতেও এরকম দু'টো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি এই ছোট শহরে ছড়িয়ে পড়বে তা বোধহয় কেউ-ই ধারণা করতে পারে নি।

খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। খবর পেয়ে ছুটে এল

থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ রাজেন নন্দী, ছুটে এল এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেব ভট্টাচার্য। খবর গেল জেলার পুলিশ সাহেব দিবাকর সেনের কাছে।

সবাই হতভম্ব। দিন-দুপুরে চোখের সামনে এমনি পুলিশ খুন যেন বিশ্বাস করাই যায় না। সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে। চারিদিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়। শঙ্কাতুর কণ্ঠে তারা আসল ঘটনাটা জানতে চাইছে। ট্র্যাফিক জ্যাম। সারি দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোটর গাড়ি, লরী ও রিক্সা। কিছু কিছু দোকানেব ঝাঁপ ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে। কেউ কেউ আবার দরজা অল্প ফাঁক করে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একটু আগে সেখানে যে স্বাভাবিক নাগরিক জীবন বয়ে চলছিল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন তা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পুলিশ। যুবকের দলটিকে যারা পালিয়ে যেতে দেখেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটা অদ্ভুত খবর দিলে পুলিশকে। পালিয়ে যাবার সময় ওরা সংখ্যায় ছিল চারজন। চতুর্থ জন একটি মেয়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা কেউ নাকি দলের একজনকেও চিনতে পারে নি।

উগ্রপন্থীদের দলে এসে জুটেছে একটি মেয়ে। অসমসাহসী মেয়েই বলতে হবে। তার পুরুষ সঙ্গীরা যখন খতম্-অভিযান চালাচ্ছিল তখন হয়তো সে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছিল। কিম্বা হয়তো নন্দের রক্তে পণ্ডিত চাণক্যের শিখা বন্ধনের মত পয়লা নম্বর শ্রেণীশত্রু পুলিশের রক্তে বেণী বাঁধবার সংকল্প করছিল। হয়তো পুলিশের রক্তে পরতে চেয়েছিল পায়ে আলতা।

খতম অভিযানের দ্বিতীয় টার্গেট একজন এ-এস-আই। এখানকার থানাতেই পোস্টিং তার। শহরের এক প্রান্তে তার বাসা। থানায় নাইট ডিউটি করে বেলা দশটায় বাড়ি ফিরছিল সে। হঠাৎ লোহার রড ও ছোরা নিয়ে আক্রমণ তার ওপর। লোকটির বরাত ভালো যে সাংঘাতিক জখম হয়েও সে পালাতে সমর্থ হয়েছিল।

শুধু এই মহকুমা সহর কেন, গোটা রাজ্য জুড়ে আরম্ভ হয়েছে এই হত্যা-লীলা। খতম হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ, খতম হচ্ছে কলেজের অধ্যাপক কিম্বা ছোটখাটো ব্যবসাদার। গ্রামে গ্রামে খতম হচ্ছে জোতদার ও তার লোকজনেরা, রাজ্য জুড়ে যেন শুরু হয়েছে এক মরণ উৎসব। এর শেষ যে কোথায় কেউ জানে না। এমনকি রাজ্যের প্রশাসনও নয়।

মানুষের মনে আতঙ্ক। সন্ধ্যের পরে লোক থাকে না রাস্তায়। সিনেমার নাইট শো'তে লোক হয় না। এমনকি দিনের বেলায়ও মানুষ তটস্থ, কখন কি হয়।

আতঙ্ক পুলিশ মহলেও। উগ্রপন্থীদের দৌরাত্ম্য যেখানে বেশি সেই এলাকা থেকে পুলিশ কর্মীরা তাদের বাসা উঠিয়ে চলে আসছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায়। যারা তা' পারছে না তারা নিজেরা আর বাড়িমুখোই হচ্ছে না। থানা-ফাঁড়িতেই খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

খুন – রক্ত ! রক্ত – খুন ! খুনের রাজনীতিতে গোটা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল। অফিস-কাছারি; হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই একটা চাপা আতঙ্ক। প্রশাসন বিভ্রান্ত। পুলিশী প্রশাসন থানার প্রায় চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। খুন-জখম তো দূরের কথা, সাধারণ চুরি-ডাকাতির ঘটনায়ও পুলিশ তদন্তে যেতে সব সময় ভরসা পায় না। উগ্রপন্থী অধ্যুষিত এলাকায় পুলিশ প্রশাসন একরকম নেই বললেই চলে। এমনিতেই তো পুলিশের তদন্তের কোয়ালিটি নিম্নমুখী, তার ওপর এই পরিস্থিতিতে তা' একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম। সব চাইতে মুশকিল ট্র্যাফিক ডিপার্টমেণ্টের পুলিশ কর্মচারীদের। রাস্তায় না বেরোলে তাদের চলে না। গাড়ি ঘোড়ার জট পাকিয়ে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। কাজেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে-নামিয়ে ডিউটি করতে হয় তাদের। উগ্রপন্থীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত সহকর্মীর রক্তের ওপর দাঁড়িয়েই ডিউটি করতে হয়। সময় নেই চোখের জল মোছার। বুকে আতঙ্ক ও চোখে জল নিয়ে ডিউটি করে চলেছে ট্র্যাফিক কনস্টেবল। অতিরিক্ত একজন সঙ্গী ছাড়া এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনসাধারণই তার একমাত্র ভরসা।

কিন্তু যাদের ওপর এই ভরসা তাদের নিজেদের ভরসা বলেই তো কিছু নেই। সুযোগ পেয়ে উগ্রপন্থীর কাজ-কর্মের আড়ালে কেউ কেউ আবার নিজেদের ব্যক্তিগত আক্রোশও চরিতার্থ করে নিচ্ছে। দায়িত্ব গিয়ে পড়ছে উগ্রপন্থীদের কাঁধে।

পৃথিবীর সব দেশেই জনতার অধিকাংশই সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়। ঝুট ঝামেলায় যেতে চায় না তারা। এদেশেও তাই। রাস্তায় একটা খুন হলেই দোকান পাটের ঝাঁপ পড়ে যায়, দরজা জানলা বন্ধ করে আশেপাশের বাসিন্দারা ঘরে বসে কাঁপে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সত্যি কথা বলতেও ভয় পায় তারা। সত্যি কথা বলে বিপদ ডেকে আনার চাইতে 'কিছু জানি না –

কিছু দেখি নি' প্রভৃতি কথাগুলো বলা অনেক সহজ। কিন্তু তাই বলে দেশের এই পরিস্থিতিকে তারা সমর্থন করে না মোটেই। দেশ জুড়ে এমন একটা খুনের রাজনীতি তাদের নার্ভের ওপর সমানে চাপ দিয়ে চলেছে। আর, সেই চাপের ফলে মানসিক প্রশান্তি হারিয়ে ফেলেছে তারা। নিষ্ফল অথচ প্রচণ্ড এক আক্রোশে মনে মনে তারা ফুঁসছে। রাজনীতির কচকচি বোঝে না তারা। সাধারণ মানুষ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তারা চায় শান্তিতে জীবনযাপনের অধিকার। সেই অধিকারে বাধ সাধছে এই উগ্রপন্থীরা। কাজেই দেশের জনসাধারণ তাদের ওপর খুশি নয় মোটেই। খুশি নয় তারা প্রশাসনের ওপরেও। দেশের প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তাদের সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে। প্রভাতী সংবাদপত্র খুলে প্রতিদিন খুনের খবর পড়তে পড়তে তারা ক্লান্ত, বিরক্ত। কিন্তু তারই মধ্যে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশ নিহত হলে, তারা সেটাকে কেবল একটা খবর হিসেবেই ধরে নেয়! নিহত পুলিশের জন্যে একটু দুঃখ বোধও করে না। কিন্তু কোন উগ্রপন্থী নিহত হলে মনে মনে একটা চাপা আনন্দ অনুভব করে। মুখে সেকথা প্রকাশ করার সাহস নেই, কিন্তু মনে মনে বলে—বেশ হয়েছে! দেশের পুলিশ বাহিনীকে অকর্মণ্য কিম্বা ঘুষখোর জেনেও কিন্তু তারা মনে মনে একটা সবল ও কঠোর পুলিশ বাহিনীকে প্রত্যাশা করে যারা নাকি তাদের এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি দিতে সমর্থ হবে।

ইদানীং সঙ্গে গার্ড না নিয়ে রুদ্রদেবও চলাফেরা করে না। পুলিশ সাহেব দিবাকর সেনের কড়া নির্দেশ—কোন পুলিশ অফিসার একা রাস্তায় বের হবে না। নিরস্ত্র অবস্থায় তো নয়ই। আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলে আত্মরক্ষার জন্যে নিদেনপক্ষে একখানা ধারালো ছুরি সঙ্গে রাখতে হবে। রুদ্রর জিপ গাড়ির পেছনে সর্বদাই উপস্থিত থাকে রাইফেলধারী দু'জন কনস্টেবল।

দেশে উগ্রপন্থীদের আবির্ভাব পুলিশের মানসিকতা যাচাইয়ের একটা চমৎকার সুযোগ এনে দিলে রুদ্রদেবকে। বিপদের মধ্যেই মানুষের মানসিকতা পরীক্ষা করা সহজ।

যতই দিন যায় ততই পুলিশের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে ফিরে আসতে থাকে একটা শৃংখলার ভাব। উগ্রপন্থীদের প্রথম আবির্ভাবে মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত পুলিশ বাহিনীর অবস্থা হয়েছিল শত্রুপক্ষের হঠাৎ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ সৈন্যবাহিনীর মত। সেই ছত্রভঙ্গ মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো ধীরে ধীরে। জেলার পুলিশ সাহেব থেকে শুরু করে একজন সাধারণ কনস্টেবলের মনেও জেগে উঠলো প্রতিরোধের স্পৃহা—রুখতে হবে—খুন ও রক্তপাত বন্ধ

করতেই হবে—কিন্তু কোন্ পথে কেমন করে তা' সম্ভব সেটাই সমস্যা।

দেশের প্রচলিত আইনে এ সমস্যার সমাধান মোটেই সহজসাধ্য নয়। উগ্রপন্থী খুনীকে হাতে-নাতে ধরা একেবারেই অসম্ভব। চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে যদি তাদের কেউ কেউ পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে তবুও তার শাস্তির কোন ব্যবস্থাই নেই। পুলিশের মুখের কথায় আদালতে অপরাধীর শাস্তি হয় না। তার জন্যে চাই সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? কার ঘাড়ে কটা মাথা যে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবে? কাজেই প্রমাণের অভাবে অবধারিত মুক্তি। অবশ্য ডিফেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া রুলস্ ও প্রিভেন্সন অফ্ ভায়োলেণ্ট এ্যাক্টিভিটিজ এ্যাক্ট-এর ধারায় ছ'টি মাস তাদের আটকে রাখা চলে। কিন্তু ছ'মাস পরে তো তাদের মুক্তি দিতেই হবে। সেই ভয়ঙ্কর 'মিসা' অর্থাৎ মেন্টেনেন্স অফ্ ইণ্টার্নাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট্ তখনও দেশে চালু হয় নি।

কমন এনিমি অর্থাৎ সাধারণ শত্রু উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে গোটা পুলিশ বাহিনীর এই প্রতিরোধের স্পৃহায় মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে এস. ডি. পি. ও. রুদ্রদেব ভট্টাচার্য। মনে মনে ভাবে, পুলিশের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে এ ধরনের কার্যকলাপের বোধহয় প্রয়োজন ছিল। দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পুলিশের এরকম স্পৃহা যদি সাধারণ চোর ডাকাতের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে, তাহ'লে সেদিন পুলিশ বাহিনী সত্যিকারের একটি কল্যাণ বাহিনীতে পরিণত হবে। জনসাধারণ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে পুলিশকে। আনন্দে ও গর্বে এই ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি কর্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তেমন দিন হয়তো সত্যিই আসবে।

উগ্রপন্থীরাও যেমন বসে নেই, পুলিশও তেমনি বসে নেই। সহরে-গ্রামে উগ্রপন্থীদের হত্যালীলা অব্যাহত। পুলিশ বাহিনীও নড়ে চড়ে উঠে পাঞ্জা কষে চলেছে তাদের সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের এন্‌কাউণ্টার হচ্ছে মুখোমুখি। আহত হচ্ছে পুলিশ, ধরা পড়ছে উগ্রপন্থীরা পুলিশের হাতে। গোপন খবরের ভিত্তিতেও ধরা পড়ছে অনেক যুবক। এমন একটা পরিস্থিতিতে পুলিশ সাহেবের হাত ঘুরে যে সব দরখাস্ত রুদ্রর হাতে এসে পড়ছে সেগুলোকে প্রথমটায় তেমন কোন আমলই দেয়নি রুদ্রদেব। দরখাস্তকারী বাপ মায়ের আবেদনকে অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিয়েছে সে। মনে মনে বলেছে—নো মার্সি, ছেলেদের উগ্রপন্থী দলে যখন মিশতে দিয়েছেন তখন তার ফল ভোগ করতেই হবে। বিনা বিচারে ছ'মাস আটকে থাকতে হবে জেলে।

কিন্তু এর মধ্যে যে আরও একটা দিক রয়েছে সেটা তখনও ঠিক খেয়াল

করে নি রুদ্র। সেই খেয়াল হলো তার সেদিন, যেদিন সহরের একটা প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক ভদ্রলোক রুদ্রর কাছে এসে চোখের জলে নিজের কাহিনী জানালো।

ভদ্রলোককে সামনে বসিয়ে রুদ্র তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই শিক্ষক ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। চোখের জল তাঁর গালের কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

বিব্রত রুদ্রদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, কাঁদবেন না। আগে বলুন আপনার কি হয়েছে।

ধুতির প্রান্তে চোখের জল মুছে ধরা গলায় ভদ্রলোক বললেন, আমার সর্বনাশ হয়েছে, স্যার। আমার একমাত্র ছেলেকে পুলিশ ধরেছে।

—কবে ধরেছে? একটু কঠিন হয়ে ওঠে রুদ্র।

—প্রায় মাসখানেক আগে, স্যার।

তেমনি কঠিন সুরে রুদ্র আবার জিজ্ঞেস করে, কেন ধরেছে? কি করেছিল সে?

—কিছুই করে নি, স্যার। ভদ্রলোক আবার চোখের জল ফেলতে শুরু করেন।

বিরক্ত রুদ্রদেব এবার ধমকে দেয় তাঁকে। রাগত কণ্ঠে বললে, কাঁদবেন না। চুপ করুন। এটা কাঁদবার জায়গা নয়। আপনার ছেলে কিছুই করে নি, অথচ পুলিশ তাকে শুধু শুধু ধরলো, তা কি হতে পারে?

—বিশ্বাস করুন, স্যার। আমাদের পাড়ার বিকাশ সাহার খুনের সঙ্গে আমার ছেলের কোন সম্পর্কই নেই। পাড়ার আরও কিছু ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে আমার ছেলেকেও। সে এখানে থাকেই না। ওর মার অসুখের খবর পেয়ে সাত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল তাকে দেখতে।

এবার একটু নরম সুরে জিজ্ঞেস করে রুদ্র, কোথায় থাকে আপনার ছেলে? কি চাকরি করে?

জবাব দেন শিক্ষক ভদ্রলোক, সে থাকে আসানসোল। একটা ছোট কারখানায় টালি-ক্লার্কের চাকরি করতো।

—এখন আর করে না?

ভদ্রলোক চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে আবার কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, স্যার, চার মেয়ে আর ঐ একটি মাত্র ছেলে আমার। প্রাইমারী স্কুলের সাধারণ শিক্ষক আমি। এই মাইনেতে সংসার চলে না।

তাই স্কুলের পড়া শেষ হতেই ছেলেকে বাধ্য হয়ে চাকরিতে ঢুকিয়েছিলাম। নিজের খরচ-খরচা বাদে মাসে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা করে ও আমায় সাহায্য করতো। আজ দেড় মাস হলো সে জেলে আছে। এদিকে কারখানার চাকরিটিও গেছে। থানার বড়বাবুকে ধরেছিলাম। তিনি আশাও দিয়েছিলেন। সেই আশায় বুক বেঁধেই এই দেড়মাস ধরে তার পিছনে ঘুরেছি। কিন্তু কাল তিনি—। কথাটা শেষ না করেই শিক্ষক ভদ্রলোক থেমে যান।

—বলুন, থামলেন কেন? কৌতূহলী রুদ্রদেবের ভুরু কুঁচকে ওঠে, কাল তিনি কি বললেন?

একটু সময় চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বললেন, কাল তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে হাজার দু'য়েক টাকা যদি খরচ করতে পারি তা'হলে তিনি ছেলেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারবেন। আমি স্যার, সাধারণ শিক্ষক। দু-হাজার তো দূরের কথা, দু'শো টাকার সংস্থানও আমার নেই। বলেই ভদ্রলোক আবার কাঁদতে থাকেন অঝোরে।

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে রুদ্রদেবের। এখানেও পয়সার খেলা? গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেখানে খুন ও রক্তের বন্যা, সেখানেও এই ঘুষখোরের দল পাওনা-গণ্ডা আদায় করতে ব্যস্ত? ঠিকই করছে ঐ উগ্রপন্থীরা। এদের খুন করাই উচিত। ক্ষমতা থাকলে সে নিজে এদের গিলোটিনে চাপাতো।

দিন কয়েক পরে প্রাইমারী স্কুলের সেই শিক্ষক ভদ্রলোকের মত আর একজন হতভাগ্য পুত্রের বাবা এসে হাজির হন রুদ্রর কাছে। এই ভদ্রলোক সহরের একজন ব্যবসায়ী। অল্প শিক্ষিত, কিন্তু বেশ পয়সা কড়ি আছে। এঁর অভিযোগও অনেকটা সেই শিক্ষক ভদ্রলোকের মত। তবে এঁর ছেলেকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করে নি। গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে এঁর কাছ থেকে থানার একজন অফিসার মাস তিনেক আগে হাজার টাকা আদায় করেছে। এবার আরও তিন হাজার চাইছে।

মওকা—প্রচণ্ড মওকা পেয়েছে ডিপার্টমেন্টের এই ব্ল্যাকশিপের দল! উগ্রপন্থীদের খুনের রাজনীতি এদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন স্বর্ণ সুযোগ এর আগে কখনও বোধহয় তারা পায় নি। পি-ভি-এর দৌলতে যে-কোন লোককে অনায়াসেই তারা ছ'মাসের জন্যে জেলে পাঠাতে পারে। দেশব্যাপী খুনের আতঙ্ক এদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। উগ্রপন্থীদের ভয়ে একা চলাফেরা করার সাহস না থাকলেও লুঠপাটের ক্ষমতা কিন্তু দিব্বি বজায় আছে।

নিজেকে সেই মুহূর্তে অপরাধী বলে মনে হয় রুদ্রদেবের। রিডার সুকুমার বক্সীকে ডেকে বললে, দরখাস্তের ফাইলটা একবার দিন তো, সুকুমারবাবু।

সুকুমার একটা মোটা ফাইল এনে রুদ্রর হাতে দিতেই রুদ্র জিজ্ঞেস করে, এর মধ্যে এস্-পি'র পাঠানো সবগুলো দরখাস্ত আছে তো?

—হ্যাঁ স্যার। মাত্র কয়েকটা দরখাস্ত আপনি থানায় এনকোয়ারীর জন্যে পাঠিয়েছেন।

—আর এনকোয়ারী! মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে রুদ্রদেব, এনকোয়ারী রিপোর্ট কি আসবে সে তো জানা কথা। ঠিক আছে। এটা আমার কাছে থাক: প্রত্যেকটা দরখাস্ত সম্পর্কে আমি নিজে এনকোয়ারী করবো। বাস্তুঘুঘুদের ডেরাগুলো তছনছ করে ফেলবো আমি।

—পারবেন কি, স্যার? রিডার সুকুমার বক্সী কথাটা বলে ফেলেই সতর্ক হয়ে ওঠে। একজন আই-পি-এস অফিসারের মুখের ওপর এমন একটা কথা বলাটা বোধহয় ঠিক হয় নি।

রুদ্র কিন্তু সুকুমারের কথায় তেমন কিছু মনে করে না। কেবল কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে অনেকটা আপন মনেই বলে ওঠে, ঠিকই বলেছেন আপনি। পারবো কিনা সন্দেহ। এদের এই পয়সার স্রোত যখন সদর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয় তখন আমার মত একজন এস-ডি-পি-ও কী করতে পারে? খোদ শনি যাদের সহায়, অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের সাধ্য কি তাদের ক্ষতি করে?

সুকুমার নিজের ঘরে চলে যেতেই রুদ্র খুলতে থাকে সেই ফাইলের বাঁধন। একটা বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা পূর্ণ হয়ে ওঠে তার। মনে হতে থাকে এই ফাইলের মধ্য থেকে যেন জেগে উঠছে একযোগে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর। কান্নার দমকে স্বরগুলো যেন কাঁপছে। বাপ কাঁদছে ছেলের জন্যে, মা কাঁদছে পুত্রের জন্যে, বোন কাঁদছে ভাইয়ের জন্যে। সেই অসহায় কান্নার রোল যেন গুমরে গুমরে ফিরছে চারিদিকে। সেই কান্নার শব্দে যেন ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। ওর মধ্যে যে মেকি কান্না একেবারেই নেই তা' নয়। মেকি কান্নায় পুলিশের মন ভিজিয়ে কার্যোদ্ধারের প্রচেষ্টাও রয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের কান্নাও তো কম নেই। পুলিশী অত্যাচার ও অবিচারের বিচার চাইছে তারা ডিপার্টমেণ্টের উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে। বাস্তবিকই ওরা হতভাগ্য। ওরা জানে না, যে দেশে ওরা জন্মেছে সে দেশে বিচারের বাণী চিরকালই নীরবে নিভৃতে কাঁদে। অতীতেও কেঁদেছে। বর্তমানেও কাঁদে।

হয়তো ভবিষ্যতেও কাঁদবে।

বিচিত্র এই দেশ, বিচিত্রতর এদেশের মানুষ। আর সম্ভবতঃ বিচিত্রতম এদেশের মানুষের চরিত্র। এদেশের একদল মানুষ এমন রাজনীতি করে যার মধ্যে নীতি বলে কোন পদার্থ নেই। ক্ষমতার লোভে কোন কুকর্মেই তারা পেছপা নয়। রাজনীতির নামে আর একদল মানুষ গোটা দেশ জুড়ে কায়েম করেছে খুনের রাজত্ব। শৃঙ্খলার নামে চারিদিকে চরম বিশৃঙ্খলা। সাধারণ মানুষ অত্যাচার আর অবিচার সহ্য করে প্রায় ক্লীবের পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে। পুলিশী প্রশাসনের নামে কোথাও চরম ঔদাসীন্য, আবার কোথাও নির্মম অত্যাচার। আর সেই সঙ্গে অবাধ ঘুষের স্রোত যা নাকি উর্ধ্বমুখী হয়ে কোন্ স্তরে গিয়ে ঠেকেছে তার হদিশ পাওয়াই শক্ত। বাইরে কিন্তু মন ভোলানো কথার চাকচিক্য। নেতাদের মুখে স্তোকবাক্য, প্রশাসনে কঠোরতার ভান। পুলিশী প্রশাসনে 'ডিসিপ্লিন' নামক ইংরেজি শব্দটির চূড়ান্ত অবমাননা। ভাগের কড়ি পকেটে পুরে উপর মহলের ফাঁকা হম্বিতম্বি নীচের মহলের ওপর। আর অন্যদিকে মুষ্টিমেয় একদল সৎ মানুষ নিজেদের সততা রক্ষা করেই পরিতৃপ্ত। অসহায়তার দোহাই দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকতেই তারা অভ্যস্ত।

এই শেষের দলের ওপরই কিন্তু রুদ্রদেবের সবচাইতে বেশি রাগ। অসৎ মানুষের মানসিকতাকে রুদ্রদেব বুঝতে পারে, কিন্তু সৎ মানুষের অসহায়তার দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার মানসিকতাকে যেন সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। তার মতে, দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ সমাজের অকল্যাণের জন্যে যতটা দায়ী, সৎ অথচ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিরা তার চাইতে একটুও কম দায়ী নয়। এই নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিতে কিছুতেই রাজি নয় রুদ্রদেব। যতদিন সে এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করবে, ততদিন নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এই বিভাগের কর্মীদের মানসিকতার বিচার করে নিজের ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্যে এর দোষ ত্রুটির ওপর অনবরত আঘাত হেনে চলবে। কিছুতেই নিরস্ত হবে না।

—না, কিছুতেই না।

বালিগঞ্জ অঞ্চলে কর্পোরেশনের তিন লাখ টাকার ভ্যালুয়েশন করা নিজেদের বাড়িতে দিনগুলো মোটামুটি ভালই কাটছিল নবনীতার। ধনী পিতার একমাত্র কন্যা নবনীতা যেদিন রুদ্রদেবের কাছ থেকে ফিরে এল, সেদিন তার মা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, এই ক'টা দিনের মধ্যে একী চেহারা হয়েছে তোর? আশ্চর্য, সেখানে খেতেও পেতিস না নাকি?

নবনীতার বদলে জবাব দিয়েছিলেন তার বাবা সুবীর ঘোষাল, না–না, খেতে পাবে না কেন? আসলে ওরকম একটা পরিবেশ ওর পক্ষে ঠিক স্যুট করছিল না।

ভদ্রমহিলা এবার তাঁর স্বামীকে নিয়ে পড়েন। মেয়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সুবীরের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন, এ জন্যে একমাত্র তুমিই দায়ী। আমি তখনই বলেছিলাম ওসব পুলিশ-টুলিশের হাতে মেয়েকে দিও না। তা' শুনলে না আমার কথা। তোমার সেই কাকার কথায় নেচে উঠলে তুমি। আর তাঁকেও বলিহারি। এমন একটা চিত্র তিনি আঁকলেন যেন আই-পি-এস অফিসারের বউ হয়ে আমার মেয়ে একেবারে রাজরাণী হয়ে যাবে। আমরাও বোকার মত তাঁর কথাই বিশ্বাস করলাম। তা', আমি মেয়েছেলে, আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও, কিন্তু তুমি এমন করিৎকর্মা মানুষ হয়ে কেমন করে এমন একটা কাঁচা কাজ করলে?

গদিমোড়া চেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিয়ে অল্প অল্প চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেছিলেন সুবীর, এ জগতে মানুষ যে বাস্তবিকই হেল্প্‌লেস তার প্রমাণ হাতে-নাতে পেলাম। এত দেখেশুনে শেষে—

সুবীরের কথা শেষ না হতেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন তাঁর স্ত্রী মনোরমা, ওসব দার্শনিক কথা বলে আর লাভ কি এখন? যে ভুল করেছ তা' তো আর শোধরাতে পারবে না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে চুরুট টেনেছিলেন সুবীর ঘোষাল। তারপর একসময় বলেছিলেন, ভুল ঠিক করি নি। খানিকটা মিস্-ক্যালকুলেশন বলতে

পারো। একজন আই-পি-এস অফিসারের স্ত্রী তো আর যাকে বলে হেঁজিপেঁজি নয়। তবে রুদ্র একটু অতিরিক্ত অনেস্ট। আর, এ যুগে অনেস্টি কথাটা যে মিনিংলেস তা' সে ঠিক বুঝতে পারে না।

নবনীতা পাশের ঘরে চলে যেতেই মনোরমা স্বামীর আর একটু কাছে সরে এসে চিন্তিত কণ্ঠে বলেছিলেন, নবু তো ফিরে এল। এর পরে কি হবে কিছু ভেবেছ কি?

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন সুবীর, কী আর হবে? ওখানকার ঐ পরিবেশের মধ্যে নবুর থাকা একেবারেই অসম্ভব। বুঝতে পারছি রুদ্রর পক্ষে সেখানে একা থাকা কষ্টকর। বাট কাণ্ট্ হেল্প। তবে নবু তো আর ছোট নয়। সে যদি নিজে থেকে ঐ পরিবেশের মধ্যে ফিরে যেতে চায় তো আপত্তি নেই। তবে আই ডোণ্ট থিঙ্ক সে তা চাইবে।

আবার একটু সময় চুপ করে থেকে মনোরমা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, সবে বিয়ে হলো। এসময় এমন একা একা থাকতে নবুর নিজেরই কি ভালো লাগবে? এই তো সেদিন মিঃ সান্যালের মেয়ের বিয়ে হলো। তাঁরও তো একটিমাত্র মেয়ে। জামাইটি নাকি এই বয়সেই একজন বিজনেস ম্যাগনেট হয়ে উঠেছে। ক্যামাক স্ট্রীটে নিজেদের মস্ত বাড়ি।

মিঃ সান্যালও একটা বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের মালিক। সেই সূত্রে সুবীর ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সান্যালের পরিবারের ঘনিষ্ঠতাও যথেষ্ট। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার আড়ালে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার যে স্রোতটি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এই দুটি পরিবারের মধ্যে বয়ে চলে তার অস্তিত্ব তারা নিজেরা টের পেলেও ভদ্রতার আড়ালে সযত্নে তারা তা' ঢেকে রাখে।

মিঃ সান্যালের সদ্য বিবাহিতা মেয়ের খবর সুবীর নিজেও জানতেন। তাই, তার প্রসঙ্গ উঠতেই সুবীর বিরক্ত ভঙ্গিতে বলে উঠেছিলেন, ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওদের হাঁড়ির খবর আমি জানি। যেমন শ্বশুর, তেমন জামাই। ব্যাক্-ডোর পলিসি ও কালো টাকা ছাড়া সান্যালের ব্যবসা তো একটি দিনও টিকতো না। জামাইটিও হয়েছে শ্বশুরের ঠিক কার্বন কপি। সেদিক থেকে বলতে গেলে আমাদের রুদ্রর পায়ের কাছে দাঁড়াবার মত যোগ্যতাও যে তার নেই, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

বিচিত্র মানুষের স্বভাব। অনেকে এ যুগে সততাকে তেমন ভালো চোখে দেখে না। এটাকে তারা বলে বোকামি কিম্বা সাহসের অভাব। কিন্তু সুযোগ পেলে পরিবার-পরিজনের মধ্যে কারুর সেই ভালো-না-লাগা সততা নিয়ে

বড়াই করতেও আবার ছাড়ে না।

—আচ্ছা, এই পুলিশের চাকরি ছেড়ে রুদ্র অন্য কোন ভালো চাকবি নিতে পারে না? স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মনোরমা।

জবাবে সুবীর বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে পারে বৈকি। ছেলে তো খারাপ নয়। কম্পিটেটিভ পরীক্ষা দিয়ে যে আই-পি-এস হতে পারে তার পক্ষে অন্য একটা ভালো চাকরি জোগাড় করা এমন কি কঠিন? তা'ছাডা, অন্য চাকরিব দরকারই বা কি? আমার এত বড় ফার্মেই তো এসে বসতে পারে। বলেওছিলাম সে কথা। কিন্তু রাজি হলো না।

কিছুক্ষণ আর কারুর মুখে কথা নেই। আপন আপন চিন্তায় ডুবে থাকেন স্বামী-স্ত্রী। একমাত্র কন্যার কথাই বোধহয় ভাবছিলেন তাঁরা। অবশেষে একসময় চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে সুবীর বলেছিলেন, যাক্ গে। আপাততঃ নবু তো এখানেই থাকুক। ভবিষ্যতে যা হবার হবে। মোটকথা, এতটা বয়স পর্যন্ত নবু যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছে, তেমন পরিবেশ ছাড়া ওর কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

নবনীতার মনের কথা যাই হোক না কেন, বাপের বাড়ি ফিরে এসে একটা মুক্তির স্বাদই সে পেয়েছিল। স্বামীকে অপছন্দ হয় নি তার। রুদ্র পুলিশ অফিসার বলেও তেমন একটা আপত্তি তার ছিল না। কিন্তু তার ঐ গোঁড়ামি-টুকুই যেন সে সহ্য করতে পারছিল না। একে তো পয়সা-কড়ির সাচ্ছল্য তেমন নেই, তার ওপর সাধারণ সুযোগ সুবিধাটুকুও রুদ্র গ্রহণ করবে না। নবনীতাব মতে এমন লোকের সংসারে না থেকে সন্ন্যাসী হওয়াই উচিত ছিল।

নবনীতা বাপের বাড়ি ফিরে আসতেই তার সেই পুরানো বন্ধু-বান্ধবীরা আবার যাতায়াত শুরু করে তার কাছে। আবার শুরু হয় বাড়ির সামনে সেই প্রশস্ত টেনিস লনে টেনিস খেলার আসর। শুরু হয় পার্টি, পিক্‌নিক, নাচগান, হৈ হুল্লোড়। কয়েকমাস বিরতির পরে নবনীতার হাই-হীল স্যাণ্ডেলের চাপ এ্যাক্সিলারেটরের ওপর আবার পড়তেই দামী বিলিতি গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তর-পঁচাত্তর কিলোমিটারের ঘরে গিয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। ডায়মণ্ডহারবার রোডের পাশের দৃশ্যগুলো অদৃশ্য হতে থাকে চোখের পলকে। হাস্যে-লাস্যে মেতে ওঠে গাড়ির ভেতরে নবনীতার বন্ধু-বান্ধবীর দল। বিয়ের আগে এসবের মধ্যেও পড়াশোনার খানিকটা চাপ ছিল, কিন্তু এখন আর সেসবও নেই। অখণ্ড অবসর এখন।

একটা ব্যাপারে নবনীতা বড়ই স্পর্শকাতর। রুদ্র কিম্বা নবনীতার শ্বশুর

বাড়ির ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধবীদের কৌতূহল কিন্তু সে বরদাস্ত করতে পারে না। এ সম্পর্কে কোন কথা উঠলেই সে এমন গম্ভীর হয়ে থাকে যে এ নিয়ে আলোচনা করতে আর কেউ ভরসা পায় না। প্রথম প্রথম কিন্তু বিষয়টার ওপর একটা হাল্কা আবরণ চাপাতে সে চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রশ্নের জবাবে বলতো, একে পুলিশের কাজ, তায় আবার বড় অফিসার। এখানে এসে আমাদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করার তাব সময় কোথায়? আর, আমারও বাপু সব সময় ঐ পুলিশী ঠাঁট-বাট, সেপাই-সান্ত্রী, আর্দালী-কনস্টেবলেব মধ্যে মেমসাহেব সেজে থাকতে ভাল লাগে না। তার চাইতে এই ভালো। যখন যেখানে ভালো লাগে সেখানেই থাকি। কিন্তু এমন ধরনের কথা দিয়ে বেশীদিন তাদের ঠেকিয়ে রাখা গেল না। অচিরেই তারা এব মধ্যে একটা কিছু অস্বাভাবিকত্ব আবিষ্কার করে ফেললে। আর তাদের সেই আবিষ্কাবের কথা টের পেয়ে ঐ ব্যাপারে গম্ভীর হয়ে উঠতে বাধ্য হলো নবনীতা। গাম্ভীর্যের আড়ালে সত্যি জবাব দেবার দায় এড়াতে চাইলো।

বাপের বাড়িতে এত আনন্দের মধ্যেও কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে নবনীতা। মনে পড়ে রুদ্রদেবের কথা। লোকটা একা একা কেমন করে দিন কাটাচ্ছে কে জানে? তার নিজের মত ঐ লোকটাও একরোখা প্রকৃতির। এই ছ'টা মাসের মধ্যে একখানা চিঠি দিয়েও নবনীতাব খোঁজ নিলে না। নবনীতা নিজেও অবশ্য কোন চিঠি দেয় নি। কেন দেবে? রুদ্র যদি তার খোঁজ না নেয়, তা'হলে নবনীতার কি দায় পড়েছে তাব খোঁজ নেবার? দু'একবার রুদ্রকে চিঠি লিখতে কাগজ কলম নিয়ে বসেওছিল নবনীতা, কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর অভিমান প্রতিবারই তার লেখার বাসনাকে পণ্ড করে দিয়েছে। অবশেষে কলম বন্ধ করে কোলের কাছে গীটারটা টেনে নিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে।

একমাত্র মেয়েকে চোখের সামনে রাখতে পেরে সুবীর ঘোষাল ও তার স্ত্রী খুব খুশি। মুখে না বললেও মনে মনে তারা ভেবেছিলেন যে এতে জামাতা বাবাজী হয়তো একটু নরম হবে। কিন্তু তার কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়ে মনে মনে একটু শঙ্কিত না হয়ে পারেন না। তাই একদিন সুবীর ঘোষাল সস্ত্রীক এসে হাজির হলেন তাদের বেয়াই মশাইয়ের বাড়ি বারাসতে।

সুবীরের কথার জবাবে জগদীশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বুঝলেন বেয়াই মশাই, মানুষের স্বাধীন মতামতকে আমি বরাববই মূল্য দিয়ে থাকি। আমার মতে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো উচিত নয়। আপনার মেয়ের

যদি ভালো না লাগে তা'হলে তাকে জোর করে আমার ছেলের কাছে পাঠানো উচিত বলে আমি বিবেচনা করি না। সে যদি আপনার কাছেই সুখে থাকে তা'হলে তার সেখানেই থাকা উচিত। আমার নিজের বিশ্বাস, কেউ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করলে তাতে ফল ভালো হয় না। তাতে সে নিজেও শান্তি পায় না, আশেপাশের কাউকেও শান্তি দিতে পারে না।

মুখের বর্মা চুরুট দাঁতে চেপে সুবীর বললেন, নবু অবশ্য আমার কাছে বেশ ভালই আছে। তবে ওর সম্পর্কে আমার একটা কর্তব্যও তো আছে। বিয়ের পরে স্বামীর কাছে থাকতে তো সব মেয়েই চায়।

গম্ভীর মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে জগদীশ বললেন, হ্যাঁ, তাই স্বাভাবিক। তবে আপনার মেয়ের সেই চাওয়াটা যদি রুদ্রর কাছে থাকার অসুবিধাগুলোর চাইতে জোরালো হয়, তাহলে সে সেখানেই যাবে। নইলে সে আপনার কাছেই থাকবে।

—আপনার ছেলের কথা চিন্তা করে এই ব্যবস্থায় আপনার কোন আপত্তি নেই তা'হলে? জগদীশের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন সুবীর।

তেমনি মৃদু হেসে জগদীশ বললেন, আমার ছেলে পুলিশ অফিসার। সে যেমন নাবালক নয়, আপনার মেয়েও তেমনি নাবালিকা নয়। তারা নিজেরা যেমন পছন্দ করবে তেমনই চলবে। এর মধ্যে আপনার আমার সম্মতি কিম্বা আপত্তি তো একান্তই মূল্যহীন। আমরা কেবল তাদের সামান্য কিছু উপদেশ দিতে পারি। তার চাইতে বেশি কিছু করার সাধ্য আমাদের কোথায়?

—দেখুন জগদীশবাবু, বলতে থাকেন সুবীর, আমি বুঝতে পারছি না এই পুলিশের চাকরির ওপর আপনার ছেলের এত মোহ কেন। ইচ্ছে করলে সে কি এর চাইতে একটা ভালো কিছু জোগাড় করে নিতে পারে না?

—হয়তো পারে, জবাব দেন জগদীশ, কিন্তু সে জোগাড় করে নেবে কিনা সেটা তো একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। আর, মোহের কথা বলছেন? আমি অবশ্যি ঠিক বুঝতে পারছি না, পুলিশের চাকরির ওপর সত্যিই তার কোন বিশেষ মোহ আছে কিনা!

—হ্যাঁ আছে। আমি তাকে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জয়েন করতে পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে রাজি হয় নি। আমার অবর্তমানে আপনার ছেলে ও আমার মেয়েই যখন এই প্রতিষ্ঠানের মালিক হবে তখন ঐ পুলিশের চাকরি ছেড়ে এখানে আসতে তার যে কি আপত্তি বুঝতে পারছি না।

একটু সময় চুপ করে থাকেন জগদীশ। তারপর বললেন, আমার ছেলের

কোন ইচ্ছায় আমি কোনদিন বাধা দিই নি, আর ভবিষ্যতেও দেব না। কাজেই এ ব্যাপারে আমি যে কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি তা' ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সুবীর আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর স্ত্রী মনোরমা জগদীশকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেন, দেশের যা পরিস্থিতি, চারিদিকে যে রকম খুন-জখম চলছে তাতে কিন্তু রুদ্রকে পুলিশের চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনাই উচিত।

ভদ্রমহিলার কথায় হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে সেখানে। রুদ্রদেবের মায়ের মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। সুবীর তার সেই ম্লান মুখ লক্ষ্য করে নিজের স্ত্রীকে সমর্থন করে বলে ওঠেন, হ্যাঁ কথাটা ভাববার মতই বটে। রুদ্র তো আপনাদের একমাত্র ছেলে। মানুষের বিপদ-আপদের কথা তো কেউ বলতে পারে না।

দেশের পরিস্থিতির কথায় জগদীশ ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করছিলেন। সুবীর থামতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, রুদ্র যেমন আমাদের একমাত্র ছেলে তেমনি আপনাদেরও জামাই। ওর ভালো-মন্দের সঙ্গে আমাদের মত আপনারাও জড়িত। কাজেই ওর সম্পর্কে আপনাদের চিন্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে রাস্তা-ঘাটে খুন-জখম হচ্ছে বলে যে রুদ্রকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে তাতে আমার একটুও সায় নেই। বিপদ-আপদের ভয়ে কাপুরুষের মত আমার ছেলে ডিপার্টমেণ্ট থেকে পালিয়ে আসবে তা' আমি ভাবতেই পারি না।

অবশেষে কোন আশার বার্তা না নিয়েই সুবীর ঘোষাল ও মনোরমা বারাসত থেকে কলকাতার পথে পাড়ি দেন নিজেদের মোটর গাড়িতে। পথে সুবীর কেবল তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এরকম একটা একগুঁয়ে পরিবারে মেয়েকে দিয়ে কি ভুলই যে করেছি তা' এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

বেলা প্রায় বারোটা। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। একতলায় অফিস ঘরের জানলা বন্ধ করে কাজ করতে করতে দরদর করে ঘামছিল রুদ্রদেব। মাথার ওপর পাখার হাওয়া ঘরের গরমকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলছিল। ভেজানো দরজার পাশে একখানা টুলের ওপর বসে গরমে হাস-ফাস করছিল আর্দালি কনস্টেবল।

এমনি সময় একখানা বিলিতি মোটর গাড়ি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে। গাড়িখানা থামতেই পেছনের সীট থেকে গাড়ির ড্রাইভার তাড়াতাড়ি

নেমে এসে সসম্মানে সামনের দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াতেই ড্রাইভারের সীট থেকে নেমে আসে নবনীতা। পরণে তার দামী সিল্কের শাড়ি, পায়ে উঁচু সোলের স্যাণ্ডাল। মাথার শ্যাম্পু করা চুলের গোছা পেছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডের ঘড়ি, ডান হাতে একগাছা বালা। চোখে আধুনিক ঢাউস সাইজের সান-গ্লাস, সিঁথির একপাশে সামান্য সিঁদুরের ছোঁয়া।

ভেজানো গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকে নবনীতা। আকর্ষণ ও বিকর্ষণের একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে কয়েকমুহূর্ত সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর স্যাণ্ডালের রবার সোলের নিঃশব্দ সঞ্চারে দরজার সামনে বসে থাকা আর্দালী কনস্টেবলের সামনে এসে দাঁড়াতেই কনস্টেবলটি সসব্যস্তে উঠে দাঁড়ায়।

মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে নবনীতা, সাহেব আছেন?

কনস্টেবলটি নতুন। এস-ডি-পি-ও সাহেবের মেমসাহেবকে সে কখনও দেখেনি। তবে অন্যের'মুখে শুনেছে যে মেমসাহেব নাকি সাহেবের সঙ্গে থাকে না। না থাকার কারণ হিসেবে পুলিশ মহলে সত্যি মিথ্যে যে সব কাহিনী ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল এবং যার সঙ্গে মেমসাহেবের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি যুক্ত হয়ে কাহিনীকে মুখরোচক করে তুলেছিল, তার কিছু কিছু এই কনস্টেবলটিও শুনেছে। কিন্তু এই সুন্দরী মহিলাই যে তিনি তা' ঠিক বুঝতে না পেরে সে জবাব দেয়, হ্যাঁ আছেন। খবর দেব?

—না, খবরের দরকার নেই। বলতে বলতে নবনীতা ভেতরে যাবার জন্যে ভেজানো দরজার ওপর হাত রাখতেই কন্‌স্টেবলটি বিব্রত ভঙ্গিতে বলে ওঠে, খবর না দিয়ে ভেতরে যাবার হুকুম নেই।

দরজার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে একটু সময় চিন্তা করে নবনীতা। তারপর কন্‌স্টেবলের দিকে তাকিয়ে বললে, বেশ, খবর দিন যে কলকাতা থেকে একজন মহিলা দেখা করতে এসেছে।

ভেতরে চলে যায় কন্‌স্টেবলটি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বললে, আসুন।

ভারি পর্দা সরিয়ে নবনীতা ভেতরে ঢোকে। অল্প অন্ধকার ঘরে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একটা মোটা ফাইলের ওপর খস্ খস্ করে লিখছিল রুদ্রদেব। নবনীতার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাতেই রুদ্রর হাতের কলম হঠাৎ থেমে যায়। স্খলিত কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, নীতা তুমি—এইসময়!

—কেন, আসতে নেই নাকি? চোখের সান-গ্লাস খুলতে খুলতে প্রশ্ন করে নবনীতা।

সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দেয় রুদ্র, না—না, তা' কেন? তবে, এই সময় এখানে তোমাকে ঠিক এক্স্‌পেক্ট করি নি। তাই একটু অবাক হয়েছি।

—ভেবেছিলে বুঝি এখানে আর কখনও আমি আসবো না, কেমন?

—না-না, তা' নয়, তেমনি হেসে জবাব দেয় রুদ্র, আমি জানতাম তুমি আসবে। তবে, কবে আসবে সেটাই জানতাম না।

হঠাৎ খেয়াল হতেই রুদ্র আবার বলে ওঠে, তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবে? বসবে না?

—এখানে বসেই কথা বলবো? রুদ্রর দিকে কটাক্ষ হেনে নবনীতা বললে, ওপরে যাবার হুকুম নেই নাকি?

—কি যে বলো! বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রুদ্রদেব। তারপর নবনীতাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, ভাগ্যিস তুমি এই সময় এসে পড়েছ। আর ঘণ্টাখানেক পরে এলে দেখা হতো না। সদরে চলে যেতাম। ফিরতে ফিরতে সেই রাত ন'টা।

নবনীতা কোন কথা না বলে রুদ্রর পিছে পিছে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল। হিসেবে একটু ভুল করেছিল সে। পথে আসতে আসতে এখানে একটা ছোট-খাটো ঝড়ের আশঙ্কা করেছিল। ভেবেছিল, রুদ্র হয়তো গম্ভীর হয়ে থাকবে। তার কথার জবাবে চোখা চোখা বাক্যবাণে হয়তো বিদ্ধ করবে তাকে। তেমন একটা পরিস্থিতিতে নবনীতা কেমন করে নিজেকে রক্ষা করবে সে সম্পর্কেও মনে মনে একটা মহড়া দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার কিছুই হলো না। রুদ্রর কথাবার্তায় রাগ কিম্বা অভিমানের ছিঁটেফোঁটাও সে লক্ষ্য করলো না। বরঞ্চ নবনীতাকে দেখে তার চোখে মুখে যে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল সেই চিহ্নটুকু যে মেকি নয় তা' বুঝতে অসুবিধে হয় নি নবনীতার।

ঘরে ঢুকে পাখা খুলে দেয় রুদ্রদেব। নবনীতাকে ঘরের আসবাবপত্রের দিকে তাকাতে দেখে রুদ্র হেসে বললে, দেখছো কি? এডিসন-অল্‌টারেসন কিছুই করিনি। তুমি যেখানে যেমনটি রেখে গিয়েছিলে তেমনটিই আছে।

—আমার স্মৃতি হিসেবে নাকি? হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করে নবনীতা।

রুদ্রও হালকা কণ্ঠে হেসে জবাব দেয়, স্মৃতি হিসেবে না হলেও বিস্মৃতি ঠিক পছন্দ করি না বলে।

নবনীতা আর কিছু না বলে পাখার নীচে দাঁড়িয়ে কোমরের ভাঁজ থেকে সুগন্ধি রুমাল বের করে মুখের ওপর বুলিয়ে নেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে, বীরবাহাদুরকে দেখছি না যে?

—তাকে এ বেলা ছুটি দিয়েছি। কলকাতায় ওর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

—রান্না-বান্না নিজেই করবে বুঝি?

নবনীতার কথায় একটু জোরেই হেসে ওঠে রুদ্র। হাসতে হাসতে বললে, তা'হলেই হয়েছে আর কি। সেসব কিছু নয়। বাহাদুর নিজেই রান্না সেরে রেখে গেছে।

একটু পরে নবনীতা আবার বললে, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো?

—নিশ্চয়। তবে ফ্রিজ তো নেই যে ঠাণ্ডা জল খাওয়াবো। এক মিনিট ওয়েট করো। দোকান থেকে বরফ আনাচ্ছি। বলতে বলতে রুদ্র কলিংবেল টিপে নীচের আর্দালীকে ডাকতে যেতেই নবনীতা তাকে বাধা দিয়ে বললে, বরফের দরকার নেই। কুজোর ঠাণ্ডা জল হলেই চলবে।

—বেশ, তবে তাই দিচ্ছি। বলে গ্লাস আনতে রুদ্র এগিয়ে যায় দেয়াল-আলমারির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নবনীতা বলে ওঠে, না—না, তোমাকে দিতে হবে না। আমি নিজেই জল গড়িয়ে খেতে পারবো।

নবনীতা আলমারি খুলে গ্লাস বের করতে যেতেই এক কোণে একটা বোতলের দিকে নজর পড়ে তার। সদ্য ছিপিখোলা নতুন বোতল। গায়ের লেবেল এখনও আন্‌কোরা।

গ্লাশ হাতে নবনীতা কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ভুরু যুগল ঈষৎ কুঁচকে ওঠে তার। ঘাড় ফিরিয়ে রুদ্রকে বললে, আজকাল রাতদিনই বুঝি এসব চলছে? দেবদাস হতে চাইছো বুঝি?

প্রথমটায় কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বিস্মিত চোখে রুদ্র তাকিয়ে থাকে নবনীতার দিকে। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ও—ওই হুইস্কির বোতলটার কথা বলছো? তা দেবদাস হতে সাধ জাগলেও সাধ্য কোথায়? আমার মত সরকারী চাকরী করলে দেবদাসকেও একটা বোতলে তিনমাস খুশি হয়ে থাকতে হতো। তা'ছাড়া তেমন পার্বতীকেই বা কোথায় পাবো?

নবনীতা আর কিছু না বলে কুজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে এগিয়ে আসে রুদ্রর কাছে। তারপর একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে বললে, কেন এসেছি তা' তো কৈ জিজ্ঞেস করলে না।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে রুদ্র জবাব দেয়, সময়মত তুমি নিজে থেকেই বলবে বলে অপেক্ষা করে আছি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ্ করে থেকে নবনীতা বললে, আজ আমার জন্মদিন।

—তাই নাকি? বলে ওঠে রুদ্র, তোমার কাছেই তো শুনেছি প্রতি বছর তোমার জন্মদিনে তোমার বাবা নাকি খুব ঘটা করে বাড়িতে পার্টির ব্যবস্থা করেন।

—হ্যাঁ, এবারেও তাই করবেন। তোমাকে যেতে হবে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্রর মুখের ওপর থেকে এতক্ষণের সেই হাল্কা ভাবটি সম্পূর্ণ উবে যায়। পরিবর্তে, সেখানে দেখা দেয় এক অটল গাম্ভীর্য। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে বসে থাকে সে। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও সে টের পায় নবনীতা উৎসুক চোখে তাকে দেখছে। অবশেষে একসময় মুখ ফিরিয়ে নবনীতার চোখে চোখ রেখে সে জবাব দেয়, আমার পক্ষে তোমাদের ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। যে কারণেই হোক, তোমার আমার মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যবধান যতদিন থাকবে ততদিন তোমাদেব ওখানে আমার যাওয়া চলে না।

—কেন চলে না জানতে পারি? নবনীতার কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস ফুটে ওঠে।

—হ্যাঁ, পারো, তেমনি গম্ভীর স্বরে জবাব দেয় রুদ্র, তাতে নিজের অপমান হবে বলে মনে করি।

—কিন্তু আমি তো তোমার এখানে আসতে অপমান বোধ করি নি।

—কারণ তুমি এসেছ নিজের ইচ্ছায়। আমি তোমাকে ডাকিনি।

—তুমি বোধহয় মনে মনে স্থির করে ফেলেছ যে আমি নিজে থেকে এখানে আসতে না চাইলে আমাকে কখনও ডাকবে না?

—না, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কিছু করাতে আমি রাজি নই।

—আচ্ছা, তুমি কি মনে করো না যে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমাদের পবস্পরের ওপর পরস্পরের অধিকার আছে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। তবে তা হচ্ছে ভালোবাসার অধিকার। জোর-জবরদস্তির অধিকার নয়।

নবনীতা কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকে। একটা পরাজয়ের গ্লানি যেন সেই মুহূর্তে তাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছে। তার বড় আশা ছিল যে সে নিজে হয়তো রুদ্রকে তাদের বাড়ি আসতে রাজি করাতে পারবে। এমনকি এখানে আসার আগে এমন একটা কথা সে তার মা'কে বলেও এসেছিল।

নবনীতার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে মনের কোণে কেমন যেন একটা

ব্যথা অনুভব করে রুদ্র। ধীরে ধীরে একসময় সে বললে, আমি বুঝতে পারছি তোমাদের বাড়িতে এমন একটা আনন্দের দিনে আমি উপস্থিত থাকলে তোমাদের বিশেষ করে তোমার ভালো লাগতো। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমি এখানে বসেই তোমাকে আশীর্বাদ করছি তোমার জীবনে এমনি আরও অনেক জন্মদিন আসুক।

নবনীতা এবার মাথা তোলে। দুঃখে রাগে তার সুন্দর মুখখানা ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। ধনী বাপের একমাত্র কন্যার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোনকালেই কোন ব্যবধান ঘটে নি। কোনদিন কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে নি তার। কেবল আজ এই মুহূর্তে নিজের ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই তাকে চলে যেতে হবে।

শাড়ির আঁচলটা ঘাড়ের ওপর আরও একটু টেনে দিয়ে সোজা হয়ে বসে নবনীতা। তার টানা টানা সজল চোখে দেখা দেয় বিদ্যুতের ঝিলিক্। মনের চাপা ক্রোধ ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসিতে রূপান্তরিত করে তীক্ষ্ণ অথচ চাপা কণ্ঠে সে বলতে থাকে, মনে করো না আমার এই জন্মদিনে কেবলমাত্র তোমার এই আশীর্বাদের লোভেই আমি কলকাতা থেকে এতদূরে ছুটে এসেছি। ওই আশীর্বাদ বস্তুটা মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের কাছ থেকে বরাবর এতই পেয়ে আসছি যে মাঝে মাঝে ভয় হয় ওর তোড়ে ভেসে না যাই। কাজেই ওর ওপর তেমন কোন লোভ নেই আমার। আশীর্বাদের মত একটা মেটিরিয়াল ভেল্যুলেস জিনিসের জন্যে আমি আসি নি তোমার কাছে। আমি কেবল তোমাকে বলতে এসেছি যে আমার জন্মদিনের পার্টিতে তোমার উপস্থিত থাকা একান্তই প্রয়োজন।

নবনীতা থামতেই একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চেপে রুদ্র মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, আমার এতকাল ধারণা ছিল যে স্ত্রীর কাছে স্বামীর আশীর্বাদের নাকি একটা স্বতন্ত্র মূল্য থাকে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই তোমার জন্মদিনে তোমাকে আমি আশীর্বাদ করেছি। মেটিরিয়াল ভ্যেলুর কথা মনে আসে নি আমার। যাক গে ওসব কথা। তোমার জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত থাকতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু তা' সম্ভব নয়।

—দেখ, তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে আমরা সবাই খুশি হবো। কিন্তু না থাকলে আমাদের দারুণ ক্ষতি হবে।

ভ্রূ-কুঁচকে রুদ্র জিজ্ঞেস করে, আমি না থাকলে তোমাদের ক্ষতি হবে?

—হ্যাঁ, সামাজিক দিক থেকে ক্ষতি হবে।

—কেন ?

কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে জবাব দেয় নবনীতা, তোমার কাছে না থেকে বাবার কাছে থাকি বলে এমনিতেই সোসাইটির লোকেরা নানা ধরনের কথা বলে। কাজেই আমার জন্মদিনের পার্টিতে তুমি উপস্থিত না থাকলে তারা মনে করবে যে তাদের অনুমানই ঠিক্। সামাজিক দিক থেকে আমাদের পরিবারের পক্ষে সেটা একটা মস্ত ক্ষতি।

—ও—তা'হলে সেখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন কেবল তোমাদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ? তার বেশি কিছু নয় ? তেমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে আমার উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে তোমাদের কিছু আসে যায় না, কেমন ?

—কথাটাকে ঘুরিয়ে ধরলে অবশ্য তেমনই একটা অর্থ করা চলে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক—

নবনীতাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠে রুদ্রদেব, আমি একান্তই দুঃখিত যে তোমাদের ওব্‌লাইজ করতে পারবো না। তা'ছাড়া, এ ব্যাপারে তোমাদের সোসাইটির কেউ যদি কিছু অনুমান করে থাকে তা'হলে সেই অনুমান যে একেবারেই মিথ্যে তা'ও তো বলা চলে না। মিথ্যে দিয়ে সত্যকে চিরকাল আড়াল করে রাখা যায় না।

নবনীতা এবার ঝাঁঝের স্বরে জিজ্ঞেস করে. কী সত্য, কাকে সত্য বলছ তুমি ?

—বলছি আমাদের মধ্যে এই ব্যবধানকে।

—এর জন্যে তো দায়ী তুমি।

—আমি দায়ী কেন ?

—এই পুলিশের চাকরি ছেড়ে অন্য কোন ভাল চাকরি কিম্বা আমার বাবার ফার্মে একটা বড় পোস্ট এ্যাক্‌সেপ্ট করতে তুমিই তো রাজি হও নি।

—তেমন কোন পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রেখে তো আমাদের বিয়ে হয়নি।

—না-ই বা হলো। এখন হতে দোষ কী ?

—প্রয়োজন নেই বলেই।

—তোমার কাছে প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আছে। এখানকার এই পরিবেশে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। যদি কোন দিন আমার থাকার মত পরিবেশ তৈরি করতে পারো, সেদিন আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে নবনীতা।

জবাব দেয় রুদ্রদেব, পরিবেশ বলতে তুমি যদি আমার আর্থিক সচ্ছলতার কথা বোঝাতে চাও তা'হলে বলতে পারি সরকারী চাকুরের পক্ষে তেমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব। আমি জানি, তোমার কস্‌মেটিকসের পেছনে তোমার বাবা যত খরচ করেন আমার সারা মাসের মাইনেও বোধহয় তত নয়। ভদ্রভাবে চাকরি করে তোমার প্রয়োজনমত পরিবেশ সৃষ্টি করা আমার পক্ষে কতদিনে সম্ভব হবে তা' আমি জানি না।

নবনীতা আবার কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে। তারপর একসময় মাথা তুলে তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, তা'হলে তুমি পার্টিতে আসবে না ?

—না, সম্ভব নয়।

—বেশ, আমি তা'হলে চলি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নবনীতা। তারপর আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

নবনীতা চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে সেখানেই বসে থাকে রুদ্রদেব। অব্যক্ত বেদনার এক কালো ছায়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার গম্ভীর মুখের ওপর।

বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী এডমাণ্ড বার্ক বলেছিলেন—"It is a great truth that once things are gone out of their ordinary course, it is by acts out of ordinary course they can alone be re-established." সোজা কথায় বলা চলে—যে বাঁকা পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তাকে সোজা পথে আনতে হলে বাঁকা দাওয়াইয়েরই প্রয়োজন।

এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেব কাজের ফাঁকে ফাঁকে এডমাণ্ড বার্কের ঐ বিখ্যাত উক্তিকেই মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল গত তিন দিন ধরে। কখনও মনে হচ্ছিল, বার্ক ঠিকই বলেছিলেন। অন্যায় দিয়েই অন্যায়কে রুখতে হয়। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠার সম্ভাবনা না থাকলে আঙ্গুল বাঁকাতেই হয়। অন্য কোন পথ নেই। পরক্ষণেই আবার মনে হচ্ছিল, অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে হয়তো রোখা যায়, কিন্তু তাতে কি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা চলে? দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব

কেবল অন্যায়কে রোখাই নয়, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। আসলে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই সভ্য সমাজের আদর্শ। অন্যায়কে রোখা কেবলমাত্র সেই আদর্শে পৌঁছবার একটা পথ। তার বেশি কিছু নয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দুষ্কৃতকারীকে বিনাশের কথা বলেছিলেন সেটা কেবল পথ, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মসংস্থাপন।

তাই যদি হয় তা'হলে এডমাণ্ড বার্কের মত মনীষী বাগ্মীর ঐ উক্তিটি কি ভুল? বোধহয় না। ওর অন্তর্নিহিত অন্য কোন অর্থ নিশ্চয়ই আছে যা নাকি রুদ্রদেব ঠিক বুঝতে পারছে না।

গত তিন দিন ধরে এডমাণ্ড বার্কের ঐ উক্তিটি নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করার একটা বিশেষ কারণ ছিল রুদ্রদেবের। আসলে ঐ উক্তির সাহায্যে পুলিশের নৃশংস কর্মপদ্ধতির একটা সমর্থন চাইছিল সে।

হ্যাঁ, নৃশংসই বলতে হবে। নরহত্যা নৃশংস অপরাধ। চরমপন্থীদের খুনের রাজনীতি বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশ নিজেই অপরাধ করে চলেছে। সোজা পথে ওদের শায়েস্তা করতে না পেরে বাঁকা পথ ধরেছে পুলিশ। আইন কিম্বা বে-আইনের প্রশ্ন এখন আর নেই। যে করেই হোক দেশব্যাপী এই নরহত্যা ও রক্তপাতের অবসান ঘটাতে হবে।

খুনের রাজনীতির অবসান ঘটানোর ইচ্ছে কেবল পুলিশেরই নয়, এ ইচ্ছা দেশের সরকারের, এ ইচ্ছা দেশের তিক্ত-বিরক্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের। আর, এর দায়িত্ব দেশের পুলিশ বাহিনীর।

সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিনের খুনের ঘটনা মানুষকে ভীত করে তোলে। প্রতিবেশীর খুনের ঘটনায় সেই ভীতি আরও বেড়ে ওঠে। কিন্তু সে নিরুপায়। প্রশাসনের ওপর ভরসা নেই তার। তাই সে এগিয়ে আসে না প্রশাসনকে সাহায্য করতে। নিরুপায় আক্রোশে সে নিজের মধ্যেই জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। প্রতিবেশীর খুনের ঘটনায় ভীত হওয়ার মত সহকর্মী খুনের ঘটনায় পুলিশও ভীত। কিন্তু ভীত হলেও সে সাধারণ মানুষের মত নিরুপায় নয়। দেশের আইন আছে তার দিকে, অস্ত্র-শস্ত্র গোলা-বারুদ আছে তার হাতে। তার চাইতেও বড় কথা, পুলিশ বুঝতে পেরেছে যে দেশের সরকার ও জনসাধারণও এই মুহূর্তে এর অবসান চাইছে। পন্থা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা এখন আর কারুর নেই। কাজেই গোটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চালু হলো সেই ভয়ঙ্কর ইংরেজি শব্দটি—এনিহিলেশন—নিশ্চিহ্নকরণ। চরমপন্থীদের খতম অভিযানের জবাবে পুলিশের খতম অভিযান। সুযোগ পেলেই খতম

করো ওদের। ছলে বলে কৌশলে যেমন ভাবে পারো শায়েস্তা করো ওদের। ওদের মনের মধ্যেও জাগিয়ে তোল প্রচণ্ড ভীতি। ওরা জানুক, বুঝুক, পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি এন্‌কাউণ্টারে নিহত হওয়া ছাড়াও পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা। কোর্ট-কাছারি, সাক্ষী-সাবুদের দীর্ঘ পথ আর নয়। সোজাসুজি পথ এবার। গভীর রাতে দেয়ালের কাছে দাঁড় করিয়ে পেছন দিক থেকে একটা মাত্র বুলেট। পরের দিনই খবরের কাগজে বেরোবে যে পুলিশের হেপাজত থেকে পালাতে গিয়ে একজন চরমপন্থী গুলি খেয়ে নিহত হয়েছে। হত্যার বদলে হত্যা। রক্তের বদলে রক্ত। সভ্যতার আদি যুগের সেই সহজ হিসেব—আই ফর এ্যান আই, এ্যাণ্ড এ টুথ ফর এ টুথ—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।

দেশব্যাপী চলছে এই রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার পালা। পুলিশী প্রশাসনের উঁচু মহলে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রায় সবাই চোখ বন্ধ করেই আছেন। এই পদ্ধতি বে-আইনী, কাজেই সরাসরি এতে তাঁদের সম্মতি দেওয়া চলে না। কিন্তু মৌন সম্মতি দিতে আপত্তি কোথায়? তাঁরা নিজের হাতে তো কিছুই করবেন না। করবে তো অধঃস্তনেরা। গরজ তো ওদেরই বেশি। রাস্তায়, বাজারে চবমপন্থীদের হাতে তো ওরাই মরছে। তাঁরা নিজেরা তো থাকেন সুরক্ষিত বাড়িতে যেখানে বাইফেল হাতে তিন শিফটে প্রহরী কনস্টেবল নিয়মিত পাহারা দেয়। তাঁরা নিজেরা যখন বাস্তায় বের হন তখন তাঁদেব সঙ্গে থাকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। চরমপন্থীদেব সাধ্য কি যে তাঁদেব চুল স্পর্শ করে?

নিউটনের থার্ড ল' অফ মোশনের মত পুলিশের এই 'এনিহিলেশন' ব্যবস্থায় কিছু ফল ফলতে শুরু কবলো। দেশের জনসাধারণও যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত। চরমপন্থীদের কাজেব বিরুদ্ধে তাদের সেই নিরুপায় আক্রোশ এতদিনে যেন উপায় খুঁজে পেয়েছে পুলিশী এ্যাক্‌শনের মাধ্যমে। খবরের কাগজে পুলিশ হেপাজত থেকে পালাতে চেষ্টা করাব পরিণতিতে চরমপন্থীর নিহত হওয়ার আসল অর্থ এখন তারা জানে। মনে মনে খুশি না হলেও অখুশি নয় তারা।

এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেব ভট্টাচার্য কিন্তু খুশি হতে পারে না এই পুলিশী-ব্যবস্থায়। তার কেবলই মনে হ'ত থাকে এটা আসল পথ নয়। এটা কেবল একটা শর্ট-কাট্ ব্যবস্থা। এই বাবস্থায় সমাজের মঙ্গল হতে পারে না। আপাত-দৃষ্টিতে কিছু উপকার হয়তো হতে পারে, কিন্তু সেটা একান্তই সাময়িক, কিন্তু এর আসল প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসাবী। অন্যায় দিয়ে কখনও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। জনমানসে পুলিশের এই ভূমিকার পরিণাম ভয়ঙ্কর। আজ

হয়তো মৌন সম্মতি দিয়ে দেশের মানুষ পুলিশের এই কাজকে সমর্থন করে চলেছে, কিন্তু এতে পুলিশের ওপর তাদের ঘৃণা বাড়বে বৈ কমবে না। যেদিন আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, যেদিন ভীতির ভাবটা আর থাকবে না তাদের মনে, সেদিন আবার তারাই এগিয়ে এসে এই কাজের কৈফিয়ত চাইবে পুলিশের কাছে। অসহায় পুলিশের সেদিন আর দেবার মত কৈফিয়ত কিছু থাকবে না। তা'ছাড়া এই ব্যবস্থার আড়ালে সমাজের শত্রুরা যে তাদেব ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করছে না, এমনকি অসৎ পুলিশ কর্মীরা যে নিজেদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে না তার গ্যারাণ্টি কোথায়? কে বলতে পারে যে এই ব্যবস্থা নিরপরাধের প্রাণও হরণ করছে না?

এডমাণ্ড বার্কের সেই বিখ্যাত উক্তিটি রুদ্রর মনে পড়লো সেদিন যেদিন সহরের শেষ প্রান্তে এক নির্জন রাস্তায় পুলিশের হেপাজত থেকে পালাতে চেষ্টা করে দু'টি যুবক নিহত হলো। তার কেবলই মনে হতে লাগলো যে এই মৃত্যুর জন্যে সে নিজেও কম দায়ী নয়। ইচ্ছে করলে এই মৃত্যু সে প্রতিরোধ করতে পাবতো, কিন্তু সে তা' করে নি।

রাত তখন প্রায় আট'টা। হঠাৎ রুদ্রর টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোন ধরতেই ওপাশ থেকে শোনা যায় ইন্সপেক্টর রাজেন নন্দীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, এই মাত্র চক্‌বাগান এলাকায় রেইড্ করে ফিরে এলাম, স্যার।

সহরের চক্‌বাগান ও আশপাশের কয়েকটা এলাকা চরমপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি। আগে পুলিশ এই বিস্তীর্ণ এলাকায় একেবারেই ঢুকতে পারতো না। ইদানীং অবশ্য তাবা মাঝে মাঝেই এই এলাকায় রেইড্ চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পুলিশের সঙ্গে চরমপন্থীদের সংঘর্ষও ঘটে। দু'একজন ধরাও পড়ে, কিন্তু তাতে অবস্থার তেমন কিছু হেরফের হয় না।

প্রশ্ন করে রুদ্র, এন্‌কাউণ্টার হয়েছিল নাকি?

—হ্যাঁ স্যার। জোর এন্‌কাউণ্টার। পাঁচজন ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে সেই সোনা ও মণ্টুও আছে।

—তাই নাকি? খুশিতে উপচে পড়ে রুদ্রদেব, সোনা ও মণ্টুকে ধরতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ স্যার। ওরা এখন থানায়। এস-পি'কেও জানিয়েছি।

—ঠিক আছে। আমি এখনই যাচ্ছি।

পুলিশের কাছে খবর আছে যে সোনা ও মণ্টু নামের যুবক দু'টি সেই ট্র্যাফিক কনস্টেবল ও একজন ব্যবসায়ী হত্যার ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে

জড়িত। শত চেষ্টা করেও এই দু'জন কট্টর চরমপন্থীকে পুলিশ এতদিন ধরতে পারে নি। কাজেই তাদের গ্রেপ্তারের খবরে রুদ্রর খুশি হবারই কথা।

থানায় এসে রুদ্র নিজে সেই পাঁচজন চরমপন্থীকে ঘণ্টাখানেক ধরে জেরা করলো, কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কোন খবরই জোগাড় করা গেল না। বিশেষ করে সোনা ও মণ্টু একেবারে মুখই খুললো না। রুদ্রর প্রশ্নে এক সময় বিরক্ত হয়ে মণ্টু বললে, শুধু শুধু পরিশ্রম করছেন, স্যার। আমাদের কাছ থেকে দলের একটি কথাও বের করতে পারবেন না।

—ট্র্যাফিক কনস্টেবল ও বাজারের সেই ব্যবসায়ীর খুনের সঙ্গে তোমরা জড়িত ছিলে?

—হ্যাঁ স্যার। স্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার করে মণ্টু।

রুদ্র এবার সোনাকে জিজ্ঞেস করে, তুমিও ছিলে?

—হ্যাঁ স্যার, ছিলাম।

—আর কে কে ছিল?

—বলবো না। জবাব দেয় সোনা।

—কেন ওদের খুন করেছিলে? কী অপরাধ করেছিল ওরা?

—তা' জানি না।

—তবে খুন করলে কেন?

—পার্টির নির্দেশে।

—পার্টির হয়ে কে তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিল?

—বলবো না।

—কতদূর লেখাপড়া করেছ।

—ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন ছাড়লে?

—সমাজের এই কাঠামোতে পড়াশোনা করার কোন অর্থ নেই বলে।

রুদ্র এবার একটু চুপ করে থাকে। তারপর মণ্টুকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?

—হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে একটা কারখানায় চাকরি নিয়েছিলাম।

—চাকরি ছেড়ে এই দলে নাম লেখালে কেন?

—নড়বড়ে ঘুণেধরা সমাজের গায়ে আঘাত হানবো বলে।

—তোমরা সামান্য কিছু লোক মিলে চেষ্টা করলে সেই চেষ্টা কি ফলবতী হবে?

—আজ হয়তো হবে না, কিন্তু একদিন হবে। সেদিনের জন্যেই আজ আমরা এই কাজ করছি।

—তোমাদের দলের পয়সা-কড়ি আসে কোত্থেকে?

—জানি না।

—তোমাদের দলে কি মেয়ে আছে?

—বলবো না।

—ভালো কথায় না বললে তোমাদের ওপর অত্যাচার হতে পারে। তখন তো বলতে বাধ্য হবে।

একটু সময় চুপ করে থাকে মণ্টু। একবার তাকায় সোনার দিকে। তারপর বললে, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে কোন অবস্থাতেই আমরা দলের কথা প্রকাশ করবো না।

রুদ্রদেব আবার বললে, হাওয়ার পেছনে ঘুরে তোমরা তোমাদের জীবন নষ্ট করছো। খুনের রাজনীতিতে কখনও তোমরা সফল হতে পারবে না।

এই সময় জবাব দেয় সোনা, আপনি হয়তো স্যার তাই মনে করেন, কিন্তু আমরা তা' মনে করি না।

ধরা পড়া সব ক'টি ছেলের বয়সই একুশ বাইশের মধ্যে। এদের মধ্যে একজনের বয়স আরও কম। রুদ্রদেব বুঝতে পারে নিজেদের পার্টির প্রতি এরা ভয়ানক লয়্যাল। পার্টির নির্দেশ পালন করতে এরা কখনও পিছিয়ে আসে না। কোন রকম প্রশ্ন না করেই এরা এদের পার্টির নির্দেশ পালন করতে অভ্যস্ত। রুদ্রদেব আরও বুঝতে পারে এদের মুখ থেকে প্রয়োজনীয় একটি কথাও বের করা যাবে না। শত অত্যাচারেও মুখ খুলবে না এরা।

ছেলেগুলোকে আবার থানা লক-আপে পোরা হলো। রুদ্র ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ রাজেন নন্দীর ঘরে এসে এস-পি দিবাকর সেনের সঙ্গে ওদের ব্যাপারেই টেলিফোনে খানিকক্ষণ কথা বলে। তারপর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে রাজেন নন্দীকে বললে, ধরে তো এনেছেন। এখন এদের বিরুদ্ধে মামলা কি টেঁকাতে পারবেন? জোরালো এভিডেন্স এদের বিরুদ্ধে কোথায়?

রাজেন নন্দী সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে একটু রহস্যময় হাসি হাসে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, দেখা যাক, স্যার।

রাজেনের সেই রহস্যময় হাসিটুকু দেখেও কিন্তু সেই মুহূর্তে রুদ্রদেব বুঝতে পারে নি যে রাজেন সেই শর্ট-কাট ব্যবস্থার কথাই ভাবছে। এন্‌হিলেশনের চিন্তাই কেবল খেলা করে বেড়াচ্ছে তার মনে। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলো

শেষ রাতে টেলিফোন আসার পরে।

টেলিফোন করেছিল রাজেন নিজেই। বললে, স্যার, একটা খারাপ খবর আছে।

—কি খবর? তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রুদ্রদেব।

জবাব দেয় রাজেন, সারা রাত ধরে ওদের জেরা করেছি স্যার। শেষে ঘণ্টাখানেক আগে ওদের মধ্যে একজন মুখ খুললো। ওদের আর একটা আস্তানার খোঁজ দিলে। সেখানে নাকি অনেকগুলো বন্দুক পাওয়া যাবে। ওদের কথামত ওদের নিয়েই গাড়িতে করে সেখানে গেলাম। সঙ্গে আর্মড কনস্টেবল ছিল। সেপাইদের সামান্য অন্যমনস্কতায় ওরা পালাতে চেষ্টা করতেই বাধ্য হয়ে আমরা গুলি চালালাম। আর—

রাজেনের কথা শেষ হবার আগেই তার কথার পাদপূরণ করে রুদ্র নিজে, আর তাতে সম্ভবতঃ সোনা ও মণ্টু মারা পড়লো, কেমন?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, স্যার। কথাটা বলেই চুপ করে রাজেন। রুদ্র নিজেও সেই মুহূর্তে আর কিছু বলতে পারে না। কী বলবে সে? সোনা ও মণ্টু যে দু'দুটো মানুষের হত্যার জন্য দায়ী তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তাদের এমনিভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াটাই কি সঠিক পথ?

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে রুদ্র বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে এসে বসে। ঘুম আর হয় না। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সোনা ও মণ্টুর মুখ। যৌবনের প্রতীক ওরা। সামাজিক অসাম্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছিল তারা। চেয়েছিল একটা কিছু করতে। সেই তাড়নাতেই ওরা ভিড়ে গিয়েছিল চরমপন্থীদের দলে। অবশেষে ওদের সরিয়ে দেওয়া হলো পৃথিবী থেকে।

কিন্তু পুলিশের করনীয়ই বা কি ছিল? প্রমাণ-অভাবে মানুষ খুন করেও ওরা আদালত থেকে ছাড়া পাবে। তারপরে বেরিয়ে এসে আবার মানুষ খুন করবে। পুলিশের নামে উঠবে অকর্মণ্যতার অভিযোগ। ভীত সন্ত্রস্ত লোকেরা মুখে কুলুপ এঁটে চুপ করে থাকবে। হবে না কোন প্রতিকার। তার চাইতে এই সহজ পথেই সমস্যার সমাধান করলো রাজেন নন্দী।

কিন্তু এমনি করে সত্যিই কি সমস্যার সমাধান হবে? রাজেন নন্দীর এই কাজের পেছনে জেলার পুলিশ সাহেবের সমর্থন আছে কিনা জানে না রুদ্র। থাকলেও হয়তো তা' মৌন সম্মতি। তবে এতে যে রুদ্রর নিজের সমর্থন থাকবে না সেটা টের পেয়েই রাজেন ঘুণাক্ষরেও কথাটা প্রকাশ করেনি তার কাছে।

অন্ধকার বারান্দায় বেতের চেয়ারে একা বসে বাগ্মী এডমাণ্ড বার্কের সেই উক্তিটিই মনে পড়ছিল রুদ্রদেবের—অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তুলতে হলে অস্বাভাবিক ব্যবস্থারই প্রয়োজন। কিন্তু না, রুদ্র পারে না এই উক্তিকে পুরোপুরি মেনে নিতে। অন্যায় দিয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। এতে কেবল মানুষের ন্যায় বোধকে নীচে টেনে নামিয়ে সমাজের ক্ষতি করাই হয়।

এতদিন পরে সহসা রুদ্রদেবের মনে পড়লো তার দাদু সোমেশ্বরকে। ব্রিটিশ আমলের দারোগা ছিলেন তিনি। রুদ্র সে যুগের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অনেক কথাই জেনেছিল তার দাদুর কাছ থেকে। সে যুগের পুলিশ টেররিস্টদের ওপর অনেক অত্যাচারই করতো। কিন্তু এই 'এনিহিলেশন' শব্দটি সেযুগে প্রচলিত ছিল কিনা তা সে কোনদিন জিজ্ঞেস করেনি সোমেশ্বরকে।

পলিটিক্সের প্রতি কোন কালেই তেমন কোন আকর্ষণ অনুভব করতো না রুদ্রদেব। ছাত্রাবস্থায় এই নিয়ে অলকার সঙ্গে অনেক তর্কও হয়েছে তার। অলকা বলতো, এযুগে পলিটিক্স ছাড়া একটা সভ্য সমাজের কথা ভাবাই যায় না। জবাব দিতো রুদ্র, ঠিকই বলেছ তুমি। তবে আমাদের দেশের পলিটিক্সকে ঠিক সভ্য সমাজের পলিটিক্স বলা চলে না।

রুদ্রর জবাবে ফোঁস করে উঠতো অলকা। বলতো, তার মানে দেশের পলিটিসিয়ানদের তুমি প্রকারান্তরে অসভ্য বলতে চাইছো?

অম্লান বদনে জবাব দিতো রুদ্র, প্রকারান্তরে নয়, সোজাসুজিই তাদের অসভ্য বলছি।

—কেন এমন বলছো? কৈফিয়ত তলবের সুর জেগে উঠতো অলকার কণ্ঠে।

জবাবে রুদ্র বলতো, নীতিজ্ঞান-বর্জিত রাজনীতির প্রাধান্য এ দেশের সমাজ-জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে বলে।

রেগে গিয়ে অলকা বলতো, তোমাদের মত কিছু লোকের চোখে এদেশের ধ্বংসের ছবিটাই কেবল ফুটে ওঠে, সৃষ্টির কোন কিছুই নজরে পড়ে না।

—সৃষ্টি হলে তবে তো নজরে পড়বে? স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও যে

দেশের অধিকাংশ মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পর্যন্ত পায় না সে দেশে সৃষ্টির বড়াই না করাই ভালো।

—খেতে পাবে কি করে? ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাই তো সৃষ্টিটুকু শুষে নিচ্ছে।

—মিথ্যে কথা, জবাব দিতো রুদ্রদেব, দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোকই কেবল সেই সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করছে।

—তোমার কথাগুলো কেমন যেন একটু সাম্যবাদী ঘেঁসা বলে মনে হচ্ছে না? মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞেস করতো অলকা।

জবাব দিতো রুদ্র, সাম্যবাদী অসাম্যবাদী বুঝি না। যা ফ্যাক্ট তাই বলছি। তবে এতে বিস্মিত হবার মত কিছু নেই। যে দেশের পলিটিক্সে নীতিজ্ঞানহীন অসৎ লোকের প্রাধান্য সে দেশের অবস্থা এমনিই হয়ে থাকে।

একটু সময় চুপ করে থেকে অলকা হঠাৎ বলতো, আচ্ছা, এদেশে যারা রাজনীতি করে তাদের ওপর তোমার এত অশ্রদ্ধা কেন বলো তো?

—কারণ, শ্রদ্ধা করার মতো তাদের মধ্যে কিছু নেই বলে। মার্কামারা কোন মস্তান যখন কেবলমাত্র দলবাজীতে সিদ্ধহস্ত হয়ে রাতারাতি একজন কেউকেটা হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণকে উপদেশ বিতরণ করে তখন কি তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা চলে? এ জিনিস কেবল এদেশ ছাড়া অন্য কোথাও চোখে পড়বে না।

—বেশ তো, এককালের মস্তান কিম্বা অসৎ কি পরবর্তীকালে সৎ হতে পারে না? দস্যু রত্নাকর কি একদিন বাল্মীকি হয়ে ওঠেন নি?

—হ্যাঁ, হয়েছিলেন। তবে তার জন্যে তাঁকে দীর্ঘকাল কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এ কালের সাধনা তো কেবল দলবাজী, ঘোঁট পাকানো আর যেন-তেন প্রকারে আপন পকেট ভারি করে তোলা। একে যদি সাধনা বলো তা'হলে দেশের তাবৎ চোর-গুণ্ডা এক একজন মস্ত সাধক।

তর্কে হেরে গিয়েও কিন্তু হারতে চাইতো না অলকা। দেশের রুলিং পার্টির সাফল্যকে ছোট করে দেখাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারতো না সে। বিশেষ করে নেতাদের সম্পর্কে রুদ্রর এমন উক্তিকে একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে করতো। দীপক উপস্থিত থাকলে তাকেই মধ্যস্থ মেনে সে বলতো, আচ্ছা তুমিই বলো দীপকদা, দেশ-নেতাদের এমন পাইকারি হারে অসভ্যের দলে ফেলা ওর পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?

জবাবে দীপক সহসা কোন জবাব না দিয়ে শিবনেত্র হয়ে আপন মনে

সিগারেট টেনে চলতো। অলকা আবার তাড়া দিতো তাকে, ওকি দীপকদা, চুপ করে রইলে কেন? কিছু বলো।

এতক্ষণে দীপকের শিবনেত্র স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। হাতের সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অলকার দিকে তাকিয়ে সে বলতো, এই একটু আগে তুই চা-কেক খাওয়ালি। তাই সত্যি কথাটা কেমন করেই বা বলি। তবে যখন জিজ্ঞেস করলি তখন শোন বাড়াবাড়ি এমন একটি শব্দ যা নাকি ভারতীয় অভিধান থেকে অনেক কাল আগে মুছে গেছে। বিশেষ করে, এ দেশের রাজনীতিতে ঐ শব্দটি একেবারেই মূল্যহীন। এ দেশে এখন আর কোনকিছুই বাড়াবাড়ি নয়। নেতাদের কাজকর্মও যেমন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে না, তেমনি তাদের সম্পর্কে কোন সমালোচনাও নয়। এখন এদেশে সবকিছুই স্বাভাবিক। অবশ্যি এজন্যে দেশের নেতাদেরও আমি দায়ী করছি না। দায়ী এদেশের মাটি।

—এদেশের মাটি? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে কথাটার পুনরাবৃত্তি করতো অলকা।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। জবাব দিতো দীপক, এদেশের মাটিতে দলে দলে পলিটিসিয়ান জন্মালেও স্টেট্সম্যান জন্মায় না।

—বলছো কি তুমি? অলকার কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ে, এদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতাদের তুমি স্টেট্সম্যান বলে মনে করো না?

—না, স্পষ্ট জবাব দিতো দীপক, তাঁরা সবাই একটু উঁচু ধরনের পলিটিসিয়ান, স্টেট্সম্যান একজনও নন। সত্যিকারের স্টেট্সম্যান যাঁরা ছিলেন তাঁরা মরে বেঁচেছেন।

—বেশ, তা'হলে বলো দীপকদা, পলিটিসিয়ান ও স্টেট্সম্যানের পার্থক্য কি? ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতো অলকা।

সামান্য হেসে জবাব দিতো দীপক, পলিটিসিয়ান্স থিঙ্ক অন্লি অফ দি নেক্স্ট ইলেকশন, বাট স্টেট্সমেন থিঙ্ক অফ দি নেক্স্ট জেনারেশন। ইলেকশনের বাইরে পলিটিসিয়ানদের দৃষ্টি যায় না, কিন্তু স্টেট্সম্যানদের দৃষ্টি ভবিষ্যৎ বংশধরদের দিকে নিবদ্ধ থাকে। এবার বুঝলে?

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের উঁচুতলার অফিসারদের ধ্যান-ধারণার কথা ভাবতে গিয়ে দেশের পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তাদের একটা আশ্চর্য মিল চোখে পড়ে রুদ্রদেবের। দেশনেতা হয়েও যেমন অধিকাংশই দেশের জন্যে মাথা ঘামায় না, তেমনি পুলিশ বিভাগের উঁচুতলার অধিকাংশই ডিপার্টমেণ্টের ভালো-মন্দের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করে না। পলিটিসিয়ানদের ভালোবাসা নেই দেশের

প্রতি, পুলিশের হোমরা-চোমরাদেরও ভালোবাসা নেই ডিপার্টমেণ্টের প্রতি। ছু'দলই কেবল ক্ষমতার সিংহভাগ আদায় করতে পারলেই খুশি, কারণ ক্ষমতা মানেই প্রতিপত্তি এবং প্রতিপত্তির পথ ধরেই আসে অর্থ যা নাকি তাদের কাছে পরমার্থেব চাইতে ঢের বেশি মূল্যবান। এইজন্যেই এই বিভাগের নীচুতলার কর্মীরা সত্যিকারের শ্রদ্ধা করে না তাঁদের। ভয় করলেও শ্রদ্ধা কবে না, কাবণ শ্রদ্ধা পেতে হলে যে চরিত্রবলের প্রয়োজন তা' অধিকাংশেরই নেই। আর শ্রদ্ধা ভালোবাসার অভাব যেখানে ঘটে সেখানে কোনকালেই আসতে পারে না সত্যিকারের কল্যাণ। যে ডিপার্টমেণ্টের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে রয়েছে এমন অকল্যাণের বিষ-বাষ্প সেই বিভাগের কর্মীরা জনসাধারণের কল্যাণ করবে কেমন করে? সাপের মুখ থেকে কোনকালেই বিষ ছাড়া অমৃত ঝরতে পারে না। সাপের মুখকে কামধেনুর ছুধের বাট বানানো মোটেই সহজ নয়। লম্বা-চওড়া কথা আর হিতোপদেশের বন্যায় তা' কখনই সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই আন্তবিকতা যা নাকি একালে কোথাও নেই।

পুলিশ একটা শক্তি—সামাজিক জীবনে প্রচণ্ডতম এক শক্তি। পারমাণবিক শক্তিব মতই এর প্রচণ্ডতা। একে মানুষের কল্যাণেও যেমন ব্যবহার করা চলে তেমন ধ্বংসের কাজেও লাগানো যায়। দেশের রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরাই ঠিক করবেন একে কিভাবে ব্যবহার করা হবে। হয় সৃষ্টি নয় ধ্বংস, হয় কল্যাণ নয় অকল্যাণ। এর মাঝামাঝি কোন পথ খোলা নেই। সেইভাবেই এমন শক্ত হাতে তৈরি করে দিতে হবে এর কাঠামো যাতে নাকি এতটুকু ফাঁক-ফোঁকর না থাকে কোথাও, যাতে নাকি উল্টো-পাল্টা রাজনৈতিক বাতাস সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে সেই শক্তির গতিপথের হেরফের না ঘটাতে পারে। অসততা, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতীক এযুগের পুলিশ সেদিন হয়ে উঠবে দেশের সবচাইতে দামী সম্পদ। আর দামী সম্পদের মতই সেদিনের মানুষ একে সাবধানে ব্যবহার করবে। কিন্তু এমন একটা দিন কি সত্যিই আসবে? এযুগে রামরাজ্য কি বাস্তবে সম্ভব?

ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের লোক রুদ্রদেব ভট্টাচার্যের ধারণা রামরাজ্য বাস্তবে সম্ভব না হলেও আদর্শ হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম। এই আদর্শ সামনে রেখে যতদূর এগিয়ে যাওয়া যায় ততই মানুষের মঙ্গল।

ইদানীং মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতিতে পেয়ে বসে রুদ্রদেবকে। নিজেকে মনে হয় পুলিশ বিভাগের এক নিঃসঙ্গ পথিক। সে যেন পুলিশ বিভাগ সৃষ্টির সেই প্রথম দিনটি থেকে নিঃসঙ্গ পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছে।

সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই যুগ যে যুগে কোন সালঙ্কারা যুবতী নারী গভীর রাতে একা রাজপথ দিয়ে চলেছে নিঃশঙ্ক চিত্তে। সে যেন বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল্-রসীদের রাজসভায় দাঁড়িয়ে প্রজাদের প্রতি সামান্য কর্তব্য-চ্যুতির অপরাধে গ্রহণ করছে রাজভর্ৎসনা। লজ্জায় অপমানে তার প্রহরীর পোশাকে আবৃত দেহটা যেন থর থর করে কাঁপছে। আবার অপদার্থ রোম সম্রাট নীরোর বেহালায় বিষাদের বাস্তব সুর জাগাতে সে যেন ভয়ঙ্কর মশাল নিয়ে রোমের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে চলেছে সম্রাটের নির্দেশে। অত্যাচারিতের আর্তচিৎকারের জবাবে সম্রাটের সঙ্গে সে-ও যেন হেসে উঠেছে অট্টহাসি। মোগল-পাঠান আমল অতিক্রম করে ইংরেজ আমলের আড়াইশো বছরের পুলিশী জীবনের পথে যেন হেঁটে বেড়িয়েছে সে। এই দীর্ঘ পথে দু'চোখ ভরে সে দেখেছে অনেক কিছু।

অবশেষে সে ভেবেছিল স্বাধীন ভারতে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই পরিসমাপ্তি ঘটবে তার এই পরিক্রমা। কিন্তু তা হয় নি। পুলিশী মানসিকতার অলি-গলি খানা-খন্দ পরিভ্রমণ করতে করতে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে সে যেন এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে নিয়ে ফিরছে পুলিশী মানসিকতার আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার আলোয় কোথাও সে পুলিশকে দেখেছে একদল বর্বর, অত্যাচারী, অসৎ ও জনগণের প্রতি হৃদয়হীন আচরণকারী বলে, কোথাও বা তাদের দেখেছে জনদরদী কর্তব্যনিষ্ঠ বন্ধু বলে। অভিজ্ঞতা-পুষ্ট রুদ্রদেবের মন চলতে-চলতে কখনও কেঁদেছে, কখনও বা হেসেছে। কখনও শিউরে উঠেছে ভয়ে, কখনও বা আনন্দে হয়ে উঠেছে আত্মহারা। সেই মুহূর্তে রুদ্রদেব আর আই-পি-এস অফিসার নয়, একটা মহকুমার প্রধান পুলিশ প্রশাসকও নয়, এমনকি আদর্শনিষ্ঠ জগদীশের পুত্র কিম্বা সেকালের ঘুষখোর দারোগা সোমেশ্বরের পৌত্রও নয়। একজন নিঃসঙ্গ পথিক ছাড়া আর সব পরিচয় তার মুছে গেছে সেই মুহূর্তে। সেই পরিচয় নিয়েই যেন সে এগিয়ে চলেছে। থামছে না—থামবার উপায় নেই। অভিজ্ঞতা সুন্দরীকে ডেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যেন বলতে ইচ্ছে করছে তার—আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বল কোন পাড়ে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?

মানুষ বিপদে পড়লেই পুলিশের কাছে আসে। বিশেষ করে রুদ্রদেবের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই থানার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয়েই তার কাছে সাহায্যের আশায় আসে। রুদ্র পারতপক্ষে কখনও কাউকে ফেরায় না। শত কাজের মধ্যেও সে সময় করে এদের সঙ্গে দেখা করে। কোথাও বেরোলে

আর-টি অর্থাৎ রেডিও টেলিফোন মারফত অফিসে রীডার সুকুমার বক্সীকে নির্দেশ দেয় যাতে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ফিরে না যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ফিরে এসেই তাদের প্রত্যেকেব সঙ্গে দেখা করবে।

সেদিন কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। একটা মার্ডার কেস সুপারভিসনে বেরিয়েছিল রুদ্রদেব। সন্ধ্যা নাগাদ সে সুকুমার বক্সীকে আর-টি মারফত খবর পাঠালে যে ফিরতে তাব অনেক দেরি হবে। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা যেন পরের দিন সকালে এসে তার সঙ্গে দেখা করে।

রুদ্রদেব যখন ফিরে এলো তখন রাত প্রায় দশটা। সুকুমার বক্সী আগেই চলে গেছে। রাইফেলধারী সেন্ট্রি কনস্টেবল ছাড়া একমাত্র রুদ্রর আর্দালী-কনস্টেবল নীচে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে, আর উপরে সাহেবের খাবার ঢাকা দিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছিল বীরবাহাদুর।

জীপ থেকে নেমে রুদ্র উপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই আর্দালী-কনস্টেবল এগিয়ে এসে সেলাম জানিয়ে বললে, একজন মহিলা দেখা করার জন্যে সন্ধ্যে থেকে বসে আছেন, স্যার।

—সেকি? বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রুদ্রদেব, সুকুমারবাবু সবাইকে কাল সকালে আসতে বলে নি?

সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে জবাব দেয় কনস্টেবল, হ্যাঁ স্যার। রীডারবাবুর কথায় অন্য সবাই চলে গেছে, কিন্তু ঐ মহিলা যান নি। ওঁর নাকি আপনার কাছে ভীষণ দরকার।

—তাই নাকি? একটু সময় চিন্তা করে রুদ্র। তারপর সিঁড়ির কাছেব দরজা দিয়ে নিজের অফিস কক্ষে ঢুকতে ঢুকতে কনস্টেবলটিকে বললে, মহিলাকে পাঠিয়ে দাও।

রুদ্র সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে নিজের চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের দরজার ভারি পর্দা দুলে ওঠে। একটু পরেই একজন মহিলা ঘরে ঢোকে। মহিলা না বলে একজন বিবাহিতা তরুণী বললেই বোধহয় ভালো হয়। দেখতে সুশ্রী। পরনে সাদা খোলের একখানা শাড়ি, মাথার খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের ওপর। পাথর সেট করা সাধারণ একজোড়া দুল কানের লতির সঙ্গে লেপটে রয়েছে। গলায় কিছু আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। মহিলার চোখ দু'টি সুন্দর। কিন্তু সেই সুন্দর চোখে ছড়িয়ে রয়েছে একটা বিষাদের ছায়া। কপালের সিঁদুরের টিপটি জ্বল জ্বল করছে। হাতের শাঁখা জোড়ার সঙ্গে কেবল রয়েছে দু'গাছা সরু চুড়ি।

চোখে মুখে বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে থাকলেও সারা মুখে মহিলাটির এমন এক চাপা গাম্ভীর্য যা নাকি এ বয়সে সচরাচর চোখে পড়ে না। তার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের সঙ্গে ঐ সাদা খোলের শাড়িখানাই যেন বেশি মানিয়েছে। গায়ের ওই সামান্য অলঙ্কারও যেন ঠিক মানানসই। ভদ্রমহিলার দিকে একপলক তাকিয়েই রুদ্রদেবের মনে হলো, এই পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া যেন মহিলাটিকে সেই মুহূর্তে আর কিছুতেই মানাতো না।

মহিলাটি ধীর পায়ে রুদ্রর দিকে এগিয়ে এসে হাত জোড় করে ছোট্ট একটি নমস্কার করলে। তারপর মৃদু লজ্জিত কণ্ঠে বললে, আপনি ক্লান্ত হয়ে বাইরে থেকে ফিরেছেন। এই সময় আপনাকে বিরক্ত না করলেই ভালো হতো। কিন্তু আমার প্রয়োজন বড় বেশি। তাই—। মহিলাটি কথা শেষ না করেই এমন ভাবে একটু হাসলে যে হাসিটুকু সেই মুহূর্তে তার মুখের বিষণ্ণতাকে যেন আরও খানিকটা বাড়িয়ে তুললো।

সারা মুখে পুলিশী গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে রুদ্র বললে, না—না, তাতে কি হয়েছে? আপনি বসুন—বলুন আপনার কথা।

—হ্যাঁ, বলার জন্যেই যখন এসেছি তখন তো বলতেই হবে। কথাটা বলতে বলতে মহিলা রুদ্রর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসতেই রুদ্র জিজ্ঞেস করে, আপনি কি এই সহরেই থাকেন?

মহিলা মুখ তুলে রুদ্রর দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নীচু করে জবাব দেয়, না, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

—কোত্থেকে? প্রশ্ন করে রুদ্র।

মহিলা দূরবর্তী একটা ভিন্ন জেলার জেলা-সদরের নাম বলতেই রুদ্র বললে, এখানে কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি উঠেছেন বোধহয়?

—না, জবাব দেয় মহিলা, আজ বিকেলেই এসে পৌঁছেছি। স্টেশন থেকে সোজা এসেছি এখানে।

মহিলার জবাবে বিস্মিত হয় রুদ্র। দূরের সেই সহর থেকে ট্রেনে আসতে কমপক্ষে আট-ন ঘণ্টা সময় লাগে। এতদূর থেকে মহিলা কেবলমাত্র তার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে নাকি? তা'ছাড়া, এই এত রাতে মহিলা আবার ফিরবেই বা কেমন করে?

রুদ্রর ভাবনার মধ্যেই মহিলা আবার মুখ তোলে। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, দীপক মৈত্র বলে কাউকে চেনেন আপনি?

মহিলার দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় রুদ্র, ইউনিভার্সিটিতে একজন দীপক

মৈত্রকে চিনতাম। সে ছাড়া আর কোন দীপক মৈত্রের কথা তো আমার মনে পড়ছে না।

—হ্যাঁ, আমি তাঁর কথাই বলছি। কথাটা বলেই মহিলা আবার মাথা নীচু করে।

—দীপক মৈত্র—আমাদের সেই দীপকদার কথা বলছেন? তাকে চেনেন নাকি আপনি? কোথায় আছে সে? খামখেয়ালী দীপকদা কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় যে সরে পড়লো জানি না। শুনেছিলাম, এম-এ'তে নাকি সে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। পুলিশী গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে রুদ্র। তার সেই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের মধ্যেই ফুটে ওঠে তার দীপকদা সম্পর্কে জানার আগ্রহ।

দীপক মৈত্র সম্পর্কে রুদ্রর এই আগ্রহটুকুর অপেক্ষাতেই যেন ছিল মহিলাটি। রুদ্র থামতেই মহিলাটি মাথা তুলে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, চিনি তাঁকে। তিনি আমার স্বামী।

—কি—কি বললেন? আপনি আমাদের দীপকদার স্ত্রী? পরিচয়ের আনন্দে প্রায় হৈ-হৈ করে ওঠে রুদ্র, কোথায় আছে দীপকদা? কি করছে সে এখন? এখনও কি তেমনি খামখেয়ালী আছে? কতদিন দেখা হয় নি তার সঙ্গে। একবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করবো, কেন সে আমাদের কিছু না জানিয়ে এমনি ভাবে সরে পড়েছিল। বিয়েতে পর্যন্ত আমাদের একটা খবর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নি।

মহিলাটি এবার লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে।

রুদ্র আবার বলতে থাকে, কি মুশকিল, এই সময় কি দিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করবো, বৌদি! আপনি তো ঠিক জানেন না দীপকদা এককালে কত ভালোবাসতো আমাকে।

—হ্যাঁ জানি, ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় মহিলাটি, ওর মুখেই আপনার কথা অনেক শুনেছি। প্রায়ই বলতো আপনার কথা। ওর কাছেই তো জেনেছি যে আপনি এখানকার এস-ডি-পি-ও।

ভ্রূ-যুগল একটু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে রুদ্রর। বলে ওঠে সে, আমার এখানে পোস্টিংয়ের কথা দীপকদার কাছেই আপনি শুনেছেন? তার মানে সে আমার খবরাখবর রাখে। তবুও সে আমার সঙ্গে এতকাল যোগাযোগ রাখে নি। মুখোমুখি দেখা হলে একবার কারণটা জিজ্ঞেস করতাম তাকে। কী করছে এখন দীপকদা?

মহিলাটির মুখখানা এতক্ষণে আবার থমথমে হয়ে ওঠে। জবাব দেয় সে, ওখানকার কলেজের লেকচারার ছিলেন।

—ছিলেন মানে? কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে নাকি? এখন তবে কি করছে?

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় মহিলাটি, উনি নিজে ছেড়ে না দিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষই ওঁকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। উনি এখন ওখানকার পুলিশের হাতে।

—দীপকদা পুলিশের হাতে? বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে রুদ্র, কেন, কি করেছে সে? তার মত লোক এমন কী করতে পারে যে তাকে পুলিশের হাতে পড়তে হলো?

দীপক মৈত্রের স্ত্রী সুস্মিতা মৈত্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে। তারপর তেমনি মৃদু কণ্ঠে বললে, সন্ত্রাসবাদী কাজ-কর্মের জন্যে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। আমাদের ওখানে পরপর কয়েকজন খুন হয়। সেই খুনের ঘটনার সঙ্গে নাকি তিনি জড়িত।

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকে রুদ্রদেব। তাদের সেই আমুদে দীপকদা যে শেষপর্যন্ত খুনের রাজনীতির দলে গিয়ে ভিড়বে তা' ছিল তার কল্পনারও অতীত। দেশের এই সমাজ ব্যবস্থাকে কোনদিনই তাদের দীপকদা তেমন পছন্দ করতো না। কিন্তু তেমন কোন চরমপন্থী মনোভাবের অধিকারী বলেও তো তাকে কোনদিন মনে হয় নি তাদের। নিজে ফার্স্টক্লাশ এম-এ, একটা কলেজের অধ্যাপক। বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী, সম্ভবতঃ শিক্ষিতাও। সেই মানুষকে কেন শেষ পর্যন্ত এই রোগে ধরলো? তবে কি ওখানকার পুলিশ কোনরকম ভুল করেছে? নাকি, পুলিশের তরফে একজন নিরীহ অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে কিছু আদায়ের প্রচেষ্টা?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে রুদ্র জিজ্ঞেস করে, সত্যি করে বলুন তো বৌদি, দীপকদা কি সত্যি সত্যিই ঐ সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

রুদ্রকে বিস্মিত করে তুলে স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয় সুস্মিতা, হ্যাঁ, ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে উনি সেই খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইদানীং কলেজে যাওয়াও প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কলেজের চাকরিটি গেল, কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি। নেহাত আমার স্কুলের চাকরিটি ছিল, নইলে একমাত্র ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়তে হতো আমাকে। রাতদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত এখানে-ওখানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন।

কোনদিন বেশি রাতে বাড়ি ফিরতেন, কোনদিন বা ফিরতেন না।

রুদ্র এতক্ষণে বুঝতে পারে তাদের ইউনিভার্সিটির সেই দীপকদা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। রক্তের রাজনীতি নিয়ে মেতেছে সে। সেই রাজনীতির যূপকাষ্ঠে সে বলি দিয়েছে নিজের ছোট্ট সাজানো সংসার, কলেজের অধ্যাপকের চাকরি। তবুও বোধহয় হুঁশ হয় নি তার। অবশেষে সে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠেছিল বলেই হয়তো সে রুদ্রদেবের খবরাখবর রেখেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে নি। যেখানে সন্ত্রাস-রাজনীতির প্রথম টার্গেট দেশের পুলিশ বাহিনী, সেখানে দীপক মৈত্রের মত একজন নেতা আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে কেমন করে?

সেই মুহূর্তে দীপকের কার্যকলাপের চাইতেও তার স্ত্রী সুস্মিতার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি বিস্মিত করেছিল রুদ্রকে। লুকোবার কোনই প্রচেষ্টা নেই, স্বামীকে আড়াল করবার কোন ইচ্ছাও নেই, সোজা সরলভাবে স্বামীর কার্য-কলাপের বর্ণনা দিয়ে গেল। মনে এতটুকু দ্বিধা দ্বন্দ্বও যেন নেই। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী যখন তখন নিশ্চয়ই উনি শিক্ষিতা। তবে কি স্বামীর কার্যকলাপ মনঃপূত ছিল না তাঁর? তাই কি এমন অবলীলায় দীপক সম্পর্কে এত সব কথা একজন পুলিশ অফিসারের কাছে বলে গেলেন? স্বামীর বিরুদ্ধে এই কথাগুলো বলতেই কি তবে উনি এতদূর ছুটে এসেছেন? নাকি বিপদে পড়ে দীপক নিজেই স্ত্রীকে পাঠিয়েছে তার কাছে যাতে সে রেহাই পেতে পারে পুলিশের টানা হ্যাঁচড়ার হাত থেকে?

গম্ভীরস্বরে রুদ্র জিজ্ঞেস করে সুস্মিতাকে, এক্ষেত্রে আমি এখন কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, বৌদি? পুলিশ যদি ভুল করতো কিম্বা কোন অন্যায় করতো তা'হলে না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু আপনার কথায় তো মনে হচ্ছে পুলিশ তেমন কোন ভুল কিম্বা অন্যায় করে নি। এখন দেশেব আইন তার নিজের পথ ধরবে। আমি এ ব্যাপারে কী করতে পারি?

রুদ্র যখন কথাগুলো বলছিল, সুস্মিতা তখন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে। রুদ্র থামতেই সুস্মিতা তেমনি মৃদু স্বরে বলে ওঠে, দেশের আইন যাতে ঠিকমত নিজের পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে সেটুকু দেখার অনুরোধ জানাতেই কেবল এসেছি আপনার কাছে।

—বলছেন কি আপনি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রুদ্রর, স্বামীর যাতে শাস্তি হয় তার তদ্বির করতেই কি আপনি এসেছেন আমার কাছে?

—শাস্তির তদ্বিরে নয়, বিচারের তদ্বিরে এসেছি আপনার কাছে, বলতে

থাকে স্মিতা, তিনি সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত কিম্বা যুক্ত নন, তিনি সেই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি ছিলেন না, তিনি সত্যিই অপরাধী কিম্বা নিরপরাধ—এই প্রশ্নগুলোর মীমাংসার দায়িত্ব যার, সেই আদালতেই যাতে দেশের আইনমত আমার স্বামীর বিচার হয় সেই তদ্বিরেই এসেছি আপনার কাছে। বিচারে আমার স্বামীর যদি ফাঁসিও হয় তাতেও আমার দুঃখ থাকবে না। কিন্তু বিনা বিচারে যেন তাঁর চরম শাস্তি না হয়।

স্মিতা থামতেই বলে ওঠে রুদ্র, তা' কেমন করে হয়? বিচার না করে আদালত তাকে শাস্তি দেবে কেমন করে?

—আদালত হয়তো দেবে না, তবে আপনাদের পুলিশের নিজস্ব আদালত যেভাবে বিচার ছাড়াই সন্ত্রাসবাদীদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা চালু করেছে তাতে খুবই ভাবনায় পড়েছি। তাই বিচারের তদ্বির করতেই এসেছি আপনার কাছে।

এতক্ষণে বিষয়টি স্পষ্ট হয় রুদ্রর কাছে। এনিহিলেশনের চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে তার কাছে ছুটে এসেছে তার দীপকদার স্ত্রী। কি আশ্চর্য যোগাযোগ! যে দীপকদাকে রুদ্র বরাবরই সব ব্যাপারে নিজের চাইতে বড় বলে ভাবতো সেই দীপকদাই শেষ পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে নিজের স্ত্রীকে তদ্বির করার জন্যে রুদ্রর কাছে পাঠিয়েছে। এতদিনে বোধহয় খুনের রাজনীতির নেশা তার কেটেছে। তাই বাঁচার জন্যে একজন মহিলাকে এমন ছুটিয়ে বেড়ানো। সেই মুহূর্তে কিন্তু দীপকের এই ভীরু কাপুরুষতাকে ঠিক ভালো লাগছিল না রুদ্রর। তার সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত যে ভালোবাসা একদিন সে পোষণ করতো, তা এই দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদেও ম্লান হয় নি। তার চেনা-জানা মানুষের মধ্যে আজও দীপক মৈত্র অধিকার করে রয়েছে একটা বিশিষ্ট স্থান। কিন্তু নিজের জীবন বাঁচাতে স্ত্রীকে এখানে পাঠানোর ঘটনা যেন তার সেই শ্রদ্ধাকে খানিকটা খাটো করে ফেললে।

স্মিতার দিকে তাকিয়ে রুদ্র চিন্তিত কণ্ঠে বললে, দিনকাল খারাপ। এর মধ্যে দীপকদার উচিত হয় নি আপনাকে একা এখানে পাঠানো। আমার এখানে কোন মেয়েছেলেও নেই যে রাতটা আপনাকে এখানে থেকে যেতে বলবো।

রুদ্রর কণ্ঠে দুশ্চিন্তার সুর লক্ষ্য করে একটু ম্লান হেসে স্মিতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—না, আমার জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। তা'ছাড়া, আমি একাও আসিনি। পাড়ার একটি ছেলেকে সঙ্গে এনেছি। সে বাইরে

বসে আছে। রাত এগারোটায় আমাদের গাড়ি। ঐ গাড়িতেই ফিরবো। তাই রাতে কোথাও থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

সুস্মিতার কথায় রুদ্র খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে কি যেন বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই সুস্মিতা আবার বলে ওঠে, তবে আপনি কিন্তু একটু ভুল করেছেন। আপনার দীপকদা আমাকে আপনার এখানে পাঠান নি। আমার এখানে আসার কথা তিনি জানেনও না। এমনকি জানতে পারলে দারুণ রাগ করবেন। কিন্তু না এসে আমার তো কোন উপায় নেই। নিজের সম্পর্কে উনি বরাবরই নিস্পৃহ, কিন্তু তাই বলে আমি তো তেমনভাবে থাকতে পারি না। তাই তো ওঁর অমঙ্গল আশঙ্কায় এত দূরে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

কথার শেষের দিকে বেদনার আভাস ফুটে ওঠে সুস্মিতার কণ্ঠে। শঙ্কায় ও উদ্বেগে কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

রুদ্র তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, আপনি ভাববেন না, বৌদি। আদালত থেকে দীপকদা ছাড়া পাবে কি পাবে না তা' বলতে পারবো না। তবে আমাদের অর্থাৎ পুলিশের তরফ থেকে যাতে তার কোন ক্ষতি না হয় সে চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করবো। কাল সকালেই টেলিফোনে ওখানকার পুলিশ সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো আমি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রুদ্রর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে একটু যেন নিশ্চিন্ত হয় সুস্মিতা। ম্লান হেসে সে বললে, আমি জানতাম যে আপনি নিশ্চয়ই ওঁর জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

—কেমন করে জানলেন? ফস করে জিজ্ঞেস করে বসে রুদ্র।

—তা' বলতে পারবো না। তবে কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল যে একবার আপনার কাছে এসে পড়তে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আপনি আমাকে সত্যিই নিশ্চিন্ত করলেন, ঠাকুরপো।

পুরুষের পক্ষে একজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো যত সহজ একজন মহিলার পক্ষে তা তত সহজ নয়, কারণ পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোক অনেক বেশি সাবধানী। স্ত্রীলোকের মনে বিশ্বাস জন্মানোও যেমন কঠিন, সেই বিশ্বাস চট্ করে মুছে ফেলাও তেমনি শক্ত। তাই, রুদ্র যত সহজে সুস্মিতাকে বৌদি বলে ডাকতে পারলে, সুস্মিতার পক্ষে রুদ্রকে ঠাকুরপো বলে সম্বোধন করতে তার চাইতে খানিকটা বেশি সময় লাগাই স্বাভাবিক।

রুদ্র একসময় সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, বৌদি?

—বলুন। শান্ত দৃষ্টিতে রুদ্রর মুখের দিকে চেয়ে জবাব দেয় স্মিতা।

রুদ্র বললে, দীপকদা এই যে খুনের রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছিল তাতে তাকে বাধা দেবার কথা কখনও আপনার মনে হয়নি?

রুদ্রর চোখে চোখ রেখে স্মিতা জবাব দেয়, না।

—কেন, প্রশ্ন করে রুদ্র।

স্মিতা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। রুদ্র তার সেই মৌনতার সুযোগ নিয়ে আবার বললে, তা'হলে কি আমি ধরে নেবো যে দীপকদার ঐ খুনের রাজনীতিকে আপনিও পছন্দ করতেন বলেই তাকে আপনি কোনদিন বাধা দেন নি?

স্মিতা আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় বললে, না, আপনার অনুমান ঠিক নয়। ওঁর খুনের রাজনীতিকে কোনদিন আমি পছন্দ করতাম না।

—তা'হলে তাকে বাধা দেওয়ার কথা আপনার মনে হয় নি কেন?

আবার একটু সময় চুপ করে থাকে স্মিতা। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দেয়, দেখুন, আমি অতি সাধারণ মেয়েছেলে। কিন্তু আপনাদের দীপকদা বাস্তবিকই অসাধারণ। আমার সাধারণ বিদ্যে-বুদ্ধি দিয়ে সেই অসাধারণের কাজ-কর্মের বিচার করতে যাওয়াকে আমি বোকামি বলেই মনে করি। তাঁর ঐ ধরনের রাজনীতি আমি পছন্দ করতাম না। কিন্তু তাই বলে তিনি যে ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন এবং তাঁকে আমার বাধা দেওয়া উচিত তা-ও মনে করতাম না। আসলে তিনি এত বড় যে তাঁর সম্পর্কে কোন কিছুর পরিমাপ করার কথাই আমি মনে ঠাঁই দিতাম না কোনদিন।

—তার মানে, তার এই রাজনীতি সম্পর্কে আপনার মৌন সম্মতি ছিল।

ম্লান হেসে স্মিতা বললে, মুখেই হোক্ কিম্বা মনেই হোক্, সম্মতি যদি দিতে পারতাম তা'হলে আমিই খুশি হতাম সবচাইতে বেশি। কিন্তু তা' আমি পারি নি। তাই বলে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিবেচনার মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে বিচার করতেও চেষ্টা করি নি।

রুদ্র আবার কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই নিজের হাত ঘড়ির ওপর নজর পড়তেই সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, পৌনে এগারোটা বাজে।

একটু চমকে উঠে স্মিতাও নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তাই তো। আর তো দেরি করা চলে না। আমি এবার উঠি। বলতে

বলতে স্মিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই রুদ্রও উঠে দাঁড়ায়। তারপর বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বৌদি। পুলিশের কাছ থেকে দীপকদার কোন ক্ষতিই হবে না।

—আপনি আমাকে চিন্তাব হাত থেকে রেহাই দিলেন, ঠাকুরপো।

স্মিতা ও তার সঙ্গের ছেলেটিকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয় রুদ্র। নিজের অর্ডার্লি কন্‌স্টেবলকে তাদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত পাঠাবার ইচ্ছে ছিল তার। সে কথা বলতেই স্মিতা বলে ওঠে, না—না, এইটুকু পথ আমরাই যেতে পারবো। একটা রিক্সা যদি পেয়ে যাই তো ভালই, না পেলেও ক্ষতি নেই। হেঁটে গিয়েও ট্রেন ধরতে অসুবিধে হবে না।

স্মিতাদের বিদায় দিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে এসে দাঁড়ায় রুদ্র। সেই মুহূর্তে তার সারা মন অধিকার করে ছিল ঐ স্মিতা। বিশেষ করে দীপক সম্পর্কে স্মিতার কথাগুলোই রুদ্রর মনটাকে আলোড়িত করে তুলছিল। ঐ শিক্ষিতা মহিলার মনের কোন্ স্তরে তার স্বামীর আসনখানি পাতা রয়েছে তাই প্রকাশ পেল স্মিতার কথায়। দীপকের উদ্দেশ্যে রুদ্র মনে মনে বললে, সত্যিই তুমি ভাগ্যবান দীপকদা। গোটা পৃথিবীও যদি তোমাকে কোনদিন দূরে ঠেলে দেয় তবুও তুমি একজনের মনে বেঁচে থাকবে। সেই একজন হচ্ছে তোমার স্ত্রী। সেই বেঁচে থাকার মধ্যে যে কোন ফাঁকি নেই তা' কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি আমি। আইনের চোখে যদিও তুমি আজ অপরাধী, প্রশাসনের লৌহ শৃংখলের কাছে যদিও আজ তুমি পরাজিত, কিন্তু তোমাব আসল জিৎ তো অন্যখানে। সেখানে তুমি আপন মহিমায় ভাস্বর। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যে সেখান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করে। তুমি সত্যিই ভাগ্যবান, দীপকদা।

সেই মুহূর্তে রুদ্রর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর একটি নারীর মুখ। নবনীতা—রুদ্রর বিবাহিতা স্ত্রী নবনীতা, যে নাকি স্বামীর কাছ থেকে সরে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করে নিজের পিত্রালয়কেই আপন ঘর বলে ধরে নিয়ে সেখানেই বাস করছে পরম নিশ্চিন্তে। দোষ তার নয়, দোষ রুদ্রর নিজের। সে নিজের সম্পর্কে নবনীতার মনে সামান্যতম দাগ কাটতেও পারে নি।

আরও একজনের কথা সময় সময় মনে পড়ে রুদ্রর। অলকা—রুদ্রর সহপাঠিনী অলকা মজুমদার। এককালে রুদ্রর মনে হতো ঐ অলকাব মনের কোণে বোধহয় একটু স্থান করে নিতে সে পেরেছে। কিন্তু সেটাও যে সত্যি নয় তা বোঝা গেল অচিরেই। রাজনীতির আবর্তে পড়ে কোথায় চলে গেছে

অলকা। আজ সে একজন এম-এল-এ। রুলিং পার্টির একজন নেত্রী। ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিয়েছে দেশের স্বার্থের কাছে, অন্ততঃ অলকা তাই ভাবে এবং বোধহয় বিশ্বাসও করে।

মানুষের জীবনে 'ব্যালান্স' শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারুর চরিত্রে এর অভাব ঘটলে সাধারণভাবে তাকে 'ছিটগ্রস্ত' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। একটু বেশি পরিমাণে অভাব দেখা দিলে বলা হয় পাগলামি।

ছিটগ্রস্ত কিম্বা এমনি সাধারণ অর্থে পাগলদের হামেশাই দেখা যায় সংসারে। সাধারণভাবে এদের নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। কিন্তু এরা যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকে তখনই ঘটে বিপদ। বিশেষ করে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এই সব ছিটগ্রস্তদের কাণ্ড-কারখানার ফল কিন্তু সময় সময় হয়ে ওঠে মারাত্মক। গোটা ডিপার্টমেণ্টকে ভুগতে হয় এদের নিয়ে। এমনি এক ছিটগ্রস্ত অফিসার হলেন বলবীর সিং। বঙ্গ-বিহার সীমান্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ জেলার এস-পি অর্থাৎ পুলিশ সাহেব তিনি।

পাঞ্জাব তনয় বলবীর সিং নিঃসন্দেহে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের সেরা ছাত্র ছিলেন তিনি। অদ্ভুত মেধা তাঁর। পশ্চিম বাংলায় চাকরি করতে এসে মাত্র দু'মাসের মধ্যে বাংলা ভাষাটাকে কাজ চলার মত রপ্ত করেছিলেন। ছ'টি মাসের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়ে রস গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তা'ছাড়া, এমন কোন সাব্‌জেক্ট নেই যাতে তাঁর অল্প-বিস্তর জ্ঞান না আছে। যে কোন সময় যে কোন টপিক্‌স নিয়ে তিনি অনায়াসে আলোচনা করতে পারেন এবং সেই আলোচনা যে খুব হাল্‌কা ধরনের তা-ও নয়। এক বছর আগে সুপারভাইজ করা কোন খুনের মামলার বাদীর নাম পর্যন্ত অনায়াসে বলে দিতে পারেন। নিত্য-নতুন গভর্নমেণ্ট অর্ডারের অধিকাংশই তাঁর কেবল মুখস্থই নয়, অর্ডারের নম্বরগুলো পর্যন্ত তিনি নির্ভুলভাবে বলতে পারেন। পুলিশ মহলে তিনি জীবন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নামেই পরিচিত।

এমন প্রতিভাবান ব্যক্তি বলবীর সিংয়ের কাছ থেকে ডিপার্টমেণ্ট ন্যায্য-ভাবেই হয়তো অনেক কিছু আশা করতে পারতো। নিজের প্রতিভার আলোয় পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদেরও হয়তো তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারতেন। সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তিনি তাদের পরিচালিত করতে পারতেন সঠিক পথে। এতে উপকৃত হতো গোটা ডিপার্টমেণ্ট, উপকৃত হতো এলাকার অধিবাসীরা।

বাস্তবে কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। ছিটগ্রস্ত আখ্যালাভ করে পুলিশ মহলের বোঝা হয়েই রইলেন তিনি। কাজ-কর্মে তার মেধার পরিচয় মেলে না, তার ওপর পটুত্বের বড়াই করতে সততই সচেষ্ট। মাঝে মাঝে বিভাগীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে এমন সব কথাবার্তা বলেন যা নাকি সাবর্ডিনেট মহলে প্রথমটায় বিস্ময় ও পরে নির্ভেজাল হাসির খোরাক জোগায়। মুখ ফুটে কেউ কখনও প্রতিবাদ করতে পারে না সাহেবের অসন্তুষ্টির ভয়ে। নীচু মহলের সেই নীরবতা নিজের মতামতকে অভ্রান্ত বলে ভাবতে প্রেরণা জোগায় তাঁকে।

এতেও হয়তো তেমন কিছু এসে যেত না যদি না তিনি খানিকটা প্র্যাকটিক্যাল হতেন। বাগান করার শখ ছিল তাঁর। আর এই শখই শেষ পর্যন্ত গোটা জেলার থানাগুলোকে এক একটি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের ইউনিট করে তুললো। পুলিশের আসল কাজ-কর্ম শিকেয় উঠলো। পুলিশ সাহেবের গুড বুকে থাকার লোভে থানার বড়বাবুরাও মেতে উঠলো বাগান নিয়ে।

বাগান করার শখ কোন খারাপ শখ নয়। থানা কম্পাউণ্ড্‌কে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে তোলার মধ্যে খারাপ কিছু নেই। আপন আপন পরিবেশকে সুন্দর করে সাজানো প্রত্যেকেরই কর্তব্য। কিন্তু জেলার চাজ নিয়েই বলবীর সিং হুকুম দিলেন যে থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে এক ছটাক জমিও যেন পতিত হয়ে না থাকে। ফুলের চারা তো বটেই, ফল ও তরিতরকারির চাষ করে জমির সদ্ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম প্রথম পুলিশ সাহেবের কথায় তেমন কর্ণপাত করলো না কেউ। কিন্তু থানা পরিদর্শনে গিয়ে বলবীর সিং যখন থানার কাজ-কর্ম ছেড়ে পতিত জমি নিয়ে পড়লেন এবং থানার ও-সি'দের নাজেহাল করতে শুরু করলেন তখনই সবার টনক নড়লো। বছর ভোর ভালো কাজ করেও যখন মাত্র বাগান করার গাফিলতির জন্যে পুলিশ সাহেব কড়া ইন্সপেকশন রিমার্ক লিখতে আরম্ভ করলেন তখন চাকরি ও গুড রেকর্ডের খাতিরে থানার ও-সি'দের সেদিকে

নজর না দিয়ে উপায় কি ? অচিরেই তারা টের পেল যে পুলিশের কাজ-কর্মে সাহেব একজন দিক্‌গজ। একমাত্র বাগান সাজালেই এই ছিটগ্রস্ত সাহেবের সুনজরে পড়া যায়। শুধু তাই নয়। বাগানের আড়ালে তাদের অনেক অপকর্মও ঢাকা পড়তে পারে অনায়াসে। কাজেই গোটা জেলার থানায় থানায় শুরু হয়ে গেল পতিত জমি উদ্ধারের প্রতিযোগিতা। অচিরেই জেলার প্রায় প্রতিটি থানাই এক একটি নন্দন-কানন হয়ে উঠলো।

পুলিশ সাহেব বলবীর সিং তো মহা খুশি। স্বর্গের নন্দন-কাননকে তিনি টেনে এনেছেন মর্তে। এ কি কম কৃতিত্ব ? কিন্তু জেলার পুলিশী প্রশাসন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেদিকে একেবারেই হুঁস নেই তাঁর। রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল যখন ক্রাইম স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ নিয়ে তাড়া দেন, তখন যা একটু হুঁস হয় সাহেবের। কিন্তু তা একেবারেই সাময়িক। তারপরই আবার যে কে সেই।

জেলার অফিসারেরাও এমন চমৎকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। শীতের মরশুমে কেউ বাগানের ডালিয়া এনে হাজির করে সাহেবের কাছে, কেউ বা অন্যের বাগান কিম্বা বাজার থেকে বাহারী ফুল কিনে স্রেফ থানার বাগানের ফুল বলে চালিয়ে দেয়। কেউ বা থানার বাগানে চাষ করা এমন মস্ত দু'টো বাঁধা কপি এনে হাজির করে সাহেবের বাংলোয় যা নাকি থানার বাগান তো দূরের কথা, গোটা অঞ্চলে ঐ জাতের কপি জন্মে না।

সরকারী-বেসরকারী সব মহলেই বিভাগীয় প্রধানকে খুশি রাখার রেওয়াজ এদেশে প্রচলিত। কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে এটা সেই রেওয়াজের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটা অবশ্য কর্তব্য কর্মের মধ্যে পড়ে। এই কর্মটিতে ডিপার্টমেণ্টের অধিকাংশই প্রচুর উৎসাহী। ব্যতিক্রমেরা কেবলমাত্র কৃপার পাত্র। তারা প্রায়ই থেকে যায় অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে। একজন সত্যিকারের সৎ ও কর্মঠ পুলিশ সাহেব এলেই কেবল এই অজ্ঞাত অখ্যাতরা খানিকটা জাতে ওঠে। তবে তেমন পুলিশ সাহেবের দেখা কদাচিৎ মেলে। অধিকাংশই হয় অসৎ ও ধান্দাবাজ নয় তো সৎ অথচ অপদার্থ। কেউ কেউ আবার অদ্ভুত ধরনের চরিত্রের অধিকারী। একটি বিষয়ে কিন্তু এঁদের মধ্যে মিল আছে। ছাত্রাবস্থায় এঁরা প্রায় সবাই ভালো ছাত্র ছিলেন। সেই গুণেই আজ এরা গোটা জেলার পুলিশী প্রশাসনের কর্ণধার হয়ে বসে আছেন। আর, যারা এদের মাইনের কড়ি জোগাচ্ছে সেই জনসাধারণের কথা এরা প্রায় বিস্মৃত হয়েই থাকেন।

পুলিশ সাহেবকে খুশি রাখতে পারলে যেখানে হাতে হাতেই ফল পাওয়া

যায় সেখানে এমন কোন্ বোকা অফিসার আছে যে নাকি সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে? সাহেব ভজনায় এমন শাঁসালো পোস্টিং মেলে যেখানে নাকি দু'টো বছর টিঁকে থাকলেই সারা জীবনে আর চাকরি না করলেও চলে। সাহেবকে হাতে রাখতে পারলে এলাকায় লুটেপুটে খাওয়ার আর কোন বাধা থাকে না। এলিগেশন করে দরখাস্ত পাঠালে একটা লোক দেখানো এন্‌কোয়ারীর পরে বিষয়টি সোজা চলে যায় ঠাণ্ডা ঘরে। তেমন মারাত্মক কিছু ঘটলে বড়জোর বদলি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কোন নন-পেয়িং জায়গায়। ক্ষমতা থাকলে ছ'মাস কিম্বা এক বছরের মাথায় আবার কোন শাঁসালো জায়গায় পোস্টিং জুটে যায়। সেখানে গিয়েও আবার সেই একই চালচলন। এমনি-ভাবেই চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে দেশের পুলিশী প্রশাসনের যন্ত্রপাতি। এইজন্যেই চারিদিকে সাহেব ভজনার এমন ঘটা। রাজনীতি-সচেতন এই রাজ্যেই যখন এই অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত কম বাজনীতি-সচেতন রাজ্যের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়। সেখানে থানার ও-সি অর্থাৎ স্টেশন হাউস অফিসারেরা তো এক একজন ক্ষুদে জমিদার। তাদের ইচ্ছাই সেখানে আইন।

সুপীরিয়র অফিসারকে খুশি রাখার রেওয়াজ এদেশে সেই ইংরেজ আমল থেকেই প্রচলিত। পুলিশ সাহেব যাবেন পাখী শিকারে। ঝিল বা বিলে অনেক পাখী। সাহেব এসে গুলি ছুঁড়ে পাখী শিকার করবেন। কিন্তু সাহেবের লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির দাপটে পাখী যদি উড়ে পালায় তা'হলে সাহেব নিশ্চয়ই সুখী হবেন না। আবার অন্য কেউ সাহেবের হয়ে পাখী শিকাব করে দিলেও সাহেবের আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। কাজেই এখন উপায়? থানা অফিসারের উর্বর মস্তিষ্কে উপায়ও উদ্ভাবিত হলো। সাহেব এলেন সদলবলে। গুলি ছুঁড়লেন। যথারীতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কিন্তু তবুও গোটাকয়েক পাখী জল ছেড়ে উড়ে পালাতে না পেরে জলের মধ্যেই ঝট্‌পট্ করতে লাগলো। সাহেব বন্দুক হাতে বীরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন হাসিমুখে। সাঙ্গপাঙ্গরা ডিঙি নিয়ে ছুটলো জল থেকে পাখী তুলতে। সেই আধমরা পাখীগুলোকে জল থেকে তোলার সময় তাদের পায়ে দড়ি বাঁধা ভারি পাথরগুলোকে সবার অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেলা হলো। জ্যান্ত পাখীগুলোকে দেখে সাহেব তো দারুণ খুশি। পরক্ষণেই তাঁর নজর পড়লো পাখীগুলোর একটার গায়েও গুলির চিহ্ন নেই। সঙ্গে সঙ্গে থানা অফিসার বলে উঠলো, স্যার, আপনার গুলির শব্দেই যেখানে এতগুলো পাখী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেখানে গুলি লাগলে আর দেখতে হতো না।

এ ধরনের পাখি শিকার সেকালের ঘটনা হলেও একালের সাহেবদের মৎস্য শিকারও অনেকটা এমনি ধরনের। জ্যান্ত মাছকে দিয়ে সাহেবের ছিপ্ খাওয়ানো কষ্টকর বলে এলাকার ও-সিকে খুঁজে পেতে এমন পুকুরের ব্যবস্থা করতে হয় যেখানে মাছ কিলবিল করে। ছিপ্ ফেললে অনায়াসেই দু'পাঁচটা মাছ উঠে আসবে—তা' সাহেব কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির ছিপই হোক না কেন। ক্ষেত্রবিশেষে সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্যে জাল দিয়ে মাছ ধরে সেই মাছ সাহেবের ছিপে গেঁথে মাছ খেলিয়ে ডাঙায় তোলার সুযোগ করে দিতে হয় তাঁকে।

এতদিনে প্রমোশন হল রুদ্রদেবের। এডিশনাল এস-পি হয়ে সে এই বলবীর সিংয়ের জেলাতেই পোস্টেড্ হলো। যার জায়গায় রুদ্রর পোস্টিং সেই ইউ-পি'র মানুষ জগৎ শর্মা চার্জ দেওয়ার সময় রুদ্রর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, উইশ ইওর গুড্ লাক্, মিঃ ভট্টাচার্য। নতুন প্রমোশন পেয়ে এলেন। তবে, এই জেলায় যখন এসেই পড়েছেন তখন আপনার পক্ষে সাক্‌সেসের সিক্রেটটি জেনে রাখা ভালো।

রুদ্রও হেসে জিজ্ঞাসা করে, কি সেই সিক্রেট, মিঃ শর্মা?

জবাব দেয় শর্মা, প্রথমতঃ, এখানকার এস-পি মিঃ সিংয়ের কথার ওপর কখনও কথা বলবেন না। উনি যা বলবেন তাই মাথা পেতে মেনে নেবার চেষ্টা করতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ—

জগৎ শর্মা কথা শেষ করার আগেই রুদ্র নিজেই বলে ওঠে, দ্বিতীয়তঃ বোধ হয় বাগান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

—এক্‌জ্যাক্ট্‌লি সো, বলতে থাকে শর্মা, এই এ্যাডিশনাল গুণটি থাকলে এস-পি আপনার ওপর খুবই খুশি থাকবেন। আমি তো মশাই এ্যাগ্রো-হর্টিকাল্‌চার সম্পর্কে চল্লিশ টাকা খরচ করে একখানা বই-ই কিনে ফেললাম।

—লাভ কিছু হয়েছিল তাতে?

—একেবারেই যে হয় নি তা' অবশ্যি বলা চলে না। বই পড়া বিদ্যা, আর হাতে-কলমে কাজের মধ্যে তফাত অনেক। তাই একদিন এস-পি'র কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতেই তাঁর কাছ থেকে কিছু উপদেশ শুনতে হলো। বললেন—বুঝলেন মিঃ শর্মা, শুধু বই পড়লে চলবে না। কিছু প্র্যাক্‌টিক্যাল কাজও করুন। ইচ্ছে হয়েছিল মুখের ওপর বলি—আপনি নিজে তো থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাক্‌টিক্যালের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে গোটা জেলাকে প্রায় ডোবাতে বসেছেন। আমাকে আবার একজন ভাগীদার করার

চেষ্টা কেন? কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছু না বলে কেবল চুপ করেই রইলাম। জানতাম, কিছু বলতে যাওয়া মানেই তাঁর ডিস্-প্লেজার ক্রিয়েট করা।

রুদ্র বললে, এখানে আসার আগেই শুনেছি যে এস্-পি মিঃ সিং নাকি একটু খেয়ালী প্রকৃতির।

বলে ওঠে মিঃ শর্মা, ভুল শুনেছেন আপনি। খেয়ালী নয়, খামখেয়ালী। সকালের হুকুম বিকেলেই হয়তো তুলে নিলেন। আবার পরের দিন সকালেই আবার হয়তো সেই হুকুমই জারি করলেন। বলুন তো, এতে কি এ্যাড্-মিনিস্ট্রেশন চলে? প্রথম প্রথম বলতে যেতাম। কিন্তু যখন বুঝলাম, এতে উনি বিরক্ত হন তখন বলাই ছেড়ে দিলাম। আমি এ্যাডিশনাল। কি দরকার আমার জেলার এস্-পি'র বিরাগভাজন হওয়ার?

জেলার এস্-পি ও এ্যাডিশনাল এস-পি'র মধ্যে তফাত অনেক। জেলার পুলিশী প্রশাসনের প্রধান পুরোহিত যদি হন এস্-পি তা'হলে এ্যাডিশনালকে বলা চলে তাঁর তন্ত্রধার। পুলিশ সাহেবের ছায়ায় এই এ্যাডিশনাল অর্থাৎ অতিরিক্ত পুলিশ সাহেব প্রায় সর্বদাই অদৃশ্য হয়ে থাকেন।

বাগান করা সম্বন্ধে রুদ্রর কোন জ্ঞান কিম্বা অভিজ্ঞতা নেই জেনে এস্-পি বলবীর সিং মুখে একটা আক্ষেপের শব্দ করে বলে ওঠেন, রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ! দেখুন, পাঞ্জাবের মত রুক্ষ রাজ্যের মানুষ হয়ে গার্ডেনিং-এর দিকে আমার কত ঝোঁক, আর এখানকার অধিবাসী হয়েও এদিকে আপনার টেস্ট নেই। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার, মিঃ ভট্চায! কথাটা শেষ করেই হেসে ওঠেন বলবীর।

বলবীর সিং থামতেই হেসে জবাব দেয় রুদ্র, নো স্যার, পাঞ্জাবকে এখন আর রুক্ষ রাজ্য বলবেন না। সেখানকার সবুজ বিপ্লবই প্রমাণ করেছে যে পাঞ্জাব এখন কত শ্যামল।

নিজের রাজ্য সম্পর্কে রুদ্রর এই প্রশস্তিতে বাস্তবিকই খুশি হয়ে ওঠেন বলবীর সিং। অবশেষে বললেন, আপনার প্রিডিসেসর মিঃ শর্মারও একদিন আপনার মতই অবস্থা ছিল। আমিই বলে বলে এদিকে তাঁর টেস্ট গ্রো করিয়েছিলাম। ডোণ্ট ওরি, আপনাকেও তেমনি করে তুলবো।

একটু স্মিত হেসে চুপ করে থাকে রুদ্র। বলবীর সিং আবার বলতে থাকেন, পুলিশ ট্রেনিং কলেজে ক্যাডেট অফিসারদের ট্রেনিং কোর্সে গার্ডেনিং একটা কম্পাল্সারি সাবজেক্ট করার জন্যে আই. জি'কে একবার একটা নোটও দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। কথাটা শেষ করেই একটু

নিরাশ ভঙ্গিতে চুপ করে থাকেন বলবীর সিং।

রুদ্র মুখে কিছু না বলে মনে মনে কেবল বললে, ভাগ্যিস্, আই. জি আপনার মত বাগান-পাগল নন। তেমন হলে ক্যাডেট বেচারাদের পড়ার বোঝা আরও বেড়ে উঠতো।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দিনগুলি মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল রুদ্রদেবের। সেই সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারেও নিত্য নতুন সংযোজন হচ্ছিল। ইদানীং রুদ্রর চরিত্রে একটা বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। আগে, পুলিশের দোষ ত্রুটি অসততা-অনাচার তার মনটিকে উত্তেজিত করে তুলতো। রাগ হতো তাদের ওপর। ইচ্ছে হতো ওদের কঠিন শাস্তি দিতে। কিন্তু আজকাল রাগের চাইতে দুঃখ হয় বেশি। সমাজের একদল হতভাগ্য মানুষ এরা। তৃতীয় রিপু এদের অক্টোপাশের মত বেঁধে ফেলেছে, কিন্তু এরা বেহুঁস। আসলে, এদের বেহুঁস করে রাখা হয়েছে সমাজের একদল স্বার্থান্ধ মানুষের স্বার্থের প্রয়োজনে। এরা জেগে উঠলে যে বিপদ। সমাজ এদের হাতে যে ক্ষমতার চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে সেই চাবিকাঠির সার্থক ব্যবহার যে সেই স্বার্থান্ধদের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে। তাই তো মায়ার আবরণে ঢেকে রাখার মত লোভের চুষিকাঠি হাতে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে এদের। আর এই হতভাগ্যরাও বুঁদ হয়ে রয়েছে সেই নেশায়। তাই রুদ্রর আজকাল এদের ওপর রাগের চাইতে দুঃখই হয় বেশি। পানিশমেণ্টের মামুলি পথে না গিয়ে তার ইচ্ছে হয় এদের ডেকে বলে—ওঠো, জাগো, চিনতে চেষ্টা করো নিজের দেশকে, চিনতে চেষ্টা করো দেশের মানুষকে যারা নাকি গায়ের রক্ত জল করা প্রতিটি পয়সা দিয়ে প্রতিপালন করছে তোমাদের। চিনতে চেষ্টা করো নিজেকে—তোমার প্রতিটি কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে প্রস্তুত থাকো নিজের বিবেকের কাছে।

পুলিশ অফিসে নিজের কামরায় একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে কাজ করছে এ্যাডিশনাল এস-পি রুদ্রদেব। টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ। পাশের কামরাটা খোদ এস-পি'র। তিনি অফিসে নেই। দুপুরে লাঞ্চে গিয়ে তিনি ফের অফিসে এসে বসেন প্রায় সাড়ে পাঁচটা-ছটায়। অফিসে ছুটির সময় এটা। কেরানীরা তখন সবাই চলে যায়। অফিস ছুটির পরে তাদের আটকে রাখার সাধ্য এস-পি বলবীর সিংয়ের নেই। কিন্তু অফিসের একজিকিউটিভ অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের না থেকে উপায় নেই। দশটা সাড়ে দশটায় তারা অফিসে আসে। এস-পি অফিস ছেড়ে

চলে যাওয়া পর্যন্ত তাদের থাকতেই হয়। রাত ন'টা দশটাও বেজে যায় কোন কোন দিন।

ব্যাপারটা বড়ই বিরক্তিকর। এস-পি না উঠলে এ্যাডিশনালও উঠতে পারে না। অবশ্য নিজের কথা চিন্তা করে না রুদ্র। একটায় লাঞ্চে গিয়ে তিনটেয় এসে সে আবার বসে অফিসে। খাওয়া ও বিশ্রামের জন্যে দুটি ঘণ্টা সময় পায় সে। কিন্তু বাহিনীর অন্যান্য কর্মীদের সে সুযোগ নেই।

কথাটা একদিন রুদ্র বলেই ফেলেছিল বলবীর সিংকে। শুনে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রুদ্রর মুখের দিকে। তারপর বললেন, দে আর সাপোজড্ টু বি অন ডিউটি ফর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স—চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি তাদের।

—এক্জাক্টলি, সো, জবাব দিয়েছিল রুদ্র, তবে কাগজে-কলমে চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি লেখা আছে বলে তো কোন হিউম্যানের পক্ষে তা' সম্ভব নয়। খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের সময় তাকে দিতেই হবে। সকাল দশটায় অফিসে এসে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করা—

রুদ্রর কথা শেষ হবার আগেই বলবীর সিং বলে উঠেছিলেন, ওরা সবাই এসে বুঝি আপনার কাছে দরবার করেছে?

—নো—নো স্যার, নট এট্ অল্, তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল রুদ্র, ওরা এ নিয়ে একটি কথাও বলে নি আমাকে। তবে আমি স্যার মনে করি অন্যের প্রতিবাদ কিম্বা প্রতিকার প্রার্থনার ওপর নির্ভর না করে নিজেদেরই কোন অসঙ্গত নিয়মের প্রতিবিধান করা উচিত।

—আই সী! বলে বলবীর সিং খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ওয়েল্ মিঃ ভট্‌চায, আপনার চাইতে অনেক বেশিদিন চাকরি হয়েছে আমার। অভিজ্ঞতাও কিছুটা বেশি। তাই একটা কথা বলছি। সাবর্ডিনেট ষ্টাফদের জন্যে অতিরিক্ত দরদ দেখালে ওরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাথায় চড়ে বসে।

—এক্সকিউজ-মী, স্যার, জবাব দেয় রুদ্র, অতিরিক্ত দরদ দেখালে হয়তো তাই করে। তবে আমি মনে করি ন্যায্য দরদ দেখালে তার সম্ভাবনা কম। তা'ছাড়া মাথায় চড়ার সুযোগ না দিলে কারুর পক্ষে তা' করাও সম্ভব নয়।

—অল রাইট। ব্যাপারটা ভেবে দেখবো আমি। বলেই সেদিন প্রসঙ্গটির ওপর ইতি টেনেছিলেন তিনি।

একক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে রুদ্র। একমাত্র বীরবাহাদুরকে নিয়েই তার সংসার। নবনীতা আর ফিরে আসেনি। এমনকি চিঠিপত্রও লেখে না রুদ্রকে। রুদ্রও কোন খবর নেয় নি তার। একজোড়া পুরুষ ও নারী যেন বসে আছে পরস্পরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। রুদ্র নবনীতার মনের কথা জানে। আড়ম্বরহীন সাধারণ জীবন তার পছন্দ নয়। যে জীবন তার পছন্দ সেই জীবনের আশ্বাস দেওয়া রুদ্রর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি একটা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হয়েও নয়। তার প্রমোশনের খবর বোধহয় কোনরকমে কানে পৌঁছেছিল সুবীর ঘোষালের। একখানা দু'ছত্রের চিঠিও তিনি লিখেছিলেন রুদ্রকে। তাতেও ভেসে উঠেছিল সেই একই সুর। তার মেয়ে যে পরিবেশে বড় হয়েছে তেমন পরিবেশ ছাড়া নবনীতার পক্ষে অন্য কোথাও থাকা সম্ভব নয়। পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে রুদ্র তার স্ত্রীর জন্যে তেমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারে অনায়াসে।

জবাব দিয়েছিল রুদ্র। সাধারণ জবাব। তার মধ্যে নিজের প্রমোশন কিম্বা নবনীতা সম্পর্কে কোন কথাই ছিল না। নিজের শারীরিক কুশল জানিয়ে তাঁদের কুশল কামনা করেছিল কেবল।

মাঝে মাঝে কিন্তু কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে রুদ্র। জীবনটাকে মনে হয় বড়ই বৈচিত্র্যহীন। একটানা একটা একঘেয়েমিতে পেয়ে বসে তাকে। এমনকি তার প্রিয় বইগুলোও বিস্বাদ লাগে তখন। মনের তেমন একটা অবস্থাতেই কেবল হুইস্কির বোতলটা আলমারি থেকে বের করে রুদ্র। ইদানীং আবার হুইস্কির বোতল হাতে নিলেই মনে পড়ে নবনীতার সেই কথাটা— দেবদাস হতে চাইছো নাকি? হাসি পায় রুদ্রর। প্রেমিকাকে না পেলে মানুষ হয়ে ওঠে দেবদাস। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে না পেলে যে মানুষের কি হয় তা' সে জানে না।

হুইস্কির বোতল হাতে নিলে আর একজনের কথা কিন্তু এখনও মনে পড়ে রুদ্রর। মনে পড়ে গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই উপদেশ। অলকাও তেমনি একটা অনুরোধ করেছিল একদিন। আজ অবশ্য সে সব একান্তই মূল্যহীন। দেশের রাজনীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য নামের অধিকারিণী অলকা মজুমদার আজ রুদ্রর কাছ থেকে সাত যোজন দূরে।

অবসর মুহূর্তে নবনীতা কিম্বা অলকার কথা রুদ্রর অশান্ত মনটিকে শান্ত করতে না পারলেও একজন মহিলার শান্ত করুণ মুখখানি কিন্তু রুদ্রর অশান্ত

মনটার ওপর ছড়িয়ে দেয় এক আশ্চর্য শান্তির প্রলেপ। তার দীপকদার স্ত্রী স্মিতা বৌদির কথা মনে পড়লেই মনটা স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে তার। মতের অমিল সত্বেও স্বামীর মত ও পথকে সম্মান করার, নিজের ব্যক্তিত্বকে খাটো না করেও স্বামীর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করার মত মানসিকতার অধিকারিণী সেই সুস্মিতার মত দ্বিতীয় কোন মহিলার কথা যেন মনে করতে পারে না রুদ্র। মাত্র ঘণ্টাখানেকের আলাপ পরিচয়েই সেদিন সুস্মিতা রুদ্রর মনে ছড়িয়ে দিয়েছিল এক ছায়ানিবিড় অনুভূতি।

সেদিন সুস্মিতার কাছে দেওয়া কথা রেখেছিল রুদ্রদেব। যোগাযোগ করেছিল সেই জেলার এস-পি'র সঙ্গে। দীপক মৈত্রর সঙ্গে নিজের পরিচয়ের কথা অকপটে প্রকাশ করে তাঁকে অনুরোধ করেছিল যাতে দীপকের কোন শারীরিক ক্ষতি না হয়। অনুরোধ রেখেছিলেন সেই জেলার এস-পি। বিচারাধীন বন্দী হয়ে জেলে স্থান পেয়েছিল দীপক মৈত্র। দেশ জুড়ে খুনোখুনি হানাহানির মধ্যেও কিন্তু যথারীতি তদন্তের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি দীপকের বিরুদ্ধে।

জেলার সদর থানার প্রবেশনার দারোগা তিমির বসু বয়সে তরুণ। বাইশ-তেইশের মত বয়স। এই বয়সে সচরাচর যা হয়ে থাকে তেমনি টগ্‌বগে তাজা তার কথাবার্তা, চালচলন। একটা রবারি কেসের তদন্তের ভার ছিল তার ওপর। মামলাটা সুপারভাইজ করেছিল অতিরিক্ত পুলিশ সাহেব রুদ্রদেব। সেই সূত্রেই একদিন সে তার অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিল তিমিরকে।

মামলার কথাবার্তা বলতে বলতে তিমিরের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা নিরুৎসাহের স্বর লক্ষ্য করে রুদ্র মৃদু হেসে বললে, সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, এর মধ্যেই এমন নিরুৎসাহ হয়ে উঠলেন কেন?

রুদ্রর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল তিমির। রুদ্রর প্রশ্নে খানিকক্ষণ সে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর ম্লান কণ্ঠে বললে, ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেই যা দেখছি তাতে আর কাজে উৎসাহ পাচ্ছি না, স্যার।

— কেন, কি দেখছেন?

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে তিমির। তারপর বললে, এই ডিপার্টমেণ্টে দেখছি অপরাধ না করলেও পানিশমেণ্ট হয়।

— কার পানিশমেণ্ট হয়েছে? আপনার?

— হ্যাঁ স্যার, মাথা নেড়ে সায় দেয় তিমির, এস-পি সেন্সার দিয়েছেন।

— কেন, কি করেছিলেন আপনি?

বলতে থাকে তিমির, কোন অপরাধই আমার ছিল না, স্যার। একটা মোটর এক্সিডেন্ট কেসে চালান কাটতে দেরি হয়েছিল বলেই এই পানিশমেণ্ট।

—দেরি করেছিলেন কেন? এই বয়সেই যদি দেরি করার অভ্যাস আরম্ভ হয় তাহ'লে ভবিষ্যতে তো আরও বিপদে পড়বেন।

তিমির অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দেয়, না স্যার। আমার কোনও দোষ ছিল না। কেসটা ছিল অন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টরের। তার কাছেই পড়েছিল চার-পাঁচ মাস, তিনি বদলি হয়ে চলে যেতেই কেসটা আমার ঘাড়ে চাপে। আমি তদন্ত করে চালান কাটতে মাত্র দিন পনেরো সময় নিয়েছিলাম। তাতেই এ-পি আমাকে সেন্সার দিয়েছেন।

রুদ্র সবিস্ময়ে বললে, আপনি এস-পি'কে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলেন?

নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেয় তিমির, পানিশমেণ্টের কাগজখানা আমার হাতে আসতেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি সব কিছু শুনলেন। তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম তিনি বুঝেছেন যে এতে আমার কোন দোষ নেই। তিনি আমাকে যেতে বললেন। আমার ধারণা হলো তিনি নিশ্চয়ই আমার ঐ পানিশমেণ্ট ক্যানসেল করে দেবেন। কয়েক দিন পরে রিজার্ভ অফিসারের কাছে জানতে পারি যে আমার সেই পানিশমেণ্ট নাকি সাহেব বহাল রেখেছেন।

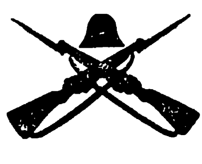
—কেন? রুদ্র জিজ্ঞেস করে, আপনার কোন অপরাধ নেই বুঝতে পেরেও সাহেব তা' ক্যানসেল করলেন না কেন?

উত্তেজিত কণ্ঠে তিমির বললে, সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার, স্যার। অপরাধ করল একজন, পানিশমেণ্ট হলো অন্যের। সাহেব নাকি আমার সার্ভিস রেকর্ডে ট্রেনিং কলেজে পাওয়া লাল কালিতে লেখা অনেকগুলো রিওয়ার্ড দেখে বলেছেন—অনেক রিওয়ার্ড রয়েছে দেখছি। পানিশমেণ্ট একটিও নেই। লালের পাশে কালো কালিতে লেখা একটা মাইনর পানিশমেণ্ট থাক্ না। এতে তো আর কোন ক্ষতি হবে না। শুধু শুধু আবার কাটাকাটি করে লাভ কি?

জেলার পুলিশ সাহেবের এমনি খামখেয়ালী আচরণে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রুদ্র। সেনাপতির যোগ্য আচরণই বটে! বিষয়টি হয়তো সামান্য। একটা সেন্সারে একজন অফিসারের তেমন কিছুই আসে যায় না। কিন্তু অল্প বয়সী একজন তরুণ অফিসারের মনের ওপর এর কি প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে সেকথা একটু ভেবে দেখলে বলবীর সিং হয়তো ওটা ক্যান্সেল করতেন। এমনি

ধরনের ছোটখাটো ঘটনাই তো অফিসারদের মনকে করে তোলে পঙ্গু, ডিপার্টমেন্টের ওপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলে তাদের।

প্রায় মাস খানেক পরে এই ঘটনাটি সম্পর্কে রুদ্রর কানে যে খবরটি পৌঁছেছিল তাতে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল সে। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল জেলার এস-পি যদিও সেদিন কেবলমাত্র খেয়ালের বশবর্তী হয়েই তিমিরের পানিশমেন্ট ক্যানসেল করেন নি, কিন্তু অন্যায় কিছু করেন নি তিনি। এমন কি ঐ ছেলেটার আরও বড় শাস্তি হওয়া উচিত ছিল সেদিন। ডিপার্টমেন্টে ঢুকেই যারা পয়সার জন্যে চারিদিকে ছুঁক ছুঁক করে বেড়ায় তাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তেমন কঠোর কঠিন হওয়া উচিত ডিপার্টমেন্টের আইন। কোন দয়ামায়া নয়। সামান্য কনস্টেবল থেকে জেলার পুলিশ সাহেব কিম্বা তারও উর্ধ্বতন অফিসারদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই আইনের সঠিক এবং সার্থক প্রয়োগ হওয়া উচিত। একদল পুলিশ কর্মী যে এই বিভাগটিকে তাদের অসৎ কার্যকলাপের লীলাক্ষেত্র করে তুলবে তা' কিছুতেই বরদাস্ত করা যেতে পারে না। পারিপার্শ্বিকতার চাপেই হোক কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, তৃতীয় রিপুকে যারা দমন করে রাখতে পারে না তাদের স্থান অন্ততঃ সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় হতে পারে না। কারণ এই সংস্থার সঙ্গেই জড়িত দেশের প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা যার অভাব সভ্যতার ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে দেয় উল্টোদিকে।



"বছা নামে নেকোয়ি পঞ্জাহ ছাল্
একে নামে জেশতশ্ কুনাদ্ পায়মাল্।"

ফারসী গ্রন্থ গুলিস্তায় কবি সেখ সা'দীর ঐ বিখ্যাত উক্তির অর্থ—একজন ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় যে সুনাম অর্জন করে, সেই সুনাম একটিমাত্র বদনামেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

নতুন জেলার পুলিশ বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করার মুহূর্তে চার্জ রিপোর্ট সই করতে করতে সেখ সাদীর ঐ উক্তিটিই মনে পড়ছিল রুদ্রদেবের। পুলিশ কি দেশের জনসাধারণের কোন উপকারই করে না? নিশ্চয়ই করে। কিন্তু

তবুও কেন তাদের এত বদনাম? দেশের মানুষ কেন তাদের বিশ্বাস করে না? কেন তারা জনতার স্রোতে মিশে গিয়ে তাদের একজন বলে গণ্য হতে পারে না?

এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব রুদ্রদেব জানে। আর জানে বলেই সেনাপতির দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার মুহূর্তে পুলিশের সুনাম-দুর্নামের ব্যাপারটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তার সামনে। এখন থেকে তার পরিচালনার দোষ-গুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিফলনই ঘটবে জেলার পুলিশ বাহিনীর কর্মকাণ্ডের ওপর। দেশের মানুষ যন্ত্রের সুর দিয়েই বিচার করবে যন্ত্রীর কর্মদক্ষতা।

মাত্র দু'টি বছর দু'টো জেলায় এডিশনালের কাজ করার পরেই জেলার চার্জ পেল রুদ্রদেব। আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্য এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ জেলার এস-পি অর্থাৎ পুলিশ সাহেব। এত তাড়াতাড়ি তার এই পদোন্নতি ডিপার্টমেণ্টে একটা রেকর্ড।

বাগানের ফুলের সুগন্ধের চাইতে নর্দমার পাঁকের দুর্গন্ধ বরাবরই বেশি। সুগন্ধকে পেছনে ফেলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে অনেক আগে। রুদ্রদেবের এই জেলার চাজ নেবার আগেই কেবলমাত্র তার এখানে পোস্টিংয়ের খবর পৌছতেই জেলার পুলিশ মহলে ছড়িয়ে পড়লো তার দুর্নাম। সাধারণ দুর্নাম নয়; শঙ্কামিশ্রিত দুর্নাম। সাবর্ডিনেট মহলে তাকে নিয়েই আলোচনা—শুনেছেন মশাই, আর. ডি ভট্টাচার্য নাকি এখানে আসছেন।

—আর ডি ভট্টাচার্য? সর্বনাশ! আর বোধহয় চাকরী করা যাবে না। শুনেছি এডিশনাল থাকতেই নাকি তিনি হাতে মাথা কাটতেন, এখন পুলিশ সাহেব হয়ে তো কথাই নেই।

—কি আর হবে? তেমন বেগতিক দেখলে ছুটি নেবো।

—ছুটি নিলেই যে পার- পাবেন তার নিশ্চয়তা আছে কিছু? ছুটির পরে তো ফিরে আসতেই হবে।

—হ্যাঁ, তা হবে। অফিসারটি চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে।

অন্য অফিসারটি আবার বললে, তবে হ্যাঁ, শুনেছি লোকটি নাকি কাজে কর্মে তুখোড়। যাকে বলে কাজ-পাগলা লোক। এই অল্প সময়ের মধ্যেই নাকি ডিপার্টমেণ্টের নাড়ী-নক্ষত্র চিনে ফেলেছেন। ধোঁকা দিয়ে পার পাবার উপায় নেই।

অকর্মণ্য ও অসৎ অফিসারদের মধ্যে রুদ্রকে নিয়ে এমনি ধরনের আলোচনা হলেও জেলার সাধারণ আলোচনা কিন্তু অন্য ধরনের। তারা বলে, এতদিনে

একজন খাঁটি লোক আসছে। যেমনি সৎ তেমনি কর্মক্ষম। ডিপার্টমেন্টের বদমাশগুলো এবারে টিট্ হবে।

—অতই সহজ! ওগুলোর গোড়ার শিকড় যে অনেকদূর ছড়ানো। তা'ছাড়া, বাবারও বাবা আছে না? বেশি টিট্ করতে গিয়ে আবার নিজেই টিট্ হয়ে না যান। ভয় সেটাই।

—তা' বটে। এই জেলায় যে সব মালেরা রয়েছে তাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষা অত সহজ নয়। আমাদের পার্বতীবাবুর কথাই ধরুন না। খোদ আই-জি তাকে ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারলেন তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে?

—পার্বতীবাবুর কথা ছাড়ুন। হোম ডিপার্টমেন্টের একজন ডেপুটি সেক্রেটারী নাকি তার হাতের লোক। তা'ছাড়া, এখানকার এম-এল-এর সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব। এমন লোককে সরানো আই-জি'র কর্ম নয়। তাই পনেরো দিনের মাথায় ক্যান্সেল হলো তার বদলীর অর্ডার।

পার্বতীবাবুর মত ডিপার্টমেন্টের ব্ল্যাক শিপের সংখ্যা পুলিশ বিভাগে মোটেই কম নয়। করিৎকর্মা ব্যক্তি এরা। ডিপার্টমেন্টের কাজও এরা জানে। তা'ছাড়া মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে এদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। উর্ধ্বতন অফিসারদের কাউকে ধমকে, কাউকে ভয় দেখিয়ে, আবার কাউকে নানাভাবে খুশি রেখে এরা নিজেদের আখের গুছিয়ে চলে। ভালোমানুষ সুপিরিয়র অফিসারেরা এদের ঘাঁটায় না কিম্বা ঘাঁটাতে সাহস করে না। আর যারা অসৎ তারা তো এদের প্রশংসায় সর্বদাই পঞ্চমুখ। তাতে ঝঞ্ঝাটও কম, আর বেশ দু' পয়সা পকেটেও আসে।

জেলার চার্জ নিয়ে প্রথমদিন রুদ্র তার সাজানো ঘরে এসে বসতেই জেলার রিজার্ভ অফিসার ঘরে ঢুকে সেলাম জানিয়ে বললে, স্যার, আগের সাহেবের আমলে তাঁর বাংলোয় যে চারজন অর্ডারলি কন্স্টেবল থাকতো তারা সবাই কি আপনার কাছে থাকবে?

—নিশ্চয়ই। গম্ভীর সুরে জবাব দেয় রুদ্র। তারপর সামান্য একটু হেসে আবার বললে, জেলার এস-পির বাংলোয় মাত্র চারজন কন্স্টেবল?

—না স্যার, তাড়াতাড়ি জবাব দেয় রিজার্ভ অফিসার, আপনার দরকার থাকলে আরও এক আধজন দিতে পারি।

—তা' তো নিশ্চয়ই পারেন, তেমনি মৃদু হাসতে হাসতে বলতে থাকে রুদ্র, আপনি হচ্ছেন গোটা জেলার রিজার্ভ অফিসার। জেলার ফোর্স তো আপনারই

হাতে। আপনি ইচ্ছে করলেই আমার বাংলোয় অর্ডারলি কন্‌স্টেবলের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারেন।

রুদ্রদেবের কথা বলার ভঙ্গিটুকু যেন কেমন ঠেকছিল রিজার্ভ অফিসারের কাছে। কথার মাধ্যমে সে যেন রুদ্রর মনের কথার সঠিক অর্থ টুকু ধরতে পারছিল না। তাই, আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

সহসা মুখের সেই কৃত্রিম হাসিটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রুদ্রদেব রিজার্ভ অফিসারকে জিজ্ঞেস করে, এই জেলায় কন্‌স্টেবলের সংখ্যা কত?

রিজার্ভ অফিসার সংখ্যা বলতেই রুদ্র আবার প্রশ্ন করে, ফুল স্ট্রেংথ্‌ আছে?

—না স্যার, জবাব দেয় রিজার্ভ অফিসার, কুড়ি বাইশ জন কম আছে। বলে বলেও পুলিশ্‌ ডাইরেক্টরেটকে দিয়ে সংখ্যা বাড়াতে পারছি না। বুঝতে পারছি এতে অনেকেরই অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? বিশেষ করে, থানায় কন্‌স্টেবল কম থাকলে কাজের ভয়ানক ক্ষতি হয়।

—তা' তো বটেই। জবাব দেয় রুদ্র, এমনিতেই তো থানায় কন্‌স্টেবলের স্ট্রেংথ্‌ কম। তার ওপর আরও কম হলে কাজের অসুবিধা তো হবেই। কিন্তু তাই বলে জেলার পুলিশ সাহেবের বাংলোয় যেন অর্ডারলি কন্‌স্টেবলের সংখ্যা না কমে, কেমন?

এতক্ষণে সেই রিজার্ভ অফিসার ধরতে পারে রুদ্রর মনের কথা। সাহেব যে এতক্ষণ কেবল ঠাট্টার সুরেই তার সঙ্গে কথা বলেছে এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই একটু চম্‌কে ওঠে। কী আশ্চর্য, সাহেব কি তবে তার বাংলোয় কন্‌স্টেবলের সংখ্যা কমিয়ে দেবার কথা বলছে? নাকি গোটা ব্যাপারটাই একটা পরীক্ষা? এ দিয়ে হয়তো সাহেব তাকে পরীক্ষা করতে চাইছে।

রিজার্ভ অফিসারকে চুপ করে থাকতে দেখে রুদ্রদেব একটু অতিরিক্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, এবার তাহ'লে বলুন আমার ওখানে আপনি ক'জন কন্‌স্টেবল পাঠাতে চান যারা নাকি রাত দিন আমার ও আমার পরিবারবর্গের সেবা করে নিজ নিজ চাকরি বজায় রাখবে?

পুলিশের চাকরিতে দীর্ঘকাল এই রিজার্ভ অফিসারের কাজ করে করেই ভদ্রলোক চুল পাকিয়েছে। রিটায়ার করতে আর মাত্র বছরখানেক বাকি। এই দীর্ঘ চাকরি-জীবনে অনেক বাঘা বাঘা পুলিশ সাহেব পার করেছে সে। তাঁদের মধ্যে সেই ব্রিটিশ আমলের লালমুখো খাঁটি বিলিতি সাহেবরাও

ছিলেন। কিন্তু সাহেবের বাংলোয় অর্ডারলি কনস্টেবল নিয়োগ সম্পর্কে রুদ্রদেবের মত এমনি ধরনের কথা আর কারুর মুখে কখনও শুনেছে বলে মনে করতে পারে না। তাই এতক্ষণে তার মনে হলো নতুন পুলিশ সাহেব সম্পর্কে কানা-ঘুসায় সে যা শুনেছে তা' বাস্তবিকই সত্যি। নতুন এই সাহেবটি সত্যিই অদ্ভুত। প্রথম সাক্ষাতেই সেই প্রমাণ পেয়ে গেল রিজার্ভ অফিসার ভদ্রলোক। অবশ্য একে অদ্ভুত বলে মনে করা তার মত একজন পুরানো অফিসারের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। জীবনভর বনস্পতিতে অভ্যস্ত মানুষের চোখের সামনে হঠাৎ খাঁটি গব্যঘৃত এনে হাজির করলে তার পক্ষে চমকে ওঠারই কথা।

রিজার্ভ অফিসারকে চুপ করে থাকতে দেখে রুদ্র তার গাম্ভীর্য বজায় রেখে আবার বললে, শুনুন লাইনবাবু, অফিসারদের সঙ্গে থেকে তাঁদের সরকারী কাজের সহায়তা করাই অর্ডারলি কনস্টেবলের কাজ। তারা তাঁর ব্যক্তিগত চাকর নয়। তাদের সেরকম ভাবা কেবল অন্যায়ই নয়, ঘোরতর অপরাধ। কাজেই আজই আমার বাংলো থেকে মাত্র একজন বাদে আর সব কনস্টেবল উইথড্র করুন। অবশ্য সশস্ত্র গার্ড যেমন আছে তেমনি থাকবে। অর্ডারলি কনস্টেবল হিসেবে যে থাকবে সে কেবল আমার যখন-তখন সরকারী প্রয়োজনের জন্যেই থাকবে। পারিবারিক কাজের জন্যে নয়।

কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই গোটা পুলিশ মহলে শুরু হলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া। সুপীরিয়র পুলিশ মহল অর্থাৎ এডিশন্যাল এস-পি ও ডি-এস-পি যারা দীর্ঘকাল ধরে পারিবারিক বিষয়ে অর্ডারলি কনস্টেবলের সেবা পেতে অভ্যস্ত, তারা এই নতুন পুলিশ সাহেবের হুকুম শুনে আড়ালে মুখ বেঁকিয়ে হাসে। বাঁকা মুখের সেই হাসির একমাত্র অর্থ—যত্ত সব ছিটগ্রস্তের জায়গা হয়েছে এই ডিপার্টমেণ্টে! জেলার চার্জ পেয়ে অনেকেই ওরকম সতীপনা প্রথম প্রথম দেখায়। দু'দিন যাক্, সব চুপ্‌সে যাবে। অর্ডারলি কনস্টেবলের সেবা লাভ করার সুযোগ যাদের নেই তারা মনে মনে হয়ে ওঠে উল্লসিত। এ উল্লাসের কারণ নতুন পুলিশ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি কিম্বা কনস্টেবলদের এ ধরনের অপমানজনক কাজকর্ম থেকে মুক্তির জন্যে যতটা তার চাইতে বেশি এক ধরনের নির্ভেজাল ঈর্ষা। অন্যায় সুযোগ লাভের সুবিধা তোমার আছে, আমার নেই। কাজেই সেই সুযোগ থেকে তুমি বঞ্চিত হলে আমার খুশি হওয়াই স্বাভাবিক।

যাদের সম্পর্কে রুদ্রদেবের এই হুকুম সেই কনস্টেবল বাহিনীর মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু আরও অদ্ভুত। একদল বাস্তবিকই খুশি। তাদের মতে

পুলিশ সাহেবের এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে নতুনত্ব। কেবল তাই নয় তাদের মধ্যে অনেককালের একটা চাপা ক্ষোভের অবসান ঘটাতে চলেছেন তিনি। একদল আবার দুঃখিত। চাকরি করতে এসে মানসম্মানের ধার ধারে না তারা! তারা কেবল সুযোগ সুবিধার কথাই চিন্তা করে। অর্ডারলি কনস্টেবলের কাজে সুযোগ সুবিধা অনেক। কনস্টেবলের শ্রমসাধ্য কাজ তাদের করতে হয় না। সাহেবদের বাড়িতে টুকিটাকি কিছু কাজ করে দিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ। তারপরে প্রচুর অবসর। তা'ছাড়া, সাহেবদের কাছাকাছি থাকার জন্যে কিছু বাড়তি সুবিধাও আছে যা নাকি অন্যদের কপালে জোটে না। আর, সাহেবের নেকনজরে পড়তে পারলে তো কথাই নেই। জেলার বাঘা বাঘা অফিসারেরা পর্যন্ত প্রয়োজনে তাকে খুশি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে থাকে।

পুলিশ সাহেব রুদ্রদেবের সামনে কথাটা একদিন পেড়ে বসলো জেলার এ্যাডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রী। রুদ্রদেবের মত প্রকাশও সরাসরি আই-পি-এস অফিসার। উত্তর প্রদেশের লোক। এই অল্প দিনের পুলিশের চাকরিতেই ডিপার্টমেণ্টের বদ গুণগুলো খুবই তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে ফেলেছিল সে। সন্ধ্যে হলেই রঙীন জলের জন্যে তার প্রাণ আইঢাই করে। সেই সূত্রে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা। তা'ছাড়া, অন্য কিছু উপসর্গও তার আছে।

প্রকাশের কথার জবাবে রুদ্র বললে, বুঝলেন মিঃ শাস্ত্রী, কনস্টেবলরাই গোটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের দর্পণ। শুধু তাই নয়, মেরুদণ্ডও বটে। সংখ্যায়ও যেমন এরাই সব চাইতে বেশি, তেমনি প্রধানতঃ এদের কাজকর্মের আয়নাতেই জনসাধারণ গোটা ডিপার্টমেণ্টকে দেখে থাকে। আমরা সুপীরিয়ররা এদের ভালো হতে বলি, জনসাধারণের বন্ধু হয়ে তাদের উপকার করতে উপদেশ দিই, কঠোর পরিশ্রম করতে নির্দেশ দিই। আবার মজা দেখুন, এদের দিয়েই আমরা নিজেরা নিজেদের পারিবারিক কাজকর্ম করাতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করি না। একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী।

পুলিশ সাহেব রুদ্রর ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। রুদ্রর কথায় প্রকাশ তার জোড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে, আই এ্যাম সরি, স্যার। আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কর্মঠ হতে হবে বলে কনস্টেবলদের উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে তাদের দিয়ে প্রাইভেট কাজ করিয়ে নেওয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? অফিসারদের অর্ডারলির কাজ তারা করুক চাই না করুক, পুলিশ

ডিপার্টমেণ্টে তাদের যা কাজ তা' তাদের নিষ্ঠার সঙ্গেই করা উচিত।

প্রকাশের কথায় রুদ্রর ঠোঁটে সামান্য হাসি দেখা দেয়। হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা এ্যাশট্রেতে ফেলতে ফেলতে সে আবার বললে, বিষয়টির একটু ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করুন, মিঃ শাস্ত্রী। সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন সেই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি কর্মী যদি নিজ নিজ র‍্যাঙ্কের মর্যাদা বুঝে শ্রদ্ধা-সহকারে নিজের কাজ করে যেতে পারে তা'হলে তাদের কাজ দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করবেই। তখন আর তাদের সামনে—জনসাধারণের সেবা করো, বন্ধু হয়ে সাধারণের পাশে দাঁড়াও প্রভৃতি বুলি আউড়ে তাদের উপদেশ দিতে হবে না। কিন্তু আমরা অর্থাৎ সুপীরিয়র অফিসারেরা করছি তার ঠিক উল্টো। ওদের দিয়ে এমন সব ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে নিচ্ছি যাতে ওদের নিজেদের র‍্যাঙ্ক ও কাজের ওপর শ্রদ্ধা না জন্মে কেবল অশ্রদ্ধাই জন্মাচ্ছে। তারই ফলে তাদের নিষ্ঠা গেছে কমে। দিনগত পাপক্ষয় হিসেবে কেবল চাকরিটুকু বজায় রাখার বেশি কিছু করার উৎসাহ নেই তাদের। এতে হয়তো অন্য ডিপার্টমেণ্টের কাজ কোনরকমে চলে, কিন্তু মোস্ট ভাইট্যাল ডিপার্টমেণ্ট পুলিশের কাজ কিছুতেই চলে না। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা থাকলেই কেবল বিপদে আপদে একজন গিয়ে আর একজনের পাশে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই আস্থা? শুধু কন্‌স্টেবল কেন, গোটা ডিপার্টমেণ্টে ক'জন আজ নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে কাজ করতে পারে?

রুদ্র থামতেই প্রকাশ বলে ওঠে, এজন্যে কি কেবল এই বিভাগের সুপীরিয়র অফিসারেরাই দায়ী, স্যার?

—না—না মিঃ শাস্ত্রী, বলে ওঠে রুদ্র, তাঁরাই একমাত্র দায়ী নয়। এর জন্যে দায়ী দেশের রাজনীতি, দেশের সমাজব্যবস্থা, দেশের জনসাধারণের চারিত্রিক অবক্ষয়।

—তা'হলে স্যার, এজন্যে একা সুপীরিয়র অফিসারদের দোষ দিয়ে লাভ কি?

—না, একা তাঁদের তো দোষ দিচ্ছি না। তাঁরা একা আর কতটুকু করতে পারেন? তবে যতটুকু করতে পারেন তাও বা তাঁরা করছেন কোথায়? ডিপার্টমেণ্টকে ভাল করে তোলার চিন্তা ক'জন করেন? এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ক'জন করেন? অধিকাংশই তো কেবল নিজ নিজ চাকরিটুকু বাঁচাতেই ব্যস্ত।

রুদ্র থামে। প্রকাশ শাস্ত্রীও আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। রুদ্র

আবার বলতে থাকে, জানেন মিঃ শাস্ত্রী, আমার ধারণা আমরা সবাই যদিও এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে চলেছি, কিন্তু এই ডিপার্টমেণ্টকে কেউ ভালোবাসি না। নিজেদের সম্মান-অসম্মানের ব্যাপারে আমরা যতটা সতর্ক ডিপার্টমেণ্টের সম্মান-অসম্মান নিয়ে আমরা ততটা মাথা ঘামাতে রাজি নই। আমরা বুঝেও বুঝি না যে ডিপার্টমেণ্টের সম্মানের ওপরই আমাদের নিজেদের সম্মান নির্ভরশীল। আসলে, ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে একাত্ম হতে আমরা শিখিনি। এর বদনাম হয়তো সময় সময় আমাদের অসুখী করে তোলে কিন্তু তা' কেবল ক্ষণিকের জন্যেই। পরমুহূর্তেই আমরা আবার তা' ভুলে যাই। সরকারী চাকরিতে যে মানুষ নিজের ডিপার্টমেণ্টকে ভালবাসতে না পারে তার কাছে দেশের মানুষকে ভালবাসার, বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াবার আশা করা মূর্খতা। প্রাণের টান না থাকলে মানুষের সেবা করা যায় না, যায় শুধু সেবা করার ভান করা। এদেশে তাই এখন চলছে। আন্তরিকতা নেই কোথাও। তাই আজ এদেশে পুলিশ কর্মীরা অসততার প্রতিমূর্তি, রাজনৈতিক নেতারা ধান্ধাবাজ ও স্বার্থপর, ব্যবসায়ীরা নিয়েছে লুঠেরার ভূমিকা, শিক্ষাক্ষেত্রে চলেছে জুয়াচুরি, প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী বিভাগে চলছে দুর্নীতির ছড়াছড়ি, আর কেবল পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে কোটি কোটি অসহায় মানুষ।

কথা বলতে বলতে বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল রুদ্র। হঠাৎ খেয়াল হতেই মৃদু হেসে সে বললে, আই এ্যাম সরি, মিঃ শাস্ত্রী। আমি আমার পয়েণ্ট থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। যাক্ গে, লেট আস ড্রপ্ দিস ম্যাটার। এবার বলুন, পঞ্চানন রায়ের বিরুদ্ধে সেই দরখাস্তগুলো সম্পর্কে কি করা যায়?

পঞ্চানন রায় একটা মহকুমা থানার অফিসার-ইন-চার্জ। ঘোড়েল প্রকৃতির অফিসার হিসাবে ডিপার্টমেণ্টে তার নাম কিম্বা দুর্নাম যা হোক একটা কিছু আছে। কাগজ-কলমের চাইতে ডাণ্ডাবাজিতেই সে সিদ্ধহস্ত। সময় সময় সঠিক লোককে ছেড়ে দিয়ে নিরীহ লোকের ওপরই সে ডাণ্ডাবাজি করে বসে। তারপর পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সেই আদি দোষটি যদি তার না থাকতো তা'হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু পঞ্চানন তাতেও যথেষ্টই পটু। কাজেই এর পরিণামে মাঝে মাঝেই তার নামে পুলিশ সাহেবের কাছে দরখাস্ত আসতো। আগের পুলিশ সাহেবের আমলেও আসতো, এখনও আসে। আগের পুলিশ সাহেব ছিলেন অন্য ধাঁচের মানুষ। তাঁর ধারণা ছিল, পুলিশের নামে দরখাস্ত আসাটা

তেমন কোন গুরুতর ব্যাপার নয়। পুলিশের কাজই এমনি যে তাতে দু'পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখা কখনই চলে না। কাজেই দরখাস্ত তো আসবেই। এমনি একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি পঞ্চানন রায়ের বিরুদ্ধে সেই দরখাস্তগুলো সম্পর্কে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু রুদ্র ব্যাপারটাকে অত সহজে নস্যাৎ করতে পারলে না। ব্যবস্থা একটা কিছু গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু কি সেই ব্যবস্থা সেটাই প্রশ্ন।

রুদ্রর জিজ্ঞাসায় প্রকাশ শাস্ত্রী একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর বললে, সত্যি বলতে কি স্যার, এর জন্যে আগের এস্-পি'ই দায়ি। তিনিই এই অফিসারটিকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছিলেন।

প্রকাশের জবাবে রুদ্র মনে মনে একটু হেসে চুপ করে থাকে। কোন বিশেষ কারণে এ্যাডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রী যে পঞ্চানন রায়েব ওপর খুশি নয় সেই খবরটা ইতিমধ্যেই তার কানে এসেছে। আর সেই বিশেষ কারণটি অনুমান করে নিতেও তার তেমন দেরি হয়নি, কারণ খোদ প্রকাশ শাস্ত্রীকেও সে চিনে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

কি নিদারুণ অবস্থা দেশের এই পুলিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে! লোভ, পরশ্রী-কাতরতা ও স্বার্থপরতায় প্রশাসনের এই ভাইট্যাল অংশটি আজ জর্জরিত। সেই বৃটিশ আমলে পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের অন্ততঃপক্ষে বৃটিশ স্বার্থের প্রতি নজর না দিয়ে উপায় ছিল না, কিন্তু একালে তাদের আর সেই দায়িত্বটুকুও নেই। এখন কেবল নিজের স্বার্থের প্রতি নজর দিলেই দিব্বি চাকরি বজায় থাকে। সেই সঙ্গে ওপরওয়ালাদের একটু খুশি রাখতে পারলেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। দেশের কোটি কোটি বুভুক্ষু গৌরী সেনের দল তাদের গায়ের রক্ত জল করা ধনসম্পদ অকাতরে ব্যয় করে চলেছে এই বাহিনীর প্রতিটি কর্মীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। বিনিময়ে তারা কেবল বেঁচে থাকতে চায় একটি সুস্থ, সবল ও দরদী প্রশাসনেব আওতার মধ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের। ছাইয়ের গাদায় কেবল জল ঢেলেই চলেছে তারা।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অনাচারের মধ্যেও কিন্তু একদল নিষ্ঠাবান মানুষ নিয়মিত স্বপ্ন দেখে চলে। সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয়, সংগঠনে তারা দুর্বল, কিন্তু মানসিকতায় তারা প্রচণ্ড আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই তারা নিরাশ হয় না। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রোশনাই দেখবার আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তারা। পুলিশ সাহেব রুদ্রদেব ভট্টাচার্যও তেমনি একজন। সেও প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের। ভবিষ্যৎ

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের একটি সুন্দর ছবি সর্বদাই তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে—একটি পরিচ্ছন্ন পুলিশী প্রশাসন। এর কর্মীরা সমাজের মঙ্গলের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। জন-সাধারণের বিপদ-আপদে এরাই তাদের প্রকৃত বন্ধু। দুর্জনের প্রতি এরা কঠোর কঠিন, দুর্বলের প্রতি এরা সদয়। দেশের রাজনীতির কলুষতা এদের স্পর্শ করে না, রাজনৈতিক কোন মতবাদ এদের পরিচালনাও করে না। এরা পরিচালিত হয় কেবল একটি আদর্শের দ্বারা যার নাম মানবিকতার আদর্শ। এর বাইরে এই বাহিনীর কর্মীরা আর কিছু জানে না, শোনে না, বোঝে না। দুর্বলের চোখের জল মুছিয়ে তার হাসি মুখের পানে তাকিয়ে এরাও হাসে। দুর্জনকে শাস্তি দিয়ে তার চোখের জলের সঙ্গে নিজেদের চোখের জলও মিশিয়ে দেয়। শাসনে এরা পিতৃতুল্য কঠোর-কঠিন, স্নেহ ভালোবাসায় এরা মাতৃসম মমতার আধার।

ঘোড়েল অফিসার পঞ্চানন রায়কে একদিন ডেকে পাঠালো পুলিশ সাহেব রুদ্রদেব। ভদ্রলোক প্রথমটায় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে গোটা জেলায় রুদ্রদেবের চরিত্রের যে ছবিটি ফুটে উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল তা' এই পঞ্চানন রায়ের মত অফিসারদেরও খানিকটা দুশ্চিন্তায় না ফেলে পারেনি।

সাব-ইন্সপেক্টর পঞ্চানন রায় পুলিশ সাহেবের ঘরে ঢুকে কড়া হাতে তাকে অভিবাদন করতেই রুদ্রদেব মাথা ঝুঁকিয়ে গ্রহণ করে সেই অভিবাদন। পুলিশ সাহেবের কথা শোনার জন্যে কান খাড়া করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পঞ্চানন। সাহেবের ঘরে ঢোকার আগে রিজার্ভ অফিসারের কাছেই যে শুনতে পেয়েছিল তাকে ডেকে পাঠাবার কারণ। রিজার্ভ অফিসার অর্থাৎ লাইনবাবু পঞ্চাননকে দেখেই বলে উঠেছিল, এই যে মশাই, এসে গেছেন দেখছি।

নিজের গোলগাল মুখখানায় একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে বলেছিল পঞ্চানন, আপনারা ডাকলে কি না এসে উপায় আছে?

—না মশাই, আমি নই। খোদ সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। লাইনবাবু বলেছিল।

পঞ্চানন এবার লাইনবাবুর আরও একটু কাছে সরে এসে অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞেস করেছিল, সাহেব কেন ডেকেছেন জানেন কিছু?

একটু রহস্যময় হাসি হেসে নিজের ওজন বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করে

লাইনবাবু জবাব দিয়েছিল, জেলার আর-ও যখন আমি তখন সাহেব কেন আপনাকে ডেকেছেন তা-ও জানি বৈকি।

—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার স্ববিধের নয়।

—কেন, কি হয়েছে? কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা ফুটে উঠেছিল পঞ্চাননের।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পঞ্চাননের কৌতূহল আরও খানিকটা বাড়িয়ে তুলে জবাব দিয়েছিল লাইনবাবু, পর পর অনেকগুলো দরখাস্ত এসেছে আপনার নামে। সাহেব তো রেগেই আগুন। সেই জন্মেই আপনার ডাক পড়েছে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বলে উঠেছিল পঞ্চানন, এসব আমার এলাকার কতগুলো বদমাশের কাণ্ড। বলতে বলতে সেখান থেকে সরে গিয়ে সাহেবকে দেবার জন্যে নিজের কৈফিয়ত মনে মনে তৈরি করতে শুরু করেছিল সে।

স্থির হয়ে পুলিশ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সাহেবের পরবর্তী আদেশের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল পঞ্চানন। সাহেবের কাছ থেকে এ্যাটাক্ অবধারিত। তবে, সেই এ্যাটাক্ কেমন ভাবে কি ভাষায় প্রকাশিত হয়ে তাকে এসে স্পর্শ করবে সেটাই চিন্তার বিষয়।

রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিজেকে পঞ্চাননের মুখোমুখি করে নেয় রুদ্রদেব। পঞ্চানন কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই আশংকা করছিল ঐ সুপুরুষ মানুষটির কণ্ঠ থেকে একটা সাহেবী মেজাজের স্বর বেরিয়ে এসে তার কৈফিয়ত তলব করবে।

শেষ পর্যন্ত পঞ্চাননের সেই আশংকা কিন্তু সত্যি হলো না। কেবল তাই নয়, সেই মুহূর্তে পুলিশ সাহেবের কণ্ঠস্বরে খানিকটা আশ্চর্যই হলো সে। রুদ্রদেব শান্ত চোখে একবার পঞ্চাননের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, বসুন।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। একটা জেলার পুলিশবাহিনীর সর্বময় কর্তা পুলিশ সাহেব যে সামান্য একজন দারোগাকে কৈফিয়ত তলব করার জন্যে নিজের কক্ষে ডেকে এনে তাকে বসতে বলবে এটা পঞ্চাননের পক্ষে বাস্তবিকই একটা নতুন অভিজ্ঞতা। কেবল পঞ্চানন কেন, অনেকের পক্ষেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করাই শক্ত। কিন্তু সেই অবিশ্বাসের ব্যাপারটাই যখন পঞ্চাননের চোখের সামনে ঘটলো তখন সে কি করবে বুঝতে না পেরে অ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই রইলো।

পঞ্চাননের দ্বিধার কারণটুকু বুঝতে পেরে রুদ্র সামনের চেয়ার দেখিয়ে আবার বললে, ওকি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন। এস-পি'র সামনে একজন সাব-ইন্সপেক্টর বসতে পারবে না এমন কথা পুলিশ রেগুলেশনের কোথাও লেখা নেই।

পঞ্চাননকে তবুও দ্বিধাগ্রস্ত দেখে সামান্য হেসে রুদ্র আবার বললে, শুনুন পঞ্চাননবাবু, নিজেকে এত ছোট ভাবছেন কেন? আমি যেমন এই জেলার এস-পি, আপনিও তেমনি একটা থানার ইন-চার্জ। তা'ছাড়া, আমার টেবিলের সামনের এই চেয়ারগুলো রাখা হয়েছে ভদ্রলোকদের বসার জন্যে। আমি বিশ্বাস করি আপনিও আমার মতই একজন ভদ্রলোক। কাজেই আমি যখন অনুমতি করছি তখন আপনি অনায়াসেই বসতে পারেন।

এতক্ষণে দ্বিধাটুকু অনেকটাই কেটে যায় পঞ্চাননের। মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে জড়োসড়ো ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সে। চোখ দুটি তার রুদ্রর দিকে নিবদ্ধ। পুলিশ সাহেবের প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন ও ভাবভঙ্গি একাগ্র দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করতে থাকে। লক্ষ্য করার মতই বটে। বিশেষত্ব কিছুই নেই, তবুও একটা মানুষ সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে উঠলে স্বভাবতই তাকে বেশি করে লক্ষ্য করতে ইচ্ছে করে। বৈশিষ্ট্যহীনতার মধ্যেই খুঁজে ফেরে বৈশিষ্ট্য।

রুদ্রদেব একটা ফাইল টেনে নেয় নিজের কাছে। তারপর ফাইল থেকে একগুচ্ছ দরখাস্ত টেনে বের করে পঞ্চাননকে বললে, আপনার নামে এই এতগুলো দরখাস্ত আমার কাছে এসেছে। নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে আপনার বিরুদ্ধে। নিরীহ লোকদের নাকি আপনি হয়রান করেন, অভিযুক্তকে ছেড়ে আপনি নাকি অভিযোগকারীকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করেন। আপনাদের নাকের ডগায় নাকি এলাকার ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যালেরা ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আপনি কিম্বা আপনার স্টাফ নাকি কোন এ্যাকৃশন নেন না, আপনার এলাকায় দেশী মদের আড্ডা আর জুয়োর আসর নাকি ভয়ানক সক্রিয়। এই ধরনের আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে এই দরখাস্তগুলোর মধ্যে। শুধু তাই নয়, নামধামহীন দরখাস্তকারীরা তাদের অভিযোগের স্বপক্ষে কতগুলো ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছে। এ সম্পর্কে আপনার কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

কথা শেষ করে রুদ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাব-ইন্সপেক্টর পঞ্চাননের মুখের দিকে। সেই মুহূর্তে পঞ্চাননের মুখে ফুটে উঠেছিল একটা বিব্রত ভাব। বাস্তবিকই বিচলিত হয়ে উঠেছিল সে। তার বিরুদ্ধে দরখাস্তে লেখা ঐ

অভিযোগগুলো কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও যে একেবারে মিথ্যে নয়, তা সে নিজে ভালভাবেই জানে। কিন্তু তার আশ্চর্য লাগছিল লোকগুলোর সাহস দেখে। পঞ্চানন দারোগাকে তারা ভালই চেনে। প্রয়োজনে পঞ্চানন যে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলতে পারে সে খবরও অজানা নয় তাদের। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তারা এস-পি'র কাছে দরখাস্ত করতে দ্বিধা করে নি। দরখাস্তকারীদের ওপর রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল পঞ্চাননের। সেই মুহূর্তে মনে মনে সে ভাবে, এর ফল ওদের পেতেই হবে। দেখা যাক্ কত দরখাস্ত করতে পারে ওরা!

রুদ্রদেব যখন দরখাস্ত পড়ে অভিযোগগুলো পঞ্চাননকে শোনাচ্ছিল তখন দৃঢ় হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছিল যেন একজন বিচারক এজলাসে বসে অভিযুক্তকে তার অপরাধের কাহিনী শোনাচ্ছে। তেমনি গম্ভীর, তেমনি দৃঢ় আবার তেমনি আবেগহীন। কিন্তু পঞ্চাননকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে অপেক্ষাকৃত হালকা কণ্ঠে সে বললে, খুব রাগ হচ্ছে এই দরখাস্তকারীদের ওপর, তাই না পঞ্চাননবাবু? আপনার জায়গায় আমি হলে আমারও রাগ হতো। কিন্তু আমি যদি বুঝতে পারতাম যে এই ধরনের অভিযোগগুলোর এক আনাও সত্যি তা'হলে কিন্তু রাগের সঙ্গে লজ্জাও হতো আমার।

এতক্ষণে মুখ খোলে পঞ্চানন। একটা ঢোক গিলে বললে, আপনি তো স্যার জানেন, পুলিশের শত্রুর অভাব নেই। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ মিথ্যে করে—

পঞ্চাননকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে রুদ্র আবার বলে ওঠে, না—মিথ্যে নয়। দরখাস্তের বয়ানই প্রমাণ করছে যে খানিকটা অতিরঞ্জিত হলেও এগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। প্রতিটি দরখাস্ত সম্পর্কে ভালোভাবে এনকোয়ারী করলে যে তা' প্রমাণ হবে তা' কেবল আমিই বিশ্বাস করি না, আপনিও মনে মনে করেন। কিন্তু এস-পি'র সামনে তা' স্বীকার করতে আপনার বাধছে। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। নিজের মুখে নিজের অন্যায় স্বীকার করার মত মানুষ সংসারে খুব বেশি নেই।

পঞ্চানন মুখে কিছু না বলে বিব্রত দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে রুদ্রর মুখের দিকে। বলতে থাকে রুদ্র, সার্ভিস রেকর্ডে লেখা সুপীরিয়র অফিসারদের মন্তব্যের ওপর আমার খুব একটা আস্থা না থাকলেও আমি আপনার রেকর্ড দেখেছি। অনেকদিন চাকরি হলো আপনার। আপনি ভালই জানেন, যে অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে করা হয়েছে তার সামান্যতম একটা অংশ সত্য

হলেও আপনাকে সাসপেণ্ড করা যেতে পারে। তারপর ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিং ড্র-আপ্ করা চলতে পারে আপনার বিরুদ্ধে।

পঞ্চাননের স্থির দৃষ্টি রুদ্রর দিকে। পুলিশ সাহেবের কথাগুলো শুনতে শুনতে বিস্মিত না হয়ে পারে না সে। একটু আগে যে লোকটি তাকে আদর করে নিজের সামনে চেয়ারে বসালে, সে-ই কিনা সাস্পেনসন, প্রসিডিং প্রভৃতি ভয়ঙ্কর শব্দগুলো কেমন অবলীলায় সহজভাবে বলে যাচ্ছে। একটুও দ্বিধা নেই। কণ্ঠস্বর গম্ভীর হলেও একটুও চড়া নয়। মুখেও রাগ কিম্বা বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। কঠিন ও কোমলের এমন সহাবস্থান এর আগে এই দীর্ঘ চাকরি-জীবনে পঞ্চাননের চোখে পড়ে নি।

একটু সময় চুপ করে থাকে রুদ্রদেব। কি যেন চিন্তা করে। নাড়াচাড়া করে হাতের কলমটা অন্যমনস্কভাবে। তারপর সহসা সেটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলে ওঠে, শুনুন পঞ্চাননবাবু, আপনার কোন ক্ষতি হোক তা' আমি চাই না। সাস্পেনসন কিম্বা প্রসিডিং তো দূরের কথা, দরখাস্তগুলোর কোন এন্‌কোয়ারীও আমি করবো না। বদলীও করবো না আপনাকে। ঐ থানাতেই আপনি কাজ করবেন। তবে, মনে রাখবেন আপনার বিরুদ্ধে এ ধরনের দরখাস্ত আর যেন না আসে আমার কাছে। এলাকার মানুষের কন্‌ফিডেন্স আদায় করতে হবে আপনাকে। ভয় দেখিয়ে কিম্বা ক্ষমতার আস্ফালন করে তা' সম্ভব নয়। আপনার কাজকর্মের ওপর তীক্ষ্ণ নজর থাকবে আমার। একটা কথা মনে রাখবেন, এই জেলার এস-পি বলে যেমন জেলাটা আমার জমিদারি নয়, তেমনি ঐ থানার ও-সি বলে ঐ এলাকাটাও আপনার জমিদারি নয়। আপনার এলাকার জনসাধারণের চাইতে আপনি নিজে কোন অংশেই বড় নন। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেরা উপবাসী থেকে আপনার খাবার যোগাচ্ছে, নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মূর্খ রেখে আপনার ছেলে-মেয়েদের পড়ার খরচ যোগাড় করছে। আর, তার বদলে তারা আপনার কাছে চাইছে খানিকটা নিরাপত্তার আশ্বাস। সেই আশ্বাসটুকু নিশ্চয়ই আপনি তাদের দেবেন।

চুপ করে থাকে পঞ্চানন। রুদ্রর কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল সে। কথাগুলো যদিও তার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু বক্তার নিজের আন্তরিকতা যেন সেই মুহূর্তে স্পর্শ করছিল তার কঠোর কঠিন মনটিকে। পাষাণ কেঁপেছে এতক্ষণে। এই কাঁপুনিটুকুই হয়তো পাষাণের ভবিষ্যৎ স্থানচ্যুতির লক্ষণ।

রুদ্র আবার বললে, অলরাইট, আপনি এবার যেতে পারেন।

অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতই উঠে দাঁড়ায় পঞ্চানন। টুপিটা মাথায় পরে অভিবাদন করে রুদ্রকে। তারপর আবেগ জড়িত স্বরে বললে, আপনার আদেশ আমার মনে থাকবে, স্যার।

—আদেশ! একটু ভেবে নিয়ে রুদ্র বললে, কেবল আদেশ নয়, অনুরোধও বটে। নিজে ভালো থাকুন, অন্যকে ভালো থাকতে দিন। মনে রাখবেন পঞ্চাননবাবু, পারিপার্শ্বিকতা মানুষকে অনেক সময় অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়। থানায় নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে সমস্যা ও কাজের চাপে আমার এই আদেশ ও অনুরোধ আপনার পক্ষে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু চেষ্টা করবেন ভুলে না যেতে।

—হ্যাঁ স্যার, কথা দিচ্ছি, চেষ্টা করবো।

পঞ্চানন এস-পি'র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই লম্বা টানা বারান্দায় লাইনবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। পঞ্চাননের মুখচোখের ভাব দেখে লাইনবাবু জিজ্ঞেস করে, কি মশাই, মোলাকাত হলো? কেমন দেখলেন সাহেবকে?

—অভিভূত কণ্ঠে জবাব দেয় পঞ্চানন, মানুষ নন উনি।

—সেকি মশাই, তা'লে কি উনি পশু?

তেমনি স্বরে জবাব দেয় পঞ্চানন, দেবতাও তো হতে পারেন।

বালীগঞ্জের প্রাসাদোপম বাড়িতে মা-বাবার কোলের কাছে থেকেও ইদানীং নবনীতা কেমন যেন একটু একাকীত্ব বোধ করে। বন্ধু-বান্ধব, খেলাধূলো, হৈ-হুল্লোড় কিছুই যেন তাকে সেই একাকীত্বের অস্বস্তি থেকে মুক্ত করতে পারে না। সময় সময় ভেতর থেকে একটা কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করে রাখে নবনীতা। মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে—এই কি জীবন? এমনি একটা জীবনের স্বপ্নই কি সে যৌবনের প্রথম দিনটি থেকে দেখে এসেছে? অন্য কেউ না জানলেও নবনীতা নিজে তো জানে চিরকাল মা-বাবার কাছে থেকে খেলাধূলো, হৈ-চৈ নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন সে কোনদিনই দেখেনি। ধনীর

দুলালী সে। রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ধন-সম্পদের মধ্যে সে মানুষ। নিজের কোন ইচ্ছাই কখনও অপূর্ণ থাকেনি। তবুও, এমনি একটা জীবন সে কোনদিন কামনা করে নি। নারীর স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মনেও ছিল। একটি ছোট্ট সংসার, একজন প্রেমিক পুরুষের ধ্যান সেও এককালে করতো। ঈশ্বর তার সেই বাসনা অপূর্ণ রাখেন নি। রুদ্রদেবের সংসারের কর্ত্রী করে দিয়েছিলেন তাকে। দিয়েছিলেন রুদ্রদেবের মত একজন চরিত্রবান ও একনিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে তার জীবনের গাঁট-ছড়া বেঁধে। খুশিই হয়েছিল নবনীতা। স্বামীর পদমর্যাদা কিম্বা তার আর্থিক কৌলিন্যের কথা মোটেই চিন্তা করেনি। সে কেবল দেখেছিল ঐ মানুষটিকে যে নাকি তার স্বামী হয়ে দেখা দিয়েছে তার জীবনে। তৃপ্ত হয়েছিল নবনীতা। ইয়ারো ভিজিটেড ও আন্‌ভিজিটেডের মধ্যে কবি যতই কেন না পার্থক্য খুঁজে পান, নবনীতার জীবনে তেমন কোন পার্থক্য ধরা পড়েনি। পক্ষীরাজ ঘোড়া সঙ্গে না থাকলেও স্বপ্নে দেখা সেই রাজপুত্রের দেখাই যেন সে পেয়েছিল রুদ্রর মধ্যে। তেমনি তেজী অথচ নরম, তেমনি কঠিন অথচ উদার। কিন্তু কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। ওলটপালট হয়ে গেল সবকিছু। ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন। একটা কঠিন পাষাণ বেদীতে যেন অকস্মাৎ আছড়ে পড়লো নবনীতা। সেদিন সে ঐ পাষাণ বেদীখানাকে চিনতে না পারলেও এই তিনটি বছর পরে আজ যেন সে একটু একটু করে চিনতে পারছে। ঐ বেদীখানার নাম অহমিকা। যে পরিবেশে সে মানুষ সেই পরিবেশই তার মনে সেই অহমিকার সৃষ্টি করেছিল। অর্থে-সামর্থ্যে, প্রভাব প্রতিপত্তিতে কোন বিষয়েই যখন তোমরা আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ নও, তখন তোমার ঐ তেজ কিম্বা উদারতার মূল্য কি?—এমন একটা ধারণাই যেন মনে মনে গড়ে উঠলো নবনীতার। স্বপ্ন, রাজপুত্র প্রভৃতি শব্দগুলো তখন অন্তর্হিত। আর তখনই শুরু হলো সংঘাত। আজ নিজের সেই মানসিকতাকে একটু একটু করে চিনতে শুরু করলেও নবনীতা বাস্তবিকই অসহায়। অহমিকা কিম্বা আত্মম্ভরিতার চরিত্রই এমন যে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা তার পক্ষে সত্যিই শক্ত। বিবেক সেখানে অবদমিত। একমাত্র সেই বিবেকেই পারে দংশনে দংশনে মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে অহমিকার আসন টলাতে। কিন্তু কোথায় তেমন বিবেকের জোর নবনীতার? তার ওপর অহমিকাকে তাড়াতে উদ্যত হলেই যে অভিমান এসে সারা মনখানি জুড়ে বসতে চায়।

সন্ধ্যা হয় নি তখনও। গাড়ি বারান্দায় ঝক্‌ঝকে ক্যাডিলাক্‌ গাড়ি থেকে

নেমে হাল্কা পায়ে দোতলায় উঠে যান সুবীর ঘোষাল। ড্রইং রুমে ঢুকতেই স্ত্রী মনোরমা কাছে এগিয়ে এসে বললেন, ওকি, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?

স্ত্রীর গালের ওপর একটা টোকা দিয়ে খোসমেজাজে বলে ওঠেন সুবীর, একটা ভালো খবর এনেছি তোমাদের জন্যে। তোমাদের সারপ্রাইজ করে দেব বলে নিজেই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

—কি খবর? কৌতূহলের স্বর মনোরমার কণ্ঠে।

সোফায় নিজের ভারি দেহভার এলিয়ে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুবীর বললেন, বলো তো কি খবর হতে পারে?

—আমি কেমন করে বলবো? জবাব দেন মনোরমা।

—গেস্ করো—অনুমান করো।

—না বাপু, আমার ওসব অনুমান টনুমান আসে না। বলবে তো বলো। নইলে আমি এখন নীচে চললাম। অনেক কাজ আছে আমার। মুখে 'নীচে চললাম' বললেও কিন্তু মনোরমার ভাব-ভঙ্গিতে যাবার কোন তাড়াই ফুটে ওঠে না। উপরন্তু স্বামীর বিপরীত দিকের সোফায় বসে পড়ে বললেন, তোমার ভালো খবরটা বলেই ফেল না।

হাসি হাসি মুখে সুবীর বললেন, তোমার জামাতা বাবাজী এবার পুলিশ সাহেব হয়েছে। প্রমোশন পেয়ে এবার এস-পি—গোটা একটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

কৌতূহলের অবসান হতেই মনোরমা খানিকটা হতাশ স্বরে বলে ওঠেন, এই তোমার ভালো খবর? আমি ভাবলাম কি না কি! তা' বাপু সাহেবই হোক আর গোলামই হোক ডিপার্টমেণ্ট তো ঐ পুলিশ ছাড়া আর কিছু নয়।

—তা'ছাড়া আর কি হবে? বলতে থাকেন সুবীর, পুলিশের চাকরি যখন ছাড়বেই না তখন এই ডিপার্টমেণ্টেই যতটা ওপরে উঠতে পারে তাতেই তো আমাদের খুশি হওয়া উচিত।

—আমরা খুশি হলে কি হবে? নবু খুশি হয়ে সেখানে গিয়ে থাকতে রাজি হবে কিনা সেটাই তো প্রশ্ন।

—তা, যা বলেছ। পুলিশ সাহেব হিসেবে এখন নিশ্চয়ই খুব ভালো বাংলো পাবে। মাইনে-পত্রও নিশ্চয়ই কিছু বাড়বে।

স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনোরমা বলে ওঠেন, কী আর এমন

বাড়বে? সরকারি চাকরিতে আর কত মাইনে পাবে? পুলিশ সাহেব হয়েছে বলে ঠাট-বাটও নিশ্চয়ই বাড়বে। পয়সা কড়ির টানাটানি ঠিক তেমনিই থাকবে। তার মধ্যে আবার গিয়ে পড়লে মেয়েটার—। ম্লান মুখে চুপ করেন মনোরমা।

একটু থেমে মনোরমা আবার বলতে থাকেন, সময় সময় আবার এও ভাবি এমনি ভাবেই বা একটা মেয়ে চিরকাল থাকে কেমন করে? পয়সা কড়ি আমাদের যতই থাক স্বামীর কাছ থেকে সরে এসে নবু চিরকাল আমাদের কাছে থাকবে, একথা আমি ভাবতেই পারি না।

—দ্যাট্‌স দি প্রবলেম, বলে ওঠেন সুবীর, ব্যবসার ক্ষেত্রে কত বড় বড় সমস্যার সমাধান করেছি, কিন্তু নিজের মেয়ের এই সমস্যার সমাধান কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না। নিজে ঘর-সংসার না করে নবু চিরকাল আমাদের কাছে থাকবে তাও যেমন ঠিক পছন্দ করি না তেমনি সেখানে গিয়ে সে যে আর্থিক অনটনে পড়বে তা'ও ঠিক সহ্য করতে পারবো না। দেখতে দেখতে তো তিনটে বছর পার হয়ে গেল। এমনি ভাবে যে আর কতকাল চলবে—। কথাটা শেষ না করেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে থেমে যান সুবীর। তারপর নিঃশব্দে বসে বসে চুরুট টানতে থাকেন।

হঠাৎ দরজার কাছে জেগে ওঠে একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর—বাবা, তুমি আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?

কথাটা বলতে বলতে ঘরে ঢোকে নবনীতা। হাতে তার টেনিস র‍্যাকেট। খেলার শেষে এইমাত্র ফিরছে সে। পরনে তার সাদা হাফ প্যাণ্ট, গায়ে সাদা হাফ সার্ট, পায়ে সাদা মোজা-কেড্‌স। চুলের বেণীটা লম্বা হয়ে সাপের মত পেছনে দুলছে। হাত, গলা খালি। কানের লতির সঙ্গে কেবল লেপটে রয়েছে একজোড়া হীরের টব যা নাকি দেহের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝক্‌মক করে ওঠে। একমাত্র এঁয়োতির চিহ্নটুকু কেবল রয়েছে তার সিঁথিতে অতি সংগোপনে।

ড্রইংরুমে মা-বাবাকে মুখোমুখি গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখে নবনীতা হাতের র‍্যাকেটখানা টেবিলের ওপর রেখে সুবীরের গা ঘেঁসে বসে পড়ে। তারপর তাঁর হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করে, এই সন্ধ্যেবেলা এমন গম্ভীর মুখ করে বসে বসে কি ভাবছিলে, বাবা?

সুবীর একটু নড়ে-চড়ে বসে হাসতে চেষ্টা করে জবাব দেন, না—না, ভাবনার আর কি আছে? একটা ভালো খবর শুনে—

সুবীরের কথার মধ্যেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে নবনীতা বললে, ভালো খবর শুনে কেউ গোমড়া মুখে বসে থাকে নাকি?

—তুই আবার কোথায় আমাদের গোমড়া মুখ দেখলি? কথাটা বলেই সুবীর একবার আড়চোখে মনোরমার দিকে তাকান। তারপর হাতের চুরুটটা এ্যাশট্রেতে রাখতে রাখতে আবার বললেন, আজই খবর পেলাম আমাদের রুদ্রর নাকি প্রমোশন হয়েছে। এখন সে একটা জেলার পুলিশ সাহেব।

কথাটা বলেই সুবীর ও মনোরমা একযোগে তাকান কন্যার মুখের দিকে। জামাতার প্রমোশনের খবরে কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করেন তাঁরা।

রুদ্রর প্রসঙ্গ উঠতেই নবনীতা মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। অবশেষে এক সময় মাথা তুলে পর্যায়ক্রমে মা-বাবার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়, এখন সেই বড় অফিসারের কাছে আমাকে কেমন করে পাঠাবে তাই নিয়েই বোধহয় তোমরা আলোচনা করছিলে?

—না, ঠিক তা' নয়, বলতে থাকেন সুবীর, তবে তোর ইচ্ছা অনিচ্ছার কথাটা জানতে পারলে—

সুবীরের কথা শেষ হবার আগেই নবনীতা তেমনি গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, আমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি, বাবা? মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছাতে কি-ই বা যায় আসে? তোমাদের ইচ্ছেয় বিয়ে হলো আমার, তার ইচ্ছেয় কিছুদিন থাকলাম তার কাছে। আবার তোমাদের ইচ্ছেয় এখানে চলে এলাম। এখন তোমরা যদি পাঠাতে ইচ্ছে করো আর সে যদি তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ না করে তা'হলে আবার যেতে হবে সেখানে। আমার নিজের ইচ্ছার কথা এখানে ওঠে কেন? আমি তো কেবল একটা পুতুল। যেমনভাবে আমাকে চালাবে তেমনি ভাবেই চলবো।

নবনীতার কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। অভিমান বশে সে এখন যা-ই বলুক না কেন, বিয়ের আগে রুদ্রর চাকরি ও পারিবারিক খবর শুনে সে যেমন অমত করে নি, তেমনি এস-ডি-পি-ও রুদ্রদেবের সরকারী কোয়ার্টার থেকে সেই তিন বছর আগে চলে আসার সময় বাপের মতেই সে মত দিয়েছিল। সেখানকার পরিবেশটাই সেদিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার কাছে।

কন্যার কথার প্রতিবাদ করতে পারতেন সুবীর। কিন্তু তিনি সেদিকে না গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওসব কথা তুলে এখন আর লাভ কি বল্? যা হবার তা' তো হয়েই গেছে। সেই ছেলেটাও গোঁয়ারের একশেষ। তিনটি

বছরের মধ্যে একটা দিনের জন্যেও তাকে এখানে আনতে পারলাম না। যাক গে, ওসব কথা। এখন যদি তুই রাজি থাকিস তো একবার যেতে পারি তার কাছে।

—গিয়ে কি বলবে তুমি? এবার জিজ্ঞেস করেন মনোরমা।

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেন সুবীর, কি বলবো? বলবো যে দিন কয়েকের মধ্যেই নবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তার কাছে।

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নবনীতা, না, কিছুতেই তুমি যেতে পারবে না তার কাছে। আমি কি তোমার এতই গলগ্রহ হয়ে উঠেছি যে অপমান সহ্য করেও আমাকে গিয়ে থাকতে হবে সেখানে। বলতে বলতে চোখ ফেটে জল আসে তার।

—না—না, সেকি, এসব কথা তুই ভাবছিস কেন মা? আমার যা কিছু আছে সবই তো তোর। তবে এটা কিন্তু তুই ঠিক বলিস নি মা। রুদ্র যতই কেন না গোঁয়ার হোক সে কিন্তু কখনও তোকে কিম্বা আমাদের কোন অপমান করে নি।

ছলছল চোখে জবাব দেয় নবনীতা, না বাবা, তোমাদের অপমান না করলেও আমাকে করেছে। তিন বছরের মধ্যে সে আমার একটা খবর পর্যন্ত নিলে না। এর চাইতে বড় অপমান আর কি হতে পারে, বাবা? আমি কি এতই নগণ্য—এতই তুচ্ছ তার কাছে? বেশ তো, তার কাছ থেকে একদিন না হয় রাগ করেই চলে এসেছি, কিন্তু তাই বলে এমন অবহেলা? কিসের তার এত গর্ব? পুলিশ সাহেব তো দূরের কথা পুলিশের খোদ ইন্সপেক্টর-জেনারেল হলেও তার কাছে যেচে গিয়ে দাঁড়াবো না আমি। না—কিছুতেই না।

কথা বলতে বলতে শেষের দিকে কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নবনীতা। কন্যাকে সামলাতে মনোরমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন, কিন্তু তার আগেই রুমালে চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত পায়ে নবনীতা ছুটে বেরিয়ে যায়। মনোরমাও অনুসরণ করেন তাকে। সাজানো গোছানো সেই সুন্দর ড্রইংরুমে একা বসে চুরুট টানতে টানতে সফল ব্যবসায়ী সুবীর ঘোষাল মনে মনে ভাবতে থাকেন—বাস্তবিক, মানুষ কতই না অসহায়! প্রচুর পয়সা-কড়ির মালিক হয়েও কতই না অসুখী তিনি! কিন্তু এর জন্যে কে দায়ী? জামাতা নির্বাচনে ভুল করে-ছিলেন তিনি? তাঁর একমাত্র আদুরে কন্যা নবু স্বামীর সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি? জামাতা রুদ্রদেবের অতিরিক্ত সততা কিম্বা তার একরোখা

চরিত্র? কোন্‌টা দায়ী এর জন্যে? হয়তো সব কটিই। কিম্বা হয়তো কোনটাই নয়। দায়ী একমাত্র তাঁর অদৃষ্ট।

জেলার পুলিশবাহিনীর মধ্যে ছোটখাটো অফিসারের সংখ্যা অনেক। কন্‌স্টেবলের মত সেপাই-সান্ত্রীর সংখ্যা তো সর্বাধিক, কিন্তু পুলিশ সাহেব অর্থাৎ বাহিনীর সেনাপতি মাত্র একজন। কাজেই সেই একমাত্র সেনাপতির অফিসিয়াল কাজকর্ম ছাড়া তার ব্যক্তিগত চরিত্র কিম্বা পারিবারিক অবস্থা নিয়ে বাহিনীর কর্মীদের মধ্যে কৌতূহল ও আলোচনা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষ করে সেই সেনাপতির পারিবারিক জীবনে যদি কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে তাহলে তো সেটাই হয়ে ওঠে মুখ্য আলোচনার বিষয়।

রুদ্রদেবের পারিবারিক জীবন নিয়েও তাই আলোচনা হয় জেলার পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের মধ্যে। লাগাম ছাড়া সেই আলোচনা সঠিক খবরের অভাবে ডালপালা ছড়িয়ে সত্যের আলোক রশ্মিকে আড়াল করে রাখে। সৃষ্টি করে আলো-আঁধারি। কেউ বলে, এস্‌-পি'র চরিত্র নাকি ভালো নয়। কলকাতায় কোন্‌ মেয়ের পাল্লায় পড়ে নাকি নিজের বউকে ত্যাগ করেছে। কেউ বলে, বনিবনা হয়নি বলে নাকি বউকে ডিভোর্স করেছে, এখন নাকি আবার বিয়ে করার ফিকিরে আছে। কেউ কেউ আবার আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলে, আসলে বউটাই নাকি চরিত্রহীন। তাই সে স্বামীকে ছেড়ে কলকাতায় অন্য একটা লোকের সঙ্গে থাকে—এমনি সব উদ্ভট খবরাখবর প্রচারিত হয় জেলার পুলিশ মহলে। কিছু কিছু কথা যে রুদ্রর কানেও ওঠে না এমন নয়। সে কেবল মনে মনে হাসে। এ নিয়ে তাকে সামনাসামনি জিজ্ঞেস করার মত সাহস কারুর নেই। একদিন অবশ্য এডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রীর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তার স্ত্রীর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল রুদ্রকে। জবাবে রুদ্র কেবল গম্ভীর স্বরে বলেছিল, সী লিভস্‌ ইন ক্যালকাটা। ব্যাস্‌, এই পর্যন্ত। এর বেশি আর কিছু সেদিন বলেনি রুদ্র। মিসেস শাস্ত্রীও আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

জেলার সদর থানার একটা ফাঁড়ির নাম চালতেবাগান। ঐ চালতেবাগান ফাঁড়ির চার্জ যে হাবিলদারটির ওপর তার নাম শ্যামনারায়ণ মিশ্র। বিহারের লোক শ্যামনারায়ণের চাকরি থেকে অবসর নিতে আর মাত্র বছরখানেক বাকি। তাই বোধহয় ফাঁড়ির এলাকায় আদায়-উশুলের ব্যাপারে একটু বেশি সক্রিয়

হয়ে উঠেছিল সে। দাবী করে বসেছিল সিংহভাগ। আর, তাই নিয়ে ফাঁড়ির অন্যান্য কনস্টেবলদের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই চলছিল তার মন কষাকষি। অবশেষে একদিন চরম পরিণতি ঘটলো পাপের পয়সার ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নে। চাকরি থেকে অবসর নেবার আর সুযোগ হলো না শ্যামনারায়ণের। তার আগেই পরপারে যেতে হলো তাকে।

সেদিন রাতে ফাঁড়ির সেন্ট্রি ডিউটি ছিল কন্‌স্টেবল সুধীর কর্মকারের। গুলিভরা বন্দুক হাতে ফাঁড়ির বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুধীর। একটু আগেই পয়সা-কড়ি নিয়ে হাবিলদার শ্যামনারায়ণের সঙ্গে একদফা ঝগড়া হয়ে গেছে তার। শ্যামনারায়ণ তাকে শাসিয়েছে যে সুধীরের নামে সে ডাইরী করবে। সুধীরও তাকে উল্টে শুনিয়ে দিয়েছে যে এস-পি'র দরবারে গিয়ে সে সবকিছু ফাঁস করে দেবে।

এমনিই হয়। পয়সার গন্ধ যেখানে, সেখানে র‍্যাঙ্কের তফাৎ মুছে যায়। ছোট মান্য করে না বড়কে। বড়র সাধ্য নেই ছোটকে দিয়ে হুকুম তামিল করায়। পাপের পয়সার এমনই মহিমা যে এক গ্লাশের বন্ধুর মত একাকার হয়ে যায় সবকিছু। তাও যদি বন্ধুত্ব হতো। হয় কেবল রেষারেষি। বাড়ে শত্রুতা। ক্রিমিন্যালদেরও তাই। ভাগের কড়ি নিয়েই হয় মন কষাকষি। তা' থেকেই সৃষ্টি হয় বিভীষণ। আর ঐ বিভীষণদের মাধ্যমেই খবর আসে পুলিশের কাছে। পাপের মধ্যেই নিহিত থাকে ধ্বংসের বীজ।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে কিন্তু ইলেকৃট্রিক লাইনে কি যেন একটা গোলযোগের জন্যে ফাঁড়ির আলো জ্বলেনি। পরনে গামছা ও গায়ে কাঁধছেঁড়া গেঞ্জি চাপিয়ে কালিপড়া একটা লণ্ঠন হাতে ফাঁড়ির লেখাপড়ার টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে শ্যামনারায়ণ। মুখে তখনও খই ফুটে চলেছে তার—শালালোগ হরবখত্‌ পয়সাকা ফিকিরমে রহেগা। আজ সবকোই কো ফাঁসায়গা হাম।

হাতের লণ্ঠনটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর রাখে শ্যামনারায়ণ। তারপর হাতলহীন ভাঙা চেয়ারটা সশব্দে টেনে নিয়ে তার ওপর বসে মোটা ডাইরীর খাতাটা টেনে নেয় নিজের কাছে।

সেন্ট্রি কন্‌স্টেবল সুধীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্যামনারায়ণের কাজকর্মই লক্ষ্য করছিল। সে জানে, হাবিলদার শ্যামনারায়ণ মুখে 'শালালোগ' বললেও এই মুহূর্তে তার প্রধান লক্ষ্য সে নিজে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার ভেজাল দিয়ে শ্যামনারায়ণ তার বিরুদ্ধেই ডাইরী করবে। ঐ ডাইরীর কপি চলে যাবে উঁচু মহলে।

ডাইরীর পাতায় খস্ খস্ করে লিখে চলেছে হাবিলদার শ্যামনারায়ণ, আর তীর্যক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে সুধীর। পূর্ববঙ্গের ছেলে সুধীরের মাথাটা এমনিতেই গরম। হঠাৎ কি যেন হলো তার। 'শালা শুয়ারকা বাচ্চা' বলে সুধীর অকস্মাৎ দু'পা পিছিয়ে যায়। পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে বন্দুকটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে শ্যামনারায়ণকে তাক্ করে ট্রিগারে চাপ দেয়।

এক ঝলক আগুনের সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার। বুকের রক্ত ছিটকে পড়ে ডাইরীর পাতাটা লাল হয়ে ওঠে। চেয়ার থেকে সশব্দে গড়িয়ে পড়ে শ্যামনারায়ণ। কয়েক মুহূর্ত ছট্‌ফট করে। তারপরেই স্থির হয়ে যায় তার রক্তাক্ত দেহটা। গরম সীসার গুলি তার হৃদ্‌পিণ্ডকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।

নিজের কৃতকর্মের পরিণতির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সুধীর। মাথার মধ্যে জলতে থাকা আগুনের শিখাটা স্তিমিত হওয়ার বদলে দাউ দাউ করে জলতেই থাকে। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সুধীর বন্দুক হাতে একলাফে ফাঁড়ির সামনের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয় দরজা।

গুলির শব্দে উপস্থিত কয়েকজন কনস্টেবল ছুটে আসতেই সুধীর জানালাব সামনে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে শাসায় তাদের—কেউ কাছে এসো না। এলেই গুলি করবো। তফাৎ যাও।

খবর যায় থানায়। সেখান থেকে খোদ এস-পি রুদ্রদেবের কাছে। অফিস থেকে ফিরে রুদ্রদেব সবে তার ধরাচূড়ো ছাডতে যাবে, হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। ওপাশ থেকে থানার ও-সি'র উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর—সর্বনাশ হয়েছে, স্যার। চালতেবাগান ফাঁড়ির হাবিলদার শ্যামনারায়ণ মিশ্রকে সেণ্ট্রি কনস্টেবল সুধীর কর্মকার গুলি করে মেরে ফেলেছে।

—বলছেন কি?

—হ্যাঁ স্যার।

—শিগ্‌গির যান সেখানে। এ্যারেস্ট করুন কন্‌স্টেবলকে

—তা' বোধহয় সম্ভব হবে না, স্যার।

—কেন?

—সুধীর কর্মকার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে সবাইকে শাসাচ্ছে। যে কাছে আসবে তাকেই নাকি গুলি করবে।

—সে কি, লোকটা পাগল হয়ে গেছে নাকি?

—বোধহয় তাই, স্যার।

একটু সময় চিন্তা করে রুদ্রদেব। তারপর হুকুম দেয়, আপনি ফোর্স নিয়ে যান। আমি নিজেও যাচ্ছি।

ফাঁড়ির চারিদিকে কয়েক শ' জনতার ভীড়। নানা ধরনের মন্তব্য তাদের মুখে। পুলিশ হত্যা করেছে পুলিশকে এমন ঘটনা সহসা ঘটে না।

অনেক চেষ্টা করা হলো সুধীর কর্মকারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে। অনেক অনুরোধ করা হলো বন্দুক নামিয়ে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু সুধীর অনমনীয়। এস-পি রুদ্রদেব নিজে চিৎকার করে আশ্বাস দিলে তাকে, কিন্তু সুধীরের সেই এক কথা—কেউ কাছে এলেই গুলি করবো।

চিন্তিত হয়ে ওঠে রুদ্রদেব। এখন কি করা উচিত? হাবিলদার শ্যামনারায়ণের মৃতদেহ সরাবারও কোন উপায় নেই। কাছের জানালার সামনেই সুধীর দাঁড়িয়ে। হাতে তার গুলিভর্তি বন্দুক।

থানার একজন সাহসী কনস্টেবল নীচু হয়ে সন্তর্পণে মৃতদেহের কাছে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করতেই সুধীর গুলি করে তাকে। কনস্টেবলটির ভাগ্য ভালো যে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। নইলে আরও একটা খুন হতো খোদ এস-পি'র চোখের সামনে।

না, আর নয়। যে করেই হোক বন্দুক হাতে ঐ পাগলটাকে বাগে আনতে হবে, নইলে আরও এক-আধজনের জীবন হানির আশঙ্কা। কিন্তু কেমন করে তা' সম্ভব?

অবশেষে চরম সিদ্ধান্তই নিতে হলো রুদ্রকে। জীবিত কিম্বা মৃত যে কোন অবস্থাতেই হোক ঐ লোকটার হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে বন্দুক।

সদর থানার একজন সাহসী সাব-ইন্সপেক্টর এবার এগিয়ে এল। হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে সে এগিয়ে যেতে থাকে সেই জানালার দিকে। হাতে তার খোলা রিভলবার।

সুধীরের দৃষ্টি তখন বাইরের জনতার দিকে। জবা-ফুলের মত লাল তার চোখ দুটো। রাস্তার আলোর একফালি এসে পড়েছে ফাঁড়ির বারান্দায়। তারই আবছা আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে সুধীরের মুখখানা। তার চোখের তারায় যেন মৃত্যু নাচছে।

শ্যামনারায়ণের মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে অফিসারটি প্রায় এসে পড়েছে সেই জানালার কাছে। অবশেষে সুধীরকে দেখবার জন্যে সে সামান্য একটু মাথা তুলতেই সুধীরের চোখ পড়ে তার দিকে।

হিংস্র বাঘের মত একটা চাপা গর্জন করে ওঠে সুধীর। চোখের পলকে সে

তার বন্দুক ঘাড়ে তুলে টিপ্‌ করে সেই অফিসারটির দিকে। কিন্তু গুলি ছুঁড়বার আর সময় পেল না সুধীর। তার আগেই সেই সাহসী অফিসারটির হাতের রিভলভার গর্জে ওঠে।

অব্যর্থ টিপ সেই অফিসারটির। 'মাগো' বলে একটা শব্দ করে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে সুধীর। বন্দুকটা ছিট্‌কে পড়ে একপাশে।

সঙ্কটজনক অবস্থায় সুধীরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ও শ্যামনারায়ণের মৃতদেহ মর্গে চালান করার হুকুম দিয়ে রুদ্রদেব ফিরে এল নিজের বাংলোয়। বড়ই ক্লান্ত লাগছে। শারীরিক ক্লান্তির চাইতে মানসিক ক্লান্তিই যেন বেশি। ঘুরে ফিরে তার চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছে ঐ শ্যামনারায়ণ ও সুধীরের মুখ। একজন মরে বেঁচেছে, আর একজনকে হয়তো বেঁচেও মরে থাকতে হবে। হাসপাতালে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এলেও আইনের হাত থেকে সে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। মার্ডার—নরহত্যা। সুধীরের সেই হতভাগ্য স্ত্রীকে হয়তো ছেলেপুলে নিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

সেই মুহূর্তে ঐ হতভাগ্য দু'জন কনস্টেবলের জন্যে দুঃখের চাইতেও কেমন যেন এক লজ্জা ঘিরে ধরেছিল রুদ্রদেবকে। ভয়ানক এক লজ্জা। ঘটনার দুঃখজনক দিকটির চাইতে লজ্জাকর দিকটিই যেন রুদ্রর মনটাকে বেশি বিব্রত করে তুলেছিল। ওরা পরস্পর খুনোখুনী করে গোটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট বিশেষ করে জেলার পুলিশী প্রশাসনের মুখেই যেন লেপে দিয়ে গেল এক পোঁচ কালি। এমনিতেই তো ডিপার্টমেণ্টের মুখখানা কালো। তার ওপর এই ঘটনাটা যেন সেই কালোর মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেল। সহরের প্রতিটি লোকই বোধহয় এতক্ষণে জেনে গেছে যে ঘুষের পয়সার ভাগ নিয়ে পুলিশ কর্মীরা খুনোখুনীতেও পেছপা নয়। জেলার পুলিশ প্রধান হিসেবে সেই কালির ছিঁটে তার নিজের মুখেও কি লাগে নি? প্রশাসনিক কানুন মতে এতে হয়তো তার নিজের কোন দায়িত্ব নেই। কর্মীর নৈতিক চরিত্রের জন্যে পরিচালকের হয়তো কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু রুদ্রদেব ব্যাপাবটিকে সেই দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। বিশেষ করে এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে একজন কর্মীর নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে বাহিনীর শৃঙ্খলার প্রশ্ন জড়িত। সেই হিসেবে সে নিজের দায়িত্ব এড়ায় কেমন করে?

পরের দিন বেলা দশটায় পুলিশ অফিসে বসে যথারীতি নিজের কাজ করছিল রুদ্র। হঠাৎ ঘরে ঢোকে এডিশন্যাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রী। হাতে তার একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ।

রুদ্রকে অভিবাদন করে চেয়ারে বসতে বসতে হাতের কাগজটা দেখিয়ে সে বললে, দেখেছেন স্যার, কাগজ-ওয়ালারা কি লিখেছে?

খবরের কাগজের ওপর চোখ না রেখে প্রকাশের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রুদ্র, কালকের ঘটনা সম্পর্কে?

—হ্যাঁ স্যার, জবাব দেয় প্রকাশ। কণ্ঠে তার উত্তেজনা।

—কি লিখেছে?

—লিখেছে যে এই ধরনের ঘটনার জন্যে জেলার পুলিশ প্রশাসনই নাকি দায়ী। প্রশাসন ঢিলে বলেই নাকি এধরনের ঘটনা ঘটে। পুলিশের উঁচু মহলের দুর্নীতি নীচু মহলে সংক্রামিত হয়েই নাকি এ ধরনের ঘটনা ঘটায়।

রুদ্র মনে মনে একটু হাসে। উঁচু মহল বলতে প্রকাশকেও বোঝায়, তাই এই খবরটিতে তার এমন উত্তেজনা।

একটু সময় চুপ করে থেকে রুদ্র তেমনি শান্ত কণ্ঠেই আবার বললে, শুনুন মিঃ শাস্ত্রী, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমার মনে হয় খবরের কাগজওয়ালারা কিছু মিথ্যে লেখে নি।

—কি বলছেন স্যার? কালকের ঘটনাটাই ধরুন। এতে আমি আপনি কেমন করে জড়িত?

—হ্যাঁ, আমরাও জড়িত। দৃঢ় কণ্ঠে বলতে থাকে রুদ্রদেব, ডিপার্টমেণ্ট থেকে এই পাপ দূর করার দায়িত্ব আমাদের অর্থাৎ সুপিরিয়রদের। কিন্তু আমরা তা পারি নি। বরঞ্চ উল্টে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তাদের উৎসাহ দিই। প্রত্যক্ষভাবে দিই—পরোক্ষভাবে দিই। জেনে দিই—না জেনে দিই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্রেফ দু' আনা পারার লোভে ওদের ষোল আনা আদায় করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কুকুরের মুখে এঁটো কাঁটা ফেলে দেবার মত ঐ দু' আনার লোভটুকুও সামলাতে পারি না আমরা। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে ঐ দু'আনাকেই আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা বলে ধরে নিই, আর ওরাও বাকি চৌদ্দ আনাকে নিজেদের পাওনা মনে করে সেই ধান্ধাতেই কেবল ঘুরে বেড়ায়। এমনিভাবেই চক্রাকারে ঘুরতে থাকে পাপের চাকা। শেষ নেই এর—সমাপ্তি নেই।

রুদ্রদেবের কথা শুনতে শুনতে মুখখানা শুকিয়ে উঠেছিল প্রকাশের। ডিপার্টমেণ্টে তার নিজেরও যে তেমন সুনাম নেই সে খবর সে নিজেও জানে। এক বোতল তরল পদার্থের লোভ দেখিয়ে তাকে দিয়ে অনেক কিছুই করানো যায়। আগের এস-পি'র আমলে তেমন দু'একটা ঘটনার কথা সেই এস-পি'র

কানেও উঠেছিল, কিন্তু তিনি তা নিয়ে তেমন একটা ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি। কিন্তু ইদানীং জমানা পাল্টে গেছে। তাই একটু সাবধানেই থাকতে হচ্ছে তাকে। এস-পি রুদ্রদেবের কানে উঠলে সে যে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে ছাড়বে সে বিষয়ে প্রকাশ শাস্ত্রী নিঃসন্দেহ।

রুদ্রদেব থামতেই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে এডিশন্যাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রী। তারপর এক সময় খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলি স্যার, একটা কেসের সুপারভিশনে এখনই একবার বেরোতে হবে।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ আসুন।

প্রকাশ শাস্ত্রী বেরিয়ে যায়। তার গমন পথের দিকে স্থির চোখে একটু সময় তাকিয়ে থাকে রুদ্রদেব। বেচারা প্রকাশ শাস্ত্রী। সুপিরিয়র অফিসারদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেন তাব কত গরজ এমনি একটা ধারণা রুদ্রর মনে সৃষ্টি করতেই সে এসেছিল তার কাছে। কিন্তু রুদ্রর মুখে সুপিরিয়রদের অসততার কথা শুনেই সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছিল। কেঁচো খুড়তে গিয়ে যদি আবার সাপ বেরিয়ে পড়ে! তার চাইতে তাড়াতাড়ি সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে রুদ্র—এই ডিপার্টমেণ্টে ক'টা বছর চাকরি করে সে কি দেখলে—কি শুনলে—কি বুঝলে?

রুদ্রর অভিজ্ঞতা যখন কম ছিল তখন এই ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে কেমন যেন নিরাশ হয়ে উঠতো সে। সেদিন সেই দেখা, শোনা ও বোঝার সম্মিলিত রূপ নিয়ে একখানা ঘন কৃষ্ণবর্ণ পর্দা এসে হাজির হতো তার চোখের সামনে। এতটুকু আলোর রেশও চোখে পড়তো না কোথাও। কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো পর্দার ওপাশে একটুকরো আলোর রশ্মিও যেন ইদানীং তার চোখে পড়ছে। দেশের যা পরিস্থিতি তাতে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে একজন সৎ ব্যক্তির হতাশাই কেবল বেড়ে ওঠে, সেখানে রুদ্রদেবের অবস্থা ঠিক উল্টো। এটাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস হারানো পাপ—এই কথাটাই যেন পুলিশ বিভাগটাকে

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করার মাধ্যমে সে অনুভব করতে শুরু করেছে। সে দেখেছে অন্যায়—ভয়ঙ্কর অন্যায়। কিন্তু সেই অন্যায়ের মধ্যেই যেন সুপ্ত রয়েছে ন্যায়ের এক কণা বীজ। ঐ বীজই একদিন অঙ্কুরিত হয়ে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়ে অন্যায়ের অবসান ঘটাবে। সে শুনতে পাচ্ছে কেবল স্বার্থপরতার গুঞ্জন। কিন্তু একদিন ঐ গুঞ্জনই পরিবর্তিত হবে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার গুঞ্জনে। পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি কর্মী সেদিন সত্যিকারের মানুষ হয়ে অত্যাচারিতের পাশে এসে দাঁড়াবে। দক্ষিণ হস্তে থাকবে তার বরাভয়, বাম হস্তে শাসনের দণ্ড। রুদ্রদেব বুঝতে পারছে যে একটা বিরাট ধ্বংস কেবল আসন্নই নয়, অনিবার্য। কিন্তু সেই ধ্বংসের কান্নার মধ্যেই জেগে উঠবে আবার সৃষ্টির হাসি। রুদ্রদেব বুঝতে পারে, রাজনৈতিক কিম্বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যেমন ধ্বংস ও সৃষ্টির এই বিচিত্র রহস্য সত্য, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। শত সহস্র দোষদুষ্ট এই পুলিশ-সমুদ্রের বিরাট বিষাক্ত জলরাশি এক নিঃশ্বাসে পান করতে একদিন একজন অগস্ত্যমুনির আবির্ভাব ঘটবেই এই ডিপার্টমেণ্টে। সেদিন হয়তো তাঁর কাঁধে সর্বভারতীয় পুলিশ অফিসারের চিহ্ন সেই আই-পি-এস লেখা তক্‌মাটি থাকবে না। হয়তো অতি সাধারণভাবেই তিনি আসবেন, হয়তো সাধারণের মধ্য থেকেই তিনি উঠবেন। কিন্তু কবে আসবেন তিনি, কখন আসবেন?

দিনকাল অনেক পাল্টেছে। এখন আর জিপ গাড়ির পেছনের সীটে বন্দুকধারী কনস্টেবল নিয়ে যাতায়াত করতে হয় না। সহরের পীচ ঢালা রাস্তায় দ্রুতবেগে ছুটে চলছিল পুলিশ সাহেব রুদ্রদেবের জিপ। সঙ্গে একজন আর্দালী কনস্টেবল। রুদ্রদেবের পরনে সাদা পোশাক।

সহসা উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসা একজন মহিলার দিকে নজর পড়তেই রুদ্রদেব তাড়াতাড়ি ড্রাইভার কনস্টেবলকে বলে ওঠে, গাড়িটা একটু দাঁড় করাও তো।

মহিলাটি অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ ব্রেকের শব্দ করে জিপটা তার পাশে এসে দাঁড়াতেই মহিলাটি চমকে উঠে মুখ তুলে তাকায়। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রুদ্র। চিনতে ভুল করে নি তো সে? পরক্ষণেই তার মনে পড়ে, ঠিক, এখানেই তো ওরা থাকে। বছর কয়েক আগে এখানকার এস-পি'কেই তো সে তার দীপকদার জন্যে অনুরোধ করেছিল। তবে আর ভুল নয়, সেই বটে।

রুদ্রদেবকে জিপ থেকে নেমে আসতে দেখে দীপক মৈত্রের স্ত্রী সুস্মিতা প্রথমটায় একটু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায়। রুদ্র হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে,

চিনতে পারছেন না, বৌদি ?

এবার স্বস্মিতার ঠোঁটের কোণেও জেগে ওঠে এক টুকরো হাসি। হাসিমুখে সে জবাব দেয়, নিশ্চয়ই পারছি, ঠাকুরপো। তাছাড়া, জেলার পুলিশ সাহেবকে চিনতে না পারার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।

—বলছেন কি ? কণ্ঠে খানিকটা বিস্ময় ফুটে ওঠে রুদ্রদেবের, আপনি জানতেন যে আমি এখানে বদলী হয়ে এসেছি ?

জবাব দেয় স্বস্মিতা, হ্যাঁ জানতাম। কেবল তাই নয়, দু' একবার রাস্তায় আপনাকে দেখেছিও।

—তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে ডাকেন নি ?

—ডাকার মত অবস্থা ছিল না, আপনি গাড়িতে, আমি হেঁটে। তা'ছাড়া—

—তা'ছাড়া কি, বৌদি ?

জবাব দিতে গিয়েই নিজেকে সামলে নেয় স্বস্মিতা। তারপর আবার বললে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব আলোচনা না করে আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিলে হতো না ?

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রুদ্র, ছি—ছি, পায়ের ধুলোটুলো কি সব কথা বলছেন, বৌদি ? আমাদের দীপকদার স্ত্রী আপনি। দীপকদার বাড়ি যেতে আমাকে এত বলতে হবে কেন ? তবে কিনা এই মুহূর্তে একটা দরকারী কাজে যাচ্ছি। তাই—

একটু সময় চুপ করে থেকে স্বস্মিতা আবার বললে, আপনি জেলার পুলিশ সাহেব। কত বড় দায়িত্ব রয়েছে আপনার কাঁধে। সে কথা ভেবেই আপনাকে আমার ওখানে যেতে বলবো কিনা ভাবছিলাম। ব্যস্ত মানুষ আপনারা। তবে আমার বাসাটা বেশী দূরে নয়। বলেই স্বস্মিতা আঙুল দিয়ে পাশের ছোট রাস্তার একটু ভেতর দিকে একটা উঁচু তেতলা বাড়ি দেখিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করে রুদ্রদেব। তারপর সহসা বলে ওঠে, ঠিক আছে, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজটুকু শেষ করে ফিরছি। এই পথেই ফিরবো। তখন আপনার ওখানে যাবো।

রুদ্রদেবের কথায় মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে স্বস্মিতার। খোদ পুলিশ সাহেব তার বাসায় আসবে! হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাসিমুখে সে বললে, আসবেন তো ?

—হ্যাঁ আসবো। নিশ্চয়ই আসবো।

রুদ্রর জিপখানা বেরিয়ে যায়। স্মিতা পথের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিজের গন্তব্যস্থলে যাওয়া মুলতুবী রেখে ফিরে চলে নিজের বাসার দিকে।

তেতলা বাড়িটার একতলায় দু'খানা ঘর নিয়ে স্মিতার সংসার। স্মিতা ফিরে এসে দরজায় টোকা দিতেই দশ বারো বছরের ফ্রক-পরা একটি মেয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে, দিদি?

স্মিতা তার হাতের ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, নাঃ, যাওয়া হলো না রে, শান্তি। রাস্তায় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটু পরেই সে এখানে আসবে।

মায়ের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চার বছরের ছোট্ট মেয়ে তুতুন পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে বলে ওঠে, তুমি এসেছো, মা?

মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে তার নরম গালে একটা চুমু খেয়ে স্মিতা বললে, হ্যাঁ তুতুন সোনা, ফিরে এলাম। তুমি ঘুমোও নি?

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে তুতুন বললে, শান্তিদির কাছে রাজপুত্রের গল্প শুনছিলাম, মা।

স্মিতা শান্তির দিকে তাকিয়ে বললে, একটু পরেই সেই লোকটি আসবে। তুই ঘরখানা একটু গোছগাছ করে রাখ, শান্তি। তারপর দোকান থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে আয়।

বছর তিনেক হলো শান্তি স্মিতার সংসারে আছে। দাদাবাবু থাকতে এখানে অনেক লোকই আসতো। কিন্তু সে জেলে যাওয়ার পর থেকে আর কেউ আসে না। আজ হঠাৎ এমন কে আসছে যার জন্যে তার দিদি স্কুল কামাই করে অসময়ে বাড়ি ফিরে এলো?

শান্তি জিজ্ঞেস করে, কে আসবে, দিদি?

মেয়েকে কোলে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে জবাব দেয় স্মিতা, পুলিশ সাহেব—এই জেলার পুলিশ সাহেব আসবে।

অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে শান্তির কাছে 'পুলিশ' শব্দটা অপরিচিত না হলেও তার সঙ্গে 'সাহেব' শব্দটি যোগ হওয়ায় সাধারণ বুদ্ধিতেই সেই বুঝতে পারে যে তিনি নিশ্চয় একজন কেউকেটা ব্যক্তি হবেন। কিন্তু ছোট্ট মেয়ে তুতুন ঐ শব্দটা শুনেই মাকে আরও একটু আঁকড়ে ধরে চোখ বড় বড় করে বললে, কোন্ পুলিশ আসবে মা? বাবাকে যে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

—না রে, না, জবাব দেয় সুস্মিতা, তোমার বাবাকে যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সে ছিল খারাপ পুলিশ। আর এ হচ্ছে ভালো পুলিশ।

—ভালো পুলিশ? চার বছরের ছোট্ট মেয়ে তুতুনের কাছেও ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকে। পুলিশের মধ্যে যে আবার ভালোও থাকতে পারে এই আশ্চর্য তথ্য এতদিন অজানা ছিল তার। তাই সে কথাটা আবার যাচাই করে নিতে চেষ্টা করে তার মার কাছে।

এক ঘণ্টা নয়, পাকা দু'ঘণ্টা পরে সুস্মিতার বাসার সামনে এসে দাঁড়ায় রুদ্রর জিপ। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সুস্মিতা মেয়েকে কোলে নিয়ে দরজার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে যেতে চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে, ঐ এলো বুঝি।

কথাটা শুনেই মুখখানা শুকিয়ে ওঠে ছোট্ট তুতুনের। মার গলা আরও শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে সে চুপ করে থাকে সেই ভালো পুলিশকে দেখার জন্যে। মা যাই বলুক না কেন, নিজের চোখে না দেখে সে কিছুতেই তার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। তার চার বছরের ছোট্ট মনে পুলিশ এমন এক ভয়ঙ্কর জীব যারা নাকি মানুষকে কেবল কষ্টই দিয়ে থাকে। শিশু-মনে পুলিশ-ভীতি ব্যাঘ্র-ভীতির চাইতে একটুও কম নয়।

মেয়ে কোলে সুস্মিতা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে রুদ্রকে, আসুন ঠাকুরপো। এই বুঝি আপনার এক ঘণ্টা?

রুদ্রও হেসে জবাব দেয়, হাজার দোষের মধ্যে আমাদের এই আর একটা দোষ, বৌদি। কথা দিয়ে কথা রাখা আর হয়ে ওঠে না। ভেবেছিলাম ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সেই জরুরী কাজটুকু শেষ করতে পারবো। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না।

রুদ্রকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে সুস্মিতা তুতুনকে কোলে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। রুদ্র তুতুনের গাল টিপে আদর করে বললে, এই বুঝি মেয়ে?

একটু স্মিত হাসি হাসে সুস্মিতা।

—দীপকদার খবর কি? জেলেই আছে এখনও? রুদ্র জিজ্ঞেস করে।

স্বামীর প্রসঙ্গে মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে সুস্মিতার। তুতুনের ছোট্ট দেহটিকে নিজের গায়ের সঙ্গে আরও একটু চেপে ধরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ, মিসায় বন্দী হয়ে জেলেই আছে। ভালো আছে। আপনি ছিলেন বলেই এটুকু হয়েছে। নইলে যে কি হতো—

রুদ্র তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে ফিরে যেতে গিয়ে বললে, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে

কি বলতে গিয়েও যেন বললেন না? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি এখানে বদলী হয়ে এসেছি এবং আমাকে রাস্তায় আপনি দেখেছেন। তা' সত্ত্বেও আপনি আমাকে ডাকেন নি। কি ভেবেছিলেন? চিনতে যদি না পারি, কেমন?

—একেবারে মিথ্যে বলেন নি, জবাব দেয় সুস্মিতা, তেমন একটা সম্ভাবনার কথা যে মনে আসেনি তা নয়। তা'ছাড়া, আপনি এখন এই জেলার এস-পি। তাই—

এস-পি বলে আমাদের বুঝি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কিছু থাকতে নেই? তবে হ্যাঁ, আমার নিজের দোষও কম নয়। আপনি যে এখানে আছেন তা' তো আমি জানতাম। তবুও এতদিনের মধ্যে কথাটা আমার একেবারেই মনে পড়ে নি। আমারই উচিত ছিল এখানে বদলী হয়ে আসার পরে আপনার খোঁজ নিয়ে দেখা করতে আসা।

—না—না, এতটা আমি আশা করি নি, ঠাকুরপো, বলে ওঠে সুস্মিতা, একে তো ব্যাপারটা অনেকদিন হয়ে গেছে। তার ওপর আপনাদের যে চাকরি তাতে এসব মনে করে বসে থাকার সময় কোথায় আপনাদের?

শান্তি এই সময় চা ও খাবারের প্লেট এনে রুদ্রর সামনে নামিয়ে রাখতেই রুদ্র বলে ওঠে, একি, এত খাবারের ব্যবস্থা করেছেন কেন? আমি এত খেতে পারবো না।

—না—না ঠাকুরপো। এমন কিছুই নয়। এটুকু আপনাকে খেতেই হবে। সুস্মিতার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

রুদ্র একবার মুখ তুলে সুস্মিতার দিকে তাকায়। তারপর হেসে বললে, দীপকদা বিয়ের সময় নেমন্তন্ন না করে যে পাপ করেছে আপনি এক সঙ্গে এত খাবার খাইয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন নাকি, বৌদি?

সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দেয় সুস্মিতা, বেশ তো, ধরে নিন তাই।

—ইস্, এত অল্পতে আপনাকে রেহাই দেব নাকি ভেবেছেন? তা' হবে না। কনুই ডুবিয়ে একদিন খাবো, তারপর ছাড়বো।

—সে ভাগ্য কি আমার হবে, ঠাকুরপো?

রুদ্র সে কথার কোন জবাব না দিয়ে খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, সত্যি বলছি বৌদি, একা এত খাবার খাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি বরঞ্চ এর থেকে খানিকটা তুলে বাইরে আমার ড্রাইভার ও আর্দালী কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিন। ওরাও সকাল থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছে।

কথাটা কানে যেতেই লজ্জায় সংকুচিত হয়ে ওঠে স্মিতা। জেলার পুলিশ সাহেবের সঙ্গে যে তার ড্রাইভার আর্দালীকেও খাবার দেওয়া প্রয়োজন এটা এতক্ষণ খেয়াল হয় নি তার। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—না ঠাকুরপো, আপনি এটা খান। আমি ওদের জন্যে খাবার আনিয়ে দিচ্ছি। বলতে বলতে স্মিতা তুতুনকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে শান্তিকে আবার দোকানে পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই রুদ্র তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, মিছিমিছি আবার দোকানে পাঠিয়ে লাভ কি? বিশ্বাস করুন বৌদি, এর অর্দ্ধেকটাও আমি খেতে পারবো না।

অগত্যা রুদ্রর কথামতই কাজ করতে হলো স্মিতাকে। রুদ্রর প্লেট থেকেই খানিকটা খাবার তুলে নিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতে হলো। তারপর প্লেটখানা রুদ্রর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে লজ্জিত কণ্ঠে বললে, বাস্তবিক, ওদের কথা আমার একদম মনে ছিল না, ঠাকুরপো।

স্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রুদ্র তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এতে আপনি এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন, বৌদি? ভুল ভুলই। এই দেখুন না, দীপকদা জেলে। আপনি একা রয়েছেন এই সহরে। এসব জানা সত্ত্বেও এতদিনের মধ্যে আপনাদের কথা আমার একবারও মনে হয় নি। কিন্তু দেখুন, আমার মনে পড়া উচিত ছিল।

একটু সময় চুপ করে থেকে রুদ্র আবার বললে, আজ যদিও দীপকদা ও আমি দুই ভিন্ন ক্যাম্পের মানুষ, আমি একটা জেলার এস-পি, আর দীপকদা আমাদের অভিযোগেই জেলের কয়েদী, কিন্তু একদিন তো তাকে বাস্তবিকই আমি ভালোবাসতাম। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস দেখুন—যতদূর মনে পড়ে আমার এই চাকরির ব্যাপারে আমাদের বন্ধু-বান্ধব মহলে অনেকেই অনেক রকম সমালোচনা করেছিল। কিন্তু দীপকদা কোনদিন তা' করে নি। বরঞ্চ সে সেদিন খুবই খুশি হয়েছিল। আজ গোটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টই বোধহয় তার শত্রু, আর সেই সূত্রে আমিও।

দীপকের প্রসঙ্গে স্মিতার মুখখানা বেদনাময় হয়ে ওঠে। ছল-ছল করে ওঠে তার চোখ দুটো। ছোট্ট তুতুনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, জানেন ঠাকুরপো, ও যে জেলে আছে তাতে আমার একটুও ক্ষোভ নেই। ও যে বেঁচে আছে এই-ই যথেষ্ট। সেদিন আপনি না থাকলে ও হয়তো বাঁচতোই না।

—না—না, তা' কেন? বলতে বলতে খাওয়ার শেষে এক নিঃশ্বাসে জলের

গ্লাসটা শূন্য করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে রুদ্র আবার বললে, ভয়ানক পেট ভরেছে। দুপুরে দেখছি খাওয়ার আর দরকারই হবে না।

ম্লান মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তুলে সুস্মিতা একটু হালকা স্বরে বললে, দুপুরে না খাওয়ার মত এমন বেশি কিছু আপনি খাননি, ঠাকুরপো। তবে সত্যিই যদি তাই হয় তা'হলে কিন্তু নিজেকে অপরাধী বলে মনে হবে।

—কেন—কেন? কৌতূহলী হয়ে ওঠে রুদ্রদেব।

—কারণ, ওদিকে হয়তো আপনার মিসেস আপনার জন্যে লাঞ্চের টেবিলে বসে অপেক্ষা করছেন।

সহসা হো—হো করে হেসে ওঠে রুদ্রদেব। হাসতে হাসতে বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন বৌদি। আপনাকে অপরাধী হতে হবে না। লাঞ্চেব টেবিলে আমার জন্যে একজন অপেক্ষা করছেন ঠিকই, তবে তিনি আমার মিসেস নন, তিনি হচ্ছেন আমার কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড বীরবাহাদুর।

—কেন, মিসেস এখানে নেই বুঝি?

এই একটা প্রসঙ্গ যা নাকি রুদ্রদেব এড়িয়ে যাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু প্রসঙ্গটি কোন কারণে অনিবার্য হয়ে উঠলে মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে তার। ভুলে যাওয়া পুরানো একটা ক্ষতের ওপর যেন হঠাৎ হাত পড়ে। ব্যথায় মনটা টনটন করে ওঠে।

গম্ভীর মুখে জবাব দেয় রুদ্র, না নেই। তারপর একটু ইতস্তত করে আবার বললে, তিনি আমার কাছে থাকেন না। কথাটা বলেই রুদ্র জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকে না—এই একটিমাত্র বাক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অনেক কাহিনী, অনেক প্রশ্ন, অনেক জবাব। বিশেষ করে আমাদের এই সমাজে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে থাকাটাই স্বাভাবিক সেখানে ঐ বাক্যটি একজোড়া নরনারীর এক অস্বাভাবিক মানসিকতাই প্রকাশ করে।

মেয়েদের কৌতূহল যেমন বেশি, তেমনি সেই কৌতূহল দমন করার শক্তিও বেশি। কথাটা কানে যেতেই সুস্মিতার মনে এক মুহূর্তে অনেকগুলো সম্ভাবনা উঁকি দেয়। এমন সুপুরুষ কৃতী মানুষের স্ত্রী কেন থাকে না তার সঙ্গে? কী সেই বাধা যা নাকি একজোড়া স্ত্রী-পুরুষকে এমনিভাবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে?

রুদ্র নিজেও কিন্তু সেই মুহূর্তে সুস্মিতার কাছ থেকে আরও কিছু প্রশ্নের জন্যে

অপেক্ষা করছিল। তাই সে মোটামুটি জবাবটাও প্রায় ঠিক করে রেখেছিল মনে মনে। কিন্তু স্বস্মিতা সেই দিক দিয়েও গেল না। গুমোট ঘরে এক ঝলক হাওয়ার প্রবেশের মত হঠাৎ নড়ে-চড়ে উঠে ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে সে বলে ওঠে, যাক গে ওসব কথা। শোনাবার মত হলে আর একদিন না হয় শোনাবেন।

স্বস্মিতার কথার ভঙ্গিটি ভারি চমৎকার লাগছিল রুদ্রর। শোনাবার মত হলে না হয় আর একদিন শোনাবেন,—এই কথাক'টি দিয়ে একদিকে সে যেমন তার নারীসুলভ কৌতূহলটুকু প্রকাশ করেছিল, তেমনি আবার সেই কৌতূহলের মুখের রাশটিও টেনে ধরেছিল নিপুণ হাতে। অন্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানার স্বাভাবিক ইচ্ছা যাতে ভদ্রতা ও শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যেন ঐ কথা ক'টি উচ্চারণ করেছিল স্বস্মিতা।

রুদ্রদেব এবার উঠে দাঁড়ায়। তারপর তুতুনকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করতেই তুতুন তার ডাগর চোখ দু'টি মেলে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে হঠাৎ বলে ওঠে, তুমি পুলিশ?

রুদ্রদেবের আচার আচরণে তুতুনের মনের সেই পুলিশ ভীতি অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। পুলিশ সম্পর্কে তার শিশুমনের কল্পনার সঙ্গে এই লোকটি যেন কেমন বেমানান। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা, মস্ত একজোড়া গোঁফ, ভাটার মত রক্তবর্ণ চোখ—এসব কিছুই তো নেই এই লোকটির। তার ওপর কথাবার্তা কেমন মিষ্টি। এমন একজন মানুষ কেমন করে পুলিশ হতে পারে?

তুতুনের কথায় রুদ্র ও স্বস্মিতা একসঙ্গে হেসে উঠতেই তুতুনের মনের শেষ সন্দেহটুকুও কেটে যায়। নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে রুদ্রর একখানা হাত জড়িয়ে ধরে মাথা দুলিয়ে সে আবার বলে ওঠে, আমি জানি তুমি পুলিশ নও। মা আমাকে শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

—তাই নাকি? তুতুনকে কোলে তুলে আদর করে হেসে রুদ্রদেব বললে, এটা তোমার মায়ের ভয়ানক অন্যায়। শুধু শুধু তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। পুলিশ হলে তো আমার মাথায় দুটো শিং থাকতো, মস্ত একটা লেজ থাকতো, লক্‌লকে একখানা জিভ থাকতো—সে সব কোথায় আমার?

রুদ্রর কথায় তুতুনের চোখে মুখে জেগে ওঠে একটা অবিশ্বাসের ছায়া। পুলিশের যে পশুর মত শিং, লেজ থাকে না এ তথ্য তার মত একটি ছোট্ট

মেয়েরও অজানা নয়। তাই সে বলে ওঠে, ধেৎ, তাই হয় নাকি? পুলিশ তো মানুষ।

তুতুনের সঙ্গে এতক্ষণ হেসেই কথা বলছিল রুদ্র। তার ঐ শেষের কথাটি কানে যেতেই রুদ্রর মুখের ওপর থেকে সেই হাসিটুকু অদৃশ্য হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত তুতুনের সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা তাকে বুকে চেপে ধরে আবেগের স্বরে বলে ওঠে, হ্যাঁ—হ্যাঁ তুতুন সোনা, তুমি ঠিকই বলেছ। পুলিশও মানুষ। এ খবরটি তোমার মত একটি ছোট্ট মেয়ে জানলেও, অনেকেই তা জানে না, বোঝে না। এমনকি পুলিশের নিজেদের মধ্যেও একদল তা' বেমালুম ভুলে বসে থাকে।

এক সময় তুতুনকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে রুদ্র সুস্মিতাকে বললে, আমি এবার চলি, বৌদি।

—আর একটু বসুন না ঠাকুরপো। এই তো সবে এলেন। অনুরোধ করে সুস্মিতা।

—ইচ্ছে থাকলেও তো বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই বৌদি, জবাব দেয় রুদ্র, যে চাকরি করি তাতে সরকারের কাছে প্রতিটি মিনিটের হিসেব দিতে হয়।

একটু থেমে রুদ্র আবার বললে, মেয়েকে নিয়ে একা থাকেন আপনি। দীপকদা কাছে নেই। আমরাই তো তাকে জেলে পাঠিয়েছি। মিসার বন্দী। কবে ছাড়া পাবে কে জানে? তাই, কোন দরকার হলে আমাকে জানাবেন। যে ক'দিন এই জেলায় আছি, সেই ক'টা দিন অন্ততঃ আপনাদের দিকে একটু নজর রাখতে পারবো। অবশ্য কথাটা জেলের মধ্যে দীপকদার কানে পৌছলে সে হয়তো এর মধ্যে পুলিশী প্যাচের মত একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারে। আমরা তো এখন তার ঘোর শত্রু।

সুস্মিতা রুদ্রর কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

সহসা রুদ্র আবার বলে উঠে, বিশ্বাস করুন বৌদি, অনেককাল দীপকদাকে দেখিনি। এতকাল তাকে মনেও পড়ে নি, তাই দেখতেও ইচ্ছে হয় নি। আজ আপনাদের দেখে সত্যিই তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। সম্ভব হলে জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু এই চাকরিতে তা' সম্ভব নয়। আচ্ছা বৌদি, দীপকদার কোন ছবি-টবি আছে না আপনার কাছে?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সুস্মিতা বললে, হ্যাঁ ছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে তার প্রায় সবগুলোই সে নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলেছিল যাতে সেগুলো তাদের হাতে না পড়ে। কেবলমাত্র তার একখানা ছবি আমি অনেক

কষ্টে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কথাটা জানতে পেরে সে অনেক বকা-ঝকা করেছিল আমাকে, কিন্তু আমি তার কোন কথায় কান দিই নি। জীবনে বোধহয় ঐ একটিবার-ই আমি তার অবাধ্য হয়েছিলাম। ছবিখানা এখনও আছে আমার কাছে। একটু দাঁড়ান, নিয়ে আসছি। কথাটা শেষ করেই দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে যায় সুস্মিতা।

একটু পরেই কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা মাঝারি ধরনের ছবি নিয়ে ঘরে ঢুকে সেখানা রুদ্রর হাতে তুলে দিয়ে সুস্মিতা বললে, এই দেখুন ওর ছবি'।

ছবিতে দীপকের চেহারা অনেকটা প্রায় আগের মতই আছে। তেমনি ব্যাক-ব্রাশ করা মাথার চুল, তীক্ষ্ণ নাক, প্রশস্ত কপাল। তবে একমাত্র তফাৎ তার চোখ দু'টিতে। সেকালে সেই চোখে ছিল কেমন যেন এক ঔদাসীন্যের ভাব। আর এখন ঐ ছবিতে সেই ভাবের লেশমাত্রও চোখে পড়ে না। বুদ্ধিদীপ্ত চোখের তারায় ঔদাসীন্যের বদলে স্থির সংকল্পের চিহ্ন। তা'ছাড়া, সারা মুখে ছড়িয়ে রয়েছে এমন এক অভিজ্ঞতার ছাপ যা নাকি আগে ছিল না।

ফ্রেমে আঁটা ছবিখানার কাঁচের ওপর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে যায় রুদ্রদেব। পাশের ঘর থেকে ছবিখানা নিয়ে আসার সময় হয়তো সুস্মিতা শাড়ির আঁচল দিয়ে সেখানা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তবুও নীচের দিকে তখনও যে দু'এক ফোঁটা শুকনো চন্দন ও দূর্বার আঁশ লেগেছিল তাতেই রুদ্রর মনে হচ্ছিল যে সুস্মিতা তার এই স্বামীর ছবিখানাকে কেবল ফুল-চন্দন দিয়ে সাজায়ই না, রীতিমত পূজো করে। হয়তো প্রতিদিনই করে। গৃহস্থ বধূ যেমন স্নান সেরে লালপাড় শাড়ি পরে ঘোমটার ফাঁকে ভিজে চুলের গোছা পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে ঠাকুরের পটের সামনে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পূজো করে, সুস্মিতাও বোধহয় তাই করে। ঠাকুরের পটের বদলে সামনে থাকে তার স্বামী দেবতার ফটো।

শুধু অবাক নয়, বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে যায় রুদ্রদেব। স্ত্রী স্বামীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখলে, তাদের ভেতর কি ধরনের সম্পর্ক থাকলে সে তার ফটোখানাকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করতে পারে? সুস্মিতা অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে নয়, রীতিমত উচ্চ শিক্ষিতা। একটা মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তা'ছাড়া এই সুস্মিতার মুখেই একদিন সে শুনেছিল যে স্বামীর রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও তার চরমপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে সে নিজে কোন কালেই একমত নয়। তাই যদি সত্যি হয় তা'হলে তার পক্ষে স্বামীকে এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করা কেমন করে সম্ভব? কিসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুস্মিতা তার স্বামীর

ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে এমনিভাবে বিলিয়ে দিয়েছে ? কি সেই প্রেরণার উৎস ?

সেই মুহূর্তে নিজেকে আর সম্বরণ করতে না পেরে রুদ্র জিজ্ঞেস করেই বসে স্মিতাকে, আচ্ছা বৌদি, দীপকদার এই ছবিখানাকে কি আপনি প্রতিদিন পূজো করেন ?

হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলে মানুষের মুখে যে ধরনের বিব্রতভাব ফুটে ওঠে তেমনি মুখ করে রুদ্রর দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে সঙ্কুচিত কণ্ঠে স্মিতা জবাব দেয়, সত্যিকারের পূজো করার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি আমার কোথায় ঠাকুরপো। তবে রোজই একবার ওর এই ছবির কাছে গিয়ে বসি—এই পর্যন্ত।

রুদ্র বুঝতে পারে স্মিতা ব্যাপারটাকে পাশ কাটাতে চাইছে। কিন্তু এত সহজে ছাড়বার পাত্র রুদ্র নয়। তাই সে আবাব জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বৌদি, একজন মানুষের ছবিকে ফুল জল দিয়ে পূজো করে কি লাভ বলতে পারেন ? দীপকদা যদি আজ জেলে না থেকে এখানে আপনার কাছে উপস্থিত থাকতো তা'হলে কি তাকে এমনি ভাবে সামনে বসিয়ে পূজো করতেন ?

স্মিতা এবারেও প্রশ্নটার ওপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে কেবল একটু হাসে।

—ওকি, চুপ করে রইলেন কেন, বৌদি ? কিছু বলুন। রুদ্র সোজা তাকিয়ে থাকে স্মিতার মুখের দিকে।

আর পাশ কাটানো চলে না, চুপ করে থাকাও যায় না। তাই এবার মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে মৃদু কণ্ঠে সে জবাব দেয়, জানেন ঠাকুরপো, দেবতা যদি রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তা'হলে প্রথমটায় হয়তো মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেটা মানুষের গা সহা হয়ে ওঠে। তাতে দেবতার দেবত্ব কিন্তু একটুও খর্ব হয় না। আপনার দাদা আজ চোখের সামনে নেই বলেই তার ছবির সামনে বসে তার কথা ভাবতে চেষ্টা করি। চোখে যাকে দেখতে পাই না, মনের চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি তাকে। কাছে থাকলে হয়তো এসব কিছুই করতাম না। সেটা গা সহা হয়ে উঠতো। তাতে কিন্তু তার ব্যক্তিসত্তা খর্ব হতো না একটুও। অন্ততঃ আমার কাছে তো নয়ই। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সে আমার চাইতে ঢের ঢের বড়। তার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা তারই যোগ্য। সেখানে পৌছবার ক্ষমতা আমার নেই।

স্মিতা থামতেই রুদ্র আবার প্রশ্ন করে, তাহ'লে কি আপনার এই পুজোর

'লক্ষ্য ব্যক্তি দীপক মৈত্র নয় ?

জবাব দেয় স্মিতা, স্ত্রী হিসেবে তার সান্নিধ্য আমি প্রতি মুহূর্তেই কামনা করি। তবে আমি পুজো করি ব্যক্তিকে নয় তার ব্যক্তি-সত্তাকে, যেমন নাকি মানুষ পূজো করে দেবতাকে নয়, দেবতার দেবত্বকে।

স্মিতার কথার ধরনে অভিভূত হয়ে পড়ে রুদ্রদেব। এই জগতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তা' ছিল তার ধারণার অতীত। সেই মুহূর্তে ভগবানের চাইতে ভক্তকেই যেন বড় বলে মনে হয় রুদ্রদেবের। বুঝতে পারে, এই ধরণের ভক্তের কাছেই ভগবান হন পরাভূত।

নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুদ্র বললে, আর দেরি করবো না, বৌদি। এবার চলি।

—আবার আসবেন তো, ঠাকুরপো ? শান্ত চোখ দুটি রুদ্রর মুখের ওপর মেলে ধরে জিজ্ঞেস করে স্মিতা।

—যখনই ডাকবেন তখনই আসবো। জবাব দেয় রুদ্র।

—না ডাকলে বুঝি আসবেন না ?

—না—না, তা কেন ? তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রুদ্র, তবে যে চাকরি করি তাতে নিজের ইচ্ছাটাই যেমন সব নয়, নিজের সময় বলেও কিছু নেই।

হেসে স্মিতা বললে, তা তো বুঝলাম। তবে বৌদি ও ভাইঝিটার খোঁজ-খবর নিতে মাঝে মাঝে এলে খুবই খুশি হবো, ঠাকুরপো।

,—বেশ আসবো, বিশেষ করে এই তুতুন সোনাকে দেখতে তো আসতেই হবে। বলতে বলতে তুতুনের গাল টিপে একটু আদর করে রুদ্র আবার বললে, এবার তা'হলে চলি, তুতুন সোনা ?

—আবার এসো কিন্তু। মায়ের কোলে চড়ে রুদ্রকে হাত নেড়ে টা-টা করে তুতুন।

—হ্যাঁ মা, আসবো। আবার আসবো।

সরকারী জিপের গদি মোড়া সীটে ঠেস্ দিয়ে জেলার পুলিশ সাহেব রুদ্র তার অফিসের পথে যেতে যেতে কেবল স্মিতার কথাগুলোই ভাবতে থাকে। তার কেবলই মনে হতে থাকে, এ যুগে স্মিতার মত একজন মহিলা বাস্তবিকই দুর্লভ।

রাজনীতির পথ বড়ই কুটিল। বিশেষ করে এদেশের রাজনীতিতে 'রাজ' শব্দটির অস্তিত্ব থাকলেও নীতির যে কোন বালাই নেই সেকথা এদেশের রাজনীতিবিদেরাও জানেন। মুখে অবশ্য তাঁরা তা স্বীকার করেন না। দেশের মঙ্গল, জনগণের সেবা প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও গালভরা শব্দগুলোর সাহায্যে রাজনীতির আসরে বাজীমাৎ করে দেশের মানুষকে বোকা ঠকানোর সাফল্যে মনে মনে তাঁরা হাসেন। আর, দাঁও বুঝে কোপ মারার আশায় তথাকথিত আয়ারাম-গয়ারামের দল দেশ সেবার মুখোশ এঁটে সর্বদাই রাজনীতির ময়দানে ছুঁক ছুঁক করে বেড়ায়। উদ্দেশ্য তাদের কেবল একটাই—আত্মোন্নতি, আত্মসুখ, আত্মপ্রচার।

এঁদের মধ্যেই কদাচিৎ দু'এক জনকে দেখা যায় যাঁদের কাছে রাজনীতি করা ঠিক লাভের ব্যবসা নয়। তাই বলে যে তাঁরা জনগণের সেবা করতে পেরেই কৃতার্থ বোধ করেন তেমন ভাববার মত কারণও নেই। এই ধরনের ব্যক্তিরা রাজনীতির জন্যেই রাজনীতি করেন। তাঁদের কাছে এটা একটা প্রচণ্ড নেশা ছাড়া আর কিছু নয়। দাবা খেলা, তাস খেলার মত এই রাজনীতির খেলা খেলতে না পারলে বাস্তবিকই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন।

আই-পি-এস অফিসার রুদ্রদেব ভট্টাচার্যের এক কালের সহপাঠিনী, বান্ধবী ও প্রণয়িনী অলকা মজুমদারও তেমনি একজন রাজনীতি পাগল যে নাকি এর আকর্ষণে নিজের জীবনের অনেক কিছুই ত্যাগ করেছে। রাজনীতিকে মূলধন করে ব্যবসা করার মনোবৃত্তি তার যেমন কোনকালেই ছিল না তেমনি জনসেবার মত একটা আদর্শ তার চোখের সামনে থাকলেও মনের অন্দরমহলে সেটাকে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে বলেও সে মনে করতে পারে না। এটা তার কাছে কেবল এমন একটা নেশা যা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।

অলকা মজুমদার সরকারী দলের একজন নেত্রী। ইদানীং সেই নেতৃত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হলেও দলের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব তার। বলতে গেলে সরকারী দলের সর্বকনিষ্ঠা এম-এল-এ এই অলকা মজুমদার দলের মধ্যে একটা

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দলের কাজে ব্যস্ত থাকে অলকা। এ্যাসেম্বলি সেসন যখন থাকে তখন তো কথাই নেই। নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত সময় পায় না। অবশেষে গভীর রাতে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের সাজানো-গোছানো ঘরের সুদৃশ্য পালঙ্কে যখন সে শুয়ে পড়ে তখন একমাত্র নিদ্রাদেবীর কথা ছাড়া আর কিছু তার মনে পড়ে না।

মাঝে মাঝে কিন্তু নিদ্রাদেবী বিশ্বাসঘাতকতা করে অলকার সঙ্গে। সেদিন সে চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। রাজ্যের চিন্তা এসে ভিড় করে দাঁড়ায় তার মাথার মধ্যে। রাজনীতির চিন্তা ছাডাও নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার টুকরো টুকরো ছবি বিদ্যুৎ চমকেব মত হঠাৎ দেখা দেয় মনের আয়নায়। অতীতও মিশে থাকে তার সঙ্গে। এই ধরনের চিন্তাগুলো গুরুভোজনে চাট্‌নির কাজ করে অলকার মনে। তারিয়ে তারিয়ে খেতে ইচ্ছে করে। সেই মুহূর্তে নিজেকে নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলে অলকা। তখন আর সে দলনেত্রী এম-এল-এ অলকা মজুমদার থাকে না। হয়ে ওঠে সাধারণ একটি নারী। আর ঠিক তখনই তার মনে পডে রুদ্রকে যে নাকি পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি জেলার পুলিশ সাহেব।

গভীর রাতে মনের সেই অবস্থায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা কাণ্ড কবে বসে অলকা। বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে নিজেকে। কেমন যেন একটা মায়া হয় নিজেব ওপর। এখনও সে মোটামুটি সুন্দরী। এরই টানে দলের মাতব্ববদের মধ্যে কেউ কেউ তার ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেও তেমন সুবিধে করতে পারে না। অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে সে। নিজের এই সৌন্দর্যকেই দিনের পর দিন অবহেলা করে চলেছে অলকা। কাজের চাপে আয়নায় নিজেকে একটিবার দেখতেও সে ভুলে যায়। প্রসাধন করা তো এখন একটা অতীতের ব্যাপার। মনের এমনি এক অবস্থায় মাঝে মধ্যে ড্রেসিং টেবিলেব সামনে বসে ড্রয়ার খুলে প্রসাধন সামগ্রী বের করে সাজতে বসে অলকা। আধুনিক প্রসাধন সামগ্রীর সাহায্যে নিপুণ হাতে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। সেই মুহূর্তে নিজেকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। অবশেষে সারাদেহে বিলিতি এসেন্স ছড়িয়ে ঘরের নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঘরের সেই আলো-আঁধারির মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে·

তাকিয়ে থাকে অলকা। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে কি দেখতে পায় তা সে-ই জানে। সেই অবস্থায় তাকে মনে হয় যেন একটি গৃহস্থ বধূ প্রসাধন শেষ করে স্বামীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের কেউ সেই মুহূর্তে তাকে দেখে ফেললে বিশ্বাস করতেই চাইবে না যে ঐ মহিলাটিই শাসকদলের একজন ভি-আই-পি এম-এল-এ অলকা মজুমদার।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চিন্তার রাশ আলগা করে দেয় অলকা। সীমাহীন চিন্তা। একটার পর একটা টুকরো টুকরো ছবি। সেই ছবির মধ্যে একটিবারের জন্যেও রুদ্রদেবের মুখখানা ভেসে ওঠে কিনা তার জবাব একমাত্র সে-ই দিতে পারে। অবশেষে একসময় যখন সে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে তখন তার মনটা বাস্তবিকই ভারি। কেমন যেন একটা অভাববোধ তাকে পীড়ন করতে থাকে। নিজের রাজনৈতিক সাফল্য মনে হয় বড়ই অকিঞ্চিৎকর, বড়ই অর্থহীন। অবশেষে এক বোঝা চিন্তা মাথায় নিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই কিন্তু অলকাব মনে পড়ে বিগত রজনীর ছেলেমানুষী কার্যকলাপের কথা। কেমন যেন একটা লজ্জা ঘিরে ধরে তাকে। তাড়াতাড়ি আয়নায় নিজেকে দেখে প্রায় চমকে ওঠে সে। এ তার কেমন ধরনের ছেলেমানুষী? রাতের অন্ধকারে এম-এল-এ অলকা মজুমদারকে কি ভূতে পেয়েছিল? বোধহয় তাই। চিন্তার ভূত।

জলের বেসিনের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখের প্রসাধনের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলে অলকা। অবশেষে রাতে নিজের আচরণের জন্যে নিজের মনেই একটু সলজ্জ হাসি হেসে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। আর কোন ভাবনা নেই। এবার সে নিশ্চিন্ত। আবার সে হয়ে ওঠে সেই ব্যস্ত এম-এল-এ অলকা মজুমদার। গভীর রাতের কার্যাবলী চাপা পড়ে যায় গভীর রাতের অন্ধকারের মধ্যেই।

দলের কাজে বম্বে যেতে হচ্ছে অলকাকে। সঙ্গে যাচ্ছে দলের তিন চারটি কর্মী যুবক। এম-এল-এ অলকা মজুমদারই একমাত্র প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। যুবকেরা চলেছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেল ছাড়ার মিনিট দশেক আগে অলকা গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই একটি কর্মী যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এসে অলকার হাত থেকে একমাত্র ব্রীফ-কেসটি নিজের হাতে নিতে নিতে বললে, যাক্ বাঁচালেন অলকাদি। আমরা তো এদিকে ভেবে মরছি যে আপনি বুঝি

ট্রাফিক জ্যামে পড়লেন।

নিজের ছোট্ট হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দেয় অলকা, কেন, এখনও তো ট্রেন ছাড়তে দশ মিনিট দেরি আছে।

যুবকটি সে কথার জবাব না দিয়ে অলকার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললে, রমেনদা অনেক আগেই এসে আপনার বার্থে বেডিং বিছিয়ে সব তৈরি করে রেখেছে।

—তাই নাকি? তেমনি হাসিমুখে জবাব দেয় অলকা, তোমরা জায়গা পেয়েছ তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমাদের অবিনাশদা করিৎকর্মা মানুষ। স্টেশনে এসেই কেমন করে যেন থ্রি-টায়ার স্লিপারে আমাদের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

—ভালো। বলতে বলতে অলকা ফার্স্টক্লাশের দিকে এগিয়ে যেতেই রমেন একটা জানালা দিয়ে তাদের ডাকে, এই দিকে—এই দিকে আসুন, অলকাদি।

চার বার্থের একটা কামরায় একখানি লোয়ার বার্থে অলকার বেডিং বিছিয়ে অপেক্ষা করছিল রমেন। অলকা কামরার ভেতরে ঢুকেই লক্ষ্য করে উল্টো-দিকের বার্থে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন। সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলা ও একটি সুন্দরী যুবতী। আধুনিক সাজে সজ্জিতা যুবতীটিকে নিজের চাইতে চার পাঁচ বছরের ছোট বলেই মনে হলো অলকার।

অলকা নিজের বিছানায় বসে বললে, আমার টিকিট কার কাছে? অবিনাশের কাছে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রমেন, না অলকাদি। আমার কাছেই রয়েছে। বলেই সে পকেট থেকে টিকিটখানা বের করে তুলে দেয় অলকার হাতে।

অলকা এবার রমেন ও অন্য যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললে, ওকি, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো না এখানে। বলেই সে জানালার দিকে একটু সরে বসলেও রমেন ও অন্য যুবকটি দাঁড়িয়েই থাকে। নেত্রীর পাশে বসার সঙ্কোচ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না।

অলকা তাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে আবার বললে, আরে বসোই না।

এবার যুবক দু'টি বার্থের অন্যপ্রান্তে জড়োসড়ো হয়ে বসে। রমেন আবার বললে, সীটের নীচে বাস্কেটের মধ্যে আপনার ওয়াটার বট্‌ল আছে। ভালো খাবার জল এনে রেখেছি আমি। তা'ছাড়া ফ্লাস্ক ভর্তি চা-ও এনে রেখেছি।

মৃদু হেসে জবাব দেয় অলকা, বেশ করেছো। তারপর অন্য যুবকটির দিকে

তাকিয়ে আবার বললে, আমাদের শ্রীমান রমেন সঙ্গে থাকলে কোথাও এতটুকু অসুবিধে হবার জো নেই, কি বলো স্বদেশ?

অলকার কথায় রমেন একটু লাজুক হাসি হাসতেই স্বদেশ তাকে সামান্য ঠেলা দেয় কনুই দিয়ে।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বেজে উঠতেই রমেন ও স্বদেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমরা এবার যাই, অলকাদি?

—হাঁ এসো। তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কামরা কত দূরে?

—বেশি দূরে নয়, জবাব দেয় স্বদেশ, মাত্র দু'খানা কামরার পরেই। আপনার কোন অসুবিধে হবে না, অলকাদি। প্রতিটি স্টেশনে ট্রেন থামলেই আমরা এসে আপনার খবর নিয়ে যাবো।

—আরে না—না, প্রতিটি স্টেশনে আমার খবর নেবার দরকার নেই। কাল সকালের দিকে বরঞ্চ একবার এসো।

—তা' তো আসতেই হবে। আপনার ব্রেক-ফাস্টের ব্যবস্থা করতে হবে না? বলতে বলতে স্বদেশকে সঙ্গে নিয়ে কামরা থেকে নেমে যায় রমেন।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। অলকা সীটের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসে ব্রীফ কেস খুলে কতগুলো টাইপ্ করা কাগজ বের করে। হাইপাওয়ার চশমার ফাঁকে একবার তাকায় সামনের বার্থের দলটির দিকে। ওঁরা সম্ভবতঃ স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গে বোধহয় মেয়ে। মায়ের মুখের আদল রয়েছে মেয়ের মুখে। আর ভদ্রলোক মা-মেয়ের সঙ্গে নীচু কণ্ঠে কথা বলার ফাঁকে কেবল চুরুট টেনে চলেছেন।

নবনীতা কিন্তু অলকাকেই দেখছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এই মহিলাটিকে যেন সে কোথায় দেখেছে। কিন্তু কোথায় যে দেখেছে তা' কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। একদৃষ্টে মহিলাটির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবারও উপায় নেই। মহিলাটির সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়ে মাঝে মাঝেই সে তার চোখজোড়া সরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল।

সুবীর ঘোষাল দিনকয়েকের জন্যে বাইরে বেড়াতে চলেছেন। গন্তব্যস্থল আপাততঃ বম্বে। সেখান থেকে যাবেন গোয়া। দিনকয়েকের জন্যে বাইরে চললেও সঙ্গে লটবহর তাঁদের কম নয়। তাঁদের মালপত্রেই কামরাটার অধিকাংশ ভর্তি।

স্ত্রী মনোরমা একসময় স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওকি, প্যাণ্ট-সার্ট পরে

এখনও যে বসে বসে চুরুট টেনে চলেছো। বাথরুমে যাও। এগুলো ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এসো।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। বলেই সুবীর বাইরের দিকে তাকিয়ে তেমনিভাবেই চুরুট টানতে থাকেন।

ইতিমধ্যে কামরার সামনে এসে দেখা দেয় কণ্ডাক্টর-গার্ড। হাতের লম্বা লিস্টে পেন্সিলের দাগ দিতে দিতে অলকার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনিই এম-এল-এ মিস অলকা মজুমদার?

কণ্ডাক্টর-গার্ডের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়ে অলকা।

—আর আপনারা মিঃ এস. ঘোষাল এ্যাণ্ড পার্টি?

মাথা নাড়েন সুবীর ঘোষাল।

—আপনাদের একটা লোয়ার, আর দু'টো আপার বার্থ।

—ঠিক আছে। সুবীর বললেন।

কণ্ডাক্টর-গার্ড চলে যায়।

এতক্ষণে অলকাকে চিনতে পারে নবনীতা। এই সেই রাজনৈতিক নেত্রী অলকা মজুমদার। সে অলকাকে এই প্রথম চাক্ষুস দেখলেও খবরের কাগজে এর ছবি অনেক দেখেছে। তাই একে এতক্ষণ চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছিল তার।

নিজের বার্থে বসে টাইপ করা কাগজগুলো এক মনে পড়ে চলছিল অলকা। আর, অন্যপাশে বসে কথা বলছিল বাপ-মা ও মেয়ে।

একসময় পড়া শেষ করে কাগজপত্র ব্রীফ কেসের মধ্যে বন্ধ করে সুবীরদের দিকে তাকায় অলকা। তারপর পবনের সাদা খোলের শাড়ির আঁচলটা গায়ের ওপর আরও একটু টেনে দিয়ে সরাসরি নবনীতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনারা বুঝি বম্বে চলেছেন?

সরকারী দলের একজন বিশিষ্ট এম-এল-এ'র সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশিই হয় নবনীতা। এই মহিলাটি সম্পর্কে বরাবরই একটা কৌতূহল ছিল তার। অলকা মজুমদারের মত এত অল্প বয়সে কোন মেয়ে এই রাজ্যের রাজনীতিতে এত নাম করতে পারে নি। তা'ছাড়া, এমন সুশ্রী একটি অবিবাহিতা মেয়ে কেমন করে যে দলের পুরুষদের সঙ্গে সমানে টেক্কা দিয়ে চলেছে সেটাও ছিল তার কৌতূহলের একটা অন্যতম কারণ।

অলকার প্রশ্নের জবাবে নবনীতা বললে, হ্যাঁ, আপাততঃ বম্বে। সেখান থেকে গোয়া।

—বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি?

নবনীতার বদলে এবার জবাব দেন তার মা মনোরমা। একটু ম্লান হেসে তিনি বললেন, হ্যাঁ মা। এই মেয়েটার শরীর কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না। তাই দিন কয়েকের জন্যে—। কথাটা শেষ না করেই তিনি থেমে যান।

--আপনার ছোট মেয়ে বুঝি? হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করে অলকা। তারপর আবার বলতে থাকে, আমিও আমার মা-বাবার ছোট মেয়ে। এককালে আমার শরীর খারাপ হলেও বাবা-মা ভারি উতলা হয়ে উঠতেন। কথাটা বলেই হালকা কণ্ঠে হেসে ওঠে সে।

অলকার সহজ কথাবার্তায় তাকে বেশ ভালই লাগে নবনীতার। এত বড় একজন রাজনৈতিক কর্মী, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। কেমন সহজভাবে কথা বলে চলেছে তাদের সঙ্গে। অলকার হালকা হাসির জবাবে নবনীতাও মৃদু হেসে বললে, এখন বুঝি তাঁরা আর উতলা হন না?

তেমনি স্বরে জবাব দেয় অলকা, না ভাই। উতলা এখনও হন তাঁরা। কিন্তু আমার সঙ্গে এখন আর পেরে ওঠেন না। আজকাল ডুবে রয়েছি রাজনীতির মধ্যে। মা-বাবা এখন মেয়ের জন্যে এত ভাবনা চিন্তা করলে চলবে কেন, বলুন?

মনোরমা এবার বললেন, না মা, ছোটই বলুন আর বড়ই বলুন, সন্তানের জন্যে সব বাবা-মা'র মনই সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। ও আমাদের একমাত্র সন্তান।

এতক্ষণে মুখের চুরুট নামিয়ে আঙুলের ফাঁকে ধরে সুবীর ঘোষাল জিজ্ঞেস করেন, আপনি বুঝি বম্বে চলেছেন?

—হ্যাঁ, মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অলকা বললে, কাজে যাচ্ছি।

—ক'দিন থাকবেন?

—বড় জোর দু'তিন দিন। তা, আপনাদের কতদিনের প্রোগ্রাম?

জবাব দেন সুবীর ঘোষাল, সব কিছুই এদের ভালো লাগার ওপর নির্ভর করছে। বলেই চোখের ইঙ্গিতে স্ত্রী ও কন্যাকে দেখিয়ে দেন।

অলকা আবার জিজ্ঞেস করে, কলকাতার কোথায় থাকেন আপনারা?

জবাব দেয় নবনীতা, বালীগঞ্জে। তারপর একটু থেমে আবার বললে, কলকাতার একটা বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম ঘোষাল এ্যাণ্ড্ ঘোষালের নাম বোধহয় জানেন। আমার বাবা ঐ ফার্মেরই সিনিয়র পার্টনার।

—তাই নাকি? সোৎসাহে বলে ওঠে অলকা, শুধু শুনিই নি, বছর দুই আগে একটা ব্যাপারে ঐ ফার্মের সঙ্গে আমি জড়িয়েও পড়েছিলাম।

—কি রকম? জিজ্ঞেস করেন সুবীর।

জবাবে বলতে থাকে অলকা, তখন আমি আমাদের দলের লেবার ফ্রণ্টে কাজ করতাম। একবার আপনাদের কাঁকুড়গাছির ফ্যাক্টরীতে লেবার ট্রাব্‌ল হয়েছিল না?

—ইয়েস—ইয়েস, বলে ওঠেন সুবীর, কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন। সেবার আমার বিরুদ্ধে লেবারদের অভিযোগের মধ্যে একটা মজার অভিযোগ ছিল এই যে আমার জামাতা পুলিশের একজন বড় অফিসার বলেই নাকি আমি তাদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করেছিলাম। তার আগে আমি নাকি এসব ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলাম। বুঝুন কাণ্ড! কথাটা শেষ করেই হো—হো করে হেসে ওঠেন সুবীর।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমরা তেমন একটা আমল না দিলেও এমনি একটা অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে লেবাররা তুলেছিল। সত্যিই, ভারি মজার অভিযোগ।

একটু সময় চুপ করে থেকে অলকা লক্ষ্য করে নবনীতাকে। মেয়েটির দেহের অন্য কোথাও এঁয়োতির চিহ্ন নেই। কেবল সিঁথির একপাশে সামান্য একটু সিঁদুরের ছোঁয়া রয়েছে।

নবনীতার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অলকা জিজ্ঞেস করে সুবীরকে, আপনার জামাতা বুঝি একজন বড় পুলিশ অফিসার?

জবাব দেন সুবীর, বড় ছোট জানি না। তবে সে একজন আই-পি-এস অফিসার। বর্তমানে সে একটা জেলার এস-পি।

—তাই নাকি? কি নাম—কোন্ জেলার? অলকার কণ্ঠে কৌতূহল।

জেলার নামটা বলে বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই সুবীর ঘোষাল উচ্চারণ করেন, ওর নাম রুদ্রদেব ভট্টাচার্য।

মুখে আর কথা সরে না অলকার। তার ধনুকের মত বাঁকা ভুরুযুগল একবার কুঞ্চিত হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তার সামনেই বসে রয়েছেন রুদ্রর শ্বশুর-শাশুড়ী। আর তাদের পাশে ঐ সুন্দরী মেয়েটিই তার স্ত্রী।

সেই মুহূর্তে অলকা রুদ্রদেবের চেহারাটা কল্পনা করে নিয়ে সামনে বসে থাকা ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে তার পাশে দাঁড় করিয়ে আপন মনেই বলে ওঠে—বাঃ, সুন্দর মানিয়েছে! বাস্তবিকই চমৎকার ম্যাচ্!

রুদ্রদেবের নাম শুনে অলকার ভুরুযুগল যে হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সেটা সুবীর লক্ষ্য না করলেও তাঁর স্ত্রী মনোরমার দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই অলকাকে

চুপ করে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, চেনেন নাকি তাকে ?

শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় অলকা, হ্যাঁ চিনি।

কৌতূহলী মনোরমা আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই সুবীর বলে ওঠেন, আপনারা তো চিনবেনই। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে আবার বললেন, উনি যখন এম-এল-এ তখন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তো ওঁদের যোগাযোগ রাখতেই হয়। সেই সূত্রে আমাদের রুদ্রকে না চেনার তো কোন কারণ নেই।

অলকা চুপ করে থাকে। সুবীর এবার অলকার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, নিজের জামাতা বলে বলছি না, এযুগে রুদ্রর মত একটি ছেলে বাস্তবিকই দুর্লভ। যেমনি চরিত্রবান, তেমনি সৎ। আমার তো মনে হয় পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ওর মত সৎ অফিসার খুব কমই আছে। তবে একটু একরোখা প্রকৃতির। তা' দেখুন মিস্ মজুমদার, একটু একরোখা চরিত্রের না হলে পুলিশের কাজ ঠিক চলে না, কি বলেন ?

হাতের চুরুট ঠোঁটে লাগিয়ে অলকার সমর্থনের আশায় সুবীর তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে।

কথাবার্তার মধ্যে অলকা কিন্তু মাঝে মাঝেই নবনীতাকে দেখছিল। রুদ্রর প্রসঙ্গ উঠতেই সেই যে নবনীতা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো একবারও এদিকে মুখ ফেরায় নি। মা-বাবার সামনে স্বামীর প্রসঙ্গে মেয়েরা স্বাভাবিক কারণেই লজ্জা পায়। কিন্তু নবনীতার ভাবভঙ্গির মধ্যে সেই স্বাভাবিক লজ্জার অতিরিক্ত কিছু একটা যেন লক্ষ্য করছিল অলকা।

সুবীরের কথার জবাবে অলকা বললে, রাজনৈতিক সূত্রে আপনার জামাতার সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি আমার। চাকরির আগে থেকেই তাকে চিনতাম আমি। ইউনিভার্সিটিতে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। ওর ছিল পলিটিক্যাল সায়েন্স, আমার ছিল ইংরেজি।

অলকার কথা কানে যেতেই এতক্ষণে বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে অলকার মুখের দিকে তাকায় নবনীতা। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যেই তার গম্ভীর মুখখানির ওপর চোখ রেখে অলকার বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না যে ঐ গাম্ভীর্যের উৎস যেন মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জা নয়, অন্য কিছু। কিন্তু কি সেই অন্য কিছু ? মনে খটকা লাগে অলকার। এই প্রসঙ্গ নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা চলে না, তাই সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সুবীরকে জিজ্ঞেস করে, বম্বে-গোয়া ছাড়া আর

কোথাও যাবেন নাকি ?

—না, আপাততঃ তেমন ইচ্ছে নেই। জবাব দেন সুবীর।

—এর আগে গোয়া গিয়েছেন কখনও ?

—না, এই প্রথম যাচ্ছি। যাবো কি বলুন, ইচ্ছে থাকলেও কি যাবার উপায় আছে ? কলকাতা ছেড়ে এক পা গেলেই ফিরে এসে দেখবো হয় ফ্যাক্টরীতে নয়তো অফিসে একটা কিছু ঝঞ্ঝাট বেধে বসে আছে।

অলকা বললে, আমি অনেকবার গোয়া গিয়েছি। জায়গাটা খুবই চমৎকার। আপনাদেরও ভাল লাগবে। তা, এই সঙ্গে জামাইকে সঙ্গে নিলে তো আরও ভালো লাগতো। কথাটা বলেই অলকা হেসে ওঠে।

স্বাভাবিক অবস্থায় অলকার এই কথায় শ্বশুর-শাশুড়ির খুশি হওয়ারই কথা, আর কন্যার একটু লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অলকা লক্ষ্য করে তার কথায় তেমন কিছুই ঘটলো না। পরিবর্তে, সুবীর ও মনোরমা গম্ভীর হয়ে উঠলেন, আর নবনীতা তেমনি ভাবেই বাইরে তাকিয়ে রইলো। কেমন যেন এক নিঃশব্দতা নেমে এলো তাদের মধ্যে।

এতক্ষণে অলকা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছালো যে রুদ্রকে নিয়ে এদেব এই পরিবারে একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু কি হতে পারে ? এদের প্রত্যেকের চাইতেই সে নিজে রুদ্রকে ভালোভাবে চেনে। পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করার মত ছেলে তো রুদ্র নয়। তবে, পুলিশের চাকরিতে ঢুকে সে ইদানীং কতটা বদলেছে তা অবশ্য সে বলতে পারে না।

রুদ্রর পারিবারিক অশান্তির আঁচ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে একটা মস্তবড় আবিষ্কার বলে মনে করে অলকা। এই হঠাৎ আবিষ্কার অলকার অন্তরের অন্তস্থলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার সঠিক খবর যদিও সে নিজেও জানে না কিন্তু সেই মুহূর্তে রুদ্রর জন্যে দুঃখ হয় তার। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃখবোধের তীব্রতা তার মনটিকে বিহ্বল করে তোলে। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। কঠিন শৃংখলে আবদ্ধ মনের এই হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতায় নিজের ওপরই সে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না, তাই মনোরমা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন, মেয়ে-জামাই সঙ্গে থাকলে তো ভালই হতো। তবে জামাইয়ের যে চাকরি, তাতে তার ছুটি পাওয়াই একটা সমস্যা।

—তা' তো বটেই। কথাটা বলে আবার নিজের মনের মধ্যে ডুব দেয় অলকা।

একসময় নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুবীর স্ত্রীকে বললেন, অনেক রাত হলো। এবার শুয়ে পড়া যাক। বলেই তিনি উঠে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে নবনীতাও উঠে দাঁড়িয়ে বেডিং খুলতে খুলতে মনোরমাকে বললে, তুমি নীচে শোও, মা। বাবা ও আমি ওপরের দু'টো বার্থে উঠে যাচ্ছি।

—তা' কেমন করে হবে? সুবীরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন মনোরমা, কোমরে বাত নিয়ে তুমি ওপরে উঠবে কেমন করে? তার চাইতে তুমিই নীচে শোও, আমি ওপরে উঠছি।

—পারবে তুমি ওপরে উঠতে? নবনীতা মনোরমার দিকে তাকায়।

জবাব দেন মনোরমা, পারতেই হবে।

—না—না, তুমি পারবে না। একটু কষ্ট হলেও আমি ঠিক ওপরে উঠে যাবো। তুমিই নীচে শোও। সুবীর বললেন।

এবার উঠে দাঁড়ায় অলকা। তারপর সুবীরের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনাদের কাউকে ওপরে ওঠতে হবে না। নীচের দু'টো বার্থে আপনারা দু'জন শুয়ে পড়ুন। আমি ওপরে উঠছি।

প্রতিবাদ করে ওঠে নবনীতা। বললে, তা কেন হবে? আপনি নীচে রয়েছেন। আমাদের জন্যে আপনি কষ্ট করবেন কেন?

মেয়েকে সমর্থন করে সুবীরও বললেন, সত্যিই তো। আপনি কেন আমাদের জন্যে কষ্ট করবেন?

হেসে অলকা বললে, কোন কষ্ট হবে না আমার। আমাদের বয়স কম। আমরা ওপরে উঠছি। আপনারা নীচে থাকুন। কথাটা বলেই সে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে তাকায় নবনীতার দিকে।

কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে নবনীতার চোখে।

গভীর রাত। হু—হু শব্দে ছুটে চলেছে বম্বে মেল। কামরার মধ্যে জ্বলছে নীল আলো। নীচে নিদ্রামগ্ন সুবীর ও মনোরমা। ওপরের বার্থে নবনীতাও গভীর ঘুমে অচেতন। কেবল ঘুম নেই অলকার চোখে। নবনীতার মুখখানা অলকার দিকে ফেরানো। তার একখানা হাত ঝুলে পড়েছে একপাশে। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে বালিশে মাথা রেখে অলকা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নবনীতার সুপ্তিমগ্ন মুখের দিকে। সত্যিই মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু সত্যিই কি সে সুখী? রুদ্র কি ওকে সুখী করতে পারে নি? কিন্তু কেন? কিসের অভাব রুদ্রর? একটা জেলার পুলিশ সাহেব সে। তবে কেন ঐ মেয়েটির মুখখানা ঘুমের মধ্যেও এমন ম্লান দেখাচ্ছে? সেই গভীর রাতে দ্রুতগামী রেলগাড়ির

গতির সঙ্গে নিজের চিন্তার গতি মিশিয়ে দিয়ে বিছানায় কেবল এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকে এম-এল-এ অলকা মজুমদার।

'পুলিশ ডিউটি মিট্'—অর্থাৎ, পুলিশী কর্মনৈপুণ্যের প্রতিযোগিতা। সর্ব-ভারতীয় পুলিশ প্রতিযোগিতা এটা। ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের পুলিশ বাহিনী অংশগ্রহণ করে এতে। ইদানীং এই রাজ্যের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কবা প্রায় প্রহসনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর জন্যে উঁচু মহলে কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। কোন পরিকল্পনা নেই, কোন প্রস্তুতি নেই। নেহাত রাজ্য থেকে একটা টিম পাঠাতে হয়, তাই। চট্পট কিছু টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে খুঁজে পেতে জনকয়েক প্রতিযোগীকে ধরে এনে পাঠানো হয় সেই প্রতিযোগিতায়। আর, সেই সঙ্গে অধিকাংশ বছরই এমন সব অফিসারকে টিম ম্যানেজার করে পাঠানো হয় যাঁরা নাকি এটাকে সরকারী খরচে একটা ভ্রমণের সুযোগ ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। নিজের রাজ্যের প্রতিযোগীদের খবরাখবর রাখার সময়টুকুও তাঁরা পান না। কিন্তু অন্য রাজ্যের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে মাথা ঘামাবার জন্যে লোক আছে। প্রতি-যোগীদের বছরভোর হয় বিশেষ ট্রেনিং যা নাকি এ রাজ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ঐ সব রাজ্যের টিম ম্যানেজারদের প্রখর দৃষ্টি থাকে দলের প্রত্যেকটি প্রতিযোগীর ওপর। তিনি তাদের আগলে রাখেন বুক দিয়ে। তাই ফলাফলও ভাল হয় তাদের। দু' পাঁচটা পুরস্কার অধিকাংশ রাজ্যই নিজেদের ঘরে তোলে, কেবল এ-রাজ্যের প্রতিযোগীরাই ফিরে আসে প্রায় শূন্য হাতে মাথা নীচু করে। বছরের পর বছর এই চলছে। এ রাজ্যের পুলিশ কর্মীর কর্মনৈপুণ্য অন্য রাজ্যেব কর্মীদের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। তবুও সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার অভাবে এ রাজ্যের প্রতিযোগীরা বছরের পর বছর পিছু হটছে।

সেবার প্রতিযোগী পুলিশ টিমের ম্যানেজার নির্বাচিত হলো রুদ্রদেব ভট্টাচার্য। প্রথমেই সে অনুযোগ তুললো যে পনেরো বিশ দিন, বড় জোর এক মাসের গা-ছাড়া দেওয়া ট্রেনিং দিয়ে টিম পাঠানো একান্তই অর্থহীন। তার চাইতে একেবারে না পাঠানও ভালো। তাতে বরঞ্চ সরকারের কিছু পয়সা বাঁচবে।

কথাটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কানে উঠতেই তাঁরা খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন। প্রতিবছর কেমন সুষ্ঠুভাবে সব কাজ সম্পন্ন হয়, আর এবারে কিনা ঐ ভদ্রলোক এমন সব প্রশ্ন তুললেন যার জবাব দেওয়াই মুশকিল। এক সময় তাঁরা রুদ্রদেবের পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠাবার কথাও চিন্তা করেছিলেন যিনি

নাকি গড্ডালিকা প্রবাহের বাইরে একটি পা-ও বাড়াবেন না। তেমন অফিসার যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত আর তা' হলো না। প্রতিবাদে মুখর রুদ্রদেবও অবশেষে সেই সরকারী আদেশই মাথা পেতে নিতে বাধ্য হলো। তার মতে পুলিশী মানসিকতার এও একটা দিক। বিশেষ করে এ রাজ্যে এমনি মানসিকতার একটা প্রধান কারণ অবহেলা। সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের এই অবহেলাই সংক্রামিত হয়েছে প্রতিযোগীদের মধ্যে। তাই, তারাও এটাকে নিছক একটা ভ্রমণের সুযোগ বলে ধরে নিয়েছে। বরাত জোরে এক-আধটা পুরস্কার মিলে যায় তো সেটা কেবল উপরি পাওনা।

যাবার আগে প্রতিযোগীদের সঙ্গে একাধিকবার একই টেবিলে বসে আলোচনা করলে রুদ্রদেব। জেনে নিলে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা, উৎসাহ দিল তাদের। বললে, সুষ্ঠুভাবে ট্রেনিং পাওয়ার সুযোগ আপনাদের ঘটে নি। তবুও আপনাদের এই চল্লিশজনের দলটিকে নিয়ে আমি চলেছি ঐ প্রতিযোগিতায়। ভরসা কেবল আপনাদের অতীতের ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা। এটুকু সম্বল করেই আপনাদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। এ যেন বহু বছর আগে অনুশীলন করা এ্যাথ্‌লেটকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে তাদেরই পাশে যারা নিয়মিত অনুশীলনে অভ্যস্ত। কিন্তু উপায় নেই। সরকারী আদেশ—আমাদের যেতেই হবে। এ সব সত্ত্বেও আপনাদের কাছে আমাব অনুরোধ আপনারা বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না। পুরানো শিক্ষাকে ঝালিয়ে নিন। মনের মধ্যে গড়ে তুলুন প্রতিযোগিতার আবহাওয়া। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের সুখ সুবিধার প্রতি প্রখর নজর থাকবে আমার। প্রতিটি মুহূর্ত আমি থাকবো আপনাদের সঙ্গে। নিজের রাজ্যের কথা ভুলবেন না। এ রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করা কিম্বা এর মুখে লজ্জার কালি মাখিয়ে দেবার সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের। নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখুন।

কেবল মুখেই নয়, নিজের আচরণেই নিজের কথার প্রমাণ দিয়েছিল রুদ্রদেব। প্রতিযোগিতার অঙ্গনে গিয়ে পুলিশ সাহেব বলে সে প্রতিযোগীদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। তাদেব সঙ্গে থেকে তাদের প্রতিমুহূর্ত উৎসাহ দিয়েছে, তাদের অসুবিধা দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, উদ্যোক্তাদের পক্ষপাতিত্বের বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে তর্ক করেছে, ঝগড়া করেছে। কোন প্রতিযোগীর সামান্য ভুলের জন্যে তার নিজের চাইতেও বেশি অনুশোচনা করেছে। অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে নেতার যাবতীয় কর্তব্য।

সঠিক নেতৃত্ব ও ঐকান্তিকতার একটা আলাদা মূল্য আছে। এর ফলে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। এই রাজ্যের প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রেও এ বছর তাই ঘটলো। বেশ কয়েক বছর ধরে যারা প্রতিবার প্রায় শূন্য হাতে ফিরে আসতো, এবার তারা অনেক ভালো ফল করলো। কিছু পুরস্কার তারা ছিনিয়ে আনলো অন্য রাজ্যের হাত থেকে।

ফেরার পথে রেলের কামরায় বসে কেবল একটা কথাই বারে বারে মনে হচ্ছিল রুদ্রর—এ বছর এ রজ্যের প্রতিযোগীরা যতটা ভালো ফল করেছে তার জন্যে একমাত্র দায়ী প্রতিযোগীদের নিজেদেরই আত্মবিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা। সে নিজে তো কেবল তাদের যৎসামান্য উৎসাহ দিতে চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে নি। পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের মধ্যে এই ঐকান্তিকতা ও বিশ্বাসকে যদি তাদের পুলিশী কাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা'হলে যে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু কেমন করে তা' সম্ভব? এই প্রশ্নটাই যে আজ গোটা দেশের পুলিশ বাহিনীতে জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এদেশে আজ যন্ত্রের তেমন কোন অভাব না ঘটলেও, সত্যিকারের যন্ত্রীর একান্তই অভাব। আর তা' নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার মত মানুষও বোধহয় আজ আর নেই।

ঘণ্টাদু'য়েক লেট্ ছিল ট্রেন। গাড়ি যখন এসে বর্দ্ধমানের স্টেশন প্লাটফর্মে দাঁড়াল তখন বেলা প্রায় ন'টা। পাশের রিজার্ভ কামরায় রুদ্রর দলের অন্য সবাই। আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত ওদের হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ কানে এসেছে, অথচ আজ সকাল থেকে তেমন সাড়াশব্দ নেই। বোধহয় ওদের মধ্যে অনেকেই এখনও ঘুমিয়ে।

নিজের কামরার জানালার কাছে বসে অলস দৃষ্টি মেলে বাইবের দিকে তাকিয়েছিল রুদ্র। এই বর্দ্ধমান সহরেই তার দাদু সোমেশ্বর ভট্টাচার্যের বাড়ি। অনেক দিন দাদুর সঙ্গে তার দেখা নেই। প্রায় মাস ছ'য়েক তো হবেই। অবশ্য মাঝে মধ্যে দু'একটা চিঠি সে লেখে তার দাদুকে। কাঁপা কাঁপা অক্ষরে তার প্রতিটি চিঠিবই জবাব দেন সোমেশ্বর। সেই চিঠির প্রতিটি ছত্রে জেগে ওঠে অশক্ত বৃদ্ধের হাহাকার ধ্বনি। জীবন সায়াহ্নে এসে সেই বৃদ্ধের বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকা অনুশোচনার আগুনের উত্তাপ যেন স্পষ্ট টের পায় তার উত্তর-পুরুষ রুদ্রদেব। তাঁর শেষ চিঠিখানার একটা লাইন এখনও স্পষ্ট মনে আছে রুদ্রর—জানিস দাদুভাই, পুলিশের চাকরিতে আমি প্রথমপুরুষ এককালে অনেক অন্যায় করেছি। ক্ষমতার দম্ভে সেদিন সেই অন্যায়কে অন্যায় বলেই মনে করিনি। দ্বিতীয়পুরুষ তোর বাবার আমার প্রতি আচরণ আজ

আমাকে প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে সেদিনের সেই অন্যায়ের কথা। তোর বাবার কোন দোষ নেই। আমি নিজেই এক ভয়ানক অপরাধী। তাই বোধহয় ভগবান তোকে পাঠিয়েছেন আমার বংশে। তুই তৃতীয়পুরুষ এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এসে ঘাড়ে নিবি সেই অন্যায়ের বোঝা।

চিন্তায় বাধা পড়ে রুদ্রর। পাশের প্ল্যাটফর্মে একখানা আপ লোকাল ট্রেন এসে দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে নেমে পড়ে যাত্রীরা। রাতের পোশাকপরা রুদ্র নিরাসক্ত দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

হঠাৎ একজন যাত্রীর দিকে নজর পড়তেই চমকে ওঠে রুদ্র। রতুকাকু না? হ্যাঁ, তিনিই তো। বর্দ্ধমানে তার দাদুর পাশের বাড়িটি এই রতন চক্রবর্তীর। তার দাদু সোমেশ্বর ছেলের মত ভালোবাসেন তাঁকে। দাদুর এখানে এলে রুদ্র তার এই রতুকাকার সঙ্গে একবার দেখা না করে ফিরতো না। রতন চক্রবর্তীও স্নেহ করেন রুদ্রকে।

রতন চক্রবর্তীর সঙ্গে একটা বড় চটের থলি। থলিটা বোধহয় ভারি। তাই রতন প্ল্যাটফর্মে সেটা রেখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন কুলির খোঁজে।

রুদ্র গাড়ি থেকে নেমে আসে। রতনের পাশে এসে বলে ওঠে, এই সাতসকালে কোত্থেকে ফিরলেন, রতুকাকু?

চমকে উঠে রতন তাকান রুদ্রর দিকে। সহসা মুখখানা তাঁর ম্লান হয়ে ওঠে। বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বললেন, একি তুমি? কবে কলকাতায় ফিরলে?

—এখনও ফিরিনি কাকু, জবাব দেয় রুদ্র। তারপর পাশের গাড়িটা দেখিয়ে আবার বললে, ঐ গাড়িতে এখন ফিরে চলেছি। দাদু কেমন আছেন?

—তোমার দাদু? এক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন রতন। তাঁর ম্লান মুখখানা আরও ম্লান হয়ে ওঠে। ধরা গলায় তিনি জবাব দেন, ভালোর চাইতেও ভালো আছেন তিনি। এখন তিনি সব ভালো মন্দের উর্ধ্বে।

রতন চক্রবর্তীর কথাটা কানে যেতেই একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ তরঙ্গে রুদ্রর মনটা যেন অসাড় হয়ে ওঠে। পাশের ওভার ব্রীজের রেলিংটা না ধরে ফেললে হয়তো সে পড়েই যেত। শূন্য দৃষ্টিতে রতনের দিকে তাকিয়ে সে স্খলিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কি বলছেন, কাকু? দাদু—দাদু নেই?

রুদ্রর পিঠে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকেন রতন চক্রবর্তী, আজ চারদিন হলো তিনি চলে গেছেন।

—বাবা—বাবা কোথায়? নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

—বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে তোমার বাবা এসেছিলেন, এখন এখানেই আছেন। জ্যাঠাবাবু তাঁর একমাত্র পুত্রকে শেষ দেখা দেখতে পেলেও কোন কথা বলতে পারেন নি। সে শক্তি তাঁর ছিল না তখন। তবে অন্তিম মুহূর্তে তিনি বোধহয় তোমাকেই কাছে চাইছিলেন। শেষ শব্দটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—দাদুভাই।

এতক্ষণে রুদ্রর চোখ থেকে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

দৃশ্যটা নিঃসন্দেহে অভিনব। দূর পাল্লার ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর একজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার। আর, একজন পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিচ্ছে তাকে। সেই মুহূর্তে রুদ্র মনে মনে ঠিক করে কলকাতায় না ফিরে সে এখানেই নেমে পড়বে। রুমালে চোখ মুছে রতুকাকুকে কথাটা বলার জন্যে মুখ তুলতেই রুদ্র লক্ষ্য করে প্ল্যাটফর্মে অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ তাকে দেখছে।

একটু লজ্জিত হয় রুদ্র। তাড়াতাড়ি সে রতনকে বললে, আপনি একটু দাঁড়ান কাকু, আমি এখনই আসছি। বলতে বলতে সে ছুটে যায় নিজের কামরার দিকে।

বেজে ওঠে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা। মহাশক্তিধর ইলেকট্রিক ইঞ্জিন সত্যিকারের শক্তিমান পুরুষের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। স্টীম ইঞ্জিনের মত ফুঁসতে ফুঁসতে অহেতুক বীরত্ব প্রকাশ করছে না। গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠতেই প্ল্যাটফর্মের যাত্রীরা গাড়িতে ওঠার জন্যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজের কামরায় রুদ্রও ততক্ষণে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। ছোট স্যুটকেস ও বেডিংটা হাতে নিয়ে সে গাড়ি থেকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে ইঞ্জিনের বাঁশি।

কলকাতার বদলে দলপতিকে বর্দ্ধমানে নেমে যেতে দেখে পাশের কম্পার্টমেন্টে তার দলের সবাই বিস্মিত। ব্যাপার কি? সাহেব এখানে নামলেন কেন?

কামরার জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রুদ্র তাদের উদ্দেশে কেবল বললে, একটু বিশেষ দরকারে এখানেই আমি নেমে গেলাম। আপনারা চলে যান।

রুদ্রর কথাটা শেষ হবার আগেই গাড়িটা স্পীড নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাক্স, বিছানা ও রতুকাকুর সেই থলিটা কুলির মাথায় চাপিয়ে রতন চক্রবর্তী ও রুদ্র এসে দাঁড়ায় গেটের কাছে।

হঠাৎ কোথেকে রেল পুলিশের একজন পোশাক-পরা অফিসার এসে হাজির

হয় সেখানে। পুলিশ সাহেব রুদ্রকে চিনতে পেরে তাকে অভিবাদন করে সে বলে ওঠে, আমাকে চিনতে পারছেন, স্যার? আমি আপনার কাছে কাজ করেছি।

রুদ্র অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বললে, পার্বতীবাবু না? কবে বদলী হয়ে এলেন এখানে?

রুদ্র যে তার নামটি পর্যন্ত বলতে পারবে এতটা সেই অফিসারটি বোধহয় আশা করেনি। জবাব দেয় সে, মাস ছ'য়েক হলো এখানে এসেছি। আপনি কি স্যার ইন্সপেক্শন বাংলোয় উঠবেন?

—না—না, আমি এখানে এসেছি নিজের একটু কাজে। আমার দাদু এখানে থাকেন। কথাটা বলেই সতর্ক হয়ে ওঠে রুদ্র। ভুল হয়েছে তার। এখন আর তার দাদু এখানে থাকেন না। আর কোনদিন থাকবেনও না।

অফিসারটি এবার জিজ্ঞেস করে, আপনার গাড়িটা কোথায়, স্যার?

—না, গাড়ির কোন ব্যবস্থা নেই। হঠাৎ চলে আসতে হলো কিনা, তাই। রুদ্র জবাব দেয়।

—সে কি স্যার, গাড়ি ছাড়া আপনি যাবেন কেমন করে? দু'মিনিট ওয়েট করুন, স্যার। টেলিফোন করে পুলিশ লাইন থেকে আপনাকে গাড়ি আনিয়ে দিচ্ছি।

রুদ্র তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—না, গাড়ির দরকার নেই। সরকারী কাজে যখন আসিনি তখন সরকারী গাড়ির প্রয়োজন নেই। এইটুকু পথ রিক্সাতেই যেতে পারবো।

শেষ পর্যন্ত সেই অফিসারটিই ষ্ট্যাণ্ড থেকে একখানা রিক্সা ডেকে নিয়ে আসে। রিক্সায় উঠতে উঠতে ভাবতে থাকে রুদ্র, এই পার্বতীবাবুর মত অফিসারেরা ছড়িয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যে যারা নাকি সুপীরিয়রদের যে কোনও কাজই হাসিমুখে করে দিতে অভ্যস্ত। হয়তো এটা তারা করে ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখেই। কিন্তু তাতে সাহায্যের মূল্য এতটুকু কমে না। অথচ সুপীরিয়রদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে তাদের 'বার্থ-রাইট' বলেই মনে করে। এই নিয়ে যখন তারা ওদের ওপর চোখ রাঙায় তখনই এই পারস্পরিক মধুর-সম্পর্কের মধ্যে ধরে ফাটল। তেতো হয়ে ওঠে সেই সম্পর্কটুকু।

রতন চক্রবর্তীর সঙ্গে রিক্সায় যেতে যেতে নিজের সেই দাদুর কথাই ভাবতে থাকে রুদ্র। অর্থ পেয়েছিলেন তিনি প্রচুর কিন্তু শান্তি পান নি জীবনে। সবশেষে একটা প্রচণ্ড মনোবেদনা নিয়েই চলে গেলেন তিনি। ভালই হয়েছে।

আরও আগে গেলে ভালো হতো। এমন মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হতো না তাঁকে। সময় সময় ঐ বৃদ্ধের প্রতি জগদীশের আচরণকে একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে করতো রুদ্র। সে বুঝতে পারতো, পিতা-পুত্রের মধ্যে এই সংঘাতের সঙ্গে জড়িয়েছিল নীতি ও আদর্শের প্রশ্ন যা থেকে তার আদর্শবাদী বাবা একচুলও সরে আসতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু তবুও তার মনে হতো পিতার প্রতি পুত্রের একটা দায়িত্ব থেকেই যায় যা যেকোন কারণে পুত্রের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া অনুচিত।

রতন চক্রবর্তী রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে টেলিগ্রাম করার কথাও একবার উঠেছিল, কিন্তু তোমার বাবা রাজি হন নি। বললেন, যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে তুমি সেখানে গিয়েছ তার সঙ্গে এ রাজ্যের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। তোমাকে খবর পাঠিয়ে সেই কাজে বিঘ্ন ঘটানো নাকি ঠিক নয়।

রুদ্র জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। বলতে থাকেন রতন চক্রবর্তী, বলিহারি তোমার বাবার জেদ। শ্রাদ্ধ-শান্তির কথা উঠতেই তোমার বাবা বললেন, ছেলে হিসেবে বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তির দায়িত্ব আমার। আমার সামর্থ্য অনুযায়ীই তা' করবো। বাবার একটি পয়সাও এতে খরচ করবো না। তাঁর পয়সা-কড়ি, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি একটা সেবা প্রতিষ্ঠানকে দান করে দেব। আমি কিম্বা আমার ছেলে এর একটি পয়সাও ভোগ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে তোমার কি মত, রুদ্র? কথাটা জিজ্ঞেস করেই রতন চক্রবর্তী জবাবের আশায় রুদ্রর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এই মুহূর্তে দাদুর পয়সা-কড়ি সম্পর্কে আলোচনা করতে ভালো লাগছিল না রুদ্রর। ম্লান দৃষ্টিতে রতন চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে সে কেবল বললে, আমি আর কি বলবো? বাবা তাঁর বাবার পয়সা-কড়ি সম্পর্কে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

বাড়ির গেটের সামনে রিক্সা থেকে নামতেই রুদ্রর দেখা হয়ে গেল তার বাবা জগদীশের সঙ্গে। জগদীশের অঙ্গে অশৌচের পোশাক, কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি অবিন্যস্ত। মুখখানা গম্ভীর। তবে সেই মুহূর্তে রুদ্রর মনে হলো তার বাবার ঐ গাম্ভীর্যের মধ্যে যেন কেমন এক বেদনার স্পর্শ মিশে রয়েছে।

অশৌচ অবস্থায় প্রণাম করতে নেই। রুদ্র তার বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছল ছল চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকায়। পুত্রের সেই দৃষ্টি জগদীশের অটল গাম্ভীর্যে কিন্তু রেখাপাত করতে পারে না। কোন কথা না বলে তিনি কেবল পুত্রের মাথায় নিজের একটা হাত স্পর্শ করেন।

ঘরে ঢুকে সোমেশ্বরের একখানা ছবির সামনে এসে দাঁড়ায় রুদ্র। চোখ ফেটে জল আসে তার। এই তার সেই দাদু যে নাকি এককালে ঘুষের দায়ে পুলিশের চাকরি খুইয়েছিলেন। এই সেই মানুষটির ছবি যে নাকি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাবার পরিকল্পনা করেও দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দাদুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্রর সেই মুহূর্তে মনে হলো যেন ঐ বৃদ্ধের শেষ জীবনের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। এখনও যেন তার কানে ভেসে আসছে তাঁর সেই হাহাকার ধ্বনি। দাদু সোমেশ্বরের অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করাটা যতখানি সত্য, পরবর্তী জীবনে তাঁর সেই দীর্ঘশ্বাসও ঠিক ততখানি সত্য। এ যেন তার দাদুর একার আর্তনাদ নয়, পঙ্কিলতার আবর্তে ডুবে যাওয়া মনুষ্যগোষ্ঠীর সম্মিলিত আর্ত চিৎকার। এই দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদই মহাবিশ্বের আকাশ বাতাস ফুঁড়ে উর্ধ্বলোকে সেই পরমপিতার রত্নখচিত কক্ষের নিরেট পাথরের দেয়ালে কেবল মাথাকুটে মরছে। পাষাণ দেবতা রয়েছেন মুখ ফিরিয়ে। কিন্তু তাই বলে মানুষ তো আর মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না, কারণ মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ দেবতা নয়।

সকালবেলা ইংরেজি খবরের কাগজখানার ওপর চোখ বুলোতে গিয়েই চমকে ওঠে রুদ্র। এ যে সরকারী দলের এম-এল-এ অলকা মজুমদারের ছবি! কৌতূহলী রুদ্র ছবিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই পাশের খবরটি পড়তে থাকে।

মন্ত্রী হয়েছে অলকা। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল তাকে রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। উপমন্ত্রী না করে সোজাসুজি তাকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করার মধ্যেই অলকা মজুমদারের নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে রুদ্র। এর পরেই হয়তো একদিন তাকে দেওয়া হবে ক্যাবিনেট র‍্যাঙ্ক।

ঘটনাটির মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাজনীতি ক্ষেত্রে অলকা আজ বাস্তবিকই সফল। পার্টির একজন প্রধান মুখপাত্র সে। নিজের ক্ষমতাবলেই

এই অল্প বয়সে সে একজন সফল রাজনৈতিক নেত্রী। রাজ্য বিধানসভায় তর্কবিতর্কের মধ্যে যুক্তিজাল বিস্তার করে যেভাবে সে বিরোধীদলের যুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে তাতে খোদ বিরোধীদলের এম এল-এ'রাও এই মেয়েটির পরিণত ও স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির তারিফ না করে পারে না। বিধানসভার লবিতে বসে তারা এই মেয়েটিকে নিয়েই আলোচনা করে। রূপ ও গুণের এমন চমৎকার সমন্বয় নাকি ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

সুর থেমে গেলেও যেমন তার রেশ থাকে, তেমনি খবরটা পড়ার পরেও ঐ খবরের রেশটুকু নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করতে থাকে রুদ্র। অলকা আজ মন্ত্রী—রাজনৈতিক জীবনে উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অলকার ঐ ছবিটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে রুদ্র। একটু যেন রোগা হয়ে গেছে অলকা। সেদিনের সেই ঢলঢলে মুখখানার ওপর থেকে কমনীয় ভাবটি অনেকটাই আজ অদৃশ্য, আর সেই শূন্যস্থানটি পূরণ হয়েছে অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছাপ দিয়ে। একজোড়া সুন্দর ফ্রেমের চশমার উপস্থিতি ও কানের সেই ইয়ারিং জোড়ার অনুপস্থিতি বেশ খানিকটা গম্ভীর করে তুলেছে তার মুখখানাকে। নাকের বদলে নরুনের মত রূপের লালিত্যর বদলে সে পেয়েছে প্রজ্ঞার স্থায়িত্ব। সরলতার বদলে কুটিলতা, সরসতার বদলে ঊষর। তবে, এই কুটিলতার জন্ম রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে হলেও ঐ ঊষর ভাবটি কিন্তু ঊষর মরুভূমির মত নয়। সেখানে রয়েছে মরূদ্যানের সজীবতার স্পর্শ। সব মিলিয়ে যুবতী অলকা আজ নারী অলকা মজুমদার, ছাত্রী অলকা আজ মন্ত্রী অলকা মজুমদার।

অলকার সেদিনের সেই যুক্তিই বোধহয় ঠিক। পুলিশ অফিসার রুদ্রর জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে হয়তো সে ঠিকই করেছিল সেদিন। নইলে হয়তো তার রাজনৈতিক জীবনের ধারা আজ অন্য খাতে বইতো। হয়তো সে থাকতো অজ্ঞাত কিম্বা অবজ্ঞাত হয়ে। এমনকি তার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব ছিল না। পুলিশ অফিসারের স্ত্রী একটা রাজনৈতিক দলের সার্থক নেত্রী—এমন একটা অবস্থা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য।

সেদিন সকাল আটটায় রুদ্র পুলিশ অফিসে এসে হাজির হতেই জেলার লাইনবাবু ঘরে ঢুকে রুদ্রকে অভিবাদন করে বললে, আজ সকাল দশটায় স্যার, ক্রাইম কনফারেন্স।

—সব ও-সি ও ইন্সপেক্টরদের খবর পাঠানো হয়েছে তো? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

—হ্যাঁ স্যার। লাইনবাবু জবাব দেয়।

—ঠিক আছে, আপনি কাগজপত্র সব রেডি করুন। আর—

কথাটা শেষ না করেই রুদ্র থেমে যায়। লাইনবাবু রুদ্রর পরবর্তী কথাটা শোনার জন্যে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রুদ্র জিজ্ঞেস করে, এডিশনাল সাহেব কি অফিসে এসেছেন?

—হ্যাঁ স্যার, এসেছেন।

—তাঁকে একবার—। কথাটা শেষ না করে আবার থেমে যায় রুদ্র। তারপর বললে, থাক, আপনি এবার যান।

লাইনবাবু বেরিয়ে যেতেই আর্দালি মারফত রুদ্র ডেকে পাঠায় এডিশনাল এস-পি'কে।

প্রকাশ শাস্ত্রী ঘরে ঢুকে রুদ্রকে অভিবাদন করে তার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসতেই রুদ্র প্রকাশের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, ওয়েল মিঃ শাস্ত্রী, আপনার মোটর ভেহিকল্‌স সেক্‌শন কেমন চলছে?

সততায় ঘাটতি থাকলেও প্রকাশ বোকা নয়। এস-পি অফিসে এসেই মোটর ভেহিকল্‌স সেক্‌শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় স্বাভাবিক কারণেই সে বুঝতে পারে যে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কিন্তু কি ধরনের গোলমাল সেটা ধরতে না পেরে সে আমতা আমতা করে জবাব দেয়, ভালই তো চলছে, স্যার। এই তো মাস তিনেক আগে আপনি নিজে ইন্সপেক্‌শন করলেন।

জবাব দেয় রুদ্র, ইয়েস, ইন্সপেক্‌শন করেছি, ভাল রিপোর্টও দিয়েছি। এ সবই আমার মনে আছে। আপনার এম-টি-ও সদানন্দবাবুকে যে কাগজপত্রে ধরবার উপায় নেই তা আমি জানি। লেখাপড়ায় কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকে না তার। চারিদিকে বেশ আঁট-ঘাট বেঁধেই সে কাজে নামে।

রুদ্রর কথায় মনে মনে একটু শঙ্কিত হয় প্রকাশ শাস্ত্রী। জল যে অনেকটা গড়িয়েছে তা' সে এতক্ষণে বুঝতে পারে, কিন্তু ঠিক ঠিক কতটা গড়িয়েছে তা বুঝতে না পারার জন্যেই তার মনের এই শঙ্কা।

এম-টি-ও অর্থাৎ মোটর ট্রান্সপোর্ট অফিসার সদানন্দ বোস মাত্র বছরখানেক হলো এই সেকশনের চার্জ নিয়েছে। পুরানো হুঁদে অফিসার। মোটর ভেহিকল্‌স সেক্‌শন নামক স্বর্ণখনি থেকে কেমন করে স্বর্ণ আহরণ করতে হয় তা সে বিলক্ষণ জানে। গাড়ির মেরামত কারখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করার খাত ধরে সরকারী অর্থের যে বান ডাকে তার একটা মোটা অংশই ঘুরে ফিরে এসে প্রবেশ করে সদানন্দর পকেটে। অবশ্য সবটাই তার একার ভোগে

লাগে না। ঐ সেক্‌শনের প্রায় সবাইকেই কিছু কিছু করে দিতে হয়। তার ওপর আছে স্বয়ং এডিশনাল এস-পি যে নাকি গোটা সেক্‌শনের চার্জে।

ডাইরেক্ট আই-পি-এস অফিসার প্রকাশ শাস্ত্রী নিজের চক্ষুলজ্জাকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেনি এখনও। দারোগা-ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে সোজাসুজি কিছু গ্রহণ করতে এখনও তার বাধে। একথা সদানন্দর বিলক্ষণ জানা আছে বলেই এডিশনাল এস-পি'র ব্যাপারে সে ধরেছে অন্য পথ। প্রকাশ শাস্ত্রীব নিজস্ব মোটর গাড়িখানা কিছুদিন আগে অন্য একটা কারখানায় মেরামত হলো। খরচ পড়লো প্রায় আড়াই হাজার টাকা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, প্রকাশ শাস্ত্রী কিছু টেরই পেল না। সদানন্দই সব ব্যবস্থা করে দিলে। নিজের ঝক্‌ঝকে গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ কেবল মিন্‌মিন্‌ সুরে সদানন্দকে বললে, তাই তো সদানন্দবাবু, এতগুলো টাকা তো এখন দিতে হবে আমাকে। জবাবে চোখে-মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে সদানন্দ বললে, এত তাড়া কিসের, স্যার? যখন হয় দেবেন। সদানন্দর কথার ধরনে প্রকাশ বুঝতে পারলে যে তাকে আর ও-নিয়ে ভাবতেই হবে না। ঘুর পথে সরকারী কোষাগার থেকেই ঐ আড়াই হাজার আসবে।

ধাঁধা—বিচিত্র এই ধাঁধা! পৃথিবীতে ফলের জন্ম আগে, না বীজের জন্ম আগে এই ধাঁধাব মত গোটা দেশে ঘুষের এই অপ্রতিহত গতিও একটা বিরাট ধাঁধা। উঁচুতলার কর্মীরা বলে—নীচুতলার ওরা দেয় বলেই নিই। না দিলে নিতাম না। আমাদের চরিত্রে লোভের বীজ ঢুকিয়ে দেবাব জন্যে তো ওরাই দায়ী। নীচুতলার কর্মীরা বলে—উঁচুতলার ওঁরা নেন বলেই তো দিই। না নিলে দিতাম না। ওঁদের খাঁই মেটাতে গিয়েই তো আমরা অসৎ। দেওয়ার জন্যে নেওয়া, না নেওয়ার জন্যে দেওয়া—এই ধাঁধার জবাব খুঁজতে গিয়েই রুদ্রদেব ভট্টাচার্যর মত মুষ্টিমেয় কিছু অফিসার জীবনভর কেবল অন্ধকারে হাতড়েই বেড়ায়। জবাব আর খুঁজে পায় না, কিম্বা পেলেও তা' নিয়ে তেমন করে মাথা ঘামাবার মত মাথা এদেশে অধিকাংশেরই নেই।

প্রকাশ শাস্ত্রীর মুখে সেই মুহূর্তে যে হাসিটুকু দেখা দিয়েছিল সেটুকু যে তাব সত্যিকারের হাসি নয়, ওটা যে মনের শঙ্কাকে ঢাকবার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় তা' কিন্তু বুঝতে পেরেছিল রুদ্র। কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে বলার উপায় নেই। শত হলেও প্রকাশ তার নিজেব মতই একজন ডাইরেক্ট আই-পি-এস অফিসার। তার সম্পর্কে নানা কথা কানে এলেও সঠিক প্রমাণ হাতে না এলে মুখ ফুটে কিছু বলা চলে না। আর বুদ্ধিমানেরা চিরকালই থাকে ধরা-

ছোঁয়ার বাইরে। তা'ছাড়া আরও একটা কথা—যে প্রমাণে একজন সাধারণ কন্‌স্টেবলের শাস্তি হয়, নিদেন পক্ষে বদলীর আদেশ হয়, সেই প্রমাণে একজন আই-পি-এস'এর বদলী হয় না। শাস্তি তো দূরের কথা। বিচিত্র এই নিয়ম। আমাদের দেশে এই নিয়মের সৃষ্টি হয়েছিল বোধহয় সেকালের সেই মানসিকতা থেকে যখন মানুষ বড়র কাছ থেকে ছোটর মত আচরণ প্রত্যাশা করতো না, যখন চালু হয়েছিল সেই কথাটা – কিং ক্যান্‌ ডু নো রং।

কিন্তু এখন আর ওসব কথা খাটে না। রাজা-প্রজা সবই এখন একাকার। কাঙালের ধন চুরি করতে এখন রাজার হস্তই বেশি সক্রিয়। গোটা দেশের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি স্তরেই আজ ঘুণ ধরেছে। অর্থ-লালসার এক সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা। ছোট-বড় সবাই সমান। এ এক বিচিত্র মাৎস্যন্যায়। নীচুস্তরের কর্মীরা চষে বেড়াচ্ছে আপন আপন এলাকা। বাড়িয়ে চলছে গোপন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। উঁচুস্তরের দিক্‌পালেরা মদৎ দিচ্ছে তাতে। অযোগ্যকে যোগ্য স্থানে বসিয়ে, অক্ষমকে সক্ষম ঘোষণা করে, অপদার্থকে পদার্থের সার্টিফিকেট দেওয়ার বিনিময়ে পকেটে পুরছে মোটা ভাগের কড়ি। একালে আর সততার মুখোসটুকু পর্যন্ত নেই। সর্বভারতীয় চাকরি। মুরুব্বির জোর থাকলে গায়ে হাত দেবে কে? পুলিশী প্রশাসন রসাতলে গেল তো বয়েই গেল। জনসাধারণ পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে তো কী যায়-আসে?

ঝি'কে মেরে বৌকে শেখানোর মত রুদ্র গম্ভীর কণ্ঠে প্রকাশ শাস্ত্রীকে বললে, শুনুন মিঃ শাস্ত্রী, সদানন্দ সম্পর্কে যেসব কথা আমার কানে আসছে সেগুলোকে স্রেফ কান-ভাঙ্গানী বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ঠগ বাছতে হয়তো গাঁ উজাড় হবে, কিন্তু তাই বলে ঠগ বাছাই বন্ধ করা যায় না। এম-টি সেক্‌শানে কাকে আনবো তা' এখনও ঠিক করি নি, বাট্‌ সদানন্দ মাস্ট্‌ গো। তাকে এখান থেকে বদলী করবোই।

জেলার এম-টি সেক্‌শন থেকে সদানন্দর এমনিভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া সদানন্দর নিজের চাইতে প্রকাশ শাস্ত্রীরই বোধহয় বেশি ক্ষতির কারণ। তাই এ্যাডিশনাল এস-পি প্রকাশ নিজের সাধুতা প্রমাণ করতে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, ইয়েস স্যার, আপনার কানে যখন কিছু এসেছে তখন তার মধ্যে কিছু সত্যি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু—

—কিন্তু কি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে তাকায় রুদ্র।

আমতা আমতা করে জবাব দেয় প্রকাশ, কিন্তু স্যার, কেবলমাত্র সন্দেহের

ওপর নির্ভর করে এভাবে হঠাৎ বদলী —

জবাব দেয় রুদ্র, অসততাব ব্যাপারে বদলী করলে হঠাৎ-ই করা উচিত যাতে সে সবকিছু গোছগাছ করে আদায়-উশুল, পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার সুযোগ না পায়। অন্ততঃ আমি নিজে এই মতে বিশ্বাসী।

প্রকাশ জানে এস-পি রুদ্রদেব যখন মনে মনে একটা কিছু ঠিক করে তখন তাকে তা' থেকে বিচ্যুত করা প্রায় অসাধ্য। তবুও চেষ্টা করে দেখতে গিয়ে সে আবার বললে, আফ্‌টার অল, এটা কেবল সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নয়। কোন ডাইরেক্ট প্রমাণ সম্ভবত আপনি পান নি, স্যার।

প্রকাশের কথায় এবার হেসে ওঠে রুদ্র। হাসতে হাসতে বললে, আপনি কি আশা করেন কেউ যেচে এগিয়ে এসে আমার হাতে সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে দিয়ে যাবে? আমাদের দেশে তা' হয় না। যা-ও বা হয় তা-ও হয় কারুর নিজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে নয়। সেসব দেখতে হলে যেতে হয় বিদেশে যেখানে প্রথম এবং প্রধান কথাই হলো — পাবলিক ইণ্টারেস্ট। আর আমাদের দেশের সর্বপ্রধান কথাটা হচ্ছে — সেলফ ইণ্টারেস্ট।

সদানন্দর পক্ষে শেষ তদ্বির করতে গিয়ে প্রকাশ শাস্ত্রী আবার বললে, এই একটা বছর ধরে ওর কাজ তো আমি দেখছি স্যার, কাজ কর্মে কিন্তু লোকটা সত্যিই এফিসিয়াণ্ট।

— তাই তো হয়, মিঃ শাস্ত্রী, বলে ওঠে রুদ্র, কর্মনৈপুণ্য যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে সাধারণতঃ ন্যায় অন্যায় সব ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করে থাকে। মনুষ্য-সমাজের এটাই তো একটা মস্ত ট্র্যাজেডি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অসৎ মানুষটি সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান। ন্যায়ের ক্ষেত্রে দারুণ এফিসিয়াণ্ট, আর অন্যায় সম্পর্কে মোস্ট ইন-এফিসিয়াণ্ট — এরকম মানুষ বাস্তবিকই মুষ্টিমেয়। আমাদের দেশের প্রশাসনে বিশেষ করে এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে সেই মুষ্টিমেয়দেরই খুঁজে পেতে এনে বসানো উচিত।

প্রকাশ শাস্ত্রী আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। রুদ্র একটা ফাইল খুলতে খুলতে আলোচনায় ইতি টেনে দেবার ভঙ্গি করে বললে, আমাদের দেশেব এই বিষাক্ত পরিবেশে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের কাছ থেকে যে বিশেষ কিছু আশা করা চলে না সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও বলতে হচ্ছে যে জেলার এম-টি সেক্‌শনের মত সরকারী অর্থব্যয়ের একটা প্রধান স্রোতের মুখে লাগানো লক্-গেটের চাবিটি যার হাতে থাকবে সেই এম-টি-ও'কে হতে হবে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। কাজেই আপনাদের সদানন্দবাবুকে এখান থেকে

যেতেই হবে। খ্যাট ইজ মাই ফাইন্যাল ডিসিসন।

রুদ্রর মুখে সদানন্দর নামের আগে 'আপনাদের' কথায় আবার একটু চমকে ওঠে প্রকাশ শাস্ত্রী। এস-পি'র মুখে এটা কেবল কথার কথা, না এটা কোন বিশেষ অর্থ বহন করছে তা বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে চিন্তিত মুখে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে অবশ্য নিয়মমত রুদ্রকে অভিবাদন করে যেতে ভোলে না।

ক্রাইম কন্‌ফারেন্স। পুলিশমহলে জেলার এই মাসিক কন্‌ফারেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। গোটা জেলার আইন-শৃংখলা ও মামলা-মোকর্দমার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে জেলার পুলিশ সাহেব নিম্নতম কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাদের নির্দেশ দেন। কাজ কর্মে গাফিলতি দেখলে ভর্ৎসনা করেন, নৈপুণ্যে বাহবা দেন।

একটা মহকুমা থানার ইন-চার্জ বীরেন চন্দ্রকে উদ্দেশ করে রুদ্র বললে, ওয়েল বীরেনবাবু, আপনার এলাকার খবর তো মোটেই ভালো নয়। এক সপ্তাহে পর পর তিনটা রাহাজানির কেস হলো, দশ-বারোজন লোককে এ্যারেস্ট করলেন। কিন্তু আসল কাল্‌প্রিটদের একটাকেও ধরতে পারলেন না। আসল ক্রিমিন্যালেরা যদি এমনিভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায় তা'হলে এমনি লোক দেখানো এ্যারেস্ট করে নিরীহ লোকদের হয়বাণি করার অর্থ কি?

জবাবে বীরেন আমতা আমতা করে বললে, না স্যার, যাদের এ্যারেস্ট করা হয়েছে তারা মোটেই নিরীহ লোক নয়। ওদের প্রায় সব ক'টাই ক্রিমিন্যাল।

—ওরাই যে ঐ রাহাজানির ঘটনাগুলোর জন্যে দায়ী তার কিছু প্রমাণ পেয়েছেন?

—না স্যার, তেমন কোন প্রমাণ এখনও হাতে আসে নি। তবে—

—আমি জানি তেমন প্রমাণ আপনার হাতে আসবেও না। কারণ ওরা ক্রিমিন্যাল হলেও এই ঘটনাগুলোর জন্যে যে ওরা দায়ী নয় তা আপনিও জানেন। আমার কাছে খবর আছে যারা এর জন্যে দায়ী সেই পল্টু সরকারের দলটি নাকি এখনও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলুন, ঠিক কিনা?

বীরেন কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। পুলিশ সাহেব কোন্ সোর্সে খবর পেয়েছেন তা' সে জানে না। তবে খবরটা তাঁর মিথ্যে নয় মোটেই। পল্টু ইদানীং একটা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলে ঢুকে পড়েছে। তাই তার দল সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হলে খুব সন্তর্পণে এগোনো প্রয়োজন।

ওদের এ্যারেস্ট করতে গিয়ে যদি কোন বড় রকমের ঝঞ্ঝাট বেধে যায় তখন হয়তো এই পুলিশ সাহেবই তাকে ট্যাক্টলেস আখ্যা দেবেন। থানার চাকরি তো শাঁখের করাত, এগোলেও কাটবে, পিছোলেও কাটবে। তা'হলে অফিসারেরা যাবে কোথায়?

বীরেনকে চুপ করে থাকতে দেখে রুদ্র আবার বললে, দেখুন বীরেনবাবু, কোথাও ক্রাইম হলেই যে এলোপাথাড়ি এ্যারেস্ট করতে হবে—এই থিয়োরীতে আমি বিশ্বাসী নই। এতে কেবল জনসাধারণের মধ্যে পুলিশের অক্ষমতাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এতে ডিপার্টমেণ্টের মুখ কখনই উজ্জ্বল হয় না। আমি চাই প্রতিটি এ্যারেস্টের পেছনেই যেন সামান্য হলেও কিছু যুক্তি থাকে। যুক্তিহীন এ্যারেস্ট স্রেফ হয়রাণি ছাড়া আর কিছু নয়। ক্ষমতা আছে বলেই আপনি তা' করতে পারেন না। আমরা যখনই যা কিছু করি না কেন, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ডিপার্টমেণ্টেব কথা মনে রাখা। এর সুনাম দুর্নামের জন্যে আমরা প্রত্যেকেই দায়ী।

রুদ্র থামতেই বীরেন মৃদু কণ্ঠে বললে, আপনি বোধহয় জানেন না স্যার, ঐ পল্টু সরকার একটা রাজনৈতিক দলের সদস্য।

জবাবে রুদ্র বললে, হ্যাঁ জানি। কিন্তু অপরাধী কেবলমাত্র অপরাধী ছাড়া আর কিছু নয়। অপবাধীর রাজনৈতিক রঙ, বিচার করে যারা চলতে চায় আমি সে দলে নেই। আমার এই জেলায় অন্ততঃ তা' হবে না। আমি চাই আইনের শাসন। আপনারাও কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষাবলম্বন করে ব্যবস্থা নেবেন না। ভয় পাবেন না ন্যায়ের পথে চলতে। তবু যদি ভয় পান আইন অনুযায়ী এ্যাক্শন নিতে, তা'হলে আমার লিখিত আদেশ চাইবেন। সব দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে আপনারা নিরপেক্ষভাবে কাজ .করে যাবেন। মনে রাখবেন, আপনাদের প্রত্যেকটি আইনানুগ কাজের পেছনে আমি আছি।

পুলিশ সাহেব রুদ্রদেবের এ্যাপ্রোচটাই যে একটু ভিন্ন ধবনের তা' এতদিনে গোটা জেলার অফিসারেরা টেব পেয়েছে। গোটা দেশের পুলিশ মহলে যে এ্যাপ্রোচটা চালু সেটাকে বলা চলে নিগেটিভ এ্যাপ্রোচ। এই নিগেটিভ এ্যাপ্রোচ সৎ অফিসারদের পর্যন্ত করে তোলে পঙ্গু। কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তারা। কিন্তু রুদ্রর এ্যাপ্রোচ পজেটিভ্। প্রতিটি ক্রাইম কন্ফারেন্সে সে সোজাসুজি অফিসারদের বলে—কেস সাপ্রেস করে, মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকতে গিয়ে আমার কাছে বাহাদুরী পেতে চেষ্টা করবেন না। আমি চাই

প্রতিটি কেস রেকর্ড হবে এবং তার তদন্ত হবে। কেসের সংখ্যা বেশি হলে তার কৈফিয়ত সরকারের কাছে আমি দেব। ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না আপনাদের। এমনকি আপনাদের নিজের নিজের এলাকায় আপনারা ক্রাইম কণ্ট্রোল করতে পারলেন কি পারলেন না তা' দিয়েও আপনাদের আমি বিচার করবো না। আমি কেবল এটুকুই আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করি যে, ক্রাইম যাতে না হয় তার জন্যে নিয়মমত প্রতিটি ব্যবস্থা আপনারা নিখুঁতভাবে গ্রহণ করবেন। আর ক্রাইম হলে ঠিকমত তার তদন্ত করবেন। ব্যস্, এটুকুর বেশি আর কিছু আমি চাই না আপনাদের কাছে। আমি জানি পুলিশের তদন্তের ব্যাপারে 'চান্স' একটা বড় জিনিস। এক্ষেত্রে ভাগ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। একথা মনে রেখেই আমি আপনাদের সি-সি-রোল অর্থাৎ কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল ক্যারেক্টার রোল লিখবো। একে আপনারা মোটেই ভয় পাবেন না। আমি আপনাদের স্পষ্ট আশ্বাস দিচ্ছি যে, ইচ্ছাকৃত অপরাধের কথা ছাড়া আর কিছু আপনাদের সি-সি-রোলে স্থান পাবে না। নির্ভয়ে কাজ করে চলুন। আলস্য ছাড়ুন। কোন অন্যায় উদ্দেশ্য নিয়ে কেস তদন্ত দীর্ঘায়িত করবেন না। সর্বোপরি নিজের ডিপার্টমেন্টকে ভালোবাসুন। এর সুনাম-দুর্নামের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত করুন নিজেকে।

কোন কাজে নিগেটিভ্ এ্যাপ্রোচ যেমন মানুষকে পঙ্গু করে তোলে তেমনি পজেটিভ এ্যাপ্রোচ তাকে করে তোলে অনুপ্রাণিত। প্রতিটি ক্রাইম কন্‌ফারেন্সের শেষে অফিসারেরা যখন চলে যায় নিজ নিজ এলাকায় তখন হয়তো দিনকয়েক তাদের মনে থাকে রুদ্রর কথা। কিন্তু তারপরেই তারা আবার সবকিছু ভুলে গিয়ে গড্ডালিকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। কেউ ইচ্ছা করে দেয়, কেউ বা পারিপার্শ্বিকতার চাপে দিতে বাধ্য হয়। এমনি যে ঘটে কিম্বা ঘটবে তা' রুদ্র নিজেও জানে। তবুও কিন্তু সে হাল ছাড়ে না। পুলিশের মানসিকতার খোঁজে এসে আজ সে এই ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। দেবশিশু মানুষ দেখতে মর্তে নেমে এসে মর্তের মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছে। আর তো তার মুক্তি নেই। স্বর্গের কথা ভুলে গেছে সে। এই মর্তই এখন তার ধ্যান-জ্ঞান, যৌবনের লীলাক্ষেত্র, বার্ধক্যের বারাণসী।

মাঝে মাঝে কিন্তু একটা আশঙ্কায় বুকটা দুলে ওঠে রুদ্রর। পারবে কি সে আলো জ্বালাতে? যতবার সে আলো জ্বালাতে চেষ্টা করছে ততবারই তা' নিবে যাচ্ছে দমকা হাওয়ায়। এই দমকা হাওয়া রোধ করার শক্তি তার কোথায়?

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা আলোর ঝলক জ্বলে উঠেই নিবে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করছে চারিদিক। এই অন্ধকার কেবল আজকের নয়। শত শত বছর ধরে শাসনের নামে যে কুশাসন চলে আসছে এদেশে, অন্যায়ের কণ্ঠরোধের বদলে ন্যায়ের গলায় দড়ি পরাতে এগিয়ে এসেছে যে অত্যাচারীর কালো হাত, তারাই নিজেদের ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে সৃষ্টি করেছে এই অন্ধকার। এখানে আগুন জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা কি এতই সহজ? সেই আগুনেই যে পুড়ে মরার আশঙ্কা।

স্মিতা বৌদি যে কোন্ ধরনের মহিলা, তা' রুদ্র টের পেয়েছিল প্রথম দি তার বাড়িতে এসেই। স্বামীর আদর্শের সঙ্গে একমত না হয়েও যে মহিল তার অনুপস্থিতিতে স্বামীর ছবিকে দেবতাজ্ঞানে ফুল-চন্দন দিয়ে প্রতিদি পুজো করে সে যে ঠিক সাধারণ নয়, এটা বুঝতে তেমন বেগ পেতে হয় নি রুদ্রর।

সংসারে এমন একদল মানুষ থাকে যারা সর্বদাই নিজেদের লুকিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে তাদের বৈশিষ্ট্যটুকু চোখে পড়ে না। কিছুদিন মেলামেশা করলে তবেই টের পাওয়া যায় তাদের চরিত্রের সৌরভ। আর, একবার সেই সৌরভের ঘ্রাণ নাকে এলে তা' আর কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না। বারে বারে ইচ্ছে করে সেই ঘ্রাণ পেতে।

স্মিতাও ঠিক তেমনি একজন মহিলা। জেলার পুলিশ সাহেব রুদ্র ইদানীং সময় পেলেই এসে হাজির হয় স্মিতার বাড়িতে। খানিকক্ষণ থাকে, গল্পগুজব করে স্মিতার সঙ্গে, হৈ-হুল্লোড় করে তুতুনকে নিয়ে, তারপর একসময় চলে যায়। যাবার আগে বৌদির পীড়াপীড়িতে কিছু মুখে না দিয়ে যাবার উপায় থাকে না।

যেদিন রুদ্র খিদে না থাকার অজুহাতে কোনকিছুই খেতে চায় না, সেদিন হয়তো স্মিতা বলে, ঠিক আছে, ঠাকুরপো, দোকানের খাবার আর খেতে হবে না আপনাকে। মোচার ঘণ্ট রেঁধেছি আজ। একটুখানি নিয়ে আসি?

—মোচার ঘণ্ট? চোখ দু'টো চকচক করে ওঠে রুদ্রর।

স্মিতা মুখ টিপে হেসে রান্নাঘরে চলে যায়।

মোচার ঘণ্ট খেতে খেতে রুদ্র একসময় বলে, জানেন বৌদি, এই জিনিসটা আমি খুব ভালোবাসি। বাড়ি গেলে মা এখনও এই মোচার ঘণ্ট রান্না করে খাওয়ান।

তেমনি মুখ টিপে হেসে সুস্মিতা বললে, জানি।

—জানেন? আপনি জানলেন কেমন করে? দীপকদা কি আমার সম্পর্কে এই খবরটাও আপনাকে দিয়েছিল নাকি? কৌতূহলী কণ্ঠে বলে ওঠে রুদ্র।

জবাব দেয় সুস্মিতা, না, তিনি দেন নি। আপনার কাছ থেকেই আমি জেনেছি।

—আমার কাছ থেকে? সেকি, আমি আবার কখন একথা আপনাকে বললাম?

এবার আর মুখ টিপে নয়, খিল খিল করে হেসে ওঠে সুস্মিতা। হাসতে হাসতে বললে, আপনারা কখন কি বলেন তা' কি আপনাদের খেয়াল থাকে? এই ধরুন, আপনার স্ত্রী নবনীতার কথা। তার সব কথাই তো আমি জানি। আপনিই বলেছেন।

বিস্মিত রুদ্র বললে, ওর সম্পর্কে আপনার কাছে যে দু'চারটা কথা বলেছি সেটাই কি সব হলো?

—না, সেটা সব নয়। বাকিটা আমরা আন্দাজ করে নিই।

—আন্দাজ করে?

—হ্যাঁ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। জানেন না যে মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যা নাকি আপনাদের নেই?

খেতে খেতে কৃত্রিম বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে রুদ্র, ওরে বাবা, তাই নাকি?

—হ্যাঁ ঠাকুরপো, তাই, জবাব দেয় সুস্মিতা, নবনীতার সঙ্গে বেশিদিন ঘর করলে আপনিও তা' জানতে পারতেন।

সুস্মিতার কথায় একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে রুদ্র। সুস্মিতা সেটা লক্ষ্য করে হেসে আবার বললে, ওকি ঠাকুরপো, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন কেন? নবনীতার প্রসঙ্গ তুলেছি বলে? বেশ, ওর প্রসঙ্গ না হয় তুলছি না। তাই বলে এ রাজ্যেব নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদারের প্রসঙ্গ তুললেও কি আপনি রাগ করবেন, ঠাকুরপো?

ধরা পড়লে চোরের যে মুখের অবস্থা হয়, রুদ্ররও তখন ঠিক তেমনি অবস্থা। খাওয়া বন্ধ করে সে কিছুক্ষণ হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে সুস্মিতার

দিকে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, এটাও কি আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের খেলা, বৌদি? ওর কথা তো কখনও আপনাকে বলেছি বলে মনে পড়ছে না।

রুদ্রর অবস্থা দেখে একটু জোরে হেসে উঠে স্নিগ্ধা বললে, না ঠাকুরপো। আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কেবল শূন্যস্থানটুকুই পূরণ করতে পারে। কিছু না থাকলে গোটা বাক্যটা তৈরি করতে পারে না। অনেকদিন আগে আপনার দাদার কাছেই কথাটা শুনেছিলাম। আজ কথায় কথায় বলে ফেললাম।

—ও, তাই বুঝি? রুদ্র আর কিছু না বলে কেবল নিঃশব্দে মোচার ঘণ্ট খেতে থাকে।

খাওয়া শেষে রুমালে হাত মুছতে মুছতে রুদ্র একটু ম্লান হেসে স্নিগ্ধাকে বললে, জানেন বৌদি, আমার জীবনে ঐ দু'টো ঘটনা এখন দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

রুদ্রর ম্লান মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে স্নিগ্ধা। সহানুভূতির স্পর্শে তার নিজের চোখ জোড়াও ততক্ষণে ভারি হয়ে উঠেছে। মৃদু ধমকের স্বরে সে বললে, ছিঃ ঠাকুরপো, ওকথা বলতে নেই। অলক মজুমদার দুঃস্বপ্ন হলেও নবনীতা তা' নয়। সে আপনার স্ত্রী—হয়তো বা একটু বেশি অভিমানী স্ত্রী।

একটা মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী স্নিগ্ধা সাধারণ বি-এ, বি-টি। স্কুলে সে ইতিহাস পড়ায়। কিন্তু রুদ্র বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে, যে কোন প্রসঙ্গ নিয়েই সে দু'দণ্ড অনায়াসে আলোচনা করতে পারে। একবারও হোঁচট খায় না কিম্বা এমন কিছু বলে বসে না যাতে তার কোন অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বরঞ্চ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায় যে, প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সে মোটামুটি ওয়াকিবহাল। তবে, প্রথমটায় তাকে আলোচনায় নামানোই মুশকিল। ধরা দিতে চায় না সহসা। সলজ্জ কণ্ঠে বলে, কথা বলার মত কি-ই বা জানি আমি? ইতিহাসের সন-তারিখ-সালের মধ্যেই তো চিরকাল নিজেকে বন্দী করে রেখেছি। এর বাইরে কতটুকু খবর রাখি?

স্নিগ্ধার চরিত্রের এই দিকটা ততদিনে ধরে ফেলেছে রুদ্র। তাই সে পীড়াপীড়ি করে বলে, যতটুকু খবর রাখেন তাই তো ঢের, বৌদি। বলুন না আপনার মতামত, একটু শুনি।

একটু সময় চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটি সম্পর্কে স্নিগ্ধা তার মতামত এমন ভাবে ব্যক্ত করে যা শুনে রুদ্র চমকে না উঠে পারে না। ভাসা ভাসা জ্ঞানে যে এমন মতামত ব্যক্ত করা যায় না তা' সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারে রুদ্র।

মনে মনে চমৎকৃত হয়। এই বিদুষী মহিলার ওপর শ্রদ্ধায় মনটা পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যেখানে পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি থাকে সেখানেই মানুষ আকর্ষণ অনুভব করে। সেই আকর্ষণ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখনই মানুষ ছুটে আসে সেখানে। ইদানীং রুদ্রর অবস্থাও অনেকটা তাই। একটা জেলার পুলিশী প্রশাসনের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। রাতদিন কেবল কাজ আর কাজ। কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই যেন সে জীবনের একটা বেদনাময় অধ্যায়কে ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে একটা ক্লান্তিতে ঘিরে ধরে তাকে। কেমন যেন একটা অবসাদ। মনের তেমনি এক ক্লান্তিকর মুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায় সুস্মিতা বৌদিকে। মনে পড়ে ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে তুতুনকে। সঙ্গে সঙ্গে সে হুকুম দেয় গাড়ি প্রস্তুত রাখতে। অবশেষে এক সময় সে বেরিয়ে পড়ে সুস্মিতা বৌদির বাড়ির উদ্দেশে। ফেরার পথে হয়তো কিছু সরকারী কাজ করে আসে।

ইদানীং রুদ্রর কনস্টেবল ড্রাইভারও চিনে ফেলেছে সুস্মিতাকে। বুঝতে পেরেছে যে ঐ মহিলা পুলিশ সাহেবের কোন এক আত্মীয়া। তাই রুদ্র সহরের ঐ এলাকায় যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেই ড্রাইভার বুঝতে পারে যে ঐ বাড়িতে যেতে হবে তাকে। সুস্মিতার বাড়িটা হয়ে উঠেছে রুদ্রর কর্মব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি দূর করার কেন্দ্র, সুস্মিতা নিজে যেন একটা জীবন্ত লাইব্রেরী, আর ছোট তুতুন যেন একটি সুন্দর ফুল। এই পরিবেশের মধ্যে খানিকক্ষণ কাটিয়ে রুদ্র যখন নিজের বাংলোয় ফিরে আসে তখন সে অনুভব করে যে মনের ক্লান্তি অনেকটাই দূর হয়েছে তার।

তুতুনকে নিয়ে রুদ্রর হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে একদিন সুস্মিতা বলেই ফেলে রুদ্রকে, আচ্ছা ঠাকুরপো, এই মুহূর্তে বাইরের কেউ আপনাকে দেখে ফেললে বিশ্বাস করতেই চাইবে না যে আপনিই এই জেলার এস-পি।

—তাই নাকি? অঙ্গভঙ্গি করে তুতুনকে বাঘের গল্প শোনাতে শোনাতে সহসা ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দেয় রুদ্র।

হেসে সুস্মিতা আবার বললে, মেয়েটাও হয়েছে তেমনি। রাতদিন কেবল কাকু আর কাকু। রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনলেই জানালার কাছে ছুটে গিয়ে দেখে আপনি এলেন কিনা।

রুদ্র তুতুনকে কোলের দিকে টেনে এনে আদর করে বললে, কাকুরও তো ইচ্ছে করে রোজ একটিবার তুতুনসোনাকে দেখে যেতে। কিন্তু কাকুর তেমন সময় কোথায় বৌদি তা'ছাড়া—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় রুদ্র।

—তা'ছাড়া কি, ঠাকুরপো? জিজ্ঞেস করে স্মিতা।

একটু সময় ভেবে নিয়ে রুদ্র জবাব দেয়, তা'ছাড়া, এটাও তো আমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আপনি হচ্ছেন চরমপন্থী একজন বন্দীর স্ত্রী যার স্বামী রয়েছে জেলে। আর আমি এই জেলারই এস-পি। আপনার এখানে বেশি এলে লোকেই বা কী বলবে?

রুদ্রর জবাব শোনাব সঙ্গে সঙ্গেই স্মিতার মুখখানা গম্ভীব হয়ে ওঠে। কয়েকমুহূর্ত সেখানেই সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাবপর একসময় একটা নিঃশ্বাস চেপে কাজের অছিলায় ঘব ছেড়ে চলে যায়। সেদিন আব তুতুনের সঙ্গে গল্প জমে না রুদ্রর। কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না স্মিতা হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে চলে গেল কেন। সে তো কিছু মিথ্যে বলে নি। তবে কি সে কোন অপ্রিয় সত্য বলে ফেলেছে?

সেদিন যাবার সময় স্মিতা রুদ্রর কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর শান্ত সংযত কণ্ঠে বললে, ওঁব মুখে আপনাব সম্পর্কে অনেক কথাই আমি শুনেছি। আপনার সম্পর্কে প্রসংশায় ও বরাবরই পঞ্চমুখ। পরিচয় হবার পর বুঝলাম ও কিছু বাড়িয়ে বলে নি। আপনি এখানে বদলী হয়ে এসেছেন জেনেও প্রথমটায় ভরসা কবে আপনার সঙ্গে দেখা কবতে যাই নি। কি জানি, আপনি হয়তো ব্যাপাবটা অন্য ভাবে নেবেন। শত হলেও আপনি হচ্ছেন জেলাব পুলিশ সাহেব, আর আমি একজন বন্দীর সামান্যা শিক্ষয়িত্রী স্ত্রী। কিন্তু যেদিন বুঝতে পারলাম আপনি চিন্তা-ভাবনায়, চাল-চলনে খানিকটা ভিন্ন ধরনের, বিশ্বাস করুন ঠাকুরপো, ঠিক সেইদিন থেকেই আপনাকে নিজেদের পরিবাবের একজন বলে ভাবতে শুরু করলাম। কিন্তু এব যে আবও একটা দিক আছে তা' সেদিন সত্যিই খেয়াল করি নি। আজ আপনার কথায় বুঝতে পারছি আপনাকে এখানে আসতে বলাও যেমন আমার পক্ষে উচিত নয়, আপনার পক্ষেও তেমনি যখন-তখন এখানে আসা সম্ভব নয়। তাই, ভেবে ঠিক করলাম আর কখনও আপনাকে এখানে আসার জন্যে পীড়াপীড়ি করবো না, ঠাকুরপো। আপনার অফিসিয়াল স্ট্যাটাস বজায় রেখে মাঝে মধ্যে যদি কখনও এদিকে আসেন তা'হলেই খুশি থাকবো।

স্মিতা থামতেই রুদ্র কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। কি জবাব দেবে সহসা বুঝতে পাবে না। অবশেষে ম্লান কণ্ঠে বললে, আমার কথায় আপনি যে দুঃখ পাবেন তা' আমি বুঝতে পারি নি, বৌদি। অতশত ভেবেও আমি বলি নি কথাটা।

রুদ্র একটু থামে। তারপর ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে আবার বললে, মাঝে-মধ্যে এখানে এলে আপনি হয়তো খুশি থাকবেন বৌদি, কিন্তু তুতুনসোনা তো তা' শুনবে না। কাজেই সময় পেলেই আমাকে ছুটে আসতে হবে এখানে। আপনি না চাইলেও আসতে হবে। তাতে যে যা ভাবে, ভাবুক।

কথাটা বলেই আর সেখানে দাঁড়ায় না রুদ্র। সোজা এগিয়ে যায় নিজের গাড়ির দিকে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখে জানালার গরাদের ফাঁকে হাত বাড়িয়ে ছোট্ট তুতুন তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে বলছে—আবার কিন্তু এসো, কাকু।

শাসন শব্দটির সঙ্গে ভালোবাসা নামক শব্দটির একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভালোবাসাহীন শাসন অত্যাচারের নামান্তর। বিশেষ করে পুলিশী প্রশাসনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আইন-ভঙ্গকারীকে শাসন করবার নৈতিক অধিকার পুলিশের তখনই জন্মে যখন সে সত্যি সত্যিই জনসাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষী। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে না পারলে তাকে শাসন করার নৈতিক অধিকারও কারুর থাকে না।

এদেশের পুলিশী প্রশাসন যন্ত্রে কিন্তু সেই ভালোবাসা নামক বস্তুটিরই অভাব। জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের আজও কোন আত্মীক যোগাযোগ ঘটেনি, কিম্বা ঘটবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কথা তেমন করে কেউ ভাবেননি। তাই আজ পুলিশ একটা আলাদা গোষ্ঠী। তাই সময় সময় পুলিশী শাসন অত্যাচারের রূপ ধরে দেখা দেয় জনসাধারণের সামনে। শাসন যে করবে তাকে হতে হবে সংযমী। এ দেশের বিরাট পুলিশ বাহিনীব মধ্যে তেমন একজন সংযমী কর্মী খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এদেশে আজও পুলিশ কেবল অত্যাচারেরই প্রতীক নয়, রুক্ষতা ও কর্কশতারও প্রতীক। এর জন্যে তারা নিজেরা যতটা দায়ী, তার চাইতেও বেশি দায়ী এদেশের সমাজ ব্যবস্থা।

মাত্র তিন-চারজন অফিসার নিয়ে ছোট্ট থানা। এর আওতায় একটা গঞ্জ এলাকা থাকায় অপরাধের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। স্বাধীনতার পরে এই এলাকার লোকসংখ্যা চার-পাঁচগুণ বেড়ে গেলেও থানার আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী অফিসারের সংখ্যা মাত্র দু'জন বেড়েছে। কাজেই এলাকার পুলিশী প্রশাসন নিয়ে এই মুষ্টিমেয় অফিসারদের হিমসিম খেতে হয়। আর, তার ফলে

এলাকার রাজনৈতিক দল ও ধনী ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর না করে থানা অফিসার-দের চলে না। সময় সময় বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদলেও তারা নিরুপায়। স্বাধীনতার পর এই দীর্ঘদিন ধরে এলাকার প্রকৃত অপরাধের সংখ্যা ইচ্ছাকৃত-ভাবে কম দেখিয়ে, পয়সাওয়ালার স্বার্থে পয়সাহীনদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সেই সূত্রে নিজেদের জন্য কিছু পয়সা কড়ির ব্যবস্থা করে মোটামুটি পুলিশী প্রশাসন বজায় রাখছিল তারা। কত অফিসার এই থানায় এলো আবার কত গেল, কিন্তু সেই ট্রেডিশন সমানে চলছিল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঝড-ঝাপ্টা সেই ট্রেডিশনে ফাটল ধরাতে পারেনি। এমনকি ইদানীং পুলিশ সাহেব রুদ্রদেবের খোলামেলা হুকুমও তেমন কোন দাগ কাটতে পারেনি এই থানার অফিসার-ইন-চার্জ বিজন হালদারের মনে।

বিজন হালদার নিজে একটু রগচটা ধরনের লোক। মানুষ হিসেবে এমনিতে খারাপ না হলেও, পুলিশী প্রশাসনে যে ধৈর্য ও সংযমের প্রয়োজন তা তার কোনকালেই ছিল না। ফলে, ঘোরতর বিপদের মধ্যে পড়েও সে অনেকবার নেহাত কপালগুণে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন হঠাৎ থানার মধ্যে যে কাণ্ড সে করে বসলো তা' থেকে রেহাই পাবার আর কোন পথই তার খোলা রইলো না।

ডাকাতি মামলার আসামী রহিম শেখ পুলিশকে যথেষ্ট নাকানি-চোবানি খাইয়ে অবশেষে ধরা পড়লো। তার বিরুদ্ধে দু'-দুটো ডাকাতি মামলার অভিযোগ ছাড়া নারী ধর্ষণের অভিযোগও ছিল।

রহিমকে ধরতে পেরে মনে মনে বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল বিজন হালদার। থানায় এসে রহিম কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে রইলো। প্রথমে মিষ্টি কথায়, পরে ভয় দেখিয়েও বিজন রহিমের কাছ থেকে একটি কথাও আদায় করতে পারল না।

এদিকে রহিমের কাছ থেকে কিছু খবর চাই-ই চাই বিজন হালদারের। নিদেনপক্ষে দলের অন্যান্যদের সম্পর্কে কিছু খবর অবশ্যই চাই। কিন্তু হার্ড ক্রিমিন্যাল রহিম শেখ অনমনীয়। একটি কথাও সে বলবে না বিজনকে। মেরে ফেললেও না।

অবশেষে বিজন হালদার চোখ পাকিয়ে বললে, শোন্ রহিম, ধরা যখন পড়েছিস তখন দলের লোকজনের নাম তোকে বলতেই হবে। না বলে তোর কিছুতেই রেহাই নেই। একটু একটু করে তোর গায়ের চামড়া আমি খুলে নেব—এই বলে রাখছি। বিজন হালদারকে তুই এখনও চিনিস না।

রহিম শেখ এতক্ষণ মাথা নীচু করে মেঝেয় উবু হয়ে বসেছিল। বিজনের কথায় মুখ তুলে সে তার দিকে তাকায়। মুখে-চোখে তার ফুটে ওঠে একটা তাচ্ছিল্যের চিহ্ন। সেইদিকে নজর পড়তেই বিজন হালদারের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। একটা নীচুস্তরের ক্রিমিন্যালের কাছ থেকে এমন তাচ্ছিল্য যে অসহ্য। দু'পা এগিয়ে গিয়ে বিজন একহাতে রহিমের ঝাঁকড়া চুলের গোছা চেপে ধরে, আর অন্য হাতে তার গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে থাকে।

স্বীকারোক্তি আদায় করতে অপরাধীকে মারধোর করা বে-আইনী, কিন্তু সময় সময় সেই বে-আইনী কাজও পুলিশকে করতে হয় প্রশাসনের স্বার্থে। তবে, তার মধ্যে প্রয়োজন সংযমের। সংযম হারিয়ে দ্বিতীয় রিপুর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে কোন কাজ করা প্রশাসনের প্রতিনিধি পুলিশের সাজে না। রগচটা প্রকৃতির মানুষ বিজন হালদার কিন্তু তাই করে বসলো। রহিমের সেই তাচ্ছিল্য দৃষ্টি ব্যক্তি বিজনকে আহত করেনি, করেছিল পুলিশ বিজনকে। সেই মুহূর্তে সে হয়ে উঠেছিল গোটা পুলিশ বাহিনীর প্রতিনিধি। ক্রিমিন্যাল রহিম শেখ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিল পুলিশকে অর্থাৎ দেশের প্রশাসনকে। কিন্তু প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ পুলিশকে যে ধৈর্য ধরতে হয়, তাকে যে সংযমী হতে হয় সে কথাটা কিন্তু মনে ছিল না বিজনের।

মার খেয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে উঠেছিল রহিম। তাকিয়ে দেখে, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে থানার অন্য অফিসার ও সেপাইরা। রাগে সে তখন ফুসছিল। এদের সম্মিলিত শক্তির কাছে সে একেবারেই নগণ্য। অথচ একটা কিছু করতেই হবে তাকে। কিন্তু কি করবে বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে সে তাকিয়ে রইলো বিজনেব দিকে। পরক্ষণেই একলাফে বিজনের সামনে এসে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলে।

থুথু তো নয়, ঘৃতাহুতি। মাথার মধ্যে আগুন, আর সেই আগুনে ঘৃতাহুতি। প্রশাসনের স্বার্থে স্বীকারোক্তি আদায় তখন গোণ, মুখ্য বিষয় হয়ে উঠলো অপমান। রহিম শেখ নিদারুণভাবে অপমান করে বসেছে খোদ থানার অফিসার-ইন-চার্জ বিজন হালদারকে।

একজন সেপাইয়ের হাত থেকে একখানা লাঠি নিয়ে রহিমের ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজন হালদার। এলোপাতাড়ি লাঠি চালাতে চালাতে মাটিতে ফেলে দিলে তাকে। মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, ব্যথায় চিৎকার করে চলেছে রহিম, কিন্তু বিজনের সেদিকে খেয়াল নেই। প্রচণ্ড আক্রোশে সে

তখনও সমানে লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে রহিমের ওপর। চোখে তার আগুন, দেহে তার মত্ত হস্তির শক্তি। সেই মুহূর্তে কে ঐ বিজন হালদারকে সতর্ক করে দেবে? কে তাকে বলবে যে তুমি তোমার সীমা ছাড়িয়ে চলেছ? তোমার পক্ষে ধৈর্য হারানো অন্যায়। সুরক্ষিত থানার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে শক্তির প্রয়োগ তুমি করছো, সেই শক্তি তোমাকে দান করেছে এদেশের এই সমাজেরই মানুষ যাদের মধ্যে ঐ রহিম শেখ নিজেও রয়েছে। সংবরণ কর নিজেকে, নইলে ঐ সমাজই আবাব শাস্তি দেবে তোমাকে। প্রশাসনের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থকে এক করে ফেলো না।

থানার বড়বাবুর অবস্থা লক্ষ্য করে উপস্থিত অন্যরা বোধহয় একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। একজন অফিসার এগিয়ে গিয়ে প্রায় জোর করে বিজনেব হাত থেকে লাঠিখানা কেড়ে না নিলে বিজন হালদার বোধহয় রহিম শেখকে সেখানেই মেরে ফেলতো।

রহিম সেদিন থানার চৌহদ্দির মধ্যে না মরলেও পরের দিনই মারা গেল জেলার সদর হাসপাতালে। সম্বিৎ ফিরে আসতেই বিজন বুঝতে পেরেছিল কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। এখন মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। রহিমের অচৈতন্য দেহটাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সদর হাসপাতালে। সঙ্গে গেল পুলিশী রিপোর্ট—গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে রহিম আহত হয়েছে।

শেষরক্ষা কিন্তু তাতেও হলো না। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশেব সঙ্গে বহিমের যে কোনরকম ধস্তাধস্তি হয়নি তার সাক্ষী-সাবুদ যথেষ্টই ছিল। তা'ছাড়া, রহিমের ওপর যখন মার-ধোর চলছিল তখন থানার গেটের সামনে এসে জড়ো হয়েছিল একদল কৌতূহলী জনতা। তারা নিজেদের কানে শুনেছে বহিমের আর্ত চিৎকার।

ময়না তদন্তের পরে মৃতদেহ মর্গে রেখে রহিমের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একদল সোজা চলে এলো পুলিশ সাহেব রুদ্রদেবের কাছে। তাদের সঙ্গে ছিল রহিমের নিজের গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি যাবা রহিমের পাপ কাজকে কোনদিন সমর্থন না করলেও পুলিশের এই নির্মমতাকেও সমর্থন করতে পারে নি। দিন-কাল এখন পাল্টেছে। পুলিশের নির্মমতাকে বরদাস্ত করতে এখন আর কেউ রাজি নয়, এমন কি ক্রিমিন্যালের ওপর হলেও নয়। সেখানে অত্যাচারিতের পরিচয় একান্তই গৌণ। মুখ্য বিষয় পুলিশী অত্যাচার।

নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে রহিমের মৃত্যুকাহিনী শুনে গেল রুদ্র। শুনতে শুনতে

তার কেবলই মনে হচ্ছিল, মানুষ কেমন করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে! থানার ও-সি বিজন হালদার তার গায়ের উর্দি খুলে ফেলে যেদিন জনতার সঙ্গে মিশে যাবে সেদিন কি সে পারবে এমনি নিষ্ঠুরভাবে একটা মানুষকে মেরে ফেলতে? সেই মুহূর্তে রুদ্রর মনে পড়ছিল পাশ্চাত্য জগতের বিখ্যাত দার্শনিক বার্টর‍্যাণ্ড রাসেলের একটি বিখ্যাত উক্তি। পুলিশের অনাচার অত্যাচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—a powerful organisation which, just because it is supposed to enforce the law, has exceptional facilities for acting illegally. সহজভাবে বলা যায়—আইনের প্রয়োগকারী পুলিশের ক্ষমতাই তার নিজের বে-আইনী কার্যকলাপের উৎস।

অভিযোগকারীদের আশ্বাস দিয়ে বিদেয় করে চিন্তায় ডুবে যায় রুদ্র। বিজন হালদারকে সে জানে। জেলার মুষ্টিমেয় সৎ কর্মীদের মধ্যে সে একজন। তবে একটু মাথা-গরম মানুষ। তার পক্ষে একটা ক্রিমিন্যালকে নির্দয়-ভাবে পেটানো অসম্ভব নয়। অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু সেই অনুসন্ধানে যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তখন কি হবে? তখন তো বিজনের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। সেক্ষেত্রে গোটা ডিপার্টমেণ্টের মুখে পড়বে চুন-কালি। এমনিতেই হেয় জেলার পুলিশ প্রশাসন আরও হেয় হবে জনসাধারণের কাছে। পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে এলাকার মানুষেরা। ব্যক্তি বিজন হালদারকে নিয়ে চিন্তা করে না রুদ্র। তার যা হবার হবে। কিন্তু ঐ একটি মানুষের আচরণে গোটা ডিপার্টমেণ্টের এই বাড়তি কলঙ্কটুকুই তার অসহ্য। এই কলঙ্ক থেকে মুক্তিরও কোন উপায় নেই। বিজন হালদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হোক কিম্বা না হোক, পুলিশের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করতেই জনসাধারণ অভ্যস্ত। এমনই সুনাম এদেশের পুলিশ বাহিনীর!

প্রশাসনিক বিচার-বিবেচনার কথা ভাবতে গিয়ে রুদ্রর মনে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নও জেগে ওঠে। একটি মানুষের জীবন—হোক সে ক্রিমিন্যাল, কিন্তু মানুষ তো বটে। সেই জীবন যে নষ্ট করে, তাকে রেহাই দেওয়া কিম্বা তার গুরুত্ব হ্রাস করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। এটাও এক ধরনের সাপ্রেশন, যার বিরুদ্ধে সে বরাবর সোচ্চার।

রুদ্রর একবার মনে হয়, গোটা ব্যাপারটা এডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিলেই বোধহয় ভালো হয়। প্রকাশ যে চরিত্রের মানুষ তাতে সে অনায়াসেই ব্যাপারটা 'ম্যানেজ' করে ফেলতে পারবে। কিন্তু রুদ্র তা' করবে

কেমন করে? জেনে-শুনে এমনি একটা বিষয় প্রকাশের ওপর ছেড়ে দিয়ে সবকিছু 'ম্যানেজ' করাব অর্থই হলো ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বুজে থাকা। রুদ্রর পক্ষে তা' সম্ভব নয়।

অনেক চিন্তা-ভাবনাব পরে রুদ্র ঠিক করে, প্রকাশ নয়, সে নিজেই বিষয়টির এন্‌কোয়াবী করবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সে চরম ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে বিজন হালদারের বিরুদ্ধে।

হলোও ঠিক তাই। থবো এন্‌কোয়ারী করতেই সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়লো। ধরা পডলো বিজন হালদারের মিথ্যাচার। বিজন হালদার তবুও শাক দিয়ে মাছ ঢাকাব চেষ্টা করতেই তাকে ধমকে ওঠে রুদ্রদেব, চুপ করুন, বিজনবাবু। আপনি খুনী—আপনি মার্ডারার। মার্ডার কেস-ই রুজু হবে আপনার বিরুদ্ধে। আপনাকে আমি এই মুহূর্তেই সাস্‌পেণ্ড করলাম। লিখিত আদেশ আগামীকাল পাবেন।

পুলিশ সাহেবের কথার কোন জবাব না দিয়ে বিজন হালদার কেবল কাঁচুমাচু মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খুনের মামলা রুজু হলো বিজন হালদারের বিরুদ্ধে। ভাবনা-চিন্তায় দু'টো মাসের মধ্যেই যেন বিজনের বয়স বেড়ে গেল দশ বছর। মণিহাবা ফণীর মত পুলিশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারিয়ে সে আজ বাস্তবিকই রিক্ত! সেই মুহূর্তে বিজন বোধহয় বুঝতে পারে যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর কোন তফাত নেই তার। যে মুহূর্তে তার গায়ের উর্দি ও কাঁধেব ব্যাজ খসে পড়েছে সেই মুহূর্ত থেকেই সে হয়ে উঠেছে সাধারণ—অতি সাধারণ।

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করা বড়ই শক্ত। আইনেব ফাঁক ফোঁকর তাদেব নখদর্পণে। সেই ফোঁকড় গলে বেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। তা'ছাড়া, আরও আছে—মামলা প্রমাণিত হয় সাক্ষীর সাহায্যে। সেই সাক্ষীদেব করায়ত্ব করা পুলিশের পক্ষে যতটা সহজ, অন্যের পক্ষে ততটা নয়। তার ওপর, পুলিশের বিরুদ্ধে যে তদন্ত করবে সেও তো পুলিশ বিভাগেরই কর্মী। সুষ্ঠু তদন্ত অনেকটা তার মর্জির ওপরই নির্ভর করে।

দুর্ভাগ্য বিজন হালদারের। কোন সুবিধাই সে পেল না। তার মামলার তদন্তের ভার পড়লো একজন ঝানু ইন্সপেক্টবেব ওপর। তার ওপর জেলার এস-পি রুদ্রদেবের কড়া নজর তো আছেই।

জেলার পুলিশ মহলে একটা চাপা গুঞ্জন। তাদের মতে, বিজন হালদারের ব্যাপারে পুলিশ সাহেব যেন একটু বাড়াবাড়ি করে চলেছে। এত কঠোর তার

না হলেও চলতো। একজন অফিসার না হয় একটা অন্যায় করেই ফেলেছে, কিন্তু তাই বলে তাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে?

কথাটা রুদ্রদেবের নিজেরও মনে হয়েছে অনেকবার। জেলার পুলিশ বাহিনীর অধিকর্তা সে। তার বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে বাহিনীর কর্মীদের ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ সবকিছু। এদের কাছ থেকে কাজ পেতে হলে এদের পেছনে দাঁড়াতে হবে। এদের অভয় দিতে হবে। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এরা। জীবনবোধের মূল্য সম্পর্কে এদের সচেতন করে তুলতে হবে। পুলিশ হলেও এরা যে মানুষ, মনুষ্যত্বের অবমাননা যে মানুষের ধর্ম নয়, এই বোধ জাগাতে হবে এদের মনে। আর তার জন্যে চাই সহানুভূতি, প্রয়োজন সহমর্মিতার। বাহিনীর পরিচালক-দেরই নিতে হবে সেই দায়িত্ব।

কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই অন্যায়কে সমর্থন করা নয়, কিম্বা অন্যায়কারী কর্মীর অন্যায় স্খালনে সহায়তা করা নয়। বিজন হালদার ঘোরতর অপরাধী। নরহত্যা করেছে সে। নিষ্ঠুরভাবে একটা জীবনের ওপর ছেদ টেনে দিয়েছে। ব্যক্তি-বর্বরতা পুলিশী-বর্বরতার রূপ ধরে গোটা ডিপার্টমেণ্টকে করেছে কলঙ্কিত। এর শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এক্ষেত্রে রুদ্র বাস্তবিকই কঠোর কঠিন। বাহিনীর মধ্যে যতই কেন না সমালোচনার ঝড় বয়ে যাক্, রুদ্র তার সঙ্কল্প থেকে একচুলও সরে যাবে না।

বিচারে মামলা প্রমাণিত হলো বিজন হালদারের বিরুদ্ধে। দায়রা জজ তাকে চার বছরের মেয়াদে জেলে পাঠালেন। চাকরি থেকে বরখাস্ত হলো বিজন হালদার।

মামলার রায় শোনার পর থেকে কেমন যেন এক অস্বস্তিতে পেয়ে বসলো রুদ্রকে। কিন্তু কেন এই অস্বস্তি? অন্যায়কারীর শাস্তি হোক, এই তো সে চেয়েছিল। হয়েছেও তাই। তবে এই অস্বস্তির কারণ কি? তবে কি একটা পরিবারকে অনিশ্চিতের দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে, একটা পরিবারের ছোট ছোট শিশুর মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছে বলে রুদ্রর মনের এই অস্বস্তি? এটাই কি অনুশোচনা? না, অনুশোচনা করার মত কোন কাজ রুদ্র করে নি। বিবেকের সঙ্গে সে লুকোচুরিও খেলে নি। কোনদিন খেলবেও না।

রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে জেলার এস-পি'দের একটা জরুরী কনফারেন্স। বিষয় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। ইদানীং সেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এ নিয়ে বাজেট অধিবেশনে বিধানসভায় ঝড় তুলেছিল বিরোধী পক্ষ। পুলিশী ব্যর্থতার নজির টেনে সরকার পক্ষকে নাজেহাল করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। সরকার পক্ষের সদস্যরাও চেষ্টা করে-ছিলেন পরিসংখ্যানের সাহায্যে পুলিশী সাফল্য প্রমাণ করতে। অবশ্য সরকার পক্ষেরও কেউ কেউ পুলিশের সমালোচনায় বিরোধী পক্ষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নিজের দলকেই বেকায়দায় ফেলেছিলেন।

রুটিন—একালে সবকিছুই রুটিনের ছকে বাঁধা। এমনকি রাজনীতিও রয়েছে রুটিনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সেকালে রাজনীতি ছিল নেশা, তাই সাধারণের ভালোমন্দের বিচার তাঁরা আন্তরিক ভাবেই করতেন। আর একালে রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পেশা, তাই আন্তরিকতার বদলে হয়ে উঠেছে রুটিন সর্বস্ব। একালে রাজনৈতিক নেতারা যা ভাবেন তা বলেন না, যা বলেন তা করেন না। কথার চাকচিক্যে তাঁরা জনগণকে মূর্খের স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে হাসেন। তাই তো, পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজকের সরকার পক্ষ আগামীকাল বিরোধী আসনে বসেই প্রশাসন তথা পুলিশের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে মেতে ওঠেন। আবার আগামী পরশু সরকারী আসনে বসেই গঙ্গাজল দিয়ে মুখ ধুয়ে পুলিশী নৈপুণ্যের খোঁজ-খবর করেন। এটাই রুটিন। এটাই করতে হয়। জনগণের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁদের নেই। ওঁদের কাছে পুলিশী প্রশাসন যন্ত্র যেন একটি ঢোলের বাঁয়া। যেমনি ইচ্ছে তেমনিভাবে চাটি মেরে ইচ্ছেমত বোল তোল। ঢোলের সাধ্য নেই যে প্রতিবাদ করে।

বেলা এগারোটায় কনফারেন্স শুরু। পৌনে এগারোটা নাগাদ রুদ্রর সরকারী জিপ এসে দাঁড়ায় রাইটার্সের ভি-আই-পি পোর্টিকোর সামনে। ইউনিফর্ম পরা রুদ্র জিপ থেকে নেমে দাঁড়াতেই আর একখানা জিপ এসে দাঁড়ায় তার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জিপ থেকে ভেসে ওঠে একটা কণ্ঠস্বর—

হ্যালো ভট্চায, কেমন আছো ?

রুদ্র ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই তার চোখে পড়ে ইউনিফর্ম পরা মধ্যপ্রদেশের সেই মায়ারাম হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মায়ারামের চোখমুখে বেশ একটা গর্বমিশ্রিত তৃপ্তির চিহ্ন।

তৃপ্ত হবারই কথা। রুদ্রর ব্যাচের আই-পি-এস অফিসারদের মধ্যে অন্যান্য রাজ্যে এতদিনে অনেকেই জেলার চার্জ পেয়েছে। রুদ্র নিজে তো পেয়েছে অনেক দিন আগেই। এরাজ্যে তার সতীর্থ একমাত্র মায়ারামই এতদিন তা' পায়নি। দু' তিনটি জেলায় এডিশনাল এস-পি থাকা অবস্থায় যে সুনাম সে কুড়িয়েছিল তাতে কর্তৃপক্ষ তার হাতে জেলার চার্জ ছেড়ে না দিয়ে ভালই করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে হঠাৎ একজন মুরুব্বি জুটিয়ে ফেললে করিৎকর্মা মায়ারাম।

এদেশে মুরুব্বির জোরে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। একজন অপদার্থ ব্যক্তির চরিত্র রাতারাতি পদার্থে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, অসৎ হয়ে উঠতে পারে সততার প্রতীক। এমনকি, মুরুব্বির জোর থাকলে সত্যিকারের সৎ ও কর্মঠকে ডিঙিয়ে যেতেও তেমন কোন বেগ পেতে হয় না—এমনই মহিমা এই মুরুব্বির !

খোদ দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে তেমন একজন মুরুব্বি জুটে যেতেই সবকিছু যেন ভোজবাজির মত ওলট-পালট হয়ে গেল। মায়ারামের পথ-আটকানো ভারি পাথরখানা কোন্ এক ভৌতিক প্রক্রিয়ায় গড় গড় করে সরে গিয়ে মায়ারামের জয়যাত্রায় পথকে সুগম করে তুললে। অবশেষে একদিন মায়ারামের হাতে এসে পৌছালো সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সরকারী হুকুমনামা—গভর্নর ইজ প্লিজড টু এ্যাপয়েন্ট ইউ এ্যাজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ ইত্যাদি। আনন্দে উৎফুল্ল মায়ারাম সেই মুহূর্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো মুরুব্বি দেবতাকে।

অনেকদিন পরে মায়ারামকে দেখে রুদ্র বাস্তবিকই খুশি হয়ে ওঠে। দু' পা এগিয়ে গিয়ে মায়ারামের হাতে হাত মিলিয়ে সে বললে, কন্‌গ্রাচুলেশন মায়ারাম। কেমন চলছে তোমার ?

হাসিমুখে মায়ারাম জবাব দেয়, ফাইন্—ভালো আছি, ভট্চায। নর্থ বেঙ্গল বলেই যা একটু অসুবিধা, নইলে জেলাটা বাস্তবিকই পীসফুল। তোমাদের এই হুগলী-হাওড়ার মত এত ঝুট-ঝামেলা নেই।

—তা যা বলেছ, জবাব দেয় রুদ্র, তুমি হচ্ছো গিয়ে মধ্যপ্রদেশের মানুষ। তোমার কাছে নর্থ বেঙ্গলও যা সাউথ বেঙ্গলও তাই।

কথা বলতে বলতে দুই জেলার দুই পুলিশ সাহেব ভি-আই-পি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে থাকে। রুদ্রর কথার জবাবে মায়ারাম বললে, ইয়েস, ছাট্‌স রাইট, ভট্‌চায। তবে কি জানো, কলকাতার কাছাকাছি থাকবার চার্ম-ই আলাদা। চাকরি করতে এসেছি বলে জীবনের এনজয়মেণ্টগুলোকে তো আর বাক্সবন্দী করে রাখতে পারি না। আর তা' করতে গেলে কলকাতার মত আইডিয়াল প্লেস আর নেই।

মায়ারামের কথায় রুদ্র কেবল মনে মনে একটু হাসে। সেই মুহূর্তে মায়ারামকে তার বলতে ইচ্ছে হয়, আর কত এনজয় করবে মায়ারাম? শুনতে পাই সন্ধ্যের পরে তুমি নাকি আর প্রকৃতিস্থ থাকো না। খাঁটি বিলিতির লোভে চা বাগানের সাহেব সুবোদের বাংলোয় প্রায়ই নাকি তোমার যাতায়াত। এডিশনাল অবস্থায়ই তোমাব সুনামে গোটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে যেসব হোটেল-মোটেল আছে সেখানে প্রায় প্রতি রাতেই নাকি নিত্য নতুন নারীর সাহচর্য লাভ করে থাকো তুমি। তোমার সুনজরে থেকে দু'হাতে লুঠপাট চালাবার লোভে এসব ব্যবস্থাপনার ভার থাকে সেই সব নিম্নস্তরের কর্মীদের ওপর যারা নাকি তোমাব মনোরঞ্জনের জন্যে যে কোন ধরনের কাজ করতেই সর্বদা প্রস্তুত। এমনকি কেউ কেউ নাকি এসব ব্যাপারে আপন-পর পর্যন্ত ভেদাভেদ করে না। এরপরে আরও এনজয়মেণ্ট চাই তোমার? তবে হ্যাঁ, করিৎকর্মা লোক বটে তুমি। জেলার পুলিশী প্রশাসন এখন তোমার হাতে। রাজনৈতিক কর্তাদের নেকনজরে যদি একবার পড়তে পারো তা'হলে তুমিই একদিন হয়ে উঠবে একজন সাচ্চা কর্মঠ প্রশাসক। সেদিন তোমার ঐ দোষ ত্রুটি নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাবে না। নিজের চারিত্রিক শৃঙ্খলাহীনতায় দেশের বিশেষ করে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের যে ক্ষতি তুমি করে চলেছো তাকে কেউ ক্ষতি বলেই মনে করবে না। বড জোর এটাকে তখন বলা হবে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত চরিত্রই যে সর্বপ্রধান, এর ছাপ যে গোটা প্রশাসন যন্ত্রের ওপর পড়ে সে বোধ একালের ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতাদের নেই। কাজেই মাভৈ, মায়ারাম! চালিয়ে যাও। পুলিশী ক্ষমতার জোরে জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করে নাও। চতুর্বর্গ লাভের এই তো মস্ত সুযোগ।

রুদ্র মুখে কেবল বললে, তুমি তো ইচ্ছে করলেই খোদ কলকাতায় চলে আসতে পারো। শুনছি, এই ডিসেম্বরেই নাকি কলকাতা থেকে দু'জন ডি-সি'র বদলী হচ্ছে।

—হ্যাঁ, খবরটা আমিও শুনেছি, জবাব দেয় মায়ারাম, দেখা যাক কি হয়।

রাইটার্সে ঢুকেই যে খবরটা রুদ্রর কানে আসে তাতে প্রথমটায় একটু বিব্রত বোধ করে সে। জেলার পুলিশ সাহেবদের সঙ্গে আই-জি-পি'র কন্‌ফারেন্স হলেও এতে নাকি স্বরাষ্ট্র সচিব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার বদলে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী অলকা মজুমদার।

অন্যমনস্ক রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মায়ারাম হাসিমুখে বলে ওঠে, লুক্ ভট্‌চায, উই আর রিয়েলি লাকি।

রুদ্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়ারামের দিকে তাকাতেই মায়ারাম তেমনি মুখ টিপে হেসে আবার বললে, খবরের কাগজে ভদ্রমহিলার ছবি দেখেছি। সী ইজ এ বিউটিফুল লেডী। আজ চাক্ষুষ দেখবো তাকে।

একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মায়ারাম—এর মধ্যে অশালীনতার কিছু নেই। কিন্তু তবুও সেই মুহূর্তে মায়ারামের কথাটা যেন ভালো লাগে না রুদ্রর। তাই সে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। কৌতূহল তার নিজেরও কম নয়। অনেকদিন পরে আজ দেখা হবে অলকার সঙ্গে। তার এককালের কল্পলোকের অপ্সরী অলকা যে নাকি একদিন তার মনটাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে তার হৃদয়রাজ্যে বিচরণ করতো।

রাইটার্সের রোটাণ্ডায় সার বেঁধে বসে আছে জেলার পুলিশ সাহেবরা। পরনে তাদের ফুল ইউনিফর্ম। গোটা রাজ্যের পুলিশী প্রশাসনের আসল স্তম্ভ এরাই। এদের পরিচালন দক্ষতার ওপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে এই বিভাগের সুনাম। জনাকয়েক রেঞ্জ ডি-আই-জি'ও কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত।

একটু পরেই রাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন আই-জি-পি। পুলিশ অফিসারেরা দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন করেন তাঁদের। মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা টেনে হাত জোড় করে সবাইকে প্রতিনমস্কার জানায় অলকা।

অলকার পরনে সবুজ পাড়ওয়ালা সাদা খোলের শাড়ি, গায়েও সাদা ব্লাউজ। যেমন-তেমন ভাবে বাঁধা চুলের খোঁপাটা পেছনদিকে হেলে পড়েছে। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই মুখে। কানের লতির সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে লাল পাথর সেট্ করা সোনার দু'টি ফুল। সোনার অলঙ্কার বলতে কেবল ঐটুকুই। গলা ও হাত খালি। বাঁ হাতের মণিবন্ধে কেবল একটি জেন্ট্‌স সাইজের রিস্ট্‌ওয়াচ।

অলকাকে মাঝখানে বসিয়ে তার দু'পাশে স্বরাষ্ট্রসচিব ও আই-জি-পি

আসন গ্রহণ করেন। তাঁদের সামনে একটি বড় টেবিল। শুরু হয় কন্‌ফারেন্স।

প্রথমেই উঠে দাঁড়ান আই-জি-পি। কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলতে শুরু করেন তিনি। আলোচনার বিষয়-বস্তু সম্পর্কিত সাইক্লোস্টাইল করা কাগজ-পত্র আগেই বিতরণ করা হয়েছিল। রুদ্র লক্ষ্য করে, অলকা মুখ নীচু করে তেমনি একখানা কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। বয়সের খানিকটা ছাপ পড়লেও অলকার মুখখানা আগের মতই কমনীয়। গালের একপাশে সেই ছোট্ট তিলটি পর্যন্ত তেমনি স্পষ্ট। শুভ্র বেশবাস ও কালো ফ্রেমের চশমা তার মুখের কমনীয়তার ওপর আরোপ করেছে এমন এক গাম্ভীর্য যাকে সম্ভ্রম না করে পারা যায় না। কুমারী অলকা মজুমদারের রূপ ও মন্ত্রী অলকা মজুমদারের পদগৌরব সম্পর্কে সচেতনতা একসঙ্গে মিশে গিয়ে তার সারা অবয়বকে করে তুলেছে এমন বৈশিষ্ট্যময় যাকে হালকাভাবে গ্রহণ করা চলে না কিছুতেই।

অলকা যতক্ষণ তার হাতের কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল, রুদ্র ততক্ষণ একদৃষ্টে কেবল দেখছিল তাকে। পুলিশ সাহেবদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তাকিয়েছিল তার দিকে। তাদের মনে হয়তো সাধারণ কৌতূহলের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু রুদ্রর বেলায় কেবল কৌতূহল নয়, তার চাইতে অনেক গভীরভাবে কিছু দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করছিল অলকার দিকে তাকিয়ে। অন্যরা যেখানে অলকাকে দেখছিল চোখ দিয়ে, রুদ্র সেখানে কাজে লাগিয়েছিল তার সেই মনটিকে যে মন একদিন ছাত্রজীবনে অলকাকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুভব করেছিল, যে মন একদিন অলকার প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত হয়েছিল, যে মন একদিন হঠাৎ পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠে নবনীতার হাত ধরে দৃঢ় পায়ে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে তাকে প্ররোচিত করেছিল।

হাতের কাগজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সামনে উপবিষ্ট পুলিশ সাহেবদের দিকে তাকায় অলকা। আই-জি-পি তখনও তাঁর বক্তব্য বলে চলেছেন। সহসা রুদ্রর দিকে দৃষ্টি পড়তেই কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে অলকা। রুদ্রর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে থাকে হাতের কাগজটার ওপর। পরক্ষণেই সে আবার মুখ তুলে সরাসরি রুদ্রর দিকে না তাকিয়ে তার পাশের অফিসারটির দিকে তাকায়। রুদ্রর কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অলকা পাশের অফিসারটির দিকে তাকালেও আসলে কিন্তু তাকেই দেখছে।

দৃষ্টির লুকোচুরি কিন্তু বেশিক্ষণ চলে না। একসময় রুদ্র নিজেই এর

অবসান ঘটিয়ে সোজা তাকিয়ে থাকে বক্তৃতারত আই-জি-পি'র দিকে। তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে দৃঢ়তার ছাপ। মনটাকে জোর করে অলকার দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে সে আই-জি-পি'র কথা শুনতে থাকে।

আই-জি-পি'র পরে বলতে ওঠেন স্বরাষ্ট্র সচিব। রাজ্য জুড়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতিতে রাজ্য সরকার যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন তা' স্পষ্ট ফুটে ওঠে তাঁর বক্তব্যে। জেলার পুলিশ সাহেবদের কোন বিশেষ নির্দেশ দানের বদলে তিনি দৃঢ় হাতে বিশৃংখলা দমন করতে আবেদন করেন তাদের কাছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের শান্তির ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রসচিবের কথাগুলো কিন্তু ভালো লাগে রুদ্রর। আই-জি-পি'র বক্তব্যে ডিপার্টমেণ্টের অফিসারদের গাফিলতির কিছু কথা থাকলেও স্বরাষ্ট্রসচিবের কথার মধ্যে কিন্তু তার লেশমাত্রও ছিল না। তার কণ্ঠে কেবল ফুটে উঠেছিল আবেদন—শান্তি-শৃংখলা রক্ষার আবেদন। তিনি যেন সম্পূর্ণ নির্ভর করতে চান জেলার পুলিশী প্রশাসনের কর্ণধার এই এস-পি'দের ওপর, তাদের কর্মদক্ষতা ও শুভবুদ্ধির ওপর।

অবশেষে বলতে ওঠে রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদার। অলকা রাজনৈতিক নেত্রী, সুবক্তা। বক্তৃতা দেওয়া তার পেশা। বিধান সভায় বক্তৃতা দিয়ে সকলের বাহবা কুড়োতে সে সিদ্ধহস্ত। সেই মূলধন নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। একবার চোখাচোখি হয় রুদ্রর সঙ্গে। পরক্ষণেই সে মুখ ঘুরিয়ে অন্যপাশে তাকিয়ে বলতে শুরু করে।

ইংরেজি ভাষার ওপর অলকার চিরকালের দখল। তার ওপর নিজের বলার কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতাও তার যথেষ্ট। স্পষ্ট সুন্দর তার বাচনভঙ্গি।

অলকার কণ্ঠস্বর যতই কেন না মিষ্টি হোক, তার বাচনভঙ্গি যতই কেন না সুন্দর হোক, তার বক্তব্য কিন্তু বেশ কটু ও তিক্ত। দেশের আইন-শৃংখলার এই পরিস্থিতির জন্যে পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ দায়ী করে সে বলতে থাকে—আইন-শৃংখলার এই অবনতি তো হঠাৎ একদিনে ঘটেনি। ধীরে ধীরে একটু একটু করে এই অবনতি ঘটেছে। আপনারা পুলিশী প্রশাসনের উঁচু পদে থেকে এসব এতদিন দেখেও দেখেন নি। বলতে বাধ্য হচ্ছি বলে আমি দুঃখিত যে আপনারা চোখ বুজে আছেন। এই চোখ বুজে থাকাটা আপনাদের ইচ্ছাকৃত কিম্বা অনিচ্ছাকৃত তা' আপনারাই বলতে পারবেন। তবে সরকারের তরফ থেকে আমি কেবল আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে এভাবে সরকারের

ভাবমূর্তিকে নষ্ট করলে সরকার তা' কিছুতেই সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

একমাত্র অলকার কণ্ঠস্বর ছাড়া কক্ষের মধ্যে আর কোন সাড়া শব্দ নেই। পুলিশ কর্তারা নির্বাক হয়ে শুনতে থাকে নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ। আবেগে উত্তেজনায় অলকার কণ্ঠস্বর কখনও উঠছে কখনও নামছে, কখনও বা স্থির হয়ে থাকছে একই পর্দায়।

বলতে থাকে অলকা মজুমদার, রাজ্যের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির খবর আই-জি-পি'র মাধ্যমে আমরা নিয়মিত পেয়ে থাকি। কিন্তু সেটাই সব নয়, আমাদের পার্টির ছেলেদের মাধ্যমেও প্রতিটি জেলার পুলিশী প্রশাসনের খবর আমাদের কাছে আসে। সময় সময় আপনারা যে এ্যাক্শন নেন না, তা' নয়। তবে পুলিশী এ্যাক্শন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় হয় নরুণ দিয়ে নয় তো কুড়ুল দিয়ে ঘাস চাঁছার মত একটা ব্যাপার। তাতে লাভের চাইতে ক্ষতিই হয় বেশি। তার ওপর ডিপার্টমেণ্টের দুর্নীতি তো আছেই। জমির শস্য রক্ষার জন্যে যে বেড়া দেওয়া হয় সেই বেড়াই যদি শস্য খেয়ে ফেলে তা'হলে তার প্রতিকারের উপায় কি ?

মিটিং নয়, কন্‌ফাবেন্স। আলোচনার সুযোগ এখানে রয়েছে। অলকার বক্তব্য শুনতে শুনতে রুদ্রর কেবলই মনে হচ্ছিল বিষয়টির গভীরে প্রবেশ না করে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেই অলকা তার বক্তব্য বলে চলেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ মোটেই মিথ্যে নয়। পুলিশ নিশ্চয়ই এজন্যে দায়ী। তবে সেই সঙ্গে দায়ী আরও অনেকেই। রাষ্ট্রমন্ত্রী কৌশলে সেই অনেকের কথা বাদ দিয়ে কেবল পুলিশের ঘাড়ে সবটুকু দোষ চাপিয়েছে। রুদ্রর আপত্তি এখানেই।

বক্তব্য শেষ করে অলকা বসে পড়ে। পুলিশ কর্তাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। রাইটার্সের চাপরাশীরা সবাইকে চা ও কাজুবাদাম পরিবেশন করে যায়। গুঞ্জন আরও একটু বেড়ে ওঠে। চা পান করতে করতে নীচু কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন স্বরাষ্ট্রসচিব, আই-জি-পি ও রাষ্ট্রমন্ত্রী।

অবশেষে চা পান পর্ব শেষ হতেই আই-জি-পি দাঁড়িয়ে উঠে আবার বললেন, পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যে খানিকটা অবনতি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনারা ডিস্ট্রিক্ট অফিসারেরা পুলিশী প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। আপনারাই এবার বলুন, কেন এমন হচ্ছে ? কি অসুবিধা আপনাদের ? কেন আপনারা এই পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছেন না ?

আই-জি-পি বোধহয় খোলাখুলি আলোচনা চাইছিলেন। কিন্তু এ ধরনের কন্‌ফারেন্সে খোলাখুলি আলোচনায় যে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে সেকথা বোধহয় তাঁর মনে ছিল না। মনের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সত্য অথচ অপ্রিয় কথা বলে ফেলে উপর মহলের বিরাগভাজন হবার চাইতে কিছু না বলে চুপ করে থাকলে অন্ততঃ অহেতুক বিরাগভাজনের সম্ভাবনা থাকে না। এতে এ ধরনের কন্‌ফারেন্সের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু অফিসারেরা নিরুপায়। এযুগে নিষ্কলঙ্ক সার্ভিস রেকর্ড নিয়ে প্রমোশনের সিঁড়ি ডিঙ্গানোই মুখ্য বিষয়। সমস্যার সত্যিকারের সমাধান গৌণ।

উঠে দাঁড়ান একজন ডি-আই-জি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি। রাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনার ধারে কাছে না গিয়েও তিনি পুলিশী ব্যর্থতার জন্যে পুলিশের সংখ্যাল্পতার ওপর জোর দেন। বলেন, দেশের লোকসংখ্যা বেড়েছে। স্বাভাবিক কারণে ক্রাইম ও ক্রিমিন্যালের সংখ্যাও বেড়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় পুলিশ কর্মীর সংখ্যা বাড়েনি। কাজেই থানার ছোট একদল কর্মীর পক্ষে বিরাট এলাকার ক্রাইম ও ক্রিমিন্যালের ওপর সঠিক নজর রাখা সম্ভব হয় না। বাহিনীর কর্মীর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

এর পরে বলতে ওঠে উত্তর বঙ্গের একজন পুলিশ সাহেব। সে বললে অপ্রতুল পুলিশী সাজ সরঞ্জামের কথা। বললে, এযুগের ক্রিমিন্যালেরা যেমন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, তেমনি ব্যবহার করে আধুনিক ট্রান্সপোর্ট। সহর কিম্বা সহরতলী এলাকায় তারা ব্যবহার করে মোটর গাড়ি। ক্রাইম করেই তারা উধাও হয়ে যায়। সেই তুলনায় ক'টা থানায় ক'খানা মোটর-গাড়ি আছে? যাও বা আছে তার ক'খানা চালু আছে? থানার একটিমাত্র গাড়ি কোন কাজে বেরিয়ে গেলে হঠাৎ বেশি প্রয়োজনেও আর একখানা গাড়ি পাওয়া যায় না।

বর্ডার জেলার একজন এস্-পি বললে ওপার থেকে বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর কথা। আর একজন ডি-আই-জি বললেন দেশের বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা।

আলোচনা যখন জোর জমে উঠেছে তখন হঠাৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদার দাঁড়িয়ে উঠে আবার বললে, আপনাদের কথা সব শুনলাম। আপনারা মেন্ অন্ দি স্পট। আপনাদের যুক্তির মধ্যে সারবস্তু নিশ্চয়ই আছে। পুলিশী প্রশাসনের ক্ষেত্রে মেন্ এবং মেটিরিয়াল দু'টোই প্রয়োজনীয়। রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী মেটিরিয়াল সরবরাহ

করা সব সময় সরকারের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না। কিন্তু মেন্ অর্থাৎ বাহিনীর বিরাট কর্মীদল কেন তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে না? কেন তারা অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াচ্ছে না? কেন আপনাদের বিরুদ্ধে অসততা ও ঔদাসীন্যের দুর্নাম? আপনারা জেলার পুলিশী প্রশাসনের কর্তারা যদি এদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন তা'হলে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটতো। আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে—কোন বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ ইলেক্শন প্রভৃতি কাজে পুলিশ যখন এত ব্যস্ত থাকে যে সাধারণ ক্রাইমের দিকে নজর দিতে পারে না, তখন নাকি ক্রাইমের সংখ্যা এমনিই কমে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা এদিকে নজর দেয় সঙ্গে সঙ্গে ক্রাইম বেড়ে ওঠে। কথাটা হয়তো একটা নির্মম ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয়। পুলিশের কর্মক্ষমতা নিয়ে সাধারণ মানুষ হয়তো এই ঠাট্টাটুকু করে। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় তাদের মনোভাব। কাজেই পুলিশী প্রশাসনের ক্ষেত্রে আপনাদের আরও সক্রিয় হতে হবে।

কনুইয়েব ওপর ভর দিয়ে সামনেব দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বসেছিল রুদ্রদেব। আইন-শৃংখলা বক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদাবের এই সমালোচনাকে তার একপেশে মনে হলেও এতক্ষণ সে চুপ করেই ছিল। অলকার বদলে অন্য যে কেউ হলে এতক্ষণে হয়তো সে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী বক্তব্য রাখতো। মন্ত্রীকে সমর্থন করা কিম্বা না করার দিকে ভ্রূক্ষেপ করতো না। কিন্তু অলকার ব্যাপারে সেটা সমীচীন হবে কিনা বুঝতে না পেরেই সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু আর নয়। পুলিশ সম্পর্কে অলকার ঐ উক্তি অসত্য না হলেও অসম্পূর্ণ, তার ঐ ইঙ্গিত মিথ্যে না হলেও একদেশদর্শী। সহসা রুদ্রর মনে পড়ে কবির বাণী—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে।
যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার আদেশে।

উঠে দাঁড়ায় রুদ্র। লক্ষ্য করে, অলকা একবার তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েই মাথা নীচু করে হাতের কাগজপত্রের দিকে নজর দেয়। রুদ্রর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অলকা ইচ্ছে করেই তার দিকে তাকাচ্ছে না। কাগজ-

পত্রের আড়ালে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করলেও কান দু'টো তার খাড়া হয়ে রয়েছে রুদ্রর বক্তব্যের দিকে।

শান্ত সংযত কণ্ঠে রুদ্র বলতে থাকে, আমি বুঝতে পারছি না পুলিশের প্রতি জনসাধারণের ঠাট্টার নামে মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া এইমাত্র যা বললেন তা' তাঁর নিজের বক্তব্য কিনা। ক্রাইমের পরিসংখ্যান একথা বলে, কি বলে না সে প্রশ্নে না গিয়ে আমি তাঁর অবগতির জন্যে স্পষ্ট করেই বলছি যে বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের কার্যকলাপ কোন কোন ব্যক্তির থাকা অসম্ভব নয়। তবে এ ধরনের ঘটনা যে ভূরি ভূরি ঘটে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে এই জাতীয় ব্ল্যাক-শিপের অস্তিত্ব থাকাটা মোটেই বিচিত্র নয়। তাদের কাছে পুলিশের উর্দি হচ্ছে একটা ছাড়পত্র, অনেকটা আদালতের উকিল-মোক্তারদের কালো কোট কিম্বা গাউনের মত। এর সাহায্যেই তারা পুলিশী-ব্যবসা করে তৈরি করে মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। আমাদের যে আরও সক্রিয় হয়ে উঠে এদের নির্মূল করতে হবে, মন্ত্রীর একথার সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একটু চঞ্চলতা দেখা দেয়। খোদ আই-জি-পি পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকেন রুদ্রর দিকে। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে হয়তো নিজেদের দোষ স্বীকার করে মন্ত্রীকে খুশি করার একটা অপ-কৌশল বলেই মনে করে।

একটু থেমে বলতে থাকে রুদ্র, মাননীয়া মন্ত্রীমহোদয়ার গোটা বক্তব্য একত্র করলে এই দাঁড়ায় যে এদেশের পুলিশ বাহিনী অকর্মণ্য ও অপদার্থ। কিন্তু তিনি একবার ভেবে দেখেছেন কি যে সমস্ত দোষ কেবল পুলিশের কাঁধে চাপানো সমীচীন কিনা? ভেবে দেখেছেন কি পুলিশ সত্যি সত্যিই অকর্মণ্য কিম্বা অপদার্থ কিনা? আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে। এদেশের পুলিশ কর্মীরা কোন কালেই অকর্মণ্য ছিল না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার টেক্‌নিক তারা ভালই জানতো। কিন্তু সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেখানে চলছে অবনতির স্রোত, যে দেশে রাজনৈতিক ভণ্ডামী সমাজ-জীবনকে করে তুলেছে কলুষিত সেখানে একা পুলিশের বেলায় উন্নতি আশা করা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। একটা মামলা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করার জন্যে যে পরিমাণ সময় ও সুযোগের প্রয়োজন তা' তার নেই। ইচ্ছে থাকলেও মামলার তদন্তে সে সুবিচার করতে পারে না। তার ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তো আছেই। পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ এ যুগের অসৎ রাজনীতির একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অবশ্য মুখে কেউ

তা' স্বীকার করতে চায় না। এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন কাজ সম্পর্কে একজন কর্মী হয়ে ওঠে উদাসীন। চাকরিটুকু কেবল বজায় রাখাই তখন তার একমাত্র কাজ। তার ওপর, অসৎ পথে উপার্জন করা তো বাড়তি লাভ।

রাইটার্সের রোটাণ্ডায় উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির নজর রুদ্রর দিকে। এমনকি মন্ত্রী অলকা মজুমদারেরও। প্রত্যেকেই মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে পুলিশী ব্যর্থতার এই ব্যাখ্যা।

বলতে থাকে রুদ্র, মানুষ মরণশীল কিম্বা পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ সত্য কথার মত পুলিশের দুর্নীতিও প্রায় তাই। একটি বাচ্চা ছেলেকে জন্মাবধি খারাপ—খারাপ বললে সে একদিন সত্যিই খারাপ হয়ে ওঠে। এদেশের পুলিশও ঠিক তাই। যেদিন সে এই ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করে সেদিন থেকেই সে মনে' মনে ধারণা করে বসে থাকে যে তার গায়ে খারাপের লেবেল আঁটা হয়ে গেল। দেশাত্মবোধ নেই, দেশের মানুষকে ভালোবাসার মত মানসিক গঠনও নেই। তার ওপর সমাজের বিষাক্ত আবহাওয়ায় রাজনীতি-দুর্নীতি সব একাকার। এর মধ্যে পুলিশ নীতিবহির্ভূত কোন কাজ করবে না, তা' কি সম্ভব? তাই মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়ার কাছে আমার অনুরোধ দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে পুলিশী ব্যর্থতার সমালোচনা করার আগে তিনি যেন দয়া করে এই কথাগুলো মনে রাখেন। সমাজের চরিত্র যেদিন পাল্টাবে, পুলিশের চরিত্রও সেদিন পাল্টাতে বাধ্য। সমাজ যেদিন দায়িত্ববোধের পরিচয় দেবে, পুলিশও সেদিন পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মহান্ কর্তব্য সম্পাদন করতে এগিয়ে আসবে। পুলিশ-কর্মীরা এই সমাজেরই মানুষ। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন এই মাৎস্যন্যায় চলবেই। এ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে নিজের আসনে বসে পড়ে রুদ্র। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। অপ্রিয় সত্য কথাগুলো সঠিক অনুধাবন করতে বোধহয় খানিকটা সময় নিচ্ছে সবাই। চিন্তার ছায়া স্বরাষ্ট্র সচিবের মুখে, মন্ত্রী অলকা মজুমদারের মুখ গম্ভীর। আর কিঞ্চিৎ বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে আই-জি-পি'র মুখে।

এর পরে আলোচনা ঠিক না জমলেও কন্‌ফারেন্সের রীতি অনুযায়ী কিছু কাজ শেষ করতে হয়। নিতে হয় কিছু সিদ্ধান্ত। বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিক-দের জন্যে তৈরি করতে হয় একটা ছোটখাটো বিবৃতি। এইসব কাজ যখন চলছিল অলকা কিন্তু সারাক্ষণই চুপ করে ছিল। একটি কথাও বলেনি। রুদ্রর কথার ধাক্কা বিশেষ করে পুলিশী প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ব্যাপার ও

রাজনীতি-দুর্নীতির সহাবস্থান প্রভৃতি কথাগুলো তার মনটাকে বড়ই চঞ্চল করে তুলেছিল। একজন পুলিশী আমলার মুখে এমন স্পষ্ট সমালোচনাকে যেন ঠিক সহ্য করতে পারছিল না সে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্যে কে কতটা দায়ি তাই নিয়েই যেন দেশের সামাজিক তথা রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে পুলিশী প্রশাসনের এক হাত চাপান-উতোর হয়ে গেল। একপক্ষে রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদার, আর অন্যপক্ষে একটা জেলার পুলিশ সাহেব রুদ্রদেব ভট্টাচার্য।

কন্‌ফারেন্স শেষে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে নামতে মায়ারাম রুদ্রকে বললে, আই কন্‌গ্রাচুলেট ইউ, ভট্‌চাজ। কন্‌ফারেন্সে কতগুলো সত্যি কথা বলেছ তুমি। অথরিটির পক্ষে এগুলো হজম করা বাস্তবিকই কঠিন।

ম্লান হেসে রুদ্র জবাব দেয়, সত্য যে চিরকালই কঠিন, মায়ারাম।

রুদ্রদেব একদিন সুস্মিতাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বৌদি, এই যে আমরা দীপকদাকে জেলে পাঠিয়ে আপনাকে অশেষ কষ্টের মধ্যে ফেলেছি এ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ নেই?

মিষ্টি হেসে জবাব দেয় সুস্মিতা, একদিন ছিল, কিন্তু আজ আর নেই।

—কেন নেই? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

একটু সময় চিন্তা করে সুস্মিতা। দেখতে দেখতে তার মুখখানা সামান্য ম্লান হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দেয়, জীবনের অভিজ্ঞতা যতই বাড়ছে ততই বুঝতে পারছি অভিযোগ-অনুযোগ করে কোন সমস্যার সত্যিকারের সমাধান করা যায় না। এই ধরুন আপনার দাদার কথা। ওঁকে ওঁর পথ থেকে সরিয়ে আনতে কি কম অনুযোগ করেছি? চেষ্টারও কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু পেরেছি কি? উনি ওঁর নিজের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে ধরে নিয়ে নিজের পথে চলেছেন। তেমনি দেশের পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনুযোগ-অভিযোগ করেও বা কি লাভ? যা ঘটবার তা' ঘটবেই। ভবিতব্যকে পাল্টানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই এসব অনুযোগ অভিযোগের পাট চুকিয়ে দিয়ে নিজেকে সেই অনিবার্যের হাতে সঁপে দিয়েছি। বিশ্বাস করুন ঠাকুরপো, এতে

কিন্তু মনে অনেক শান্তি পাচ্ছি। বাস্তবিক, একদিন আপনারা আমাদের যথেষ্ট নাজেহালই করেছেন। সেদিন রাগ হতো আপনাদের ওপর। এখন কিন্তু আব তা' হয় না। এখন ভাবি, সেদিন আমি আমার পাওনাই পেয়েছি, আপনাবা তো কেবল উপলক্ষ্য।

রুদ্র বললে, ঈশ্বরের ওপর আপনি এতটা নির্ভরশীল, বৌদি?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় সুস্মিতা, কে বললে আমি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল? যাকে কখনও দেখিনি, যাকে জানি না তার ওপর নির্ভর করে থাকি কেমন করে? নির্ভর যদি করতেই হয় তা'হলে যাকে দেখি, জানি সেই মানুষের ওপর নির্ভর করাই তো ভালো, ঠাকুরপো।

—মানুষের ওপর আপনাব এত বিশ্বাস?

একটু সময় চুপ,করে থেকে জবাব দেয় সুস্মিতা, সেই বিশ্বাস আছে বলেই তো একদিন আপনার দাদার প্রাণ বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলাম আপনার কাছে।

—সেদিন যদি আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিতাম?

—তা'হলে সেটাকেই সেদিন অনিবার্য বলে ধরে নিতাম, ঠাকুরপো। মানুষের ওপর বিশ্বাস আছে বলেই যে আমার ইচ্ছেমত সবকিছু ঘটবে তার তো কোন মানে নেই। অবিশ্বাস করে ইচ্ছাপূরণ হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে নিরাশ হওয়াও ভালো। তাতে বিশ্বাসের মর্যাদাই বাড়ে।

আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে ভাবতে থাকে রুদ্র। সুস্মিতার সঙ্গে যতই সে মিশছে ততই তার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই মহিলার চিন্তা-ভাবনার ধাবাটা বড়ই ভালো লাগে তার। খুবই পরিণত বলে মনে হয়। সেই তুলনায় সে নিজে যেন অনেকটা পিছিয়ে আছে। এমন একজন শক্তিময়ী মহিলাই যখন তাব স্বামীর ওপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তখন তাব দীপকদা নিজে কতটা মানসিক শক্তির অধিকারী তা সে সহজেই অনুমান কবতে পারে। সেই দীপকদাই আজ জেলে বন্দী।

রুদ্র একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে আবাব বললে, জানেন বৌদি, একটা জেলার পুলিশ বাহিনীর কর্তা আমি। বাহিনীর কর্মীদের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটাই নির্ভর কবে আমার ওপর। সেই ইচ্ছা নিয়েই এগিয়ে যাই আমি। ওদেব বিশ্বাস করে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বাবে বারেই তারা আমার সেই বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে আমাকে বিভ্রান্ত কবে তোলে। টলে ওঠে আমার বিশ্বাস। দারুণ দমে যাই আমি। বুঝতে পারি না কেন এমন হয়। আমি তো ওদের ওপর নির্ভর করতেই চাই কিন্তু ওরা

কেন তা' বোঝে না ? বলতে বলতে রুদ্রর মুখখানা বাস্তবিকই ম্লান হয়ে ওঠে।

রুদ্রর সেই ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে স্বস্মিতা জবাব দেয়, আমি আপনাদের ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কিছুই জানি না, ঠাকুরপো। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এটুকু বলতে পারি, মানুষকে বিশ্বাস করে তার ওপর নির্ভর করে থাকতে পারলে একদিন না একদিন সেই বিশ্বাসের মর্যাদা সে পাবেই।

স্বস্মিতার জবাব যেন শুনতে পায় নি এমনি ভঙ্গিতে রুদ্র জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে। সেই অবস্থায় সে অনেকটা আপন মনেই বলতে থাকে, পুলিশের মানসিকতার খোঁজে এই ডিপার্টমেণ্টে এসে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো আমাকে। তাকিয়ে দেখি চারিদিকে কেবল অনাচার, অবিচার আর অসততার জঞ্জালেব স্তূপ। হাজার হাজার টন ভারি সেই জঞ্জালের স্তূপের নীচে চাপা পড়ে মানবতা কেবল অসহায় ভাবে চিৎকার করে কেঁদে চলেছে। পারলাম না সেই কান্না সহ্য করতে। মনে মনে সঙ্কল্প করে এগিয়ে গেলাম—আমার সামান্য শক্তি দিয়ে যতটা পারি ঐ জঞ্জাল সরিয়ে মানবতাকে মুক্তি দিতে হবে। চোখের সামনে আমার ভেসে উঠলো কল্পনার পুলিশ বিভাগ—এর প্রতিটি কর্মী উৎসর্গীকৃত প্রাণ। জনগণের মঙ্গলই তাদের একমাত্র কামনার বস্তু, অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়ানোই তাদের একমাত্র কর্তব্য। অত্যাচারীর প্রতি তারা বজ্র কঠোর, অত্যাচারিতের প্রতি ফুলের মত কোমল। জনসাধারণের স্বার্থই তাদের স্বার্থ, জনসাধারণের সুখই তাদের সুখ। এমনি হাজার হাজার নিপুণ ও নিরলস কর্মী নিয়েই যেন দেশের পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট। তাদের ওপর চোখ পড়লেই জনসাধারণের মাথা আপনিই নত হয়ে আসে, তাদের কথা বলতে সাধারণ মানুষের বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

বলতে বলতে সহসা থেমে যায় রুদ্র। বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে স্বস্মিতার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে আবার বললে, আমার এই ধারণাকে আপনি হয়তো এই মুহূর্তে কেবলমাত্র আবেগপ্রবণ কল্পনা বলেই উড়িয়ে দেবেন, বৌদি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পুলিশী প্রশাসনকে একদিন ঐ স্তরে উঠতেই হবে। মানুষের ভবিষ্যৎ সভ্যতার ওপর যদি আস্থা রাখতে হয় তা'হলে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এরকম একটা কল্পনা নিশ্চয়ই আকাশ কুসুম নয়। আচ্ছা বৌদি, আপনার কি মনে হয় না, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দেশে এরকম একটা পুলিশ বাহিনীই কাম্য ?

মৃদু হেসে জবাব দেয় স্বস্মিতা, দেখুন ঠাকুরপো, আপনার ঐ আদর্শ পুলিশ বাহিনী যে কোন দেশের মানুষেরই কামনার বস্তু। সাধারণ মানুষ দেশের

পুলিশ বাহিনীর কাছে ঐরকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করে। কিন্তু প্রত্যাশা করলেই তো কেবল হবে না, তার সম্ভাব্যতাও তো বিচার করতে হবে। আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা' আমরা সবাই বুঝতে পারছি। তবুও কিন্তু আমরা অবোধ শিশুর মত প্রত্যাশা করি যে দেশের পুলিশ শক্তিতে হবে স্যামসনের মত, তদন্তে হবে শার্লক হোম্‌স, আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষ্যভেদে হবে অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান স্বটার, আর ধৈর্যে হবে রবার্ট ব্রুস। ইন্দ্রজালে তাকে হতে হবে ম্যানড্রেক, আবার ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণে ভগবান বুদ্ধ। সম্ভব নয় জেনেও কিন্তু মনে মনে আমরা এরকম একটা কিছুই আশা করি। কারণ এরকম আশা করতেই আমাদেব ভালো লাগে।

সুস্মিতার বলার ভঙ্গিটি বড়ই চমৎকার। নিজের কোয়ার্টাবে ফিরে এসেও সুস্মিতার কথাই বারে বারে মনে পড়ে রুদ্রর। সুস্মিতার সান্নিধ্য তার ভালো লাগে। ভালো লাগে তার কথা শুনতে, তাকে কথা শোনাতে। শালীনতার সীমা বজায় রেখে কখন যে একজোড়া মানব-মানবী মানসিক দিক থেকে পরস্পর পরস্পরের অনেক কাছে সরে এসেছে তা' কিন্তু দু'জনের একজনও টের পায় না। রুদ্রর নিঃসঙ্গ জীবনে সুস্মিতা যেন এক ঝলক দাক্ষিণা বাতাস। তাতে নেই কোন ঝড়ের সংকেত, আছে কেবল দেহ-মন জুড়িয়ে দেবার আশ্বাস। আর সুস্মিতার জীবনে জেলার পুলিশ সাহেব রুদ্র কেবলই একটা বিস্ময়। এ কোন্ আধুনিক প্রহ্লাদ এসে জন্ম নিয়েছে হিরণ্যকশিপুর ঘরে!

মাঝে মধ্যে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে রুদ্র। কী চায় সে তার সুস্মিতা বৌদির কাছে? কিসেব আশায় সময় পেলেই সে ছুটে যায় তার কাছে? না, কিছুই সে চায় না। সুস্মিতা তার দীপকদার স্ত্রী যে নাকি এখনও প্রতিদিন স্বামীর ছবিখানাকে দেবতার পটস্থানে পুজো করে। সেই সুস্মিতা বৌদির কাছে একমাত্র তাব সান্নিধ্য লাভটুকু ছাড়া আর কিছুই সে চায় না। এতেই তার আনন্দ, এতেই তার তৃপ্তি।

পুলিশ অফিসে বসে কাজ করছে রুদ্র। অর্ডারলি কন্‌স্টেবল এসে সেলাম করে জানায় যে সাব্-ইন্সপেক্টর বিজন হালদারের স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা কবতে চায়। নামটা শুনেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে রুদ্রর। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিজন হালদারের সেই করুণ মুখখানা।

জামিনে ছাড়া ছিল বিজন। মামলার রায় যেদিন বেরোবে সেইদিন

বিজন এসেছিল রুদ্রর সঙ্গে দেখা করতে। উস্কো-খুস্কো চুল, খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। ময়লা বেশ-বাস। চাকরি থেকে সাস্‌পেণ্ড হয়েছিল সে। আর্থিক অনটন, তার ওপর মামলার খরচ চালানো। চিন্তা-ভাবনায় তার ঋজু দেহটা ঝুঁকে পড়েছিল সামনের দিকে।

ম্লান কণ্ঠে বিজন সেদিন বলেছিল রুদ্রকে, আজ মামলার রায় বেরোবে, স্যার। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে আমার হয়তো শাস্তি হবে।

রুদ্র কোন কথা বলে নি, বলতে পারে নি। সোজাসুজি কেবল তাকিয়েছিল বিজনের দিকে।

কান্নাভাঙা কণ্ঠে বলেছিল বিজন, অন্যায় করেছি, শাস্তি হবে। এতে বলার কিছু নেই আমার। কেবল একটামাত্র দুশ্চিন্তা নিয়েই জেলে যেতে হবে। ডিপার্টমেণ্ট থেকে তো বরখাস্ত হয়ে যাবো। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে আমার। তার ওপর অসুস্থ স্ত্রী। আমি জেলে গেলে এরা সব থাকবে কোথায়? খাবে কি?

বিজন হালদারের কথায় সেই মুহূর্তে ব্যথায় মনটা ভরে উঠেছিল রুদ্রর। আশ্বাস দিয়ে বলেছিল তাকে, আমরা থাকতে আপনার ছেলেপুলেরা গাছতলায় গিয়েও দাঁড়াবে না, আর না খেয়েও থাকবে না। নিজেদের সম্মান বাঁচানোর তাগিদেই ওদের জন্যে আমাদের কিছু করতে হবে। একজন পুলিশ অফিসারের স্ত্রী তার ছেলেপুলে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালে তাতে যে আমাদের প্রত্যেকেরই লজ্জা।

এই হতভাগ্য পরিবারটির জন্যে যথাসাধ্য করেছিল রুদ্র। সাপ হয়ে দংশন করতেও যেমনি তার দ্বিধা ছিল না, তেমনি ওঝা হয়ে ঝাড়তেও ছিল না কোন কার্পণ্য। বিজন হালদার যে থানায় পোস্টেড্ ছিল সেখানেই তাদের জন্যে সস্তায় একখানা বাসা ভাড়া করে দিয়েছিল। বিজনের শূন্য চেয়ারে নতুন অফিসার-ইন্-চার্জ'কে বসিয়ে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল এই পরিবারটির দিকে নজর রাখতে। বলেছিল, শুনুন তপনবাবু, বিপদ যে কার কোন্ দিক দিয়ে আসবে তা' কেউ বলতে পারে না। আজ বিজন হালদার বিপদে পড়েছে, কাল হয়তো আমি আপনি যে কেউ এর চাইতেও কঠিন বিপদে পড়তে পারি। সেদিন যদি ডিপার্টমেণ্টের লোকেরাই আমাদের না দেখে তাতে যে আমাদেরই লজ্জা, আমাদেরই অপমান। এমনিতেই তো হৃদয়হীন বলে আমাদের বদনাম, অন্ততঃ ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের পরিবার পরিজন সম্পর্কে যেন কিছুটা হৃদয়বানের পরিচয় আমরা দিতে পারি। জেলার এস-পি হিসেবে এটা আমার কোন

হুকুম নয়, এটা কেবলমাত্র আমাব একান্ত অনুরোধ।

জেলাব একজন জাঁদবেল পুলিশ সাহেবেব এমনি মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর যে কোন ব্যক্তির হৃদয়ই স্পর্শ করবে। হলোও তাই। বিজন হালদার জেলে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই তার পরিবার পরিজনের জন্যে একখানা বাড়ি ভাড়া করা হলো। রুদ্রর চেষ্টায় বিজনের পাওনা টাকাপয়সাও কিছু আদায় হলো সরকারের কাছ থেকে।

সেই বিজন হালদারের স্ত্রী আজ রুদ্রর সাক্ষাৎপ্রার্থী। কথাটা শুনেই রুদ্র সেই মহিলার সাক্ষাৎ করতে আসার কারণ অনুমান করতে পারে। খুব সম্ভব আর্থিক সাহায্যের আশায মহিলা এসেছে তাব কাছে। না এসে উপায় বা কি? বিজনের পাওনা পয়সা-কড়ি তেমন কিছু ছিল না। যা-ও বা ছিল তা' দিয়ে এই ক'টা মাস পরিবারটির কোনবকমে চলেছে। এবাব ওরা কি কববে? কোথায় যাবে?

রুদ্রব অনুমান সত্য। মহিলাটি আঁচলে চোখ মুছে তার আর্থিক অনটনের কথা বললে। খানিকক্ষণ চুপ কবে রইলো রুদ্র। কি আশ্বাস সে তাকে দিতে পাবে? আন্তরিকতা থাকলেও তার নিজের সামর্থ্য কোথায়?

অবশেষে মৃদু কণ্ঠে রুদ্র মহিলাটিকে বললে, আপনি বাড়ি যান। আমি দেখছি কি করা যায়।

মহিলাটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতেই রিজার্ভ অফিসারেব ডাক পড়ে রুদ্রর ঘবে। রুদ্র জিজ্ঞেস করে, আমাদেব কোয়ার্টার্লি কন্‌ফাবেন্স কবে, লাইনবাবু?

লাইনবাবু তারিখ বলতেই রুদ্র মনে মনে কি যেন হিসেব করে। তাবপর লাইনবাবুকে বললে, ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।

কন্‌ফারেন্সে গোটা জেলার থানার ও-সিরা উপস্থিত। উপস্থিত ইন্সপেক্টববাও। কন্‌ফারেন্সের শেষে বিজন হালদারের পরিবারেব কথাটা তুললে রুদ্র। বললে, বলুন আপনারা, এই হতভাগ্য পরিবারটির জন্যে আমবা সবাই মিলে কী করতে পারি? এটাকে আপনারা দায় বলে ভাববেন না। এটা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। যে ডিপার্টমেণ্ট আমাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে সেই ডিপার্টমেণ্টের প্রতি আমাদেরও কিছু কর্তব্য রয়েছে। ডিপার্টমেণ্টের একজন কর্মীর নির্বুদ্ধিতার ফলে তার ছেলেপুলেরা যে না খেয়ে মরবে তা' কিছুতেই হতে পারে না। আমি মনে করি, এই জেলার পুলিশ কর্মীরাই কেবল এই ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত নয়, এর ওপর যারা নির্ভর করে আছে, পুলিশ কর্মীদের সেই পরিবার পরিজনেরাও এর অন্তর্ভুক্ত। ডিপার্টমেণ্টের

সুনাম-দুর্নামের সঙ্গে কেবল কর্মীরাই যুক্ত নয়, তারাও যুক্ত।

কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত সবাই চুপ। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। পুলিশ সাহেব যতই কেন না বলুন এটা কোন দায় নয়, তারা সবাই বুঝতে পারছে যে এটা দায় ছাড়া আর কিছু নয়। এই অর্থনৈতিক দুর্দিনে দায় ঘাড়ে নিতে কে এগিয়ে আসবে?

এতক্ষণে নিজের চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে এ্যাডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রী। তারপর উপস্থিত ও-সি'দের দিকে তাকিয়ে বললে, ইচ্ছে করলে থানার এই বড়বাবুরা সবাই মিলে মোটা টাকা তুলে দিতে পারে।

প্রকাশ শাস্ত্রীর এই ইঙ্গিতপূর্ণ প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না রুদ্রর। থানার ও-সি'দের উপরি আয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র বলে ওঠে, কেবল ও-সি'রা কেন, ইচ্ছে করলে আমরা সবাই মিলেই ঐ পরিবারটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি কর্মী যদি প্রতি মাসে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করে তা' দিয়েই ঐ পরিবারটির শাক-ভাত না হোক, নুন-ভাতের ব্যবস্থা করা যায়। অভাব অনটন আমাদের প্রত্যেক্যেরই রয়েছে, তা'হলেও অতি সামান্য কিছু কিছু বোধহয় আমরা প্রত্যেকেই দিতে পারি।

রুদ্র থামতেই উপস্থিত অফিসারেরা সবাই সমর্থন করে তাকে। প্রকাশ শাস্ত্রীও ম্লান কণ্ঠে সমর্থন করে। ঠিক হয়, এর গোটা দায়িত্ব থাকবে প্রকাশ শাস্ত্রীর ওপর। প্রতি মাসের টাকাটা সে বিজন হালদারের স্ত্রী'র হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করবে।

পুলিশ সাহেব রুদ্রদেব মদ খায়। নিজের পয়সাতেই খায়। নিয়মিত না হলেও মাঝে মধ্যেই খায়। সাহেবের এই মদ খাওয়াকে কিন্তু ভয় করে তার কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড বীরবাহাদুর। সে লক্ষ্য করেছে যেদিনই সাহেব মদ খায় তার পরের দিনই ঘুম থেকে উঠতে সাহেবের দেরি হয়। মদ খেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বারান্দায় পায়চারি করে বেশি রাতে ঘুমোতে গেলে উঠতে তো দেরি হবেই।

এই নিঃসঙ্গ লোকটির ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে বীর-বাহাদুরের। সাহেবের ঘরের সামনে বারান্দাতেই সে শোয়। সাহেব যতক্ষণ ঘুমোতে না যায় বীরবাহাদুরও ততক্ষণ নিজের দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। কেন যে পারে না তা' সে নিজেই জানে না। বারে বারে বিছানায় উঠে বসে লক্ষ্য করে সাহেবের ঘরের আলো নিবেছে কিনা। অবশেষে আলো নিবিয়ে রুদ্র শুয়ে পড়তেই নিশ্চিন্ত হয়ে বীরবাহাদুরও ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন সাহেব দেরি করে উঠলেও বীরবাহাদুরের নিজের তাড়াতাড়ি না উঠলে

চলে না। সাহেবের চা-টোস্ট তৈরি করা, ডিম সিদ্ধ করা প্রভৃতি কাজগুলো সারতে হয় তাকে। তারপর আছে রান্নার ব্যবস্থা। তাই, রুদ্রর মদ খাওয়াকে তেমন একটা ভালো চোখে দেখে না বীরবাহাদুর।

বীরবাহাদুর আরও লক্ষ্য করেছে, রুদ্র যেদিন কোন কারণে বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে সেদিন সে মদ খাবেই। বাড়িতে মদের বোতল খালি থাকলে তাকেই মদ কিনতে ছুটতে হয় দোকানে। আবার মনটা খুশি থাকলে বীরবাহাদুরকে ডেকেই যেচে হয়তো বলে, জানিস বাহাদুর, এর পেছনে বেশ কিছু পয়সা খরচ হয় আমার। ভাবছি এই অভ্যেসটা এবার ছাড়বো।

—জী হ্যাঁ, জবাব দেয় বীরবাহাদুর, আমি শীতের দেশ দার্জিলিংয়ের লোক হয়ে যদি সরাব না খেয়ে থাকতে পারি, আপনি তবে এর পেছনে পয়সা খরচ করবেন কেন?

বীরবাহাদুরের কথায় হেসে উঠে রুদ্র বলে, ঠিক বলেছিস। আর এসব ছোঁব না।

রুদ্র মুখে বললেও বীরবাহাদুর জানে সাহেব তার কথা রাখতে পারবে না। যেদিন খেতে ইচ্ছে করবে সেদিন বিলিতি সরাবের দোকান থেকে তাকে বোতল কিনে আনতেই হবে। বীরবাহাদুর বাধা দিতে চেষ্টা করলে মৃদু কণ্ঠে বলবে, আজ বড়ই খেতে ইচ্ছে করছে রে।

সাহেব কথাটা এমন মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলবে যে সেই মুহূর্তে সরাবের দোকানে ছুটে যাওয়া ছাড়া বীরবাহাদুরের আর কোন উপায় থাকে না। বীরবাহাদুরের দৃঢ় বিশ্বাস মেমসাহেবের জন্যেই তার সাহেবের এই অবস্থা। মেমসাহেব যদি সাহেবকে ছেড়ে না যেতো তা'হলে হয়তো সে এসব খেতোই না।

রুদ্রর গাড়ির ড্রাইভার আনোয়ারের সঙ্গে বীরবাহাদুরের খুব ভাব। সময় সুযোগ পেলেই সে আনোয়ারের সঙ্গে গল্প করে। সেই আনোয়ারের মুখেই সে শুনেছে যে সাহেব নাকি ইদানীং এই সহরের একজন ঔরতের বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছে। সেই ঔরৎ খুব সুন্দরী। তার মরদ নাকি জেলে আছে।

উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা আনোয়ারের মুখে কথাটা শুনে কিন্তু ভালো লাগে নি বীরবাহাদুরের। রুদ্রদেব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা তার। সেই রুদ্রদেব যে সহরের একজন ঔরতের পেছনে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াবে তা' তার ধারণারই অতীত। আনোয়ারের কথায় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বীরবাহাদুর বলেছিল, ঐ ঔরত হয়তো সাহেবের কোন আত্মীয় হবে।

জবাবে আনোয়ার একটু বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, তাই যদি হবে তা'হলে তার মরদ কি জেলে থাকে ?

জেলার এস-পি'র কোন আত্মীয় জেলে থাকতে পারে এটা অনেকের মত বীরবাহাদুরের কাছেও এক আশ্চর্য ব্যাপার। আবার রুদ্র সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণাও সে করতে পারে না। তাই অবশেষে সে বললে, আত্মীয় না হলেও সাহেবের কোন জান-পহ্‌ছান ঔরত হবে হয়তো।

তেমনি মুখ টিপে হেসে আনোয়ার সেদিন বলেছিল, হয়তো তাই।

আত্মীয় হোক, অনাত্মীয় হোক বীরবাহাদুর কিন্তু লক্ষ্য করে, সাহেব যেদিন সেই ঔরতের বাড়ি যায় সেদিন ফিরে এসে সাহেবের মন-মেজাজ খুবই ভালো থাকে। কেবল সেইদিনই নয়, বেশ কয়েকটি দিন সাহেব তেমনি মেজাজে থাকে। এমনও দেখা গেছে, পর পর দু' সপ্তাহ সেখানে গিয়ে সাহেব দুটো সপ্তাহের মধ্যে একটিবারও তাকে মদের বোতল বার করতে বলেনি। বীরবাহাদুর বোকা নয়। সে জানে মানুষের খারাপ প্রবৃত্তি তার সরাবের নেশাকে আরও উস্কে দেয়, কমিয়ে ফেলে না কখনও। কাজেই, ড্রাইভার কন্‌স্টেবল আনোয়ার যা-ই বলুক না কেন, তার সাহেব সেখানে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চয় যায় না।

সেদিন পুলিশ অফিস থেকে ফিরে প্রায় এক সপ্তাহ পরে মদের বোতল নিয়ে বসেছিল রুদ্র। এমনিতেই সেদিন ভালো ছিল না মনটা। বারাসাত থেকে বাবার চিঠি এসেছে যে মা'র শরীর নাকি ভালো নয়। সম্ভব হলে রুদ্র যেন একবার আসে। কিন্তু হেড্ কোয়ার্টার ছেড়ে রুদ্রর নড়ার উপায় নেই। প্রকাশ শাস্ত্রী সাত দিনের ছুটিতে। সামনেই কালীপুজো। সদর রাস্তার ওপর একখানা কালীপুজো নিয়ে জল ক্রমশই ঘোলা হয়ে উঠছে। মাত্র বছর দু'য়েক ধরে এই পুজোটা শুরু হয়েছে। গতবছর পুজোর পরে সে এই জেলায় এসেছে। এবার ঐ পুজোর অনুমতি দেওয়া নিয়েই গণ্ডগোল। তার ওপর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ তো আছেই।

মদের গ্লাশে চুমুক দিতে দিতে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনের ওপর চোখ বুলোতে চেষ্টা করে রুদ্র, কিন্তু ম্যাগাজিনের পাতায় মন বসাতে পারে না কিছুতেই। মদের গ্লাশ হাতে নিলে আজও দু'টি নারীমূর্তি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। তাদের মধ্যে একজন অলকা, আর অন্যজন নবনীতা। একালের রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদার নয়, সেকালের ইউনিভার্সিটির ছাত্রী অলকা, যে নাকি একদিন তাকে বলেছিল—মদ খেও আপত্তি নেই, তবে তখন আমাকে

একবার মনে করতে চেষ্টা করো। কী মায়া ঐ ক'টি কথার মধ্যে! একজনের জন্যে আর একজনের কী দুশ্চিন্তা ঝরে পড়ছে ঐ কথার মধ্য দিয়ে! কিন্তু কোথায় আজ সেই মায়া, কোথায় আজ সেই দুশ্চিন্তা! ওগুলো যেন তার এই জীবনে ঘটেনি। জাতিস্মরের মত বিগত জীবনের ঘটনা যেন এ জীবনে মনে পড়ছে রুদ্রদেবের। কালস্রোতে জীবন-যৌবন-ধন-মান ভেসে যাবার কথাই বলে গেছেন কবিগুরু। প্রেম-ভালোবাসাও যে কালেব স্রোতে কর্পূরের মত উবে যায় সে কথা কেন বলেন নি তিনি?

নবনীতা একদিন তার আলমারীর মধ্যে মদের বোতল দেখে বলেছিল—দেবদাস হতে চাইছো নাকি? ব্যঙ্গ মিশ্রিত কথা। না, দেবদাস হবাব মত কোন বাসনা নেই তার। তবে, দেবদাস চেয়েছিল পার্বতীকে পেতে, আর রুদ্রদেব চেয়েছিল নবনীতাকে না হারাতে। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল খুবই সামান্য। একখানি ছোট্ট শান্তির সংসার, একজন প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী, এব বেশি কিছু তাব কাম্য ছিল না। নির্বাচনে ভুল করেছিলেন তার বাবা। তাবই খেসারত দিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে—হয়তো জীবনভরই দিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, নবনীতা কি আজও কপালে সিঁদুরেব টিপ পরে? হয়তো পরে, হয়তো পরে না। হয়তো কেবলমাত্র চুলের আড়ালে একবিন্দু সিঁদুর লুকিয়ে রেখে সংস্কার বাঁচায়। সেই সিঁদুরের বিন্দু ধারণ করার মুহূর্তেও কি রুদ্রর কথা তাব মনে পড়ে না? রাস্তাঘাটে কোন পুলিশ অফিসারের দিকে চোখ পড়লেও কি তার মনে হয় না রুদ্রর কথা? রুদ্রর নিজের কিন্তু মনে পড়ে। এই মফঃস্বল সহরে মেয়েদেব গাড়ি ড্রাইভ করতে সাধাবণতঃ দেখা যায় না। কিন্তু তেমন কোন দৃশ্য কখনও চোখে পড়লে আজও রুদ্রর মনে পড়ে নবনীতার কথা। গাড়ি চালাতে ভালোবাসে নবনীতা, ঝড়ের বেগে চালাতে আরও ভালোবাসে। গতিময় ওর জীবন। গতিই জীবন। গতিহীনতা মৃত্যুরই নামান্তর। মৃত্যু কেউ চায় না। রুদ্রব সংসারে সেই গতিহীনতাই বোধহয় নবনীতার আশঙ্কার কারণ। এটাই বোধহয় মুখ্য। আথিক সচ্ছলতার অভাব সম্ভবতঃ গৌণ ব্যাপাব।

সময় সময় এই দু'জন মহিলার পাশাপাশি রুদ্রর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরও একজন মহিলার মুখ। সুস্মিতা—সুস্মিতা বৌদি। তার কথা মনে হলেই একটা অনৈসর্গিক স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠে তার দেহ-মন। পঙ্কিলতাহীন তীব্র এক মাদকতায় মন অবশ হয়ে ওঠে। সুস্মিতা বৌদির ঐ কল্যাণময়ী রূপটি রুদ্রর খবজ্বালাতপ্ত হৃদয়ে এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ। তার ঐ বাড়িখানি যেন এক আনন্দনিকেতন যেখানে তুতুন নামে ঐ মেয়েটি একটি সদ্য ফোটা সুন্দর ফুল।

না, বেশিক্ষণ নিজের পারিবারিক চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতে পারে না রুদ্র। হাজার হাজার পথচারীর অসুবিধা সৃষ্টি করে সদর রাস্তায় কালীপুজো করার অনুমতি সে কিছুতেই দেবে না। কাল সকালেই সে সদর থানার ইন্সপেক্টরকে হুকুম দেবে পুজোর পাণ্ডা ঐ পাগলা ওরফে দাশু রায় ও নান্টু ওরফে স্বপন দে'কে এ্যারেস্ট করতে। ওদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ। রুদ্র জানে, পাগলা ও নান্টু একটা রাজনৈতিক দলের দু'জন চাঁই। ওদের পেছনে রয়েছে অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি। কিন্তু তাদের ভয়ে অন্যায়কে সে কিছুতেই সমর্থন করতে পারবে না। তাতে যা হবার হবে। জঙ্গলের রাজত্ব—গোটা দেশ জুড়ে সেই রাজত্বই চলছে। জোর যার মুলুক তার। আর তারই চাপে পড়ে সাধারণ মানুষ দিশেহারা, বিভ্রান্ত। মুষ্টিমেয় একদল মানুষ রাজনৈতিক স্পেস স্যুটের আড়ালে আত্মরক্ষা করে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। আইন-শৃংখলার দোহাই দিয়ে আইন-শৃংখলার রক্ষাকারীরা বসে আছে পুতুল সেজে। কেউ কেউ আবার ওর মধ্য থেকেই কিছু মুনাফা লোটার ধান্দায় ঘুর ঘুর করছে। এরকম একটা অবস্থা বাস্তবিকই অসহনীয়। কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট করে আজ বলতে হবে কী তারা চান। আন্তরিকভাবেই বলতে হবে সেকথা। ভোট বাক্সের দিকে নজর রেখে বললে চলবে না। আইনের শাসন চান? শান্তি-শৃংখলা চান? মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন চান? না, ঐ শেষেরটির দায়িত্ব পুলিশের নয়। ওর দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদের। তবে, প্রথম দু'টি সম্পর্কে দয়া করে একটু চুপ করে থাকুন। কোন কথা বলবেন না। শাসক দল হলে দয়া করে ক্ষমতার চাপ দেবেন না। আর বিরোধী দল হলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবেন না। দেখুন, এই অকর্মণ্য, অপদার্থ, ধান্দাবাজ পুলিশ বাহিনীই কি করতে পারে। কি বলছেন, পুলিশী-রাজ তৈরি হয়ে যাবে? দয়া করে বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্কের সেই বিখ্যাত উক্তিটি আবার স্মরণ করুন—It is a great truth that once things are gone out of their ordinary course, it is by act out of ordinary course they can alone be re-established.

ভয় নেই, পুলিশী-রাজের প্রতিষ্ঠা হবে না। ওপরে আপনারা তো রয়েছেন। ক্ষমতার আসল চাবিকাঠিটি তো আপনাদেরই হাতে। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কথা, দেশের কোটি কোটি অসহায় মানুষের কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করুন। সঠিক পথে পরিচালিত করুন শান্তি-শৃংখলার রক্ষক পুলিশ বাহিনীকে। ওদের মধ্যে যারা অত্যাচারী নিষ্ঠুর, তাদের দিন

কঠোর শাস্তি। যারা অসৎ, যাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান পুলিশী ক্ষমতার অপব্যবহার করে কৌশলে অর্থ উপার্জন, তাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলান। যারা অকর্মণ্য, তাদের করে তুলুন কর্মক্ষম। আর, যারা কর্মঠ সৎ, যারা লোভের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ করে চলেছে, মুখের মধ্যে মিছরির টুকরো থাকা সত্ত্বেও যারা অমানুষিক শক্তিবলে নিজেদের সংবরণ করে তার এক ফোঁটা রসও গিলে ফেলছে না, সেই মুষ্টিমেয়দের সততার পুজো করুন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে শক্ত করুন তাদের হাত। পুলিশ বাহিনীর কর্মীবৃন্দকে বুঝিয়ে দিন যে, সরকারে যে রাজনৈতিক দলই থাকুক না কেন তাদের নীতি রূপায়ণে সেই দলকে নয়, সরকারকে সাহায্য করাই পুলিশের একমাত্র কর্তব্য। এর অন্যথা চলবে না। সরকারী নীতি রূপায়ণে নিজের বিবেক খাটবে না। এটাই গণতন্ত্র। সেই সঙ্গে তাদের আরও বুঝতে দিন যে সরকারের প্রতিটি আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে যেমনি তারা মানতে বাধ্য, তেমনি দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোন সরকারী আদেশ মানতেও তারা বাধ্য নয়। নিজেরা আইনের পথে চলুন, পুলিশকে আইনের পথে চলতে বাধ্য করুন।

রুদ্রর অনুমানই ঠিক। পরের দিন পাগলা ও নান্টুকে এ্যারেস্ট করতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। সহর জুড়ে হৈ-চৈ। এলেন দাদারা, এলেন নেতারা। রুদ্রর কিন্তু সবাইকে সেই একই জবাব, হাজার হাজার পথচারীর অসুবিধা সৃষ্টি করে সদর রাস্তায় পুজোর অনুমতি কিছুতেই দিতে পারি না।

—গত বছর তো দিয়েছিলেন।

—আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি কেন দিয়েছিলেন তিনিই জানেন। তবে আমি অনুমতি দেব না।

—কেন দেবেন না?

—জনস্বার্থে দেব না।

—জনস্বার্থ দেখার মালিক কি আপনি একাই?

—হ্যাঁ, পুলিশী প্রশাসনের দিক থেকে এই জেলার জনস্বার্থ দেখার একমাত্র মালিক আমি। সরকারের মাধ্যমে জনগণ সেই অধিকার দিয়েই আমাকে এস-পি'র আসনে বসিয়েছে।

—আপনি জানেন, এতে সহরের মানুষ ক্ষেপে উঠতে পারে?

—হ্যাঁ জানি। সহজ সরল মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার মত লোকের তো অভাব নেই এদেশে।

—এটা তো স্পষ্ট ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ।

—না, তা' নয়। তা'হলে কলকাতার রাস্তায় ব্যাঙের ছাতাব মত গজিয়ে ওঠা ধর্মস্থানগুলোকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো না।

—বেশ তো, অনুমতি না হয় না-ই দিলেন। কিন্তু দাশু রায় ও স্বপন দে'কে এ্যারেস্ট করলেন কোন্ যুক্তিতে?

—আমাদের কাছে খবর এসেছে তারা জোব কবে চাঁদা আদায় করছে। দিতে না চাইলে শাসাচ্ছে।

—কেউ কি কোন লিখিত অভিযোগ কবেছে?

—না, সেই সাহস তাদের নেই। এলাকায় বাস করে কিম্বা ব্যবসা কবে লিখিত অভিযোগ পেশ করার মত বুকের পাটা কারুব নেই। কাবণ, তারা জানে পুলিশ তাদের সবসময় চোখে চোখে রাখতে পারবে না।

অবশেষে অনেক যুক্তি-তর্ক বাদানুবাদের পরে রুদ্রদেব পাগলা ও নাণ্টুকে ছেড়ে দিতে সম্মত হলো। তবে, বড় রাস্তায় পুজোর অনুমতি কিছুতেই দিলে না। এই একগুঁয়ে অফিসারটির আচবণে ক্ষুব্ধ নেতারা অবশেষে চলে গেলেন। যাবার আগে অবশ্য বলে যেতে ভুললেন না যে অচিরেই রুদ্রকে এব ফল পেতে হবে।

একটু ম্লান হেসে রুদ্র নিজের কাঁধের অশোকস্তম্ভ তাঁদেব দেখিয়ে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলবো বলে অঙ্গীকার করে এই প্রতীক কাঁধে তুলেছি। আমি দুঃখিত যে এগুলো আপনাবা কেডে না নিয়ে আমাকে ন্যায়-নীতির বাইবে যেতে বাধ্য করতে পাববেন না।

পুলিশ সাহেব রুদ্রদেবের কর্মনৈপুণ্যের খবরের সঙ্গে সঙ্গে তার একগুঁয়েমীব কথাও ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের পুলিশ মহলে। কেবল পুলিশ মহল কেন, প্রশাসনেব উচ্চতম মহলেও তাকে নিয়ে আলোচনা। তাকে কেউ বলে সাক্সেস্‌ফুল অফিসার, কেউ বলে আন্-সাক্সেস্‌ফুল। যারা আন্-সাক্সেস্‌ফুল বলে তাদেরও কিন্তু ঐ একগুঁয়েমীটুকু বাদ দিয়ে তাকে সাক্সেস্‌ফুল বলতে আপত্তি নেই। এযুগে এমনিই হয়। নীতির প্রতি কঠোব-কঠিন আনুগত্য একালে বোধহয় একগুঁয়েমী নামেই পরিচিত।

রুদ্রদেব তার কর্মদক্ষতা ও ঐকান্তিকতার সাহায্যে তার নিজের জেলার কর্মীদের যে কতখানি সততার পথে টেনে আনতে সমর্থ হয়েছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে জেলার ক্রাইম সাপ্রেশন কমিয়ে এনে পুলিশ মহলে যে একটা কর্মচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতে সে সমর্থ হয়েছে একথা একবাক্যে সবাই স্বীকার করে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক জেলার পুলিশ প্রশাসন ইদানীং কর্মচঞ্চল। কর্মীদের প্রধান বল-ভরসা এখন ঐ পুলিশ সাহেব। তারা জানে, কোনরকম উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের যে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্যে স্বয়ং পুলিশ সাহেব আছেন। কেবল শাস্তির ভয় দেখিয়ে নয়, সত্যিকারের দরদ দিয়ে সে তাদের স্বাভাবিক ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে দেবার ব্যবস্থা করবে। উপরওয়ালাদের কাছে সাধারণ কর্মীরা তো এটাই আশা করে। সেনাপতির কাছে তো সাধারণ সৈনিকের এটুকুই কামনা। এটা পূরণ হলেই তো তারা তার হুকুমে জীবন বিসর্জন দিতেও পিছিয়ে যাবে না।

মানুষের মনের সত্যিকারের উষ্ণতা টের পেতে বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। মানুষ তো দূরের কথা, একটা সাধারণ পশু পর্যন্ত তার প্রতি মনিবের দরদের কথা স্বাভাবিকভাবেই টের পায়। জেলার এম-টি-ও অর্থাৎ মোটর ট্রান্সপোর্ট অফিসারের ওপর এস্-পি রুদ্রদেবের স্পষ্ট হুকুম—অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদে জেলার যে কোন কর্মীর পরিবার-পরিজনেরাই যেন গাড়ির সুযোগ পায়।

হুকুম শুনে এ্যাডিশনাল এস্-পি প্রকাশ শাস্ত্রী মৃদু প্রতিবাদ করে বলেছিল, এত সরকারী পেট্রল কোথা থেকে আসবে, স্যার?

জবাবে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল রুদ্রদেব, আপনার আমার পরিবার-পরিজনের বেলায় যেখান থেকে আসে। সরকারী সুযোগ-সুবিধার দুধ-দইটুকু চিরকাল আমরাই খাবো, আর নীচুতলার ওরা কেবল হা-করে তাকিয়ে থাকবে, এ ব্যবস্থা তো চিরকাল চলতে পারে না।

—কিন্তু স্যার, এতে যে অপব্যবহারের সম্ভাবনা।

জবাব দিয়েছিল রুদ্র, তা' তো থাকবেই। দু'চার জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন ব্যাপারে যতটা রিস্ক্, দু' চার হাজারের মধ্যে সেই রিস্ক্ তো বেশি হবেই। সেই রিস্ক্ যতটা সম্ভব কমিয়েই যদি না আনতে পারা যায় তা'হলে আমরা আছি কেন? অপব্যবহারের প্রমাণ পেলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে সেই কর্মীকে। আমার কাছে ইচ্ছাকৃত অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।

গ্রামের একটা থানায় সশস্ত্র ডাকাতদলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন

কনস্টেবল গুরুতরভাবে আহত। তাকে জেলার সদর হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাকে দেখতে হাসপাতালে যাওয়া ছাড়াও রুদ্র প্রতিদিনই টেলিফোনে তার খবর নেয়। হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদিন হেসে বলেছিলেন, রোগীর কাছে আপনার স্টাফ্ তো দিন-রাত রয়েছে। তা'ছাড়া, পেশেণ্ট তো এখন আউট-অফ-ডেঞ্জার। আপনি নিজে কেন প্রতিদিন খবর নিতে এত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, মিঃ ভট্চায ?

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে তেমনি মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল রুদ্র, আসলে ব্যাপার কি জানেন, সামান্যতেই একটু বেশি উদ্বিগ্ন বোধকরা আমার স্বভাব। তা'ছাড়া, জেলার এই কর্মীরাই তো আমার হাত-পা-চোখ-মুখ। এদের ওপরেই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে জেলার পুলিশী প্রশাসন। দেহের যে কোন একটা অঙ্গে আঘাত লাগলে কি কেউ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? আমার অবস্থাও তাই। কথাটা বলেই হালকা স্বরে হেসে উঠেছিল রুদ্র।

সেদিন রুদ্রর কথায় হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বোধহয় একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন।

পুলিশ মহলে রুদ্রর সততার খ্যাতি ও তার জনপ্রিয়তা কিন্তু এই মহলেরই অনেকের চক্ষুশূল। তারা এর মধ্যে অন্যকিছু আবিষ্কার করে ফেলে। সুযোগ-সুবিধা মত তার বিরুদ্ধে কাল্পনিক সব অভিযোগ এনে বিষোদ্গার করতেও ছাড়ে না। প্রকাশ্যে এরা এমন ভাব দেখায় যেন তারা বাস্তবিকই রুদ্রদেবের গুণগ্রাহী। কিন্তু পেছনে এদের ভিন্ন রূপ। সংখ্যায় এরা অল্প হলেও রটানোর কলা-কৌশলে এরা সিদ্ধহস্ত। কেবল পুলিশ মহল কেন, সব মহলেই এধরনের মানুষের সাক্ষাৎ মেলে। রুদ্র কিন্তু এদের মধ্যে অনেককেই চেনে। এদের পরশ্রীকাতর চরিত্রের কথাও তার অজানা নয়। কিন্তু এ নিয়ে সে কখনও প্রতিবাদ করে না। সে জানে, জোর করে মিথ্যাকে সরিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না। সত্য নিজের মহিমা ও ক্ষমতায়-ই প্রতিষ্ঠিত হয়। রটনাকারীদের এসব কথা যখন তার কানে আসে তখন সে কেবল মৃদু হেসে ব্যাপারটাকে পাশ কাটিয়ে যায়।

রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে রুদ্রর সুনাম-দুর্নাম যাই থাকুক না কেন, রাজনৈতিক মহলে কিন্তু তার দুর্নামের পরিমাণই বেশি। এর একমাত্র কারণ তার নিজের রাজনৈতিক রঙ্ সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দলই স্থির নিশ্চিত নয়। তার কার্যকলাপে কখনও মনে হয় সে এদলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, কখনও বা ওদলের। একালের রাজনীতিতে সরকারী কর্মীদের সঠিক

রাজনৈতিক রঙ্ নিরূপণ করা একটা অবশ্য কর্তব্য ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলসে যাই লেখা থাক না কেন, এদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে সব রাজনৈতিক দলই তাকিয়ে থাকে। বিশেষ করে, পুলিশ বিভাগটির দিকে নজর আরও তীক্ষ্ণ। প্রশাসনের প্রকৃত কর্ণধার যখন এরাই তখন এদের হাতে রাখাই রাজনৈতিক রেসে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া।

ভয়ঙ্কর শক্ত ব্যাপার—ভারি কঠিন কাজ। এ যুগের একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সরকারী কাজ করবে, এটা অন্ততঃ এযুগে আশা করা অন্যায়। অবশ্য যাদের তেমন কোন মতাদর্শ নেই, আত্মোন্নতিই কেবল যাদের একমাত্র আদর্শ, তারা ঝোপ বুঝে কোপ মারে। হাওয়া বুঝে হেলে পড়ে। কিন্তু যারা তা' পারে না মুশকিল তাদের নিয়েই।

রুদ্রদেবের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সরকারী কাজের সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শকে মিশিয়ে ফেলতে সে মোটেই রাজি নয়। আর তাই এই অফিসারটিকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল। কোন দলই তার ওপর খুশি নয়। তা'ছাড়া তার নির্ভিক কাজকর্ম অনেকের কাছেই স্পর্দ্ধা বলে মনে হয়।

সরকারী মহলেও এই মানুষটিকে নিয়ে মতানৈক্য। কেউ প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ বা সমালোচনায় মুখর। কেউ বলে আদর্শ, কেউ বলে আদর্শের ভান।

একবার ফ্লাড রিলিফের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন বিরোধী পক্ষের একজন এম-এল-এ। থানার একজন নিরীহ প্রকৃতির অফিসার একদিন দু'জন কনস্টেবল নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে গেল তাঁর বাড়িতে।

মানী লোকের মান! গ্রেপ্তারের কথা শুনেই তো ভদ্রলোক মহা খাপ্পা। বললেন, কই মশাই, ওয়ারেণ্ট দেখান।

দারোগাবাবু যখন নিরীহ কণ্ঠে বললে যে এই মামলায় সে নিজেই তদন্তকারী অফিসার, কাজেই গ্রেপ্তার করতে ওয়ারেণ্টের প্রয়োজন নেই, তখন ভদ্রলোক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সরকার তথা পুলিশের ওপর কটুক্তি বর্ষণ শুরু করলেন।

এম-এল-এ ভদ্রলোক যেমন ছিলেন একটু রগচটা প্রকৃতির, সেই দারোগাবাবুর সঙ্গী বাঙ্গালী কনস্টেবলদের মধ্যে একজনও ছিল ঠিক তেমনি।

এম-এল-এ ভদ্রলোকের কটূক্তির জবাবে নিরীহ দারোগা যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের বৃথা চেষ্টা করে চলেছে, তখন সেই কনস্টেবলটি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলে না। বিরক্ত চোখে দারোগাবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে সে হঠাৎ বলে ওঠে, এম-এল-এ হোন আর যা-ই হোন, শুধু শুধু গালাগাল পাড়ার এক্তিয়ার আপনার নেই, মনে রাখবেন।

আর যায় কোথায়। একজন সাধারণ কনস্টেবলের কথায় আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো। কনস্টেবলটির দিকে দু'পা এগিয়ে এসে কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলে ওঠেন তিনি, এ যে দেখছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! কার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছো, জানো?

কনস্টেবলটিও কম যায় না। তার মেজাজও তখন আগুন। তাচ্ছিল্যের স্বরে সে জবাব দেয়, জানি—জানি। আপনার চাইতে ঢের ঢের বড় এম-এল-এ আমি দেখেছি।

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারেন না সেই এম-এল-এ ভদ্রলোক। কেউ কিছু বোঝার আগেই সে ঠাস করে কনস্টেবলটির গালে একটা চড় বসিয়ে দেন।

চড় খেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় কনস্টেবলটি। স্তম্ভিত হয় সেই দারোগাবাবুও। দায়িত্ববান একজন এম-এল-এ যে এমনি একটা কাণ্ড করে বসতে পারে তা' সে ধারণা করতে পারেনি। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কনস্টেবলটি রুখে দাঁড়াতেই দারোগাবাবু ও অন্য কনস্টেবলটি তাকে ধরে একরকম জোর করে বাইরে নিয়ে আসে।

সদর থানা থেকে টেলিফোনে খবরটা শুনে এস-পি রুদ্রদেব কয়েক মুহূর্ত চুপ্ করে থাকে। তারপর অনুযোগের স্বরে ইন্সপেক্টর-ইন্-চার্জকে বললে, ঐ ভদ্রলোকটির স্বভাব বরাবরই ঐরকম। ওকে এ্যারেস্ট করতে আপনার নিজের যাওয়াই উচিত ছিল। যাক গে, আপনি আপনার হাতের কাজ ফেলে রেখে এই মুহূর্তে তাঁকে এ্যারেস্ট করে আসুন।

একটু আমতা আমতা করে ইন্সপেক্টর বললে, এক্ষুণি যেতে পারছি না, স্যার। থানার গাড়িটা নিয়ে মেজবাবু একটা তদন্তে গেছে। সে ফিরে এলেই আমি যাচ্ছি!

—নো—নো, দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্র, আপনি এখনই যান। হেঁটেই যান। তাঁকে এ্যারেস্ট করে হাতকড়া পরিয়ে খোলা রিক্সায় থানায় নিয়ে আসুন।

—কিন্তু স্যার, ইতঃস্তত করে ইন্সপেক্টর, একজন এম-এল-এ'কে হাতকড়া পরিয়ে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, হাতকড়া পরিয়ে থানায় এনে ডাইরী করবেন যে—আণ্ডার অর্ডার অফ এস-পি, হি ওয়াজ ব্রট টু দি পোলিশ স্টেশন আণ্ডার হ্যাণ্ডকাফ।

এস-পি'র হুকুম তামিল করে ইন্সপেক্টর। রাস্তার লোকের বিস্মিত দৃষ্টির মধ্যে হাতকড়া পরিয়ে সেই এম-এল-এ ভদ্রলোককে সে নিয়ে আসে থানায়।

শুরু হলো হৈ-চৈ। একটা 'ইস্যু' পেয়ে গেল বিরোধী পার্টি। বিবৃতির ঢল নামলো খবরের কাগজে। এই কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে সরকারকে। পদত্যাগ করতে হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। সরকার পক্ষ কিন্তু রুদ্রর কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট নিয়েই চুপ করে রইলো।

বিরোধী পক্ষ অবশ্য বেশিদিন ধরে এ নিয়ে হৈ-চৈ করতে পারলে না। পারলে না সবকার পক্ষ থেকে কোন কৈফিয়ত আদায় করতে। বিধানসভার অধিবেশন তখন বন্ধ। তাই বিরোধী পক্ষ সুযোগের অপেক্ষায় কিছুদিন চুপ করেই রইলো।

অবশেষে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হতেই বিরোধী পক্ষ একযোগে আক্রমণ করলে সরকার পক্ষকে। অবশ্য তাঁদের দাবী তখন অনেকটা কম। সরকার কিম্বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী ছেড়ে তাঁরা এবার পুলিশ সাহেব রুদ্রকে নিয়ে পড়লে। এই অত্যাচারী অকর্মণ্য পুলিশ অফিসারটিকে এখনই ঐ জেলা থেকে সরাতে হবে। দিতে হবে তাকে কঠিন শাস্তি।

সুযোগ বুঝে সরকারী দলের সেই সমালোচকবৃন্দও কণ্ঠ মেলালো বিরোধীদের সঙ্গে—এই অফিসারটির স্পর্দ্ধা গগনচুম্বী, এর ঔদ্ধত্য সীমাহীন। তা'ছাড়া, পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে এই অফিসারটির আমলেই জেলাব ক্রাইম বেড়েছে। এমন একজন ওয়ার্থলেস অফিসারকে যে কেউ কেউ কেমন করে সাক্‌সেস্‌ফুল অফিসার বলে প্রশংসা করে তা' তারা ভেবে পায় না। একে শাস্তি দেওয়াই উচিত।

একেবারে মিথ্যে বলে নি তারা। রুদ্রর আমলে জেলার ক্রাইম বেড়েছে বৈ কমে নি। প্রশাসনের উচ্চতম মহলে এ নিয়ে জবাবদিহিও করতে হয়েছিল তাকে। রুদ্রর কিন্তু স্পষ্ট জবাব—দেশে যে সমাজব্যবস্থা চালু তাতে ক্রাইম বাড়বে বৈ কমবে না। যতই দিন যাবে ক্রাইম ক্রমেই বাড়বে। একে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পুলিশের নেই। কারণ পুলিশের কর্মক্ষমতার চাইতে সমাজের কারখানায় ক্রিমিন্যালের প্রোডাক্‌শন অনেক বেশি। তবে সাপ্রেস

অর্থাৎ চেপে গিয়ে কাগজে কলমে ক্রাইমের সংখ্যা অনেক কম দেখিয়ে নিজের কর্মনৈপুণ্য জাহির করে সরকারকে সে খুশি করতে পারে। কিন্তু তা সে কিছুতেই করবে না। ক্রাইম চেপে যাওয়ার অর্থ সমাজের সাংঘাতিক ক্ষতি করা, ক্রিমিন্যালদের পরোক্ষে উৎসাহিত করা। ক্রাইম রেকর্ড হলে তেমন একটা ইচ্ছে না থাকলেও পুলিশকে কিছুটা কাজ করতেই হয়। ক্রিমিন্যালরাও বুঝতে পারে যে পুলিশ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নয়। খানিকটা সতর্কও হয় তারা'। নিজের জেলায় সেই চেষ্টাই করে চলেছে রুদ্র। অফিসারদের কাছে তার স্পষ্ট নির্দেশ—ক্রাইম সাপ্রেস করবেন না—কিছুতেই না। কেন ক্রাইম বাড়ছে তার জবাব সরকারকে আমি দেব। আপনাদেব কাছে কেবল আন্তরিক চেষ্টাটুকুই আমি চাই। সফল হলেন কি হলেন না সেটা বড় কথা নয়। ক্রাইম বন্ধ করার চেষ্টাটুকুই আসল।

রুদ্রর এ ধরনের জবাবের পরে উঁচু মহল আর বেশি ঘাঁটায় নি তাকে। তারা বুঝতে পেরেছে যে এই মানুষটি সত্যকে আঁকড়ে ধরে নরকে যেতেও রাজি, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বর্গে যেতে নারাজ।

রুদ্র সম্পর্কে তার সমালোচকদের দেওয়া স্পর্দ্ধা, ঔদ্ধত্য বিশেষণগুলো তাঁদের ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল ছাড়া কিছু নয়। তাঁদের মতে নীতির প্রতি আনুগত্য স্পর্দ্ধারই নামান্তর, আইনের প্রতি একনিষ্ঠতা ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য অনেকের মত রুদ্র 'জো-হুকুম' দলে নাম লেখালে বোধহয় তাঁরা খুশি হতেন। এঁরা বাঘকে ভয় পায় বলে বাঘ কেন শেয়াল হয় না তাই নিয়েই এঁদের যত অনুযোগ।

বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে বিবৃতি দেবার কথা ছিল খোদ্ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। কিন্তু হঠাৎ তিনি অন্য কাজে আটকে পড়লেন। কাজেই সেই দায়িত্ব এসে পড়লো রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদারের কাঁধে।

বিধানসভায় ট্রেজারী বেঞ্চে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অলকা। রুদ্র সম্পর্কে বলতে হবে তাকে। রুদ্রকে ডিফেণ্ড করে জবাব দিতে হবে।

প্রথমটায় কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে ওঠে অলকার। আশ্চর্য ব্যাপার—এই বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে এর আগে অনেকবার সে বক্তৃতা করেছে। কেবল তাই নয়, তার বক্তৃতায় সরকার পক্ষ তো বটেই এমনকি বিরোধী পক্ষেরও কেউ কেউ প্রশংসা করেছে তাকে। কোনদিন তো এমনিভাবে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে নি। আজ তবে কাঁপলো কেন?

কারণটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেন যেন নীচের দিকে তার মাথাটা ঝুঁকে

পড়ে। কিন্তু তা' কেবল মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা উঁচু করে অকম্পিত কণ্ঠে সে বলতে থাকে, এটা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, যে ঘটনা নিয়ে আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এমন উত্তেজিত হয়েছেন, সেই ঘটনার সঙ্গে এই সভারই একজন বিরোধী পক্ষের সদস্য অতি লজ্জাকরভাবে জড়িত। তিনি—

বক্তব্য শেষ করতে পারলে না অলকা। তার আগেই বিরোধী সদস্যরা একযোগে হৈ-হৈ করে উঠে অলকাকে বাধা দিতে থাকেন। তাঁদের সমবেত চিৎকারের মধ্যে অলকার কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। তাঁদের উত্তেজনার কারণ তাঁদেরই একজন সদস্য সম্পর্কে মন্ত্রীর ঐ 'লজ্জাকর' শব্দটির ব্যবহার।

তাঁদের সেই সমবেত চিৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করে অলকা তার বক্তব্য বলে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার কথা কিছুই শোনা যায় না। অবশেষে সে হতাশ হয়ে নিজের আসনে বসে পড়তেই সরকার পক্ষের সদস্যরাও বিরোধীপক্ষের আচরণে প্রবলভাবে আপত্তি জানায়। তাঁদের দাবী, মন্ত্রীকে বাধা দেওয়া চলবে না। তাকে তার বক্তব্য বলতে দিতেই হবে।

শুরু হয় দুই পক্ষের প্রবল বাদানুবাদ। সভার অধ্যক্ষ স্পীকার দুই পক্ষকেই থামাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দশ মিনিটের জন্যে সভার কাজ মুলতুবী ঘোষণা করে সভা ছেড়ে চলে যান।

সভার কাজ আবার শুরু হলে অলকা দাঁড়িয়ে উঠে আবার বলতে থাকে, সেই সদস্যের বিরুদ্ধে ফ্লাড রিলিফের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে একটা মামলা হয়েছে। মামলার তদন্তে গিয়ে একজন অফিসার যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করে তখনই সেই মাননীয় সদস্য রেগে গিয়ে একজন কনস্টেবলকে চড় মারে। এরই পরিণতিতে জেলার এস-পি তাঁকে গ্রেপ্তার করে আনতে হুকুম দেন—

বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য আবার বাধা দেয় অলকাকে। স্পীকার টেবিলের ওপর হাতুড়ী পিটিয়ে তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেও তিনি গলা চড়িয়ে আপন বক্তব্য বলে যেতে থাকেন—এ্যারেস্ট করা, আর একজন সদস্যকে হাতকড়া পরিয়ে থানায় টেনে নিয়ে এসে অপমান করা এক কথা নয়। এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে—

এবার রেগে ওঠেন স্পীকার। কড়া ভাষায় তিনি সেই সদস্যকে বললেন, আপনি বসবেন কিনা বলুন, নইলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্পীকারের ধমকে কাজ হয়। সদস্যটি বসে পড়েন। মন্ত্রী অলকা মজুমদার

আবার বলতে থাকে, সেই মাননীয় সদস্যকে হাতকড়া পরানো হলেও তাঁকে টেনে নিয়ে আসা হয়নি। পুলিশ-গাড়ি না-থাকায় তাঁকে রিক্সায় করে থানায় আনা হয়েছিল।

—কেন তাঁকে হাতকড়া পরানোর হুকুম দিয়েছিল জেলার এস-পি? একজন সদস্য অলকার দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিতেই অলকা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসার সময় তিনি যাতে সঙ্গের অফিসারটিকে আবার চড় মারতে না পারেন তারই জন্যে তাঁকে হাতকড়া পরানো হয়েছিল।

একটু সময় চুপ্ করে থাকে অলকা। বিরোধী সদস্যদের মুখের ভঙ্গি লক্ষ্য করে কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, জেলার এস-পি'র কাজের মধ্যে এই সরকার কোন অসঙ্গতি কিম্বা অন্যায় লক্ষ্য করেনি। তাঁর ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে ঐ জেলার একজন সৎ ও কর্মঠ এস-পি সম্পর্কে এই সভায় অনেক অপমানকর উক্তি করা হয়েছে—

—ইস, কী দুঃখ! বিরোধী পক্ষের দিক থেকে ভেসে ওঠে একটা মন্তব্য।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে থাকে অলকা, আমরা মনে করি তাঁর মত একজন পুলিশ সুপার সত্যিই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের গর্ব। তিনি—

—প্রেমে পড়েছে নাকি? আবার বিরোধী পক্ষ থেকে শ্লেষাত্মক টিপ্পনি।

কথাটা কানে যেতেই বুকটা কেমন যেন কেঁপে ওঠে অলকার। কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। মিথ্যা টিপ্পনি নয়। একদিন ওর প্রেমেই পড়েছিল অলকা। কিন্তু সেটা অতীতের ব্যাপার। আজ তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। একজন মন্ত্রী, আর একজন পুলিশ সাহেব। এখন আর প্রেমের কথা ওঠে না।

মুখে না উঠলেও মনেও কি ওঠে না? বোধহয় ওঠে। অলকার নিজেরই ওঠে! পার্টির কাজ, মন্ত্রীত্বের ব্যস্ততার পরে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে মাঝে মাঝে বারান্দায় ডেক চেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে। বাইরের বিক্ষিপ্ত মনটাকে গুটিয়ে এনে জড়ো করে এক জায়গায়। অবশেষে সেই মন একটির পর একটি প্রশ্ন করে বিব্রত করতে থাকে অলকাকে। সেইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের প্রশ্নের জবাবের চাইতে অনেক শক্ত। বিপাকে পড়লে সেখানে কৌশল খাটানো চলতে পারে। বিরোধী পক্ষের আক্রমণের ধার তীব্র হলে মন্ত্রীদের সাহায্যে ছুটে আসেন সরকারী সদস্যরা। তা'ছাড়া, মাননীয় স্পীকারের

হস্তক্ষেপ তো আছেই। কিন্তু এখানে কেউ নেই। কেউ আসে না তাকে সাহায্য করতে। একা অলকা মনের সেই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে গিয়ে হিমসিম খায়। অতি সাধারণ অথচ ভয়ঙ্কর কঠিন সেই প্রশ্ন। সত্যিই তো, নিজের এতটা বয়স পর্যন্ত সে কী পেয়েছে? পেয়েছে প্রতিপত্তি, পেয়েছে সম্মান, পেয়েছে ক্ষমতা। এগুলোই তো সে চেয়েছিল, কাজেই এর বাইরে অন্য কিছু পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এর বাইবে অন্য কিছু কি সে চায় নি? সত্যি বটে এই পাওয়াগুলোও মানুষেব জীবনে কম নয়। এতে হয়তো সুখ আছে, কিন্তু শান্তি আছে কি? হয়তো আনন্দ আছে, কিন্তু তৃপ্তি আছে কি? না, নেই। অলকা আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছে এগুলো পাওয়ার পরেও কোথায় যেন একটা ফাঁকি থেকে গেছে। সেই ফাঁকির ফাঁক পূরণ করার মত কিছুই যেন আর অবশিষ্ট নেই তার কাছে। যা একদিন ছিল তা' এখন তার নাগালেব বাইরে। সে আজ একা—সম্পূর্ণ একা। এই একাকীত্বেব জ্বালাই যেন এক যাযাবরের বেশ ধরে ছায়ার মত অনুসবণ করে চলেছে তাকে। যাযাবরই বটে। স্থিতি নেই, স্থায়িত্ব নেই, আছে কেবল অস্থায়ী তাঁবুব বাহাব। সেই ছায়াটাই যেন তাকে প্রতি মুহূর্তে স্মবণ কবিয়ে দিচ্ছে—নেই, কিছু নেই তোমার। সব কিছু পেয়েও কিছুই পাও নি তুমি। শীতের শেষের ঝরা পাতার মধ্যে নবীন কিশলয় আজ অন্তর্হিত। তুমি নিঃস্ব, তুমি রিক্ত। এর জন্যে দায়ী তুমি নিজে। জমার ঘরে একটা মস্ত শূন্য ছাড়া আর কিছুই তোমার নেই।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য না জেনে যে সরস মন্তব্যটি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন তার চাইতে বড সত্য বোধহয় অলকার জীবনে আর নেই। কিন্তু তার জীবনে সেই সত্য আজ একান্তই অর্থহীন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে অলকা। বিরোধী সদস্যের সেই শ্লেষাত্মক টিপ্পনি যেন শুনতে পায়নি এমনি ভঙ্গিতে বলতে থাকে, আমার বিরোধী ও অন্যান্য বন্ধুরা যা-ই বলুন কিম্বা যা-ই ভাবুন না কেন ঐ এস্-পিকে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, ঐ সম্পর্কে নতুন করে কিছু অনুসন্ধানেরও কোন প্রয়োজন আছে বলে এই সরকার মনে করে না। আইন তার নিজের পথেই চলছে এবং চলবেও। ঐ অফিসারটিকে ঐ জেলা থেকে সরাবার কোন ইচ্ছাই আপাততঃ সরকারের নেই।

শত চেষ্টা করেও এই ব্যাপারে সরকারপক্ষকে নতি স্বীকার করাতে না পেরে বিরোধী পক্ষ অবশেষে বিধানসভার কক্ষ থেকে একযোগে ওয়াক আউট

করেন। সরকার পক্ষের সদস্যরা বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি তোলেন তাঁদের দিকে তাকিয়ে। মন্ত্রী অলকা মজুমদার গম্ভীর মুখে বসে থাকে নিজের আসনে। মন্ত্রী হিসেবে একজন সরকারী কর্মীর কাজ সমর্থন করে সে সেই কর্মীকে ধন্য করেছে কিম্বা নিজে ধন্য হয়েছে সেই কথাই বোধহয় বসে বসে ভাবতে থাকে।

শক, হূন, পাঠান, মোগলেরা যেমন একদিন এই ভারতবর্ষকে জয় করতে এসে দেশটাকে ভালোবেসে এই দেশেরই বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের মানসিকতার খোঁজ করতে এসে এই ডিপার্টমেণ্টকে ভালোবেসে ফেললে রুদ্রদেব। তার আকাঙ্ক্ষা, এই বিভাগের প্রতিটি কর্মী ডিপার্টমেণ্টকে ভালোবাসুক। একদল রাজনৈতিক কর্মী যদি নিজেদের দলের মুখ উজ্জ্বল করার বাসনায় দলের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে যে ডিপার্টমেণ্ট তার কর্মীদের খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, সেই কর্মীরা কেন ডিপার্টমেণ্টের মুখ উজ্জ্বল করার জন্যে চেষ্টা করবে না? কেন তারা এমন কাজ করবে যাতে ডিপার্টমেণ্টের মুখ মসীলিপ্ত হয়ে ওঠে? কেন তারা বুঝবে না যে ডিপার্টমেণ্টের মুখের ঐ কালি যে তাদের নিজেদের মুখেই এসে পড়ে।

না, তারা বুঝবে না। অতীতেও বোঝে নি, বর্তমানেও বোঝে না, সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও বুঝবে না। তাদের বোঝানোর মত পরিবেশই কেউ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করেনি। যে ডিপার্টমেণ্ট তার কর্মীদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠিটি তুলে দিয়ে বলে—যাও, চরে খাও গে। ধরা পড়লে কিন্তু শাস্তি পাবে। অবশ্য শাস্তি যে পাবেই তার নিশ্চয়তা নেই। বুদ্ধি থাকলে সেই শাস্তি এড়িয়েও যেতে পারে। আর ধরা না পড়লে তো সাধুতার স্ট্যাম্প গায়ে নিয়ে তুমি বুক ফুলিয়ে বেড়াবে। এমন ডিপার্টমেণ্টকে তার কর্মীরা আর যা হোক ভালোবাসতে পারে না কিছুতেই। বাপ যদি ছেলেকে অসততার পথে পয়সা উপাজন করতে শেখায়, তাহলে দু'হাতে পয়সা রোজগার করেও কিন্তু সেই ছেলে বাপকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। ভালবাসতেও পারে না।

এসব কথা যে রুদ্র জানে না তা' নয়। কিন্তু জেনেও যেন জানতে চায় না, বুঝেও যেন বুঝতে পারে না, কারণ হতভাগ্য এই ডিপার্টমেণ্টকে সে এতদিনে মনে-প্রাণেই ভালোবেসে ফেলেছে। নিজের অজান্তেই কখন যেন সে এর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে। এর সামান্যতম সুনামে তার বুকখানা গর্বে ফুলে ওঠে, দুর্নামে ম্লান হয়ে ওঠে তার মুখখানা। কিন্তু গর্বে বুক ফুলে ওঠার মত সুযোগ কোথায় রুদ্রদেবের? এই ডিপার্টমেণ্টের প্রায় সবটাই তো দুর্নামে বোঝাই। তাই সুনামটুকুও দুর্নামের পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় অনায়াসেই।

ডিপার্টমেণ্টের এই দুর্নামের জন্য যে একা এর কর্মীরা দায়ী নয়, তাও রুদ্র জানে। জানে যে এর জন্যে দায়ী এদেশের ঘুণেধরা সমাজ ও সমাজ-ব্যবস্থা, জানে যে এদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক কদাচারও বহুলাংশে এরজন্যে দায়ী, জানে যে এই ডিপার্টমেণ্টের সেই মান্ধাতার আমলের গঠনপ্রণালী ও নিয়মকানুনও কম দায়ী নয়। সর্বোপরি বাহিনীর সেনাপতিদের শৈথিল্য, আদর্শহীনতা ও ক্ষেত্রবিশেষে অসততা তো আছেই।

. এতসব জানা সত্ত্বেও কিন্তু রুদ্র আশা করে, এই ডিপার্টমেণ্টের কর্মীরা একে ভালোবাসবে—মনে-প্রাণে ভালোবাসবে। এর সুখে তারা হাসবে, এর দুঃখে তারা কাঁদবে।

আশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা রুদ্রদেবের! বিস্ময়কর আশা তার! সে কি জানে না সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত দুর্নীতির বিষাক্ত কালসাপ এই বিভাগটিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে? আড়াই হাজার বছর আগে নৃপতি শূদ্রক রচিত সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য মৃচ্ছকটিক গ্রন্থে যে দু'জন উচ্চশ্রেণীর রাজ-প্রহরীকে দেখানো হয়েছে তাদের চরিত্রের সঙ্গে একালের পুলিশের চরিত্রের কি তেমন কিছু তফাৎ আছে? গভীর রাতের অন্ধকারে জেল পালানো নায়ক যখন গরুরগাড়ীতে চেপে পালাচ্ছিল তখন চিনতে পেরেও কেন সেই প্রথম রাজ-প্রহরী তাকে গ্রেপ্তার না করে ছেড়ে দিয়েছিল? কেন সে দ্বিতীয় রাজ-প্রহরীকে মিথ্যে করে বলেছিল যে গরুরগাড়ীর মধ্যে সেই ফেরারী আসামী নেই? দ্বিতীয় রাজ-প্রহরী নিজে ব্যাপারটা যাচাই করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে কেন প্রথম প্রহরী তাকে বাধা দিয়েছিল? অবশেষে দু'জনের ঝগড়া-দ্বন্দ্বের মধ্যে পালিয়ে গেল সেই ফেরারী আসামী।

কালিদাসের শকুন্তলা গ্রন্থে সূচক ও জানুক নামে যে দু'জন রাজ-প্রহরী রাজ-অঙ্গুরী চুরি করার অপরাধে সেই জেলেকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করেছিল

এবং সবশেষে রাজা জেলেকে যে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়েছিলেন তার একটা অংশ বক্‌শিস হিসেবে আদায় করার ইচ্ছায় জেলেকে নিয়ে মদের দোকানে ঢুকেছিল, তারাও তো একালের পুলিশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ট্রেডিশন সমানে চলেছে। হাজার হাজার বছর আগেও যা ছিল, আজও তাই আছে। সামান্য রকমফের ছাড়া আর কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

তা'হলে কি শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক রুদ্রদেব ভট্টাচার্য বাস করছে মূর্খের স্বর্গে? পুলিশ বিভাগের প্রতিটি কর্মী তাদের ডিপার্টমেণ্টকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে, রক্ষা করবে নির্যাতিতকে, ঘৃণা করবে অসততাকে—এসব চিন্তা এই যুগে আকাশ-কুসুম ছাডা আর কি? এধবনেব চিন্তা যারা করে তারা একালে উপহাসের পাত্র। রিয়্যালিজমের বাইরে আইডিয়্যালিজমের কোন স্থান নেই।

হয়ত তা-ই ঠিক। এযুগে চারিদিকেই কেবল রিয়্যালিজমের বন্দনা গান, আইডিয়্যালিজম প্রায় অপাংক্তেয়। তবুও কিন্তু সেই আইডিয়্যালিজমকে আঁকড়ে ধরে থাকার মত মানুষ এখনও মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। আদর্শবাদকে তারা স্থান দেয় বাস্তববাদের অনেক উপরে। উপহাস তাদের টলাতে পারে না, যুক্তি তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারে না, এমনকি স্তুতি পর্যন্ত তাদের ভোলাতে পারে না। চলার পথে সঙ্গীর আশা করে না তারা। একাই এগিয়ে যায়। তারা জানে যে তাদেব ডাক শুনে এগিয়ে আসার মত মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। তাই তাদের একাই এগিয়ে যেতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর এই শেষপাদের মানুষ হয়েও রুদ্র বিশ্বাস করে পুলিশ বিভাগের কর্মীরা একদিন সত্যিকারের মানুষ হয়েই দেখা দেবে। এমন একদিন আসবে যেদিন ঐ হাজার হাজার বছরের ট্রেডিশন ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এমন একদল নতুন মানব গোষ্ঠী যাদের মুখগুলো সত্য ও ন্যায়ের আলোকে উদ্ভাসিত। রুদ্রদেব বিশ্বাস করে সেদিন আসবে—আসবেই। কিন্তু কবে তা' সে জানে না।

মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত বোধ করে রুদ্র। মানুষের মনের হীনতা, নীচতা, দীনতা ব্যথা দেয় তাকে। নিজের বিশ্বাসে যেন চিড় ধরে। টলে ওঠে যেন হিমালয়ের চূড়া। পরমুহূর্তেই নিজেকে বোঝায় সে—না—না, মানুষের ওপব বিশ্বাস হারানো পাপ। পুলিশ বিভাগের এই কর্মীরাও মানুষ। সমাজের বিষের বোঝা কণ্ঠে নিয়ে ওরা এখনও নীলকণ্ঠ হয়ে উঠতে পারে নি। বিষে জর্জরিত হয়ে ওবা নিজেরা এখনও অচৈতন্য। কিন্তু যেদিন ওদের চৈতন্য

ফিরে আসবে, যেদিন ওরা নিজেদের চিনতে পারবে, সেদিন বাস্তবিকই নীলকণ্ঠ হয়ে উঠবে ওরা। বিষ হবে নিষ্ক্রিয়।

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে এমনি বিষে আচ্ছন্ন শত শত কর্মীর মধ্যে শেখর দত্তও একজন। একটা মহকুমা থানার অফিসার-ইন-চার্জ শেখর দত্তর চাকরি হয়েছে অনেকদিন। সরাসরি দারোগায় ভর্তি হয়ে আজও সে দারোগাই রয়ে গেছে। প্রমোশন পেতে হলে যে পরীক্ষায় পাশ করা প্রয়োজন সেই পরীক্ষাই সে দেয়নি। কেউ কিছু বললে গম্ভীর মেজাজে জবাব দেয়—আরে দূর—দূর, ইন্সপেক্টর হয়ে কি হবে? তার চাইতে এই দারোগাগিরিই ভালো। বেশ আছি।

সত্যিই তাই। বেশ আছে শেখর দত্ত। কাজকর্মে তুখোড়, পরিশ্রমীও বটে। মামলার ডাইরী লেখার হাত চমৎকার। আইন-কানুনও ভালোই জানে। এক কথায় একজন সাক্সেস্‌ফুল পুলিশ অফিসার হতে গেলে যে গুণগুলির প্রয়োজন তার সবই আছে শেখরের। কিন্তু তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনেই লুকিয়ে থাকে এমন একটা উদ্দেশ্য যা নাকি তার সেই কর্মকাণ্ডকে করে তোলে নিষ্ফল। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কখনও কোন সৎকাজ করা যায় না। অসৎ পথে পয়সা উপার্জনের ধান্ধায় থাকে বলেই শেখর দত্তর চরিত্রে সেই গুণগুলো থাকা না থাকা প্রায় সমান হয়েই দাঁড়ায়। অন্য অনেক বৃত্তির মত পুলিশী বৃত্তিরও বোধহয় এটাই ট্র্যাজেডি। যারা অসৎ তারা প্রায় সবাই কর্ম-পটু। আর, যারা সৎ তাদের ভেতর একটা বড় অংশই কাজকর্মে অপদার্থ। অসৎ হতে হলেও যতটুকু কর্মক্ষমতার প্রয়োজন তাদের বোধহয় তা-ও নেই। সততা ও কর্মপটুত্বের সহাবস্থান যাদের চরিত্রে আছে তেমন কর্মী খুবই মুষ্টিমেয়। এরা কেবল নমস্যই নয়, এদের আত্মীক শক্তিই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে সাধারণ মানুষের মঙ্গল করে বেড়ায়। বাসুকী নাগের সহস্র ফণা থাকলেও যেমন সে একটিমাত্র ফণার ওপর পৃথিবীটাকে ধারণ করে থাকে, তেমনি এই মুষ্টিমেয় মানুষগুলোর জন্যেই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টটা আজও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শেখর দত্ত মুখে যদিও বলে—আরে বাপু, ইন্সপেক্টর হলেই তো উপার্জন কমে যাবে। দারোগার চাকরির মত এমন রাজার চাকরি আর আছে নাকি? এই বেশ আছি। কিন্তু মনের কোণে যে তার প্রমোশনের লোভ একেবারেই নেই তা' বোধহয় ঠিক নয়। জীবনে অন্ততঃ একটিবার একটা প্রমোশনের মুখ দেখার কামনা প্রত্যেকেই করে। বিশেষ করে সমসাময়িক কর্মীরা যখন

একটির পর একটি প্রমোশনের ধাপ অতিক্রম করতে থাকে তখন প্রমোশন না পাওয়ার দুঃখ বড় বেশি করে মনে বাজে।

এইজন্যেই বোধহয় শেখর দত্ত হঠাৎ একদিন ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষায় বসলো। পড়াশোনা একেবারেই করে নি, তবুও কিন্তু সে বেশ ভালোভাবেই পাশ করলো। কুলোকে বলে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মত স্রেফ টুকেই নাকি পাশ করেছিল শেখর দত্ত। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষায় ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব নয় মোটেই। কেবল একটা পরীক্ষায় নয়, প্রমোশন পেতে গেলে যে সব ট্রেনিং দরকার তাও শেষ করলো শেখর দত্ত। সব কিছু সমাপ্ত। এবার যে কোন দিন লিষ্টে নাম উঠবে তার। বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার—কথাটা মনে করে নিজের মনেই একটু হাসে শেখর। প্রমোশন-দেবী এবার প্রায় তার হাতের মুঠোয়।

জেলার পুলিশ সাহেব রুদ্রদেব শেখর দত্তর চরিত্র সম্পর্কে ভাল রকমেই ওয়াকিবহাল। এই অফিসারটির কর্মক্ষমতার জন্যে শ্রদ্ধা ও তার অসততার জন্যে ঘৃণা—এই দুটোই একসঙ্গে মনে মনে পোষণ করে সে। সাধারণ মানুষ হয়তো একজন কর্মঠ অথচ অসৎ অফিসারকেই বেশি পছন্দ করবে। তারা হয়তো যুক্তি দেখাবে—একজন কর্মঠ অথচ অসৎ মানুষের কাছ থেকে কিছুটা কাজ হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সৎ অথচ অকর্মণ্য লোকের কাছ থেকে কোন কালেই কোন কাজ আশা করা যায় না।

রুদ্র নিজে কিন্তু এই মতে বিশ্বাসী নয়। তার ধারণা, অসততা নামক ব্যাধি কেবলমাত্র একজন মানুষকে নয়, গোটা সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। সুদূর প্রসারী এর ফল। সামান্য কাজ পাওয়ার আশায় একে সমর্থন করা চলে না। তা'ছাড়া, মেজে-ঘসে অকর্মণ্যকে হয়তো একদিন খানিকটা কর্মক্ষম করে তোলাও চলতে পারে, কিন্তু অসৎকে সততার পথে টেনে আনা উজান ঠেলে সাঁতার কাটার মত অতি দুরূহ কাজ। এই ব্যাধি একবার যাকে ধরে তাকে প্রায় কোনদিনই রেহাই দেয় না।

রুদ্রদেব শেখর দত্ত সম্পর্কে বরাবরই সতর্ক ছিল। তার ধারণা, এই অফিসারটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে সে একদিন ডিপাটমেণ্টের এ্যাসেট হয়ে উঠবে। তেমনি মনোভাব নিয়েই রুদ্র চলতো শেখরের সঙ্গে। সে-ই শেখরকে ঐ মহকুমা থানার ও-সি হিসেবে পোস্টিং করেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারলে শেখর দত্ত অন্য ধাতের মানুষ। পানিশমেণ্ট ছাড়া অন্য কোন পথে তাকে বাগে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু

পানিশমেণ্ট দিয়েও কি একজনের চরিত্রের ধারা পাল্টানো যায়? রুদ্রর বিশ্বাস, যায় না। ভয় দেখিয়ে কিম্বা শাস্তি দিয়ে যে যুগে একটা বাচ্চা ছেলের চরিত্রও তেমন একটা সংশোধন করা সম্ভব নয়, সেখানে একজন বয়স্ক লোকের তো কথাই ওঠে না। তা'হলে উপায়?

রুদ্র একটা জেলার পুলিশ সাহেব। ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের চারিত্রিক উন্নতি ঘটানোর কাজ তার নয়। কিন্তু ডিপার্টমেণ্টের উন্নতির চেষ্টা করতে হলে এর কর্মীদের চারিত্রিক উন্নতির প্রয়োজনই সবচাইতে বেশি। সেই কাজটা তবে করবে কে? দেশের সমাজ ব্যবস্থা চোখ বুজে আছে, রাজনীতিবিদেরা এসব ছোটখাটো কাজে মাথা গলাবার সময় পান না, অত্যাচারিত অসহায় মানুষ কেবল চোখের জলের মধ্যে ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয়।

একটা জেলার বিশাল পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি কর্মীর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। রুদ্রর সহকারী আই-পি-এস্ অফিসার প্রকাশ শাস্ত্রীর নিজের চরিত্রেরই সংশোধনের প্রয়োজন। কাজেই তার সাহায্য আশা করাই চলে না। তা'হলে উপায় কি?

রুদ্র নিজের অভিজ্ঞতায় এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের মধ্যে এই সাব-ইন্সপেক্টর পদটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের সংস্পর্শে আসে এরাই। পয়সার লোভে মামলা নষ্ট করা, জুয়াড়ী ও চোলাই মদের ব্যবসায়ী কিম্বা ওয়াগন ব্রেকার ও স্মাগলারদের সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্তের অশুভ আঁতাত যেমন ঘটে এদেরই মাধ্যমে তেমনি ডিপার্টমেণ্টের কৃতিত্ব বলতে যদি এখনও কিছু যৎ-সামান্য চোখে পড়ে তার গৌরবও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদেরই প্রাপ্য। কঠিন বিপদের মুখে বাহিনী নিয়ে যেমন এগিয়ে যায় এরাই তেমনি আবার এদের উপার্জনের অংশই জেলার পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ মহল থেকে নিম্ন মহল পর্যন্ত শিরা উপশিরার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চ মহল সাধারণত বিপদের ভয়ে এদের মাধ্যম ছাড়া স্বাধীন উপার্জনের পথে পা বাড়ায় না, আর নিম্নমহলও এদের সম্মতি ও পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া কিছু করতে পারে না। তাই রুদ্র এই পদটির ওপরই নজর দেয় বেশি। তার প্রধান চিন্তা-ভাবনা এই সাব-ইন্সপেক্টরদের নিয়ে। ডিপার্টমেণ্টের সুনাম-দুর্ণাম প্রধানতঃ নির্ভর করে এদেরই কাজ-কর্মের ওপর।

শেখর দত্তর মত বেপরোয়া অফিসারদের নিয়েই রুদ্রর যত দুশ্চিন্তা। এরা শাস্তির পরোয়া করে না, প্রমোশনের ধার ধারে না। সবকিছু বর্জন করে ঈশ্বর লাভের মত অর্থলাভ ই এদের একমাত্র কামনার বস্তু।

অবশেষে একদিন ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠলো রুদ্রর। সে খবর পেল একটা ভয়ঙ্কর রাহাজানি মামলায় শেখর দত্ত নাকি মোটা টাকার বিনিময়ে মামলাটাকে খারিজ করে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। মামলার ডাইরী লেখার দায়িত্ব যখন শেখর দত্তর হাতে তখন ওস্তাদ ডাইরী লিখিয়ে শেখরের পক্ষে মামলাটাকে অন্য পথে পরিচালিত করা মোটেই অসম্ভব নয়।

খবরটা কানে যাবার পর থেকে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল রুদ্রর। সাধারণ রাহাজানি নয়, একটা গোটা মালবোঝাই লরী রাহাজানি। নেহাত বরাত জোরেই লরী সমেত দু'জন আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল পুলিশ। গাড়ির ড্রাইভার ও ক্লিনারকে মারধোর করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই মামলা নষ্ট করে দেবার খবরে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

জেলার পুলিশ সাহেবের পক্ষে একজন দারোগাকে শায়েস্তা করতে তেমন বেগ পেতে হয় না। পুলিশের কাজই এমন যে তার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তার ওপর কাজের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে তো কথাই নেই। শাস্তি মানুষকে খানিকটা সংযত করতে পারলেও সংশোধন বড় একটা করতে পারে না। এটাই নাকি এ-যুগের মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত। রুদ্রর দৃষ্টি সেই সংশোধনের দিকে। কিন্তু শেখর দত্তর ব্যাপারে আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে মোক্ষম জায়গায় ঘা দিলে রুদ্র। মামলার ডাইরী সময়মত না লেখার অপরাধে শেখর দত্তর ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিংয়ের হুকুম দিলে। ইচ্ছে করলে সে তাকে চাকরি থেকে সাসপেণ্ড করতে কিম্বা অন্যত্র বদলি করতেও পারতো। কিন্তু রুদ্র সেসব কিছু না করে কেবলমাত্র প্রসিডিং করলে তার। কিন্তু এতেই প্রচণ্ড ক্ষতি হলো শেখর দত্তর। তার মনের কোণে প্রমোশনের যে সম্ভাবনা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল তার সমাপ্তি ঘটলো। প্রসিডিংয়ের ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত প্রমোশন তো দূরের কথা লিস্টে তার নামই উঠবে না। একজন কর্মীকে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত করা মস্ত অপরাধ। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তা-ই করতে বাধ্য হলো রুদ্র।

ক্ষেপে উঠলো শেখর দত্ত। পুলিশ সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে গম্ভীর হয়ে থাকে, আর মনে মনে মুণ্ডুপাত করে তার—শালা, সতীপনা দেখিয়ে আমার পেছনে লেগেছে! আরে বাপু, কে কতবড় সতী তা' এই শেখর দত্তর জানতে বাকি নেই। ভেবেছে, ডুবে ডুবে জল খেলে বুঝি কেউ টের পাবে না!

শেখরের কথায় কেউ হয়তো সবিস্ময়ে বললে, তাই নাকি? ঘুস খায় নাকি

বড সাহেব ?

হাতের সিগাবেটে দীর্ঘ টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শেখর জবাব দেয়, ঘুস খায় কিনা জানি না, তবে ঘুস খাওয়াটাই বুঝি একমাত্র অসততা ? আব ঘুস না খেযে নিজেব বউকে তালাক দিয়ে অন্য মেয়েছেলে নিয়ে স্ফুর্তি কবাটা বুঝি সততাব লক্ষণ ?

—ও—সেই মেয়েছেলেটাব কথা বলছো ? শুনতে পাই সে নাকি সাহেবেব দূব সম্পর্কের কোন্ এক আত্মীয়া।

-আবে রেখে দাও—বেখে দাও। বিপাকে পডলে সবাই ওবকম আত্মীয় দেখায়। কোন্ এক ডেটিনিউব বউ। লোকটা জেলে পচছে। আব, সেই সুযোগে উনি তাব বউকে নিয়ে বৃন্দাবন লীলা চালাচ্ছেন। আবে ভাই, তাই যদি হবে তা'হলে নিজেব বউকে নিয়ে ঘর করে না কেন ?

কথাটা মিথ্যে নয়। জেলাব সবাই জানে যে তাদেব সাহেবেব সঙ্গে মেমসাহেবেব বনিবনা নেই। তাবা আবও জানে যে সময় পেলেই তাদেব সাহেব এই সহবেব একজন মিসা-বন্দীব বাড়ি যাতায়াত কবে। উঁচু মহলেব পাবিবাবিক বিষয় নিয়ে নীচুমহলেব কৌতূহল চিবকালেব। তাব মধ্যে যদি কোন স্ত্রী ঘটিত ব্যাপাব থাকে তা'হলে তো কথাই নেই। বিশ্বাস কবাব জন্যেই যেন মন উন্মুখ হয়ে থাকে। হোক্ না তাদেব সাহেব সৎ, হোক্ না সে কর্মঠ, বিবেচক, আদর্শস্থানীয়, কিন্তু তাই বলে যে তার কোনবকম চাবিত্রিক দুর্বলতা থাকবে না তা' কি কেউ হলপ্ কবে বলতে পাবে ?

জেলাব পুলিশ মহলেব অনেকেব মনেব কথাই এই ধবনের। কেউ হযতো মুখে প্রকাশ কবে, কেউ কবে না। একটা ডিপার্টমেণ্টেব পবিচালকেব পক্ষে তাব কর্মীদের সবাইকে সবসময় খুশি বাখা সম্ভব নয়। যাবা তাব ওপব খুশি তারা ব্যাপাবটা পুরোপুবি বিশ্বাস না কবলেও ঢোক গিলে চুপ কবে থাকে। সন্দেহকে মন থেকে তাডাতে পাবে না কিছুতেই। রটনাকারীর জিভেব বিষ গোখবো সাপের বিষেব চাইতেও ভয়ঙ্কব। সাপের বিষেব ওষুধ আছে, কিন্তু মানুষেব জিভেব বিষের কোন ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

রাইটার্সেব পুলিশ ডাইবেক্টরেট থেকে পাঠানো চিঠিখানা পডতে পড়তে খুশি হযে ওঠে রুদ্রদেব। সাত দিনেব একটা পুলিশী ট্রেনিং নিতে দিল্লী যেতে হবে তাকে। তার অনুপস্থিতিতে জেলাব চার্জে থাকবে এডিশনাল এস-পি।

দিল্লীতে ট্রেনিং যা-ই হোক না কেন, এই সুযোগে একটা সপ্তাহ বাইরে

কাটিয়ে আসার কথা ভাবতেই রুদ্রর ভালো লাগে। দিল্লীতে পোস্টেড্ আছে তাদেরই ব্যাচের দেওকীনন্দন ওঝা। উত্তরপ্রদেশের মানুষ দেওকীনন্দন-ই একমাত্র অফিসার যার সঙ্গে রুদ্রর এখনও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। সত্যিকারের ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় দেওকীনন্দন ছিল তাই। লেখাপড়ায় অতিশয় মেধাবী, কথাবার্তায় অতি নম্র ও বিনয়ী। মাউন্ট আবুর ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে থাকতে রুদ্রর মনে হতো পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের চাইতে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চার রুমেই যেন দেওকীনন্দনকে বেশি মানাতো।

সেই মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির দেওকীনন্দনই নাকি এখন একজন বাঘা পুলিশ অফিসার। দিল্লীর পুলিশ মহলে তার নাকি খুব নাম ডাক। তার চিঠিপত্রের ভাব ও ভাষায় রুদ্রও তা' টের পায়। বাস্তবিকই রুদ্রর কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকে। আসল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার আগে কারুর সম্পর্কেই বোধহয় কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না।

হাতে মাত্র দু'টো দিন সময়। এই সময়ের মধ্যে ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না। অগত্যা কিছু গাঁটগচ্চা দিয়ে প্লেনে যাওয়াই ঠিক করলে রুদ্রদেব।

সকাল আটটায় ফ্লাইট। সাতটা নাগাদ একটামাত্র বড় সুট্কেস ও একজন পুলিশ আর্দালি সঙ্গে নিয়ে দম্দম্ এয়ারপোর্টে এসে হাজির হলো রুদ্র। পরনে তার সাদা পোশাক। প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে ঢুকে কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে গিয়ে রুদ্র হাতের টিকিটখানা মেলে ধরতেই একজন ব্যস্ত কর্মী সেটার ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললে, সরি মিস্টার, প্লেনের যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে আটটার দিল্লী-বাউণ্ড ফ্লাইট দশটায় ছাড়বে। একটু পরেই মাইকে এনাউন্সমেণ্ট হবে। কথাটা বলেই কর্মীটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে অন্য কাজে মন দেয়।

বিরক্তি বোধ করে রুদ্র। তার সব প্রোগ্রাম আপ্সেট হয়ে গেল। দিল্লীতে দেওকীনন্দনকে টেলিগ্রাম করে দেয়া হয়েছে। এয়ারপোর্টে সে গাড়ি পাঠাবে। দিল্লীতে তার এ্যাকমোডেশনের ব্যবস্থাও সে-ই করে দেবে। দু'ঘণ্টা পরে দিল্লী পৌঁছলে আবার কোন্ ঝামেলায় গিয়ে পড়তে হবে কে জানে?

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায় রুদ্র। মাত্র সাড়ে সাতটা। এখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি। এই সময়টা এই প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে বসে সে কী করবে? একবার মনে হলো বাড়ি যায়। বাড়ি মানে বারাসাত যেখানে তার মা-বাবা

আছেন। পরক্ষণেই মনে হয়, নাঃ, দরকার নেই। বাড়ি গেলেই দেরি হবার সম্ভাবনা। তা'ছাড়া, রাস্তা-ঘাটের যা অবস্থা কোথায় গিয়ে আটকে যাবে কে জানে! এতগুলো টাকার প্লেনের টিকিটটাই তা'হলে বরবাদ। তাব চাইতে দিল্লী থেকে ফেরার পথে সেখানে গেলেই চলবে। ইচ্ছে করলে তখন একটা দিন সেখানে থাকাও চলতে পারে।

প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে যথারীতি এনাউন্স্‌মেণ্ট—এ্যাটেন্‌শন প্লীজ—ইয়োর এ্যাটেন্‌শন। যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন নম্বর দিল্লীর ফ্লাইট দু'ঘণ্টা পিছিয়ে গেল। প্যাসেঞ্জারদের অসুবিধার জন্যে আমরা দুঃখিত।

আর্দালি কন্‌স্টেবলের জিম্মায় সুটকেসটা রেখে এগিয়ে যায় রুদ্র। এর মধ্যেই চারিদিকে প্যাসেঞ্জারের ভিড। দেশী-বিদেশী নরনারী ঘোরাফেরা করছে চারিদিকে। লাউঞ্জের গদিমোড়া চেয়ারে প্লেনের অপেক্ষায় বসে আছে যাত্রীরা। কান তাদের মাইকের দিকে। কখন তাদের ফ্লাইটের নম্বর ঘোষিত হয়ে তাদের সিকিউরিটি এনক্লোজারের দিকে যেতে অনুরোধ জানানো হবে।

নতুন টার্মিনাল ভবনের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেডাতে থাকে রুদ্র। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে যায় বাড়িটার অন্যপ্রান্তে যেখানে ইণ্টাবন্যাশনাল রুটেব প্যাসেঞ্জারদের মালপত্র পরীক্ষা করার জন্যে কাস্টম্‌স ডিপার্টমেণ্টের কর্মীরা সতর্ক হয়ে বসে আছে। অন্যদিকে সেই মালপত্রের মালিকদের দেহ পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা কবছে এণ্টি-হাইজ্যাকিং স্টাফ। একপাশে ফবেন কারেন্সি ভাঙাবার ব্যবস্থা, অন্যপাশে প্রাইভেট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কাউণ্টাব। আবাব তারই মধ্যে ছোট ছোট সাজানো-গোছানো দোকান যেখানে বিদেশীদের আকর্ষণ কবার ঢালাও ব্যবস্থা।

ঘুরতে ঘুরতে রুদ্র আবার ফিরে আসে প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে। হঠাৎ তাব চোখ পড়ে একখানা ছোট সাইনবোর্ডের দিকে। ভিজিটর্‌স এন্‌ক্লোজার— প্যাসেঞ্জারদের আত্মীয়-স্বজনেরা এই পথে দোতলায় উঠে গিয়ে তাদের প্রিয়জনদের সী-অফ্‌ কবে। কেউ কেউ আবার কেবলমাত্র প্লেনের ওঠা-নামা দেখতেই এখানে আসে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে রুদ্র। বাইরে রানওয়েতে প্লেনের শব্দ। এইমাত্র বোধহয় একখানা প্লেন আকাশ পথে উড়ে চলে গেল। ভিজিটর্‌স এন্‌ক্লোজাব থেকে একদল লোক নীচে নেমে আসছে। এরা বোধহয় তাদেব প্রিয়জনদের সী-অফ্‌ করে ফিরছে। চোখেমুখে বিষাদের চিহ্ন।

ভিজিটর্‌স এন্‌ক্লোজারের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রুদ্র। এত সকালে

প্লেনের ওঠা-নামা দেখার মত লোকের ভিড় নেই। রেলিং ঘেরা বারান্দায় মাত্র তিন-চার জন মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাদের দৃষ্টি বাইরের উন্মুক্ত রানওয়ের দিকে। খোলা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তারা হয়ত তাদের সেইসব প্রিয়জনদের কথা মনে করছে যারা নাকি একটু আগেও ছিল তাদের মধ্যে। এই মুহূর্তে তারা আকাশ পথে কত দূরে কোন্ প্রান্তরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে কে জানে ?

বারান্দায় রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রুদ্রও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে রানওয়ের খোলা প্রান্তরের দিকে। এখানে-ওখানে দু'চারখানা প্লেন, কোনটা তেল নিচ্ছে, কোনটা বা তৈরি হচ্ছে যাত্রী বোঝাই হয়ে উড়বার জন্যে।

কি মনে করে রুদ্র ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে আরও খানিকটা ওপরে উঠতে থাকে। এখানে আর একটা বারান্দা। রানওয়ের পুরো দৃশ্য চোখে পড়ে এখান থেকে।

রুদ্র সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়াতেই একজন মহিলার দিকে নজর পড়ে তার। মহিলার ধপধপে সাদা খোলের শাড়ির আঁচলটা হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছে। চুলের খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে ঘাড়ের ওপর।

প্রথমটায় রুদ্র মহিলাটিকে ঠিক নজর করে দেখেনি। অলসমন্থর পায়ে সেও এসে দাঁড়ায় রেলিংয়ের পাশে। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। মাথার ওপর খোলা আকাশ, সামনের প্রান্তরে বিরাট রানওয়ে।

হঠাৎ মহিলাটির দিকে নজর পড়তেই চম্‌কে ওঠে রুদ্র। রানওয়ের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে নবনীতা। অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

সেই মুহূর্তে মনটা যেন কেমন করে ওঠে রুদ্রর। নবনীতা –তার বিবাহিতা স্ত্রী নবনীতা। অনেকদিন পরে সে দেখলো তাকে। সেই পরিবেশে নবনীতাকে বড়ই সুন্দর লাগছিল রুদ্রর। খোলা আকাশের নীচে উদাস দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নারী। তার কপালের চুলগুলো হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছে। শুভ্রবসনা সেই নারী যেন বিশ্ব সংসারের সবকিছু ভুলে গিয়ে কোন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। সাদা খোলের শাড়ি ঘেরা তার ঋজু দেহটি সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে। পেলব দু'খানি হাত আলতোভাবে প্রসারিত রয়েছে রেলিংয়ের ওপর।

রুদ্র সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে নবনীতার ধ্যান-সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক চোখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে তাকে। সহসা তার মনে হয় সে যেন চুরি করে একটি নারীর রূপসুধা পান করছে। এই

সময় এখানে অন্যকেউ এসে পড়লে তার চোখে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দৃষ্টিকটু ঠেকবে।

হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হয় নবনীতার। ঘাড় ফিরিয়ে রুদ্রর দিকে তাকাতেই তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে অপার বিস্ময়। এই সময় এই অবস্থায় সে নিশ্চয়ই রুদ্রকে আশা করে নি। হাতের ছোট্ট রুমালে তাড়াতাড়ি নিজের চোখ দু'টো মোছার চেষ্টা করতেই রুদ্র বুঝতে পারে নবনীতা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিল। কিন্তু কেন? কার বিরহে এই বিরহিনী নারী এখানে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল? কে সে?

কথাটা মনে হতেই বুকেব মধ্যে কেমন যেন এক ধরনের জ্বালা অনুভব করে রুদ্র। মুখখানা গম্ভীব হয়ে ওঠে তার। নবনীতার চোখের জলটুকু আগে লক্ষ্য করলে রুদ্র হয়তো এখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে যেমনিভাবে এসেছিল তেমনি ভাবেই নিঃশব্দে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করতো। কিন্তু এখন আর তা হয় না।

ধীর পায়ে রুদ্র এগিয়ে যায় নবনীতার দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পরেও মানুষের মনে সময় সময় যে রেশটুকু থেকে যায় তেমনি মুখ নিয়েই অপলক চোখে নবনীতা তাকিয়ে থাকে রুদ্রর দিকে।

দীর্ঘকাল পরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রী। রুদ্রর মনে হয় যার সঙ্গে একদা তার বিয়ে হয়েছিল এ যেন সেই নবনীতা নয়। ভেতরের খবর এখনও সে জানে না, কিন্তু বাইরে এ যেন অন্য কোন নবনীতা। গায়ের রংটা আরও ফর্সা হলেও চেহারাটা অনেক শুকিয়ে গেছে। মুখে সেই উগ্র প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। এমনকি পাউডারের চিহ্ন আছে কি নেই তাই প্রায় বোঝা যায় না। গলায় একগাছা সরু সোনার চেন। কানের হীরে বসানো বড় বড সোনার রিং দু'টোর বদলে ছোট্ট টব জাতীয় কিছু। সারা মুখে এমন একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব যা নাকি রুদ্র এর আগে কখনও দেখে নি নবনীতার মুখে। এব সঙ্গে গায়ের সাদা ব্লাউজ ও সাদা খোলের শাডিখানা চমৎকার মানিয়েছে। সব মিলিয়ে সেই উগ্র আধুনিকতার বদলে এমন একটা শুচিশুভ্র ভাব যা নাকি মানুষের মনকে স্বাভাবিক ভাবেই নাড়া দেয়। এ যেন হাস্যে লাস্যে মেতে ওঠা যৌবনবতী এক নারীর জায়গায় দেখা দিয়েছে শান্ত সংযত এক বৈরাগ্যময়ী নারী মূর্তি।

কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে নবনীতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনের সেই ভারটুকু যেন অনেকটা কমে আসে রুদ্রর। মৃদু কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস

করে, কেমন আছো ?

দীর্ঘদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথম সংলাপ। জবাব দিতে গিয়ে প্রথমটায় নীচের ঠোঁটখানা থর থর করে কেঁপে ওঠে নবনীতার। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নেয় সে। তারপর রুদ্রর চাইতেও মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, ভালো।

—এখানে বুঝি কাউকে সী-অফ্ করতে এসেছিলে ?

—হ্যাঁ, বাবাকে।

কথাটা কানে যেতেই রুদ্রর মনটা অকস্মাৎ হাল্কা হয়ে ওঠে। মনের সংকীর্ণতার জন্যে নিজের ওপরই রাগ হয়। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে আবার বললে, তাই বুঝি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে ?

নবনীতা তাড়াতাড়ি হাতের রুমালটা আর একবার নিজের চোখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে কোন জবাব না দিয়ে কেবল মাথা নীচু করে।

—কোথায় গেলেন তিনি ?

মাথা তুলে জবাব দেয় নবনীতা, বম্বে।

—একটু আগে যে প্লেনখানা ছেড়ে গেল সেখানাই বুঝি বম্বের প্লেন ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় নবনীতা। রুদ্র জিজ্ঞেস করে, অফিসের কাজে গিয়েছেন বোধহয় ?

—হ্যাঁ।

—ক'দিনের জন্য গিয়েছেন ?

—দিন পনেরো।

একটু সময় চুপ্ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করে রুদ্র, বাড়িতে তোমার মা কেমন আছেন ?

জবাব দিতে খানিকক্ষণ সময় নেয় নবনীতা। তারপর বললে, ভালো-মন্দ মিশিয়ে একরকম।

—কেন, মন্দ কেন ?

—হার্টের রুগী। কখনও ভালো থাকেন, কখনও মন্দ।

আর কোন বলার কথা খুঁজে পায় না রুদ্র। এতক্ষণ ধরে সে কেবল প্রশ্নই করে গিয়েছিল, আর নবনীতা কেবল জবাব দিয়ে গেছে। প্রাণহীন জবাব যেন। দিতে হয় বলেই দিয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। এমনিভাবে বেশিক্ষণ কথা চালানো যায় না। ভালোও লাগে না।

ঠিক এমনি সময় একদল অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে হৈ-হৈ করে ওপরে উঠে

আসতেই রুদ্র নবনীতাকে বললে, চলো নীচে যাই।

নবনীতা কোন জবাব না দিয়ে রুদ্রর পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

ছোট সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দায় নেমে আসে তারা। এখানেও একদল ছেলে-মেয়ের ভিড়, তবে জায়গাটা বড় বলে ভিড় তেমন মনে হচ্ছিল না। রেলিং ঘেঁসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ উভয়েই তাকিয়ে থাকে রানওয়ের দিকে। রুদ্র নবনীতার কাছ থেকেই কিছু প্রশ্ন আশা করছিল, কিন্তু তা' না পেয়ে যখন ভাবছিল সে কী করবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই নবনীতা জিজ্ঞেস করে, এখানে কোন ডিউটি আছে নাকি ?

—না—না, ডিউটি নেই। আমি দিল্লী চলেছি।

—বেড়াতে ?

মুখে হাসি ফুটিয়ে রুদ্র বললে, বেড়াতে যাবার সময় কোথায় ? সাত দিনের একটা ট্রেনিং নিতে দিল্লী চলেছি।

—ক'টায় ছাড়বে তোমার প্লেন ? জিজ্ঞেস করে নবনীতা।

—এই তো সময় হয়ে এলো। সময় মতো প্লেন ছাড়লে তো তোমার সঙ্গে এই দেখাই হতো না। আটটার প্লেন ছাড়বে দশটায়। বলেই রুদ্র তার হাতঘড়ির দিকে তাকায়।

নবনীতাও হাত ঘুরিয়ে তার ছোট্ট হাতঘড়িটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, এখন তো সবে সাড়ে আটটা। এখনও তো দেড় ঘণ্টা বাকি।

—হ্যাঁ, তা বটে। অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে জবাব দেয় রুদ্র। প্লেন ছাড়তে এখনও দেড় ঘণ্টা বাকি, আর সে কিনা বলছে, সময় হয়ে এলো। নবনীতা তার এই ভুলটুকু ধরিয়ে দেওয়াতে মনে মনে খুশিই হয় সে। নবনীতা বোধহয় আরও কিছুক্ষণ চাইছে তার এই সান্নিধ্যটুকু। কথাটা ভাবতেই ভালো লাগে রুদ্রর।

প্যাসেঞ্জার এন্‌ক্লোজারের ভিড় আরও বেড়ে উঠেছে। বিরক্তি লাগে রুদ্রর। এক সময় সে নবনীতাকে বললে, এখানে ভালো লাগছে না। বড় ভিড়। তার চাইতে চলো অন্য কোথাও যাই।

—এখানে ফাঁকা জায়গা কোথায় পাবে ? এতক্ষণে একটু ম্লান হাসি নবনীতার পাতলা ঠোঁট জোড়ার ফাঁকে একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

একটু সময় চিন্তা করে রুদ্র হঠাৎ বলে ওঠে, চলো, এয়ারপোর্ট রেঁস্তোরায় গিয়ে বসি।

একমুহূর্ত দ্বিধা করে নবনীতা। কি যেন একটু ভাবে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, চলো।

দোতলায় রেঁস্তোরার দিকে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নবনীতার কথাই ভাবতে থাকে রুদ্র। কী দারুণ পরিবর্তন! চেহারায়, সাজগোজে, কথাবার্তায় কী সাংঘাতিক পরিবর্তন ওর! কে বলবে এই মেয়েটিই সেই নবনীতা?

প্রায় অন্ধকার রেঁস্তোরার এককোণে মুখোমুখি বসে রুদ্র ও নবনীতা। সামনে তাদের দু'কাপ মাত্র চা। রুদ্র চা ছাড়া আর কিছু খেতে পীড়াপীড়ি করেছিল নবনীতাকে, কিন্তু নবনীতা রাজি হয়নি। ম্লান স্বরে রুদ্র জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বাড়ী থেকে ব্রেকফাস্ট করে এসেছো নাকি?

ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিল নবনীতা, না।

—তবে কিছু খেতে চাইছো না কেন?

—আজকাল সকালে স্নান করার আগে একমাত্র চা ছাড়া আর কিছু খাই না। স্নান সেরে সামান্য পুজো-অর্চনার আগে চা ছাডা আর কিছু যে সে খায় না, সেই সত্যি কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলে না নবনীতা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে রুদ্র হাল্কা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এম-এ'টা পাশ করেছো নাকি?

মুখের কাছ থেকে কাপটা নামিয়ে রেখে জবাব দেয় নবনীতা, না, সে সুযোগ আর হলো কোথায়?

—কেন, চাকরি-বাকরির মধ্যে নিজেকে আটকে ফেলেছ বুঝি?

তেমনি ম্লান হেসে নবনীতা বললে, না তাও নয়, সময় কাটাবার জন্যে তেমনি একটা ইচ্ছে অবশ্যি ছিল, কিন্তু বাবা রাজি হননি।

—তা'হলে বুঝি সেই খেলা-ধূলো, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই সময় কাটাচ্ছো?

জবাব দিতে গিয়ে একটু সময় নেয় নবনীতা। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, তা' করতে পারলে তো ভালই হতো, কিন্তু তাও পারি না আজকাল।

—কেন? কৌতূহলী হয়ে ওঠে রুদ্র।

—ওসবও আজকাল আর ভালো লাগে না।

—তবে সারাদিন বাড়ি বসে কী করো?

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় নবনীতা, কী আর করবো? লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বইপত্র নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। ওতেই আজকাল সময় কেটে যায়।

ভাবতে থাকে রুদ্র—মানুষের কি পরিবর্তন! যে নবনীতা নিজেদের

বাড়ীতে এতবড় একটা লাইব্রেরী থাকতেও সেদিকে কোনকালে ঘেঁসতো না, তারই কিনা এখন সময় কাটে সেখানে বইপত্রের মধ্যে। সম্ভবত, ঐ বইপত্রই এখন তার একমাত্র সঙ্গী।

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে নবনীতা জিজ্ঞেস করে, বারাসাতে যাও? মা-বাবা কেমন আছেন?

জবাবে রুদ্র বললে, নিয়মিত যেতে পারি কোথায়? তবে সুযোগ পেলেই যাই। মোটামুটি ভালই আছেন তাঁরা।

—বীরবাহাদুর আছে তো?

ম্লান হেসে জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ, আছে। ও-ই তো এখন আমার একমাত্র ভরসা। গৃহিনী, রাঁধুনী, চাকর, বাজার সরকার, এক কথায় আমার সংসারের সবকিছুই তো এখন ঐ বীরবাহাদুর। কথাটা শেষ করে একটু জোরেই হেসে ওঠে রুদ্র।

নবনীতা কিন্তু হাসে না। মাথা নীচু করে খালি চায়ের কাপটা নিয়ে নাডাচাড়া করতে থাকে। কি যেন বলতে গিয়েও মুখফুটে বলতে পারে না।

আশ্চর্য ব্যাপার! দীর্ঘ দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা। এই সময়ের মধ্যে কতই না পরিবর্তন ঘটেছে তাদের মনোজগতে। কত বেদনা, কত অভিযোগ-অনুযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে তাদের মনের মধ্যে। আজ এমনি আকস্মিকভাবে দু'জনের দেখা হতেই একে অন্যের কত খবরই না নিচ্ছে, কত কথাই না বলছে। কিন্তু তাদের সেই পুঞ্জীভূত অভিযোগ-অনুযোগ নিয়ে একটি কথাও বলছে না কেউ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যাপারটি অতি সতর্কভাবে উভয়েই পরিহার করে চলেছে। ঐ প্রসঙ্গ কেউই টেনে আনছে না। ওটা যেন ওদের কাছে কোন প্রসঙ্গই নয়, কিম্বা ও ধরনের কোন ঘটনা ওদের জীবনে যেন কোনকালে ঘটে নি। এমনি স্বাভাবিক ভাবে সেই রেঁস্তোরার এক নিভৃত কোণে বসে নীচু কণ্ঠে কথা বলে চলেছে একজোড়া অভিমানী নর-নারী। অনুচ্চারিত মনের কথা মনেই থেকে গেল তাদের। বলা আর হলো না বলার কথা।

একটা সিগারেট ধরায় রুদ্র। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠে বললে, সাড়ে ন'টা বাজলো। এখনই হয়তো আমাদের ফ্লাইটের এ্যানাউন্সমেন্ট হবে। চলো নীচে যাই।

—হ্যাঁ চলো, চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে নবনীতা বললে, আমাকেও এখনই যেতে হবে। ড্রাইভার বেচারা বোধহয় গাড়ির ভেতর বসে ছট্‌ফট করছে।

দোতলার সিঁড়ি ভেঙে প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে নামতে নামতে রুদ্র জিজ্ঞেস করে, ড্রাইভার কেন? তুমি নিজে আর গাড়ি ড্রাইভ করো না?

মাথা নীচু করে জবাব দেয় নবনীতা, না, অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি—

—কেন?

—ভালো লাগে না।

রুদ্র আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। দু'জনে নীচে এসে দাঁড়ায়। নবনীতা মুখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকের ঘোষক দিল্লীর ফ্লাইটের কথা ঘোষণা করে যাত্রীদের সিকিউরিটি এন্‌ক্লোজারের দিকে যেতে অনুরোধ করে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে রুদ্র। হাতে আর সময় নেই। টিকিট চেক্ করিয়ে স্যুট্‌কেসটা এয়ার পোর্টের কর্মচারীদের হাতে তুলে দিতে হবে। তারপর যেতে হবে সিকিউরিটি চেক করাতে।

নবনীতা মৃদু কণ্ঠে বললে, আর দেরি করো না তুমি। আমি এবার যাই।

—যাবে? রুদ্র তাকায় নবনীতার দিকে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, এতক্ষণই যখন রইলে তখন আর একটু সময় থেকে আমাকে বিদায় দিয়েই যাও না। দিল্লীর প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে অনেকের আত্মীয়স্বজনই তো এতক্ষণে ওপরে ভিজিটর্স্ এনক্লোজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে। আমাকে বিদায় দিতে যখন কেউ আসে নি তখন তুমিই না হয় গিয়ে একবার দাঁড়ালে।

কথাটা মনে হলেও মুখে কিন্তু সে তা' প্রকাশ করতে পারলে না। এক ধরনের লজ্জা এসে ঘিরে ধরলে তাকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে নবনীতার শান্ত সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, বেশ যাও।

নবনীতা একবার মুখ তুলে তাকায় রুদ্রর দিকে। তারপর কোন কথা না বলে ধীর পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

বিরাট প্লেনখানা দূরে রানওয়ের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রলি-বাসে চেপে প্যাসেঞ্জারেরা চলেছে সেই দিকে। টারমিন্যাল বিল্ডিংয়ের দোতলায় ভিজিটর্স্ এন্‌ক্লোজারে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ছে নর-নারীরা। রুদ্রদেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে সেই দিকে তাকাতেই সহসা তার চোখে পড়ে ওপরে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে নবনীতা। তার কপালের চুল ও সাদা শাড়ির আঁচল হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছে।

পুলিশ বাহিনীর কর্মীদেব কাছে জেলার পুলিশ সাহেবের নৈতিক চবিত্রেব মূল্য খুবই বেশি। তার সেই চরিত্রের মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে তা'হলে সেই পথে অসৎ সাবর্ডিনেটরা যেমন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজে বেড়ায়, তেমনি যারা সৎ, যারা কর্মঠ তারাও ভয়ানক নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। সৎকে অসততাব পথে ঠেলে দিতে, কর্মক্ষমকে অকর্মণ্য কবে তুলতেও পুলিশ সাহেবেব নৈতিক চরিত্রের সেই ফাঁকের ভূমিকা যথেষ্ট। এমনকি, তাব চবিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বদনামও জেলার পুলিশবাহিনীর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কবতে পাবে, ডি-মবালাইজ করে দিতে পারে একটা শৃংখলাবদ্ধ বাহিনীকে।

মিসা-বন্দী দীপক মৈত্রের স্ত্রী সুস্মিতা ও জেলার পুলিশ সাহেব রুদ্রকে নিয়ে পুলিশ মহলের আনাচে-কানাচে যে ধরনেব কানাঘুসা চলে তাব কিছু কিছু রুদ্রর কানেও এসে পৌছয়। ব্যথায় মনটা টনটন করে ওঠে রুদ্রর। সে ভেবে পায় না, মানুষ এত নীচ হয় কেমন করে? মানুষেব চিন্তা ভাবনাব গতি এমন পঙ্কিলতাব দিকে ধায় কেন? সুস্মিতা বৌদিকে সে শ্রদ্ধা কবে। তাই সে সময় পেলেই তার বাড়ি যায় কঠিন-কঠোব পুলিশী কর্মকাণ্ডের হাত থেকে কিছু সময়ের জন্যে পরিত্রাণ লাভের আশায়। তার সঙ্গে গল্প করে, ছোট্ট তুতুনের সঙ্গে হৈ-হৈ করে পুলিশী জীবনেব একঘেয়েমিব মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্যের স্বাদ পায় রুদ্র। আব এই ব্যাপারটাকেই কিনা ডিপার্টমেন্টের 'কর্মীবা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা কিম্ভুতকিমাকার করে তুলেছে! এই মানুষ-গুলোকে নিয়েই সে ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বোনে! এরাই নাকি একদিন গড়ে তুলবে এমন এক আদর্শ পুলিশ বাহিনী যাদের নিয়ে জনসাধারণ গর্ব কববে!

দারুণ দমে যায় রুদ্র। তার কল্পনার অপমৃত্যু ঘটতে চলেছে নাকি? এদের মত একদল হীন চরিত্রের মানুষকে দিয়ে সত্যি সত্যিই কি সে একদিন তার কল্পনাব পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট গড়ে তুলতে পারবে?

কিন্তু কেন সে এদের হীন চবিত্রের মানুষ বলছে? মানুষ কি হীন চরিত্রের হয়েই জন্মায়? না, কখনই না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাকে হীন করে তোলে। পুলিশ বিভাগে যেমন কিছু সৎ চরিত্রের মানুষও আছে তেমনি

অভাব নেই অসৎচরিত্রেরও। ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সেই অসৎ মানুষগুলো অনেক কাজ-কারবার করেই ডিপার্টমেণ্টকে মসীলিপ্ত করে তোলে। তাই আজ একজন অনাত্মীয় মহিলার সঙ্গে তার এই হঠাৎ গড়ে ওঠা সম্পর্ককে যদি কেউ অন্য চোখে দেখে তা'হলে বোধহয় তাকে খুব বেশি দোষ দেয়া চলে না।

এমনি ধরনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে রুদ্র কখন অজান্তেই হাত্‌ড়ে বেড়াতে থাকে নিজেরই মনটাকে। খুঁজতে থাকে মনের আনাচ-কানাচ। সুস্মিতা বৌদি তার দীপকদার স্ত্রী। তাকে সে শ্রদ্ধা করে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেটাই কি সব ? তার বাইরে কি আর কিছু নেই ?

সহসা দারুণ চম্‌কে ওঠে রুদ্র। জলের তলায় হাতড়ে মাছ ধরতে গিয়ে হাতের মুঠোয় যদি একটা সাপ উঠে আসে তা'হলে মানুষের যে মনের অবস্থা হয়, এ যেন অনেকটা তাই। এর আগে এমনি করে নিজের মনের খবর জোগাড় করার চেষ্টা তো সে করে নি কোনদিন। করলে হয়তো আজকে এমনি চম্‌কে উঠতে হতো না তাকে।

না—না, এ কিছুতেই চলতে পারে না। সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্ এমন কোন কাজই তার করা উচিত নয় যাতে ডিপার্টমেণ্টের কর্মীরা তার সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণা মনে মনে পোষণ করতে পারে। এতে তার ব্যক্তিগত লোকসান হয়তো কানাকড়িও নয়, কিন্তু ডিপার্টমেণ্টের পর্বতপ্রমাণ লোকসান। পুলিশ প্রশাসনে জেলার পুলিশ পরিচালকের ওপর শ্রদ্ধা হারানো আর মাতাল মাঝির নৌকোয় চেপে স্রোতস্বিনী পাড়ি দেয়া একই কথা। ভরসা নেই কোনটাতেই।

দাস্ ফার এ্যাণ্ড নো ফারদার—। যা হবার হয়েছে, আর নয়। সুস্মিতা বৌদির ওখানে আর যাওয়া উচিত নয়। সে হয়তো দুঃখ পাবে, কিন্তু রুদ্র আর সেখানে যেতে পারে না। নিজের মনের এই নেমকহারামি সে বরদাস্ত করবে না কিছুতেই। চোর বলে ধরা না পড়লেও সন্দেহ যখন একবার হয়েছে তখন আর পরিত্রাণ নেই। এমনকি সন্দেহ না হলেও ডিপার্টমেণ্টের স্বার্থে সুস্মিতা বৌদির সংশ্রব ত্যাগ করতেই হতো তাকে।

দীপকদার বাড়ি যাওয়া সত্যিই ছেড়ে দিলে রুদ্র। তবে সুস্মিতা বৌদির জন্যে যতটা নয়, ঐ ছোট্ট তুতুনকে দেখতে মাঝে মাঝে বড়ই ইচ্ছে করে তার। কঠিন সংযমে মনের লাগাম টেনে ধরে সে। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। তবুও কিন্তু সময় সময় অবাধ্য মন লাগাম-ছাড়া ঘোড়ার মত সেই দিকেই দৌড়াতে থাকে। তাকে বাধা দেবার সাধ্য হয় না রুদ্রর।

স্মিতা বৌদি রুদ্রর চোখে এক আশ্চর্য চরিত্রের নারী। এদেশে এমন অনেক স্ত্রী-ই আছে যারা তাদের স্বামীকে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করে। আবার এমন স্ত্রীরও অভাব নেই যারা তাদের স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা একটি নারীর মধ্যে স্বামীর ওপর এমন গভীর শ্রদ্ধা ও নির্ভরশীলতা বড় একটা চোখে পড়ে না। সেই সঙ্গে সবকিছুর ওপরেই কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গি তার সেই চরিত্রের মাধুর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। আসক্তিহীন থেকে সংসার ধর্ম পালনের যে মহান ভারতীয় ঐতিহ্য তা-ই যেন ফুটে উঠেছিল স্মিতার চরিত্রে। স্মিতা সম্পর্কে রুদ্রর মনে এই আকর্ষণটুকুই ছিল সবচাইতে প্রবল।

মানুষের জীবনে 'আউট্ অফ সাইট্ আউট্ অফ মাইণ্ড্' কথাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও একেবারে বোধহয় মিথ্যে নয়। নবনীতার সঙ্গে রুদ্রর দীর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। তাকে ভুলে যাবার প্রশ্ন অবশ্য ওঠে না, কিন্তু তাকে নিয়ে একটা ছোট্ট সুন্দর সংসার গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রায় বাতিল করেই দিয়েছিল রুদ্র। অভিমানের বাষ্পস্তরের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে। কিন্তু সেদিন এয়ারপোর্টে নবনীতার সঙ্গে সেই হঠাৎ দেখা হবার পর থেকেই মনেব সেই একান্ত গোপন ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। নবনীতার কথাবার্তা, চালচলনের সেই পরিবর্তন রুদ্রকে কেবল বিস্মিতই করে তোলে নি, অভিভূত করেছিল তাকে। সেই মুহূর্তে তার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ যেন সেই আগের নবনীতা নয়। একই কাঠামোর ওপরে একটা নতুন মানুষ যেন আবির্ভূত হয়েছিল। সেদিন একটা মস্ত সুযোগ হাতে পেয়েছিল রুদ্র। ইচ্ছে করলেই সে সেদিন আহ্বান জানাতে পারতো তাকে। হয়তো সাড়াও মিলতো। কিন্তু তা সে পারেনি। মনের ইচ্ছে ব্যক্ত করতে পারে নি তাব কাছে। না-বলা কথা না-বলাই থেকে গিয়েছিল। কেমন যেন একটা বাধা এসে তার সেই বলার ইচ্ছাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। অবশেষে অনুশোচনা জেগেছিল রুদ্রর মনে। বিশেষ করে ট্রলি বাসে চেপে প্লেনের দিকে যাবার সময় খোলা আকাশের নীচে নবনীতার সেই স্থির মূর্তিখানি বড়ই করুণ মনে হচ্ছিল তার। সেই দিকে তাকিয়ে রুদ্র মনে-মনে বলেছিল, ভুল করেছি আমি —মস্ত ভুল করেছি।

ইদানীং অবসর মুহূর্তে মাঝে মাঝেই নবনীতার কথা মনে পড়ে তার। সে যেন কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নিজেকে রুদ্রব উপযুক্ত করে তুলে এখন যেন তার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। রুদ্রর সাগ্রহ আহ্বানের অপেক্ষাতেই

যেন রয়েছে সে। কিন্তু রুদ্র পারে নি তাকে ডাকতে, পারেনি তাকে নিজের কাছে টেনে নেবার আশ্বাস দিতে।

সেদিন পুলিশ অফিসে ঢুকেই রুদ্র ডেকে পাঠায় এ্যাডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রীকে। প্রকাশ আসতেই জিজ্ঞেস করে রুদ্র, কাল কখন মাটিরগড় থেকে ফিরলেন ?

রুদ্রর সামনে চেয়ারে বসতে বসতে জবাব দেয় প্রকাশ শাস্ত্রী, তা' প্রায় রাত ন'টা বেজে গেল। আপনি বিশ্রাম করছিলেন বলেই তখন আর আপনাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করিনি।

—করলেই পারতেন। রাত দশটা নাগাদ রেঞ্জ ডি-আই-জি খবরটা জানার জন্যে টেলিফোন করেছিলেন। আমি বললাম, আপনি তখনও সেখান থেকে ফেরেন নি।

জেলার পশ্চিমপ্রান্তে শক্তিপুর থানা এলাকার মধ্যে মাটিরগড় একটি বর্দ্ধিষ্ণু গাম। মধ্যবিত্তের বাস সেখানে। সেই গ্রামেই আগের দিন রাত্রে ওখানকাব হাইস্কুলের হেডমাষ্টার খুন হন। ভদ্রলোক একটা ব্যক্তিগত কাজে পাশেব গাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। পথের মধ্যে তাকে খুন করে তার হাতের রিস্টওয়াচ ও আংটি নিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়েছে। এই নিয়ে পরের দিন সকাল থেকেই গোটা তল্লাটে হৈ-চৈ। একদল বলছে এই খুনেব পেছনে রাজনীতি আছে, অন্য দল বলছে এটা সাধারণ ক্রিমিন্যালদের কাজ।

রুদ্র প্রকাশকে জিজ্ঞেস করে, কি বুঝলেন ?

জবাব দেয় প্রকাশ, দেখেশুনে তো আমার পলিটিক্যাল মার্ডার বলেই মনে হলো, স্যার। পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে সাধারণ ক্রিমিন্যালদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টাতেই ঘড়ি আংটি খুলে নিয়েছে।

—আসামীদের নাম-ধাম পেয়েছেন ? জিজ্ঞেস করে রুদ্র।

প্রকাশ জবাবে বললে, তিনটে নাম জোগাড় করেছি, স্যার। মনে হচ্ছে এরা ডাইরেক্ট্‌লি ইন্‌ভল্‌ভড্‌ না হলেও এদের যথেষ্টই হাত ছিল। হয়তো পরিকল্পনাটা ওদেরই।

—ওরা কি কোন পলিটিক্যাল পার্টির ?

—পুরোপুরি না হলেও খানিকটা তো বটেই, স্যার। এমনিতে সাধারণ ক্রিমিন্যাল হলেও পলিটিক্যাল পার্টির শেল্টারে আছে।

একটু সময় কি যেন চিন্তা করে রুদ্র। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, ওদের

এ্যারেস্ট করা হয়েছে তো?

সহসা কোন জবাব দেয় না প্রকাশ। রুদ্র আবার জিজ্ঞেস করে, তারা পালিয়েছে নাকি?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেয় প্রকাশ, না স্যার, ঠিক পালায় নি তারা।

—তবে তাদের এ্যারেস্ট করা হয় নি কেন? ও-সির কৈফিয়ত কি?

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে প্রকাশ। তারপর জবাব দেয়, না স্যার, ও-সির তেমন একটা দোষ নেই। অবস্থা বিচার করে আমিই তাদের এ্যারেস্ট করতে বারণ করেছি।

রুদ্র কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে প্রকাশের মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, কেন, কী এমন অবস্থা যে তাদের এ্যারেস্ট করা হলো না? এই সময়ের মধ্যে ওরা যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে?

আবার একটু সময় চিন্তা করে জবাব দেয় প্রকাশ, এটা যখন একটা পলিটিক্যাল মার্ডার, তখন—

প্রকাশ কথাটা শেষ করার আগেই রুদ্র বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, পলিটিক্যাল—পলিটিক্যাল—পলিটিক্যাল! এই শব্দটা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। মার্ডার মার্ডারই। তার মধ্যে আবার পলিটিক্যাল, নন-পলিটিক্যাল কি? পেনাল কোডে কি পলিটিক্যাল মার্ডারের জন্যে আলাদা কোন ধারা রয়েছে? তা' যখন নেই তখন এই আখ্যা দিয়ে এর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কেন?

—কিন্তু স্যর, মাস্-এজিটেশন—

—হ্যাং ইওর মাস্ এজিটেশন! প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে রুদ্র, এই করেই তো এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের আজ এই অবস্থা। একজন ভদ্রলোক নৃশংসভাবে খুন হলেন। গোটা পরিবারটা তাঁর ভেসে গেল। আর আমরা অর্থাৎ দেশের পুলিশবাহিনী বসে বসে কেবল পলিটিক্যাল, মাস্-এজিটেশন প্রভৃতি শব্দগুলো জপ করছি। ন্যায়পরায়ণতা, মানবতা প্রভৃতি কথাগুলো কি একেবারেই অর্থহীন হয়ে গেছে? আমরা কি ইচ্ছেমত আইনের প্রয়োগ করবো নাকি? সেই অধিকার আমাদের কে দিয়েছে?

—ওদের এ্যারেস্ট করলে একটা ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল হতো, স্যার।

—হয় হতো। তার মোকাবেলা করতাম আমরা। গণ্ডগোলকে যদি ভয়ই পাই তা'হলে আমরা পুলিশে চাকরি করতে এসেছি কেন? এই আপনার

কথাই ধরুন। একজন আই. পি. এস. অফিসার আপনি। সেখানে গেলেন, কাল্‌প্রিটদের নাম-ধাম জানতে পারলেন, তবুও পলিটিক্যাল, মাস-এজিটেশন প্রভৃতি শব্দগুলোর আড়ালে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায় তেমন কোন এ্যাক্‌শনই নিলেন না। এতে হলো এই যে কাল্‌প্রিটদের সাহস বেড়ে গেল, কমে গেল তাদের এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের ওপর শ্রদ্ধা। তারা জানলো যে খানিকটা পলিটিক্যাল কালার গায়ে মাখতে পারলে অনেক ঝঞ্ঝাট-ই এড়ানো যায়।

—অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে এ্যারেস্ট করতে গিয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলে তো এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনই আবার ট্যাক্ট্‌লেস বলে আখ্যা দেয়।

—হ্যাঁ, তা দেয়। ট্যাক্ট্‌ মানে কৌশল। কিন্তু কৌশলের অর্থ ভীরুতা নয়। একবার তাকিয়ে দেখুন, কৌশলের নামে চারিদিকে কী চলছে। স্রেফ ভীরুতা—এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা। তা'ছাড়া পুলিশ প্রশাসনে যেমন কৌশলের প্রয়োজন আছে, তেমনি ডাইরেক্ট এ্যাক্‌শন নেবারও প্রয়োজন আছে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট এ্যাক্‌শন যে দেশের আইন ও তার প্রয়োগকারীর ওপর সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে তা' আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। তাই আজ সাধারণ মানুষ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, আইনের প্রয়োগকারী পুলিশের গায়ে থুথু ছিটোয়। আর, দেশের বিরাট পুলিশ বাহিনীও তা' নির্বিবাদে হজম করে।

রুদ্র থামতেই প্রকাশ বলে ওঠে, তা'ছাড়া আর উপায় কি স্যার? এ যুগে পুলিশকে ক্রিপ্‌ল অর্থাৎ অকেজো করে দিতেই তো সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন।

—ভুল করলেন মিঃ শাস্ত্রী, বলে ওঠে রুদ্র, পুরোপুরি ক্রিপ্‌ল নয়। প্রয়োজনে ক্রিপ্‌ল, আবার প্রয়োজনে পুলিশকে ভয়ানক এ্যাক্‌টিভ দেখতেই তাঁরা পছন্দ করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, একবার ক্রিপ্‌ল করে তুললে আর এ্যাক্‌টিভ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অকর্মণ্যতাই কেবল বাড়তে থাকে তখন। তা'ছাড়া আরও একটা কথা—ক্রিপ্‌ল হবার জন্যে যারা মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকে তাদের অতি সহজেই তা' করা চলে। যে মানসিক শক্তির অধিকারী হলে একজন কর্মঠ ব্যক্তিকে অকর্মণ্য করে তোলা যায় না, সেই শক্তি আমাদের অধিকাংশেরই আজ নেই। চাকরির মায়ায়, অর্থের মোহে সেই শক্তি আমরা আজ হারিয়েছি। যে করেই হোক্‌, চাকরি রক্ষা আর অর্থ উপার্জনই এখন আমাদের অধিকাংশেরই একমাত্র চিন্তা। আমাদের এই দুর্বলতার কথা ওঁরাও জানেন। তাই আজ এত সহজে কার্যসিদ্ধি করে চলেছেন ওঁরা। কথাটা শেষ

করেই রুদ্র এমন ভাবে প্রকাশের দিকে তাকায় যে প্রকাশ একটু থতমত খেয়ে মাথা নীচু করে। তার অপরাধী মন বোধহয় অন্যায় পথে অর্থ উপার্জনের প্রসঙ্গে চমকে ওঠে।

কথা শেষে রুদ্র স্থির চোখে কিছু সময় তাকিয়ে থাকে প্রকাশ শাস্ত্রীর দিকে। কী অবস্থায় এসে আজ পৌঁছেছে এই সর্বভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের অফিসারদের একাংশ! যাদের বাঘ হয়ে ওঠার কথা ছিল, তারা আজ পর্যবসিত হয়েছে শেয়ালে। মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। হুকুম করে সেই হুকুম অধস্তনদের দিয়ে তামিল করাবারও শক্তি নেই। বাইরে নৈবিদ্যের কলা, আর ভেতরে নৈবিদ্যের চালের সঙ্গে একাকার। চরিত্র দিয়ে বেছে নেবার আর উপায় নেই। চরিত্রে শ্রেণীহীন পুলিশী সমাজ!

রুদ্র একসময় বললে, অল্ রাইট মিঃ শাস্ত্রী। যা হবার হয়েছে। এক্ষুণি ও-দিকে হুকুম দিন ওদের গ্রেপ্তার করতে। তেমন অবস্থা হলে হেড্ কোয়ার্টার থেকে ফোর্স পাঠান।

রুদ্রর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছাড়ে প্রকাশ শাস্ত্রী। মনে মনে বলে, ইম্প্রাক্‌টিক্যাল ননসেন্স! এমন অফিসারের অধীনে চাকরি করতে গিয়ে শেষে কোন বিপদ না ঘটে! আই. পি. এস.-এর চাকরি চট্ করে যাবার নয়। কিন্তু প্রমোশনের পথে কাঁটা পড়তে কতক্ষণ? হুঁঃ, যত সব বাজে সেণ্টিমেণ্টের কচকচি!

বাজেই বটে! এই পৃথিবীর আবর্জনা পরিষ্কার করতে যুগে যুগে যাঁরা এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা একদিন এই আখ্যাই লাভ করেছেন। আজও সরকারী বেসরকারী মহলে এধরনের দু'চারজন বাজে লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায় অন্যের সঙ্গে বাস্তবিকই বেমানান। সম্ভবতঃ এই মুষ্টিমেয় বাজে লোকের জন্যেই পৃথিবীটা আজও বাসযোগ্য।

যখনই যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে তখনই তাদের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে অপরাধ ও আইন শৃংখলার অবনতির অভিযোগ ওঠে। এটাই এ দেশের রীতি। সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশাই সমাজে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির প্রধান কারণ। সমাজবাদীরা বলেন, সম্পদের বণ্টনব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মানুষের মুক্তি নেই। জেলার ক্রাইম ও ক্রিমিন্যালের কথা ভাবতে বসে সামাজিক এই বৈষম্যের কথাই মনে উদয় হয় রুদ্রর। তা'হলে কি সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা ত্রুটিহীন হলেই দেশে অপরাধের সংখ্যা কমবে? জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদা মিটলেই কি মানুষ

অপরাধের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? রুদ্রর কিন্তু তা মনে হয় না। আসলে মানুষের চাহিদার সঙ্গে অপরাধের যে সম্পর্ক তার চাইতে মানুষের মনের অতৃপ্তির সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক অনেক বেশি। এ যুগে আর কেউ নিজের অবস্থায় তৃপ্ত নয়। লোভ বেড়ে গেছে মানুষের। আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। সেই আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নিতে সমাজের সাধারণ মানুষ যেমন ঝুঁকেছে সাধারণ অপরাধের দিকে, সমাজের উঁচুতলার লোকেরা ঝুঁকেছে অন্য ধরনের অপরাধের দিকে, যার নাম 'হোয়াইট কলার ক্রাইম'। সমাজ জীবনে এই অপরাধের মূল যখন নিহিত রয়েছে দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের মনের মধ্যে, তখন একে সামাল দেবার মত ক্ষমতা একটা দেশের পুলিশ-বাহিনীর কোথায়? তার ওপর তারা নিজেরাও তো কলুষমুক্ত নয়।

কিন্তু দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা তা' বুঝবে না। তারা পুলিশের কাছে অপরাধীর দমনই আশা করবে। ঠিকই তাই। অপরাধের মূল যখন রয়েছে অন্যত্র তখন সোজাসুজি অপরাধীকে দমন করা তাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় সেই বেড়ে যাওয়া অপরাধ যাতে আরও বেড়ে না ওঠে সেটুকু অন্ততঃ দেশের মানুষ পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই আশা করতে পারে।

সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে সেটুকুই চায়। তার বেশি কিছু নয়। আর, সেটুকু করতে হলেও এই বাহিনীর মধ্য থেকে নোংরা আবর্জনাই প্রথমে সরিয়ে ফেলতে হবে। রুদ্র জানে, একাজ কোন মানুষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্যে চাই উৎসর্গীকৃত প্রাণ একদল মানুষ যারা পরম মমতায় এই বাহিনীর দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ বুঝবে, যারা পরম বিচক্ষণতায় এদের অসততা, অপরাধের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখবে, যারা পরম দক্ষতায় এদের মানসিকতার সঠিক মূল্যায়ন করে সংস্কারের পথে পা বাড়াবে। কিন্তু কোথায় সেই উৎসর্গীকৃত প্রাণ মানুষ? কোত্থেকে আসবে তারা? বাইরে থেকে তো আসবে না। রুদ্র মন-প্রাণে বিশ্বাস করে একদিন তারা আসবেই। এই ডিপার্টমেন্টেই একদিন তারা জন্ম নেবে। অতীত ভারতবর্ষের ঋষিদের মত বাহিনীর কর্মীদের তারা ডাক দেবে—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মত পাপীতাপীদের ডাক দিয়ে বলবে—এসো আমার সঙ্গে। অন্ধকার থেকে আলোকের পথে তোমাদের আমি নিয়ে যাবো। সেই দিন আসবেই। কিন্তু কবে?

পুলিশ অফিসে বসে কাজ করছিল রুদ্র। হঠাৎ হোম ডিপার্টমেন্টের একখানা কাগজের ওপর চোখ পড়তেই সে চমকে ওঠে। রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা

মজুমদারের ট্যুর প্রোগ্রাম। জেলা সফর শুরু করবে সে। আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে সে প্রতিটি জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করবে। সেই সঙ্গে কথা বলবে জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও।

কাগজটা পড়া শেষ হলেও কিন্তু রুদ্র সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে অন্যমনস্ক হয়ে। রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদার—তার এককালের মানসী অলকা আসছে তার জেলায়। সঙ্গে নিয়ে আসছে রাজনৈতিক বুদ্ধির দীপ্তি, মন্ত্রীত্বের জৌলুস এবং সম্ভবতঃ পুলিশের প্রতি এমন এক ধরনের অনীহা যা নাকি একদিন আই. পি. এস. অফিসার রুদ্রকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কর্তৃত্বের তক্‌মা গায়ে এঁটে সেই রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকাই আসছে জেলার পুলিশ সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে। এবার আর রাইটার্সের রোটাণ্ডায় সেই কন্‌ফারেন্সের আবহাওয়া নয়, মুখোমুখি আলোচনা। কে জানে, সেই আলোচনার মুহূর্তে কী ধরনের মনোভাব গ্রহণ করবে সে? রাজনৈতিক দলের, বিশেষ করে সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ যে তার ওপর খুশি নয় তা' সে জানে। তাঁদের ইচ্ছেমত চলতে না পারাটাই রুদ্রর অপরাধ। অলকা সেই নেতৃবৃন্দের সঙ্গেই আলোচনা করবে সর্বপ্রথম। তাঁরা হয়তো রুদ্রর বিরুদ্ধে অলকার কান ভারি করে তুলবে সেই সুযোগে।

এই ধরনের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্রের কথা মনে পড়লে বাস্তবিকই দুঃখ হয় রুদ্রর। ঈশ্বর এদের নেতা হবার মত কতগুলো গুণ নিশ্চয়ই দিয়েছেন। কিন্তু এই হতভাগ্যরা দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে তার ব্যবহার করতে পারলে না। ক্ষুদ্র স্বার্থের পেছনেই কেবল ছোটাছুটি করে গেল এরা। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার অভাব ঘটলেই বুঝি এমন হয়।

রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদার এসে উঠেছে জেলা সদরের ইন্‌স্‌পেকশন বাংলোয়। নিয়ম মত পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। সঙ্গে আছে নিজের মহিলা সি. এ. এবং একজন স্টেনোগ্রাফার। দলের দু' তিনজন কর্মীও তার সঙ্গে এসেছে।

সকালের দিকে অলকা জেলার রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছে। নিজের দলের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়াও জেলার প্রশাসন সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে। প্রশাসনের হাল-চাল সম্পর্কেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে অনেক কিছু সে জেনে নিয়েছে। অবশেষে বিকেলের দিকে তার সঙ্গে কথা বলতে এলেন আই. এ. এস. জেলা শাসক। প্রশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সেই অভিজ্ঞ মানুষটির সঙ্গে আলোচনা হলো তার। অবশেষে তিনি চলে যেতেই পুলিশ জিপে চেপে এলো

হাজির হলো রুদ্রদেব।

রুদ্রর পরনে পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক। মুখখানা গম্ভীর। তার স্বপ্নালু চোখজোড়ায় শান্ত সংযত দৃষ্টি।

দরজার ভারি পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকায় রুদ্র। বড়সড় ঘরখানার সেণ্টার টেবিলের একদিকে বসে আছে অলকা। পাশে একখানা চেয়ারে তার মহিলা কন্‌ফিডেন্সিয়াল এ্যাসিস্টেণ্ট। অলকার সামনে টেবিলের ওপর কতগুলো কাগজপত্র। সেই দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছিল অলকা। সি-এ নোট নিচ্ছিল।

পায়ের শব্দে অলকা তার পুরু লেন্সের চশমার ফাঁকে রুদ্রর দিকে তাকায়। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েই থাকে নিঃশব্দে। তার সেই স্থির দৃষ্টির মধ্যে ঈষৎ বিব্রত বোধ না করে পারে না রুদ্র। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, মে আই কাম ইন্‌, ম্যাডাম?

—ইয়েস—ইয়েস। জবাব দিয়েই একটু নড়ে চড়ে বসে অলকা। সাদা খোলের শাড়ির আঁচলটা কাঁধের আরও একটু ওপরে তুলে দেয়। নিজের অজ্ঞাতেই আলতো হাতে সরিয়ে দেয় কপালের চুলগুলো।

রুদ্রর গম্ভীর মুখখানা যেন আরও গম্ভীর দেখায়। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জুতোর গোড়ালীতে শব্দ করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারপর পুলিশী কায়দায় স্যালুট করে অলকাকে।

মন্ত্রীকে অভিবাদন করছে পুলিশ সাহেব। হাত তুলে প্রতি নমস্কার করার-ই কথা অলকার। একটু আগে জেলা শাসককেও সে তেমনিভাবে প্রতি নমস্কার জানিয়েছে! কিন্তু রুদ্রর বেলায় হাতখানা যেন উঠতে চায় না অলকার। সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে কোনমতে প্রতি নমস্কারের পালা শেষ করে মৃদু কণ্ঠে সে বললে, হ্যাভ ইওর সীট প্লীজ।

রুদ্র চেয়ারে বসে নিয়মমত মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে টেবিলের একপাশে রাখে। অলকা তার সামনের কাগজপত্র সামান্য সরিয়ে একবার রুদ্রর দিকে তাকায়। পরক্ষণেই নিজের সি. এ'র দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আপনাকে এখন প্রয়োজন হবে না। দরকার হলে ডাকবো।

অলকার কথায় একটু বিস্মিত হয় সেই ভদ্রমহিলা। সকাল থেকে আলোচনা চলছে। সর্বক্ষণই সে রাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশে বসে নোট নিয়েছে। এমনকি কিছুক্ষণ আগে জেলা শাসকের বেলায়ও তাই হয়েছে। এই পুলিশ সুপারের বেলায় এমন কি ঘটলো যাতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল! এবারের আলোচনা কি এতই সিক্রেট যে মন্ত্রীর সি. এ'র পক্ষেও সেখানে থাকা চলে না।

নোটবই পেন্সিল নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভদ্রমহিলা। একবার অপাঙ্গে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

মুখোমুখি বসে রাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ সাহেব। সহসা কেউই কোন কথা বলতে পারে না। তু'জনের মনেই একই চিন্তা। এই সরকারী বৈঠকে তারা পরস্পরকে কিভাবে সম্বোধন করবে? আপনি আজ্ঞে, না তুমি? অবশ্য ইংরেজিতে বললে এটা এড়ানো চলে, কিন্তু সেটাও কেমন যেন দৃষ্টিকটু।

অবশেষে রুদ্রই ভঙ্গ করে নীরবতা। গম্ভীর মুখের ওপর একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে বলে ওঠে, তোমার সি-এ'কে সরিয়ে দিলে কেন?

এতক্ষণে পথের হদিশ পায় অলকা। সলজ্জ হাসি হেসে সে জবাব দেয়, বেফাঁস কিছু বলে ফেলার ভয়ে। তা'ছাড়া ঐ মহিলা কাছে থাকলে কি তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারতে? না, আমি এমন ফ্রিলি বলতে পারতাম?

—কিন্তু ঐ মহিলা হয়তো কিছু মনে করলেন। আফটার অল্, তুমি একজন অবিবাহিতা মহিলা, আর আমিও এমন কিছু বয়স্ক নই।

রুদ্রর কথায় তেমনি হাসিমুখে অলকা বললে, এ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। অবিবাহিতা মহিলা হলেও আমি এ রাজ্যের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী।

—তা' ঠিক্, বলে ওঠে রুদ্র, আর আমি হচ্ছি একজন সাধারণ পুলিশ কর্মচারী।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রুদ্রর দেওয়া খোঁচাটুকু হজম করে অলকা। তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, যাক্ গে ওসব কথা। কেমন আছো, বলো?

—খুব ভালো। জবাব দেয় রুদ্র।

রুদ্রর জবাবে অলকা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। পরক্ষণেই মৃত্নু হেসে বললে, দেখ, তোমাদেরই দেওয়া দেশের ল' এ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশনের পরিসংখ্যান নিয়েই আমরা বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের সঙ্গে লড়াই করি। এ নিয়েই আমরা জনসাধারণের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের সাফল্যের কথা বলি। তবে, মুখে যা-ই বলি না কেন মনে মনে ভালই জানি যে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি তেমন সুবিধের নয়। এর জন্যে প্রধানতঃ তোমরাই দায়ী। তবুও কর্তব্যের খাতিরে জনসমক্ষে আমরা তোমাদের ডিফেণ্ড করেই চলি। দেশের এই পরিস্থিতিতে তুমি কিনা বলছো খুব ভালো আছো?

জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ, খুব ভালো আছি। সেদিন বিধান সভায় দাঁড়িয়ে

তোমার আমাকে ডিফেণ্ড্ করার প্রচেষ্টার খবর কাগজে পড়েছি। যদিও সরকারের তরফে এরকম করাই রীতি, তবুও সেই জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে ভালো না থাকার তো কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ভালই হোক আর খারাপই হোক, তাতে তোমার আমার তেমন কিছু যায় আসে বলে তো মনে হয় না। ভুগছে তো কেবল সাধারণ মানুষ। তোমরা মশগুল ক্ষমতা নিয়ে, আর আমরা মশগুল চাকরি নিয়ে। নিজের নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে আমরা সবাই তো বেশ ভালই আছি।

রুদ্রর কথায় অলকার মুখের ওপর থেকে হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে যায়। শান্ত কণ্ঠে সে বললে, এদেশের রাজনীতির ওপরে যে তোমার কোনকালেই শ্রদ্ধা নেই তা' আমি জানি। তবে এও জানি, আমাদের সম্পর্কে তোমার এই মূল্যায়নও ঠিক নয়। জনসাধারণের কথা ভাবাই রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ। আমরাও তাই ভাবি।

অলকা থামতেই রুদ্র বলে ওঠে, মূল্যায়নের কথাই যখন বললে তখন বলছি যে পুলিশ সম্পর্কে তোমাদের মূল্যায়নও ভ্রান্ত। আইন-শৃংখলার অবনতির জন্যে কেবল আমরাই দায়ী নই, তোমরাও দায়ী।

—তুমি কি বলতে চাইছো তোমরা তোমাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করছো ?

—না, করছি না, স্পষ্ট জবাব দেয় রুদ্র, কাজ সুষ্ঠুভাবে করার মত পরিবেশ নেই। নোংরা পরিবেশে নোংরা কাজই হয়। তাই তো আজ গোটা দেশের পুলিশ বাহিনীর একটা চোখ নিজের চাকরির দিকে, আর অন্য চোখটি কেবল পয়সার সন্ধান করে বেড়ায়। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্রাইম ও ক্রিমিন্যালের দিকেও একটু-আধটু নজর দিয়ে ফেলে।

রুদ্রর জবাবে পাতলা ঠোঁটে আবার হাসির রেখা টেনে অলকা বলে ওঠে, একটা তৃতীয় নয়ন থাকলে বোধহয় তোমরা অপরাধীর দিকে একটু বেশি নজর দিতে পারতে ?

জবাবে রুদ্রও হেসে বললে, বলা যায় না। চাকরি, পয়সা ও অপরাধী—এই তিনটি বস্তুর ওপর তখন তিনটে চোখ সমানভাবে কাজ করতো কিনা, কিম্বা শক্তিশালী তৃতীয় নয়নটি কোন্ বস্তুটির ওপর বিশেষভাবে পড়তো তা' জোর করে বলা চলে না।

একটু থেমে অলকা আবার বললে, এখানকার রাজনৈতিক নেতাদের তোমার ওপর ধারণা ভালো নয়।

—জানি। জবাব দেয় রুদ্র।

—তোমার বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ।

—জানি।

—কেন সেই অভিযোগ তা-ও নিশ্চয়ই জানো?

—হ্যাঁ, তাও জানি। আমি তাদের হাতের পুতুল হতে পারি নি বলে

—তা ছাড়া, তাদের অভিযোগ তোমার নাকি তেমন একটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপাসিটিও নেই। তোমার জেলার অফিসারেরা নাকি ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে হামেশাই ওঠ-বস করে।

—কাল্পনিক অভিযোগ, না কিছু প্রমাণ আছে?

—প্রমাণ আছে। দিন কয়েক আগে এই সহরের একজন কুখ্যাত ক্রিমিন্যালের সঙ্গে তোমার সদর থানার একজন অফিসারকে একটা দোকানে বসে চা-মিষ্টি খেতে খেতে গল্প করতে দেখা গেছে। এখানকারই একজন নেতা নিজের চোখে তা' দেখেছে।

একটু সময় ভেবে নিয়ে রুদ্র বললে, তারা কোন সৎ উদ্দেশ্য কিম্বা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দেখা করেছিল কিনা তার কোন প্রমাণ সেই নেতা পেয়েছে কি?

—ক্রিমিন্যালের সঙ্গে কি কেউ সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মেলামেশা করে?

—হ্যাঁ, করে। পুলিশ করে। ক্রাইম ও ক্রিমিন্যালের খবর আর একজন ক্রিমিন্যালের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তোমার সেই নেতা কিম্বা তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই ঐ ধরনের খবর জোগাড় করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না তা' আমি বলছি না।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে অলকা। তারপর রুদ্রর চোখে চোখ রেখে বললে, ওরা বলছে তুমি নাকি ভয়ানক একগুঁয়ে। আমিও বুঝতে পারছি, তুমি ভীষণ জেদী হয়ে উঠেছ। পুলিশে ঢুকেই এটা হয়েছে তোমার। আগে তো কখনও তুমি এমন ছিলে না।

অলকার কথায় রুদ্র সহসা কোন জবাব দেয় না। টেবিলের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে জানালা দিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। তারপর একসময় দৃষ্টি সরিয়ে এনে চাপা ম্লান কণ্ঠে সামান্য হেসে অলকাকে বললে, এখন মনে হচ্ছে আমার জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা নয়, তুমি যেন তোমার দলের নেতাদের অভিযোগ শুনে আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতেই এসেছো। তবে হ্যাঁ, তুমি মন্ত্রী, আমি সামান্য কর্মচারী। আমার কৈফিয়ত চাইবার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে। আমি—

রুদ্রকে বাধা দিয়ে অলকা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, দোহাই তোমার। আমাকে ভুল বুঝ না তুমি। অধিকার থাকলেও সেই অধিকার প্রয়োগ করার ইচ্ছা নিয়ে তোমাকে কথাগুলো বলছিনা। ওরা এখান থেকে তোমার বদলি চাইছে। মিনিষ্ট্রির ওপর ভয়ানক প্রেশার সৃষ্টি করেছে ওরা। বিশ্বাস করো, ওদের ঠেকাতেই আমি কেবল তোমার কাছ থেকে তোমার যুক্তিগুলো জেনে নিতে চাইছি। কথাগুলো বলতে বলতে অলকার চোখ দু'টো যে ছল্ ছল্ করে ওঠে তা' তার চশমার ফাঁকেও টের পায় রুদ্র।

--বেশ তো, আমাকে এই মুহূর্তেই এখান থেকে বদলি করে দাও।

—না, সেই সময় এখনও আসেনি, মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকে অলকা, তুমি আমার কোন খবর না রাখলেও তোমার প্রতিটি খবর আমি আগেও রাখতাম, আর এখন মন্ত্রী হয়ে তো রাখতেই হয়। শুধু তাই নয়, এই ডিপার্টমেণ্টে তোমার চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার কথাও কিছু কিছু আমাদের কানে এসেছে। তোমার পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই শুনতে পাচ্ছি আমরা। ক্যাবিনেটের ইচ্ছে নয় কোন রকম চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তোমাকে এখান থেকে এত তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেয়। আমার কাছে তো এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলকা স্পষ্ট করে না বললেও রুদ্র বুঝতে পারে, এটা হচ্ছে ওদের দলেব মধ্যে গোষ্ঠীবাজির ব্যাপার। ইদানীং কালে এদেশের রাজনীতি তো কেবল গোষ্ঠিদ্বন্দ্বের ইতিহাস।

রুদ্রকে চুপ্ করে থাকতে দেখে অলকা আবার বললে, তুমি আমার কথাগুলো বুঝি বিশ্বাস করলে না?

জবাব দেয় রুদ্র, না—না, বিশ্বাস না করার কী আছে? তবে তুমি একটু আগে বললে না যে, আমি নাকি এই চাকরিতে ঢুকে ভয়ানক জেদী ও একগুঁয়ে হয়ে উঠেছি। ঠিকই বলেছ তুমি। নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ'এর মত আমারও বলতে ইচ্ছে করে—বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড বিষ জ্বালা এই বুকে; দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে। সত্যিই তাই, অলকা। দেশের পরিস্থিতি দেখছি, এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অবস্থা দেখছি। যতই দেখছি ততই ক্ষেপে উঠছি, ততই নিরাশ হয়ে পড়ছি। তবুও আবার আশায় বুক বেঁধে সোজা হয়ে উঠছি। এমনিভাবেই রাত দিন যুদ্ধ করে চলেছি নিজের সঙ্গে। বলতে বলতে একসময় কণ্ঠস্বর থেমে যায় রুদ্রর। অলকাও আর কিছু না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রুদ্রর মুখের দিকে।

হঠাৎ এক সময় অলকা বলে ওঠে, এই দেখ, চায়ের কথা বলতে একদম ভুলে গেছি। বলেই সে কলিং বেলে চাপ্ দেয়।

একটু পরেই উর্দি-পরা একজন বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢোকে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অলকা বললে, তোমার জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু বিশদভাবে জানতে পারলে ভালো হতো।

—বেশ, তবে শোন, বলেই রুদ্র পর পর কয়েকবার চায়ের কাপে চুমুক দিতেই অলকা তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, ওকি. এত তাড়া কিসের? সুস্থ হয়ে চাটুকু খেয়ে নাও না আগে।

রুদ্র সে কথার জবাব না দিয়ে খালি কাপটা ট্রের ওপর রেখে হাতের ফাইলটা খুলতে খুলতে বললে, পরিস্থিতি যে ভালো নয় তা' আমি তোমাকে আগেই বলেছি। তবে, এ ব্যাপারে আমরা কী ধরনের স্টেপ্ নিয়েছি ও নিচ্ছি সেটাই কেবল বলছি তোমাকে। এর বেশি তো আর কিছু করতে পারি না আমরা।

এর পরে রুদ্র বেশ কিছুক্ষণ ধরে জেলার আইন-শৃংখলা ও পুলিশী ব্যবস্থার কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে থাকে অলকাকে। বাঁ হাত গালে রেখে কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে রুদ্রর মুখের দিকে অলকা তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু নোটও নেয় সে।

অবশেষে এক সময় রুদ্র থামতেই অলকা নিজের গালের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে, এত করা সত্ত্বেও ল' এ্যাণ্ড্ অর্ডার সিচুয়েশন তেমন একটা ইমপ্রুভ করছে না?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্র, না করছে না। করবে না—করতে পারে না। ওঝা নিজেই যদি সাপ হয়ে দংশন করে তা'হলে ঝাড়বে কে?

—কাকে ওঝা বলছো তুমি?—আমরা?

—শুধু তোমরা কেন? তোমরা—আমরা—দেশের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সবাই।

অলকা কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করে। তারপর এক সময় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে, বুঝলাম। যাক গে ওসব কথা। এবার তোমার নিজের কথা কিছু বলো।

জবাবে হালকা সুরে রুদ্র বললে, এটাও কি জেলার আইন-শৃংখলার মধ্যে পড়ে নাকি?

অলকাও তেমনি সুরে জবাব দেয়, হ্যাঁ, পড়ে বৈকি। তবে, জেলার আইন-শৃংখলা নয়, তোমার সাংসারিক জীবনের আইন-শৃংখলা।

—তেমন কোন বিশৃংখলার কথা জানতে পেরেছ কি? রুদ্র কথাটা হালকা সুরে বললেও সেই মুহূর্তে তার সুস্মিতা বৌদির ব্যাপারটা মনে পড়ে। রটনাকারীর রসনা বড় সাংঘাতিক। বিশেষ করে এখানকার রাজনৈতিক নেতারা যখন তার ওপর তেমন খুশি নন।

জবাবে মুখটিপে হেসে অলকা বললে, হ্যাঁ, পেয়েছি বৈকি।

—কার কাছে? ঈষৎ গম্ভীর শোনায় রুদ্রর কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে অলকা বললে, তুমি দেখছি সেই আগের মত ছেলে-মানুষটিই আছো। তারপর একটু থেমে অলকা আবার বলতে থাকে, না—না, সে সব কিছু নয়। অনেকদিন আগে একবার ট্রেনের কামরায় তোমার স্ত্রী ও তার বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সত্যি বলতে কি সেদিন তাদের কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গিতে যেন তেমন একটা আভাসই পেয়েছিলাম।

রুদ্র কোন জবাব দেয় না। টেবিলের ওপর খোলা ফাইলের পাতাগুলো নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করতে থাকে।

অলকা আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, সেদিন তোমার স্ত্রী কি বালীগঞ্জে তার মা-বাবার কাছো থাকতো?

এতক্ষণে জবাব দিতে গিয়ে উল্টে প্রশ্ন করে বসে রুদ্র। জিজ্ঞেস করে, তা' শুনে তোমার লাভ?

রুদ্রর কথায় অলকার মুখের ওপর একটু বিব্রতভাব ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়। হালকা স্বরে সে জবাব দেয়, লাভ লোকসান আবার কি? কেবল কৌতূহল। মন্ত্রীই হই আর যা-ই হই, জানো তো মেয়েদের কৌতূহল বড় বেশি।

—হ্যাঁ জানি, বলতে থাকে রুদ্র, আর এও জানি তাদের সেই কৌতূহলের শেষ নেই। তবুও যখন জানতে চাইছো তখন বলছি, তুমি ঠিকই অনুমান করেছিলে। সে সেদিন আমার কাছে থাকতো না। কথাটা শেষ করেই রুদ্র গম্ভীর হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে তার মনের আয়নায় ভেসে ওঠে এয়ারপোর্টে দেখা নবনীতার শান্ত, সৌম্য মুখখানি যা নাকি ইদানীং প্রায়ই তার মানসপটে ভেসে উঠে তাকে চঞ্চল করে তোলে।

অকস্মাৎ নীরবতা নেমে আসে সেখানে। কেউ কোন কথা বলে না। রুদ্র ভাবতে থাকে অলকার কথা। এতদিন পরে দেখা হলো তাদের! অফিসিয়াল সাক্ষাৎকার। এর মধ্যে অলকা নবনীতার প্রসঙ্গ টেনে আনলে কেন? কী তার উদ্দেশ্য? কী জানতে চায় সে? কী লাভ তার এসব জেনে?

একসময় অলকা নিজেই নীরবতা ভঙ্গ করে মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকে, জানো তো, মেয়েরা বড়ই স্বার্থপর, কিন্তু তোমরা উদার। তারা দুর্বল, তোমরা সবল। তারা অভিমান করতে জানে, তোমরা তা' ভাঙাতে জানো। তাদের জগৎ ছোট, কিন্তু তোমাদের জগৎ বিশাল। সেই মহত্ব ও উদারতা দিয়ে তোমরা যদি তাদের কাছে টেনে নিতে না পারো তা'হলে তো তারা নিরুপায়। মেয়েদের জীবনই তো পুরুষের মহত্ব ও উদারতা পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান। সেই মহত্ব ও উদারতার প্রকাশে পুরুষ তৃপ্ত, আর তা' লাভে মেয়েরা ধন্য। তোমার স্ত্রীও তোমার কাছে সেটুকু নিশ্চয়ই আশা করতে পারে। আবেগজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলতে বলতে একসময় থেমে যায় অলকা।

সেই মুহূর্তে মনটা যেন কেমন করে ওঠে রুদ্রর। অলকা কথাগুলো তার স্ত্রী নবনীতা সম্পর্কে বললেও এগুলো কি তার নিজের জীবনের কথা? সে কি সেদিন রুদ্রর কাছ থেকে তেমনি কোন মহত্বই আশা করেছিল? সে কি চেয়েছিল রুদ্র তার জন্যে অনির্দিষ্ট কাল ধরে অপেক্ষা করবে? তা'হলে কি অলকার ওপর অভিমান করে নবনীতাকে বিয়ে করা ভুল হয়েছিল তার? অলকা কি সেদিন তার মনটাকে কেবল যাচাই করতে চেয়েছিল?

হয়তো তাই। কিন্তু সেদিন তো কেবল অপেক্ষা করার প্রশ্ন ছিল না। এমনকি সাধারণ প্রত্যাখ্যানও নয়। সেদিন সেটা ছিল তার পুলিশী সত্তার প্রতি অপমান। সাধারণ মান-অপমানের ব্যাপার নয়, গোটা বিশ্বের পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি কর্মীর প্রতি সেই অপমানের প্রতিবাদ করতে গিয়েই যেন সেদিন নবনীতাকে বিয়ে করতে সে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসেছিল।

এতক্ষণে রুদ্র যেন স্পষ্ট লক্ষ্য করে অলকাকে। এই মুহূর্তে তার সামনে যে মহিলাটি বসে আছে সে যেন সেই মন্ত্রী অলকা মজুমদার নয় যে নাকি তার রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, যে নাকি রাজনৈতিক জীবনের ডাকে ব্যক্তি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে একমুহূর্তও দ্বিধা করে নি। এ যেন সেই নারী অলকা যে নাকি জীবনের দেনা-পাওনার হিসেব কষতে বসে জমার ঘরে একটা বড় শূন্য দেখে ভয়ানক চমকে উঠে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে হিসেবের খাতাখানা আবার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে।

এক সময় অলকা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে?

—বল।

—জীবনে তুমি কি সুখী হতে পেরেছ?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দেয় রুদ্র, সাংসারিক সুখ হয়তো আমি পাই নি, কিন্তু তবুও আমি সুখী। বিশ্বাস করো অলকা, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের একদল অবহেলিত, পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই সুখী। যতই কেন না ওরা ঘৃণ্য হোক, পথভ্রষ্ট হোক একথা তো ভুললে চলবে না যে ওরাও মানুষ। ওদের সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের পথের সন্ধান দেওয়াই তো আমার লক্ষ্য। জানি, সেই লক্ষ্যে আমি কোনদিনই পৌছতে পারবো না, কিন্তু তাই বলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু তো অর্থহীন নয়। আমার এই প্রচেষ্টার মধ্যেই তো আমি সুখের সন্ধান পেয়েছি। শুধু আমি কেন, মানুষ মাত্রই সুখের সন্ধান পায় তার প্রচেষ্টায়, ফল লাভের মধ্যে নয়। তোমার কথাই ধর না কেন, অলকা। নিজের রাজনৈতিক জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে কি তুমি সুখের সন্ধান পাওনি ?

রুদ্রর কথার সহসা কোন জবাব দেয় না অলকা। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকে, রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে চেয়েছিলাম মানুষের কল্যাণ। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই চাওয়া থেকে কেমন করে যেন অনেক দূরে সরে গেলাম। আজ আমি এ রাজ্যের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। কত ক্ষমতা আমার। হয়তো খুব শীগ্‌গিরই ক্যাবিনেট র‍্যাঙ্ক পাবো। কিন্তু বিশ্বাস করো, কেবলই আমার মনে হচ্ছে জীবনের কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেল। কিছুতেই যেন সেই ফাঁক পূরণ হবার নয়। হয়তো মেয়েদের জীবনের গণ্ডী সীমাবদ্ধ বলেই এমনি মনে হয়। সময় সময় ভাবি, এর চাইতে যদি আর দশজন মেয়ের মত ঘর সংসার করতাম তাহ'লে বোধহয় সুখী হতাম।

কথা বলতে বলতে অলকার চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করে ওঠে। রুদ্র ভেবে পায় না জবাবে সে তাকে কি বলবে।

ঠিক এমনি সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। একটু পরেই অলকার কন্‌ফিডেন্সিয়াল এ্যাসিস্টেণ্ট এসে হাজির হয়ে বললে, সি-এম আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

চীফ মিনিস্টার ডাকছেন। উঠে দাঁড়ায় অলকা। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রও। অলকা একবার চোখ তুলে রুদ্রর দিকে তাকায়। রুদ্র হাতের টুপিটা মাথায় পরে পুলিশী কায়দায় এ্যাটেনশন হয়ে অভিবাদন জানায় অলকাকে। জোর করে মুখের ওপর একটু হাসি টেনে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রত্যাভিবাদন করে অলকা দ্রুত পায়ে চলে যায় পাশের ঘরে। বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের জিপের দিকে এগিয়ে যায় রুদ্রদেব।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে কোটাল অর্থাৎ কোতোয়াল বলছে—

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—
চোর চাই যে করেই হোক, চোর চাই।
হোক না সে যে-কোনো লোক, চোর চাই
নহিলে মোদের যাবে মান।

অপরাধীকে ধরতে না পারলে পুলিশের মান থাকে না। হয়তো সেকালে বাস্তবিকই থাকতো না। কিন্তু একালে থাকে। একালে পুলিশের মান সেকালের মত ভঙ্গুর নয়।

আসলে, পুলিশের মান-সম্ভ্রম নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মাথাই একালে প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। যে যার নিজের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। গোটা ডিপার্টমেণ্ট যদি জাহান্নামেও যায় সেদিকে তাকাবার মত সময়ও কারুর নেই।

তাহ'লে কি ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের সদস্য রুদ্রদেব ভট্টাচার্য কেবল মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে? মানুষের মনে মান-সম্ভ্রম বোধ জাগিয়ে তোলা কি এতই শক্ত ব্যাপার? বিশেষ করে, যে বোধ জেগে উঠলে মানুষ কর্তব্য-পরায়ণ হয়ে উঠবে, ভ্রষ্টাচারের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে, লোভের হাতছানিকে অনায়াসেই অগ্রাহ্য করতে পারবে, পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সেই বোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা যে অনেক রথী-মহারথীরই শঙ্কার কারণ। তাহ'লে যে তাঁদের রথের চাকা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি কর্মী কর্মঠ, ন্যায়নিষ্ঠ, সদাচারী হয়ে উঠলে যে অনেকেরই চোখের ঘুম ছুটে যাবে। তাই তো দিকে দিকে লোভের জাল আর মোহের আবরণ—আফিংয়ের নেশায় ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখো, অসততার আবর্তে পড়ে ওরা নিস্তেজ হয়ে থাকুক। সাবধান, ওরা যেন কোনক্রমেই জেগে উঠে নিজেদের চিনতে না পারে। তা'হলেই সর্বনাশ!

পুলিশ সাহেব রুদ্রদেব এসব জানে। জেলার পুলিশ বাহিনীকে নতুন সঞ্জীবন রসে সঞ্জীবিত করে তোলার তার এই প্রচেষ্টায় পদে পদে যে সব বাধা বিপত্তি আসে সেগুলোকে সহজেই চিনতে পারে সে। এই সেই সম্মোহনের

আবরণ! ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে রুদ্রর। মনে মনে বলে, যতই কেন না ভয় দেখাও, যতই কেন না জাল বিস্তার করো, আমি পিছু হটবো না —কিছুতেই না। দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েই তোমাদের ঐ নোংরা জাল ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো আমি।

রাইটার্স থেকে খোদ্ ইন্সপেক্টর জেনারেল ডেকে পাঠিয়েছেন রুদ্রকে। কাগজটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করে রুদ্র, কিন্তু কেন যে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন তা বুঝতে পারে না। অবশেষে সে অনুমান করে রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা তার ট্যুর শেষ করে কলকাতায় ফিরে গিয়ে হয়তো কোন নোট আই. জি. পি'কে দিয়েছে, আর সে সম্পর্কে আলোচনার জন্যেই হয়তো তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু, অলকা এমন কী নোট দিতে পারে আই. জি. পি'কে? রুদ্রর জেলার আইন-শৃংখলা সম্পর্কে? সম্ভবতঃ তাই। এছাড়া, রুদ্র সম্পর্কে আর এমন কী বলার থাকতে পারে অলকার? তাদের সেই ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু নয়।

যথা সময়ে রাইটার্সে আই. জি. পি'র ঘরে ঢুকে তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়াতেই প্রৌঢ় আই. জি. পি. গম্ভীর মুখে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বসতে বলেন তাকে। তারপর একটা ফাইল তার দিকে ঠেলে দিয়ে তেমনি গম্ভীর স্বরে বললেন, ফাইলটা ভালো করে পড়ে দেখ।

কৌতূহলী রুদ্র ফাইলটা টেনে নিয়ে পড়তে থাকে। দেখতে দেখতে মুখের ওপর থেকে কৌতূহলটুকু উবে যায়, আর সেখানে দেখা দেয় দুঃখ ও রাগের স্পষ্ট চিহ্ন।

রুদ্র যতক্ষণ ফাইল পড়ছিল আই. জি. পি. ততক্ষণ নিজের কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে রুদ্রর মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলেন। পড়া শেষ করে রুদ্র ফাইলটা বন্ধ করতেই আই. জি. পি. জিজ্ঞেস করেন, ডি. আই. জি., আই. বি'র রিপোর্টটাও পড়েছ?

—হ্যাঁ স্যার। মাথা নেড়ে সায় দেয় রুদ্র।

—এ সম্পর্কে তোমার বলার কিছু আছে?

—না, স্যার।

—ঐ বেনামী দরখাস্তে তোমার বিরুদ্ধে যা লেখা আছে সব সত্যি?

—হ্যাঁ স্যার, ঘটনাগুলো সত্যি।

ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে এন্‌কোয়ারী করিয়ে ডি. আই. জি., আই-বি যা রিপোর্ট

পাঠিয়েছে তাও বোধহয় তুমি অস্বীকার করবে না?

এবার একটু সময় স্থির হয়ে থাকে রুদ্র। দুঃখ ছাপিয়ে মনের মধ্যে রাগ প্রবল হয়ে ওঠে। মানুষের নীচতা প্রায় ক্ষিপ্ত করে তোলে তাকে। টক্‌টকে লাল হয়ে ওঠে তার ফর্সা মুখখানা। কিন্তু কঠিন সংযমে নিজেকে সামলে নেয় সে। তার সামনে বসে রয়েছেন রাজ্যের পুলিশ প্রধান। তাঁর সামনে শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে।

শান্ত স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্র, হ্যাঁ স্যার, সবই আমি স্বীকার করছি। দীপক মৈত্র ও আমি এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। সে ছিল আমার চাইতে সিনিয়র। সন্ত্রাসবাদী কাজ-কর্মের জন্যে মিসায় সে এখনও জেলে। তার স্ত্রী সুস্মিতা মৈত্রকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি আমার ঐ সহরেই থাকেন। সময় সুযোগ মত আমি সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। কিন্তু এটাকে যদি কেউ সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে আমার সমর্থন আছে বলে ধরে নেয় তা'হলে আমি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। তা'ছাড়া, সেই মহিলা সম্পর্কে এই বেনামী দরখাস্তে যে কদর্য ইঙ্গিত করা হয়েছে তাকে আমি একজন স্কুল শিক্ষয়িত্রীর প্রতি এক জঘন্য অপরাধ বলেই মনে করি। আমাকে হেয় করতেই বেনামী দরখাস্তকারী এই নোংরা পথ বেছে নিয়েছে। দীপক মৈত্রর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ডি. আই. জি., আই-বি'র রিপোর্ট যদিও নির্ভুল, কিন্তু তিনি তাঁর এন্‌কোয়ারী রিপোর্টে একথাটা উল্লেখ করেন নি যে ইদানীং আমি আর সেখানে যাই না।

শান্তভাবে আই. জি. পি. রুদ্রর কথা শুনলেন। রুদ্র থামতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেন যাও না?

রুদ্রর একবার মনে হয় আই. জি. পি'কে বলে, সুপীরিয়র অফিসার, বিশেষ করে জেলার এস-পি'র নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহই জেলার পুলিশ বাহিনীর মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বলে আমি মনে করি। আর সেই জন্যেই আর সেখানে যাই না। কিন্তু আই. জি. পি. তার কথা কতটা বিশ্বাস করবেন বুঝতে না পেরে সে জবাব দেয়, কাজের চাপে এখন আর সময় করে উঠতে পারি না বলেই যাওয়া হয় না।

আই. জি. পি. খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তা করেন। রুদ্রকে তিনি চেনেন—বেশ ভালোভাবেই জানেন তাকে। তারপর বললেন, আমারও তাই মনে হয়। তোমাকে হেয় করার প্রচেষ্টা। হাউয়েভার, একটা কথা—জাস্ট এ্যান এড্‌ভাইস। জেলার এস-পি হয়ে সেই এক্সট্রিমিস্ট দীপক মৈত্রর

ফ্যামিলির সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা না করাই ভালো। ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরও নানা ধরনের কথা উঠতে পারে। প্রবেব্‌লি ইউ কুড্‌ ফলো মাই ভিউ।

—ইয়েস স্যার। জবাব দেয় রুদ্র।

—অল রাইট, ইউ মে গো।

আই. জি. পি'র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে রুদ্র। এই সেই ভয়ঙ্কর জাল যার সাহায্যে তাকে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা। দেশের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে সার্ভিস রেকর্ড মসীলিপ্ত করিয়ে চরিত্রে কলঙ্কের বোঝা আরোপ করিয়ে এমনিভাবে তাকে সংকল্পচ্যুত করাবার প্রয়াস। কিন্তু কে করতে পারে এমন নোংরা কাজ? জেলার সেই রাজনৈতিক নেতারা? বোধহয় না। তা'হলে পুলিশ অথরিটির কাছে বেনামী দরখাস্ত না পাঠিয়ে তাঁরা ব্যাপারটা সোজাসুজি মন্ত্রী মহলে তুলতেন। এ সম্ভবতঃ তারই ডিপার্টমেণ্টের কারুর কাজ। কিন্তু কে হতে পারে? হতে পারে অনেকেই যারা নাকি তাকে তাদের পথের কাঁটা বলে মনে করে, যারা নাকি তার ভয়ে সাপের মত গর্তে লুকিয়ে সুসময়ের প্রতীক্ষা করছে। তেমন অফিসার এই জেলায় তো অনেক আছে। বেশি দূর যেতে হবে কেন, মহকুমা থানার সেই ও-সি শেখর দত্তই তো তেমনি একজন। ওর প্রসিডিং এখনও চলছে, প্রমোশন নাগালের বাইরে চলে গেছে। ওর পক্ষে রুদ্রর বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠা তো খুবই স্বাভাবিক।

হয়তো শেখর দত্তই ঐ বেনামী দরখাস্ত পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ কিছু নেই। প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায়। কাজেই মনের সন্দেহ মনেই চেপে রাখে রুদ্র। কিন্তু একটা বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটায় সে। যে যা ভাবে ভাবুক, এবার থেকে সে আবার সুস্মিতা বৌদির ওখানে যেতে শুরু করবে। হ্যাঁ, আগের চাইতেও বেশি করে যাবে। দেখা যাক্‌ কী হয়!

প্রায় মাস তিনেক পরে রুদ্রর গাড়ি সুস্মিতার বাড়ির দোরগাড়ায় এসে দাঁড়াতেই বাড়ির ঝি শান্তির মুখখানা খোলা জানালার পাশে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

রুদ্র এসে দাঁড়ায় দরজার কাছে। হাতে তার তুতুনের জন্যে কেনা একটা পুতুলের বাক্স। কড়া নাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজার পাল্লা খুলে এসে দাঁড়ায় সুস্মিতা। মুখে তার সেই চিরপরিচিত মিষ্টি হাসি।

সুস্মিতা হাসলেও রুদ্র কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে আর হাসতে পারে না। মাত্র তিনটি মাসের মধ্যে একী চেহারা হয়েছে সুস্মিতার! গায়ের রং কালো,

বেরিয়ে পড়েছে কণ্ঠার হাড়, চোখের কোণে কালি। তার সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে যেন ছোট হয়ে গেছে। গলায় জড়ানো একটা মাফলার।

চেয়ারে বসতে বসতে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রুদ্র, একী চেহারা হয়েছে আপনার, বৌদি! কি হয়েছে আপনার? গলায় বা মাফলার জড়িয়েছেন কেন?

চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়ে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় সুস্মিতা, আর বলেন কেন, সামান্য সর্দি-কাশি। কিন্তু তা-ই আর যাচ্ছে না।

—সামান্য সর্দি-কাশি! বলে ওঠে রুদ্র, সামান্য সর্দি-কাশিতে কারুর চেহারা এত তাড়াতাড়ি এমন খারাপ হয় নাকি?

—বারে, খেতে না পারলে শরীর একটু দুর্বল দেখাবে না? গলায় এমন ব্যথা যে ঢোক গিলতেও কষ্ট হয়। তাই তো ডাক্তার রাত দিন মাফলার গলায় রাখতে বলেছেন। কিন্তু এই দারুণ গ্রীষ্মে গলায় মাফলার জড়িয়ে রাখা কি কষ্টকর—

কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সুস্মিতা। তারপর আবার বলতে থাকে, আপনিও তো বেশ শুকিয়েছেন, ঠাকুরপো।

—আমি শুকিয়েছি? হেসে উঠে বলতে থাকে রুদ্র, গত বছরের তৈরী করা প্যাণ্ট পরতে এখনই কষ্ট হচ্ছে, বুঝলেন? যাক গে, তুতুন কোথায়? তাকে যে দেখছি না?

—দিন কয়েকের জন্যে ওকে ওর মাসির কাছে পাঠিয়েছি। এখানে আমি থাকি স্কুলে। শান্তি ব্যস্ত থাকে ঘরের কাজে। ওকে দেখাশোনা করে কে? তাই ভাবলাম, দিন কয়েকের জন্যে সেখান থেকে ঘুরে আসুক। সমবয়সী একটা মাসতুতো বোন আছে ওর। সেখানে ভালই থাকবে।

আশাহত কণ্ঠে রুদ্র বললে, এদিকে আমি যে এই পুতুলটা এনেছি ওর জন্যে—

—আপনি আবার এসব আনতে গেলেন কেন, ঠাকুরপো? অনুযোগের সুরে বলে ওঠে সুস্মিতা।

রুদ্র সেকথার কোন জবাব না দিয়ে বাক্সটা সুস্মিতার হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, এটা রেখে দিন ওর জন্যে।

বাক্সটা হাতে নিয়ে সুস্মিতা একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর বললে, এতদিন আমাদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন নাকি, ঠাকুরপো?

এখানে আসার আগে এই ধরনের প্রশ্নের কি জবাব সে দেবে তা-ই ভেবে ভেবে ঠিক করতে পারে নি রুদ্র। তাই এই মুহূর্তে প্রশ্নটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। অবশেষে একটু আমতা আমতা করে জবাব দেয়, না বৌদি, সেসব কিছু নয়। আসলে কাজের এমন চাপ যে—

মিথ্যে কথাটা আর শেষ করতে না পেরে রুদ্র চুপ করে। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করে, দীপকদার খবর কি? জেল থেকে চিঠিপত্র পেয়েছেন?

জবাবে সুস্মিতা বললে, মাস দু'য়েক আগে একখানা পেয়েছিলাম। তারপর আর পাই নি।

—ভালো আছে তো?

—বোধহয় আছে।

—বোধহয় কেন?

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চেপে সুস্মিতা বললে, নিজের শরীর সম্পর্কে তো কখনও কিছু লেখে না। এমনকি আমার কথাও কিন্তু জানতে চায় না। মেয়েটার কথা দু'এক ছত্র থাকে। আর গোটা চিঠিতেই থাকে তার নিজের ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণার কথা।

রুদ্র লক্ষ্য করছিল এই তিন মাসে সুস্মিতার চেহারায় পরিবর্তন ঘটলেও তার কথা-বার্তায় পরিবর্তন হয়নি একটুও। সেই আগের মতই প্রতিটি কথায় হাসির ছোঁয়া, চোখের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধতার স্পর্শ। মুখখানা শুকিয়ে উঠলেও চাপা ঠোঁট জোড়ায় সেই আগের মতই কেমন যেন এক সংকল্পের চিহ্ন যা নাকি তার ব্যক্তিত্বকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এমন একটা ক্লান্তির চিহ্ন রুদ্রর চোখে ধরা পড়ে যা নাকি আগে ছিল না। হয়তো শারীরিক অসুস্থতার জন্যেই এই ক্লান্তি।

সুস্মিতা জিজ্ঞেস করে, এতদিন পরে যখন আমাদের কথা মনেই পড়লো তখন বলুন, কি খাবেন?

—না বৌদি, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রুদ্র, আপনাদের কথা মনে পড়ে প্রতিদিনই, কিন্তু এমন কাজের চাপ যে ঠিক সময় করে উঠতে পারি না।

একটু অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে সুস্মিতার মুখে। বললে, এমন কাজের চাপ যে এই তিন মাসের মধ্যে দু'দশ মিনিটের জন্যেও একবার এখান থেকে ঘুরে যেতে পারেন নি, কেমন?

রুদ্র কোন জবাব না দিয়ে একটু বিব্রত ভঙ্গিতে চুপ করে থাকে। সুস্মিতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু জোরেই হেসে ওঠে এবার।

—ওকি, হাসছেন যে?

হাসি মুখে জবাব দেয় স্মিতা, হাসছি আপনার অবস্থা দেখে।

তারপর হাসি থামিয়ে খানিকটা গম্ভীর সুরে স্মিতা আবার বললে, আপনি বলতে না চাইলে কি হবে, আমি জানি কেন আপনি এতদিন এদিকে আসেন নি।

—কেন বলুন তো?

রুদ্রর প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে স্মিতা উল্টে তাকেই জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ঠাকুরপো, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন? আমাদের এখানে আপনার যাতায়াতের ব্যাপারে আপনাদের ডিপার্টমেণ্টে কোন রকম কথা উঠেছে কি?

মুশকিলে পড়ে রুদ্র। স্মিতা কতটা কি জেনেছে তা সে জানে না। এমনও হতে পারে তার নিজের সঙ্গে এই মহিলাকে জড়িয়ে ডিপার্টমেণ্টে যে নোংরা কানাঘুসো শুরু হয়েছিল তারই কিছু কানে এসেছে স্মিতার, কিম্বা এর পলিটিক্যাল দিক্ সম্পর্কে কিছু শুনতে পেয়েছে সে।

রুদ্রকে নিরুত্তর দেখে স্মিতা আবার বললে, আমি জানি তেমন একটা কিছু ঘটেছে। অবশ্যি আমি আগেই ধারণা করেছিলাম যে এইরকম একটা কিছু ঘটতে পারে। জেলার পুলিশ সাহেব একজন সন্ত্রাসবাদী ডেটিনিউর বাড়ি যাতায়াত করে, এটা হয়তো অনেকেই ভালো চোখে দেখবে না।

এতক্ষণে রুদ্র খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। সেই পলিটিক্যাল্ দিক সম্পর্কেই কিছু কথা তার কানে উঠেছে। নোংরা কানাঘুসোর ব্যাপারটা সে জানে না; সেটা জানতে পারলে রুদ্রর লজ্জার আর সীমা থাকতো না।

রুদ্র এবার জিজ্ঞেস করে, আপনি এসব কথা কোথায় শুনলেন, বৌদি?

জবাব দেয় স্মিতা, কলকাতা থেকে আপনাদের ডিপার্টমেণ্টের একজন অফিসার স্কুলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। যদিও তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন জেলে আপনার দাদার ব্যাপারেই তিনি কথা বলতে এসেছেন, কিন্তু তাঁর কথায় বুঝতে পেরেছিলাম আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের খবরাখবর জানাটাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য।

লজ্জায় মাথা নীচু করে রুদ্র। ছি—ছি, এই একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কতই না কেলেঙ্কারী! একজন পুলিশ অফিসারের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী কেউ কি থাকতে পারে না? আর, তেমন কেউ থাকলে তার সঙ্গে কি সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে? এটা কেন হবে? একজন পুলিশ কর্মীর মন বলে যখন একটা পদার্থ আছে তখন তার যেকোন একটা রাজনৈতিক মতবাদ থাকাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ কোন

মতবাদের পক্ষে তার কাজ করাটাই অন্যায়।

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে সুস্মিতা মৃদু কণ্ঠে বললে, একটা কথা বলবো ঠাকুরপো, রাখবেন ?

মুখ তুলে জবাব দেয় রুদ্র, বলুন।

একটু সময় দ্বিধা করে সুস্মিতা। তারপর বললে, আপনি আর আমার এখানে আসবেন না, ঠাকুরপো। চাকরির ক্ষেত্রে এজন্যে ভবিষ্যতে হয়তো আপনাকে ভুগতে হবে।

—কি বলছেন, বৌদি ? অন্যায় জেনেও এই ব্যবস্থা আমাকে মেনে নিতে বলছেন ? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে রুদ্র।

—হ্যাঁ ঠাকুরপো, আপনার ভবিষ্যতের জন্যেই বলছি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এমনি ছোটখাটো ব্যাপারের সঙ্গে আপোস করা মোটেই অন্যায় নয়। জিততে হলে অনেক সময় পিছু হটতেও হয়। আমি জানি আপনার ডিপার্টমেণ্টকে আপনি কত ভালবাসেন। আমি জানি এই বাহিনীর কর্মীদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে আপনার কতই না প্রচেষ্টা। সেই সুযোগ পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই নিজের সার্ভিস রেকর্ডের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আজকাল আই. পি. এস. অফিসারদের তো পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া অন্য ডিপার্টমেণ্টেও কাজ করতে পাঠানো হচ্ছে। আপনার ক্ষেত্রে যদি তেমন কিছু ঘটে তাহ'লে সেই সুযোগ কি আপনি পাবেন, ঠাকুরপো ? একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে ওঠে সুস্মিতা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে রুদ্র। বেদনাময় হয়ে ওঠে তার মুখখানা। অবশেষে একসময় যে সুস্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বেশ বৌদি, আপনার কথাই আমি মেনে নিলাম। আর কখনও এখানে আসবো না।

রুদ্রর কথায় সুস্মিতার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে সেই মুহূর্তে। ধরা গলায় সে বললে, হ্যাঁ ঠাকুরপো, এখানে না এলে আপনার এমন কিছু যাবে আসবে না। তাই এখানে না আসাই ভালো। তবে যখন যেখানেই থাকুন না কেন, জানবেন আপনার এই বৌদিটির প্রীতি ও শুভেচ্ছা থেকে কোনদিন আপনি বঞ্চিত হবেন না।

মাস চারেক কেটে গেছে তারপর। এস-পি হিসেবে এই জেলায় দু'টো বছর পূর্ণ হয়েছে রুদ্রদেবের। অবসর মুহূর্তে নিজের কাজ-কর্মের মূল্যায়ন করতে সে নিজেই বসে। তার বাংলোর দোতলার এই ছোট্ট বারান্দাটুকু তার

বড়ই প্রিয়। সামনে তাল-জাতীয় বাগান-সাজানো গোটাকয়েক গাছের উঁচু মাথা। তারপরেই খোলা নীল আকাশ। অবশ্য, আকাশের এই নীল রং দেখার সৌভাগ্য রুদ্রদেবের খুব কমই জোটে। দিনের বেলায় এখানকার এই ডেক-চেয়ারটিতে বসার সুযোগ তার হয় না। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পরে চেয়ারটিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসার মত একটু সময় জোটে। তখন আকাশের নীল রং চোখে না পড়লেও কালো আকাশের তারার মেলা দৃষ্টিগোচর হয়। সেই দিকে তাকিয়ে মনে মনে নিজের সারাদিনের কাজ-কর্মের মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করে রুদ্র।

জেলার পুলিশ-প্রধান হিসেবে এই দীর্ঘ দু'টো বছরে পুলিশ বাহিনীর কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছে সে? কতটা উন্নতি ঘটাতে পেরেছে জেলার পুলিশ প্রশাসনে? কাজে কর্মীদের উৎসাহ সৃষ্টি করতে পেরেছে কি? পেরেছে কি তাদের মধ্যে অসততার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে? তার চাইতেও বড় কথা, ডিপার্টমেন্টের প্রতি এর কর্মীদের ভালোবাসা সৃষ্টি করাতে পেরেছে কি?

রুদ্র নিজের কাছেই নিজে একের পর এক প্রশ্নগুলো করে যায়। কিন্তু জবাব যা পায় তাতে তেমন উৎসাহবোধ করে না। প্রায় সবগুলো জবাবই নেতিবাচক। তা'হলে আর এত কষ্ট করে ভস্মে ঘি ঢেলে লাভ কি?

ভস্মে ঘি! একি বলছে রুদ্র? সেকি তবে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে? না, কখনই নয়। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে বাহিনীর প্রতিটি কর্মীর বিবেকের কাছে সে আবেদন জানিয়ে চলেছে। এই আবেদন কখনও পুরোপুরি ব্যর্থ হতে পারে না। এই করে একজন—মাত্র একজন কর্মীর বিবেককেই যদি সে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয় তা'হলেই সে নিজের প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করবে।

শরীর ভালো ছিল না বলে সেদিন বিকেলের দিকে আর পুলিশ অফিসে যায় নি রুদ্র। দোতলার এই বারান্দায় বসে এমনি ধরনের কথাই সে ভাবছিল। হঠাৎ ভেতরে টেলিফোন বেজে ওঠে। রুদ্র উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে সেই মহকুমা থানার ও-সি শেখর দত্তর ত্রস্ত কণ্ঠস্বর—স্যার, ভয়ানক ঝামেলা বেঁধেছে এখানে। দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভয়ঙ্কর মারামারি, বোমাবাজি। পাইপগানও ব্যবহার হয়েছে। খবর পেয়ে ফোর্স নিয়ে ছুটে যেতেই ছোট দলটি সরে পড়লেও বড় দল আমাদের ওপরই হামলা শুরু করলে। ইন্‌জিওর্ড হলো তিনজন কনস্টেবল। বোমার টুকরোয় আমার নিজের হাতও খানিকটা কেটে গেল। লাঠি ও গ্যাস চালিয়েও

যখন কিছু হলো না তখন বাধ্য হয়েই রিভলবার থেকে দু'রাউণ্ড গুলি চালিয়ে অবস্থা আয়ত্বে আনলাম।

—মারা গেছে কেউ? উত্তেজিত কণ্ঠস্বর রুদ্রর।

—না স্যার, দু'টো গুলিই দু'জনের পায়ে লেগেছে। হাসপাতালে পাঠিয়েছি তাদের। সেই সঙ্গে বোমা ও পাইপগানে আহত আরও দু'জন। তবে ইন্‌জিওর্ডের মধ্যে একজন ঐ দলের একটু নেতা গোছের। আগে ছিল মস্তান, এখন ছোটখাটো একজন নেতা।

—এ্যারেস্ট হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার, বারোজন।

—সবাই ঐ দলের?

—হ্যাঁ স্যার, অন্য ছোট দলটি তো আগেই সরে পড়েছিল।

—তারপর? চিন্তিত কণ্ঠস্বর রুদ্রর।

অপর প্রান্ত থেকে তেমনি ত্রস্ত কণ্ঠে বলতে থাকে শেখর দত্ত, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শ'পাঁচেক লোকের একটা দল এসে থানা ঘেরাও করলে। ওদের দাবী, যাদের ধরা হয়েছে তাদের এখনই ছেড়ে দিতে হবে, আর এস্‌-পি'কে এখনই এসে দোষী পুলিশদের শাস্তি দিতে হবে।

একটু সময় চিন্তা করে রুদ্র। তারপর বললে, ঠিক আছে, ওরা যেমন আছে, তেমনি থাকুক। ফারদার কোন এ্যাক্‌শান নেবেন না। তবে লক্ষ্য রাখুন, থানার মধ্যে যেন ওরা ঢুকতে না পারে। আমি এখনই রওনা হচ্ছি।

জেলা সদর থেকে মহকুমা থানা গাড়িতে আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের পথ। আগে আগে চলেছে পুলিশ সাহেব রুদ্রর জিপ, পেছনে আর একটা ওয়েপন ক্যারিয়ার গাড়িতে এ্যাডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রী ও ফোর্স।

রুদ্রর মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা। যা দিনকাল তাতে সিচুয়েশন যে কোন মুহূর্তে খারাপ হয়ে উঠতে পারে। শেখর দত্তর কণ্ঠস্বরে মনে হলো লোকটি বেশ ঘাবড়ে গেছে। একে তো ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিং মাথার ওপর ঝুলছে, তার ওপর আবার এই ফায়ারিং। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে? প্রমোশনের শেষ আশাটুকুও হয়তো নির্মূল হয়ে যাবে।

বাস্তবিক, শেখর দত্তর মত অফিসারের প্রমোশন না হলে সেটাকে একটা বড়রকম অন্যায় বলে মনে হবে না রুদ্রর। ঐ লোকটির এমনি একটা কিছু শাস্তিই প্রয়োজন। ডিপার্টমেণ্টের এ ধরনের ব্ল্যাক্‌শিপগুলো যতই কোন্‌ঠাসা হবে ততই ডিপার্টমেণ্টের মঙ্গল।

ঘেরাও—গণপ্রতিবাদ। আগে এটা সীমাবদ্ধ ছিল স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারিতে। এখন এসে ঠেকেছে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু থানায়। ভবিষ্যতে হয়তো এটা গিয়ে হাজির হবে খোদ গভর্নর হাউসে। তবে সেখানে আছে বারোমাসের একশ' চুয়াল্লিশ ধারা, এই যা ভরসা। কি হাল হয়েছে দেশের প্রশাসনের! এই মুহূর্তে কোথাও কোন খুন-জখম, ডাকাতি-রাহাজানি হলেও সেখানে ছুটে যাবার সাধ্য নেই পুলিশের। তারা তখন ঘেরাও হয়ে রয়েছে একদল গণতান্ত্রিক মানুষের হাতে।

রুদ্র থানায় এসে দেখলে, রাজনৈতিক দাদারা ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন আসরে। বাইরে ঘেরাওকারীদের আস্ফালন—যাদের ধরা হয়েছে তাদের তো ছেড়ে দিতেই হবে, সেই সঙ্গে এখনই শাস্তি দিতে হবে থানার ও-সিকে।

পুলিশ সাহেবকে দেখে ঘেরাওকারীদের উৎসাহ আরও বেড়ে উঠলো। রুদ্র ও প্রকাশ শাস্ত্রী তাদের নেতাদের অনেক করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঘেরাও তুলে নেবার জন্যে অনুরোধ করলে। এমনকি ধৃতদের ছেড়েও দিতে চাইলে জামিনে, কিন্তু তাতে ভবি ভোলবার নয়। তাদের দাবী—এখনই শাস্তি দিতে হবে ও-সিকে। এই মুহূর্তে।

ও-সি শেখর দত্ত তখন থানার এককোণে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। মুখখানা ম্লান, হাতে ব্যাণ্ডেজ। থানার অন্যান্য অফিসারেরাও বিরসমুখে যে যার আসনে বসে আছে চুপটি করে। থানায় এ-ধরনের ঘেরাওয়ের অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম।

অবশেষে নিরুপায় রুদ্র জেলা শাসককে টেলিফোন করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে ওঠে ঝন্ ঝন্ শব্দে।

রুদ্র টেলিফোন ধরে নিজের পরিচয় দিতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে রাজ্যের খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারি কণ্ঠস্বর—আপনারা সব পেয়েছেন কি? একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপনারা গুলি চালিয়ে আমাদের দলের কতগুলো ছেলেকে হাসপাতালে পাঠালেন!

রুদ্র তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, না স্যার, আপনি কি রিপোর্ট পেয়েছেন জানি না, তবে ঘটনাটা মোটেই সামান্য ছিল না। বোমাবাজি, পাইপগান ছোঁড়াছুঁড়ি প্রভৃতি অনেক কিছুই হয়েছে। লাঠি ও টিয়ারগ্যাসে যখন কাজ হলো না তখনই বাধ্য হয়ে—

রুদ্রর কথা শেষ হবার আগেই অপর প্রান্তের সেই ভারি কণ্ঠস্বর—ওটা তো আপনাদের বাঁধা বুলি, মশাই। গুলি চালালেই আপনারা বাধ্য হয়ে চালান।

রুদ্র মনে মনে বললে, একটা ভয়ানক সিচুয়েশন ট্যাক্‌ল করা, আর পরে শান্ত পরিবেশে তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার মধ্যে অনেক তফাৎ। প্রথমটা যতখানি শক্ত, দ্বিতীয়টা ঠিক ততখানি সহজ।

রুদ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে মন্ত্রী আবার বললেন, আপনাদের আই. জি. পি'কে কনট্যাক্ট করতে না পেরে সরাসরি আপনাকেই বলছি। আপনার থানার ঐ ও-সি'টি মোস্ট্ ট্যাক্ট্‌লেস অফিসার। তা'ছাড়া, তার উদ্দেশ্যও খারাপ, নইলে গুলিতে কেবল আমাদের দলেরই দু'টো ছেলে ইন্‌জিওর্ড হলো! ধরাও পড়লো কেবল তারাই!

জবাবে রুদ্র বললে, অন্য দলটি তো পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিল, স্যার।

—হ্যাঁ, তাদের পালাতে দিয়ে আমাদের ছেলেগুলোর ওপর হামলা করেছে আপনার সেই ও-সি।

– ঠিক তা' নয় স্যার, মন্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করে রুদ্র, সবকিছু দেখেশুনে আমি বুঝতে পেরেছি সেই মুহূর্তে ও-সি গুলি চালিয়ে সিচুয়েশন কণ্ট্রোল না করলে হাঙ্গামা আরও ছড়িয়ে পড়তো। আমি নিজে হলেও সেই মুহূর্তে তাই করতাম, স্যার।

—নো – নো, বলতে থাকে মন্ত্রী, আই ক্যাণ্ট্ এ্যাক্‌সেপ্ট ইওর আরগুমেণ্ট। আমার দলের ছেলেরা যে থানা ঘেরাও করে ঠিক কাজ করেছে একথা আমি বলছি না। এমনিভাবে থানা ঘেরাও করে রাখা ঠিক নয়। আমি ওদের বলেছি এখনই থানা ঘেরাওমুক্ত করে চলে যেতে। বাট্ দ্যাট্ ও-সি মাস্ট বি পানিশ্‌ড। ওকে আপনি এখনই সাস্‌পেণ্ড করুন।

জবাবে বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে রুদ্র, অফিসারটির দোষ প্রমাণিত হলো না। তার আগেই তাকে সাস্‌পেণ্ড করতে বলছেন, স্যার?

– হ্যাঁ, শুনতে পেলাম ঐ অফিসারটির রেপুটেশন নাকি ভালো নয়।

—তা' হতে পারে স্যার, তবে এই ব্যাপারে সে কোন অন্যায় করেছে বলে তো মনে করতে পারছি না।

এবার রেগে উঠে মন্ত্রী বললেন, ডু হোয়াট আই সে।

তবুও অনুনয়ের স্বরে রুদ্র বলতে থাকে, আপনি আর একবার ভেবে দেখুন, স্যার। এমনিভাবে একজন অফিসারকে সাস্‌পেণ্ড করলে গোটা ফোর্স যে ডিমরালাইজ্‌ড হয়ে পড়বে।

রুদ্র যখন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিল, ও-সি শেখর দত্ত তখন একদৃষ্টে

তাকিয়েছিল তার দিকে। সেই মুহূর্তে তার মনে কি হচ্ছিল তা' একমাত্র সে নিজেই জানে।

রুদ্রকে চুপ্ করে থাকতে দেখে কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নরম করে মন্ত্রী আবার বললেন, কি ভাবছেন এত? যা বলছি করুন। ও-সি'কে সাস্‌পেণ্ড করলেই যদি জনতা শান্ত হয় তাতে আপনার এত আপত্তি কেন? বি ট্যাক্ট্‌ফুল।

মন্ত্রীর কথায় রুদ্র মনে মনে বলে, এই করেই তো আজ প্রশাসনের এই অবস্থা। একালের প্রশাসন ট্যাক্ট্‌ফুল আখ্যা লাভ করে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে। কিন্তু তাতে যে মানুষ প্রশাসনের ওপর আস্থা হারায় এটা তারা বোঝে না।

অনুনয় বিনয় করে মন্ত্রীকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে রুদ্র অপেক্ষাকৃত দৃঢ় কণ্ঠে বলতে থাকে, স্যার, এই জেলায় পুলিশ ফোর্সের পরিচালক আমি। বাহিনীর ভালো-মন্দের জন্যেও আমিই দায়ী। একদল মানুষের আবদার রাখতে গিয়ে একজন অফিসারকে এখনই সাস্‌পেণ্ড করে আমি ট্যাক্ট্‌ফুল হতে চাই না, স্যার। তার চাইতে ট্যাক্টলেস হওয়াই ভালো। আমার পক্ষে এই মুহূর্তে ও-সি'কে সাস্‌পেণ্ড করা সম্ভব নয়। এক্স্‌কিউজ মি, স্যার। আপনি মিনিস্টার, আর আমি একজন কর্মচারী। আপনার হুকুম মানতে যখন আমি অক্ষম তখন আমাকেই আপনি সাস্‌পেণ্ড করুন, স্যার।

একজন সামান্য এস-পি'র কাছ থেকে এ ধরনের কথা বোধহয় আশা করেননি মন্ত্রী। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, এ আপনি কী বলছেন?

—ইয়েস স্যার, তেমনই দৃঢ় স্বরে বলতে থাকে রুদ্র, আমাকে আগে সাস্‌পেণ্ড না করে ও-সি'কে সাস্‌পেণ্ড করতে পারবেন না। আপনার হুকুম মানতে আমি বাধ্য, কিন্তু অন্যায় হুকুম নয়। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, স্যার।

কথা শেষ করেই রুদ্র বুঝতে পারে মন্ত্রী সশব্দে টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। একজন এস-পি'র বেয়াদপি সম্ভবত তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

রুদ্র হাতের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চিন্তিত মুখে ঘুরে বসতেই শেখর দত্ত হঠাৎ ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার পায়ের ওপর।

অপ্রস্তুত রুদ্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে শেখর দত্তকে হাত ধরে তুলে বললে, এ কি করছেন শেখরবাবু, এমনিভাবে ছোট করছেন কেন নিজেকে?

জাঁদরেল অফিসার শেখর দত্ত তখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। আবেগে তার শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। রুদ্ধ কণ্ঠে কি যেন সে বলতে যায়, কিন্তু কিছুই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না।

রুদ্র তার একখানি হাত ধরে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, বি ব্রেভ, শেখরবাবু—বি ব্রেভ। অন্যায় যেমন করবেন না, তেমনি তা' সহ্যও করবেন না। মনে রাখবেন মানুষের জীবনে চাকরিটাই শেষ কথা নয়।

পুলিশ সাহেব রুদ্রর কাছে পরের দিনই এলো সরকারী হুকুম। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই জেলার চার্জ এ্যাডিশনাল এস-পি প্রকাশ শাস্ত্রীকে দিয়ে অন্যত্র বদলী হবার জন্যে তাকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

সারা জেলায় পুলিশ মহলে দাবানলের চাইতেও তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ সাহেব রুদ্রর বদলীর কথা। খবরটা শুনে কেউ খুশি হয়, কেউ অখুশি। কেউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, কেউ আড়ালে চোখ মোছে। তবে একথা সবাই বুঝতে পারে যে, রুদ্রর ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে গেল। কোথায় তাকে বদলী করা হলো সে হুকুম যদিও তখনও আসে নি, তবে সবাই প্রায় নিশ্চিৎ যে তাকে কোন গুরুত্বহীন জায়গায় পাঠানো হবে অথবা কোন পানিশমেণ্ট পোস্টিং দেওয়া হবে।

রুদ্রর নিজের ধারণাও তেমনি। খোদ্ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুকুম সে অমান্য করেছে, কাজেই এর ফল পেতেই হবে তাকে। মনে মনে প্রস্তুত হয় রুদ্র। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে সুস্মিতা বৌদির কথা। নিজের মনে বলে, আপনার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেও কর্তাদের বিরাগভাজন হবার হাত এড়াতে পারলাম না, বৌদি।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল রুদ্রর পোস্টিং অর্ডার। রুদ্র তখন তার বাংলোয়। হঠাৎ প্রকাশ শাস্ত্রী জিপ থেকে নেমে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে প্রবেশ করে রুদ্রর বাংলোয়। হাতে তার রুদ্রর পোস্টিং অর্ডার।

কাগজখানা রুদ্রর হাতে দিয়ে সে বলে ওঠে, দু'তিন বার চেষ্টা করেও টেলিফোনে আপনাকে ধরতে না পেরে শেষে নিজেই চলে এলাম, স্যার। কী তাজ্জব ব্যাপার! ব্যাড্ পোস্টিংয়ের বদলে একেবারে অভাবনীয় পোস্টিং, স্যার—কলকাতার ডি-সি, সাউথ। পানিশমেণ্টের বদলে যে রিওয়ার্ড!

কাগজখানার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয় রুদ্র। ঠিকই তাই। দক্ষিণ কলকাতার ডেপুটি কমিশনার হিসেবে তাকে জয়েন করতে হবে।

প্রকাশ শাস্ত্রী চলে যায়। রুদ্র একা বসে বসে ভাবতে থাকে, এরকম হলো কেন? তবে কি তার এই পোস্টিংয়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকার কোনরকম হাত ছিল? প্রকাশ শাস্ত্রী যা-ই বলুক না কেন, কলকাতার ডি-সি হওয়াকে রুদ্র কোন রিওয়ার্ড বলে মনে করে না। চাকরি চাকরিই। তা' সে যেখানেই হোক না কেন। তবে শেষ পর্যন্ত যে তাকে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের বাইরে ঠেলে দেয় নি, এই যথেষ্ট। পুলিশ কর্মীদের মধ্যে কাজ করার সুযোগ আরও কিছুদিন পাওয়া গেল।

রুদ্রকে চুপ্ করে বসে থাকতে দেখে হাসি মুখ করে বীরবাহাদুর সামনে এসে দাঁড়ায়। রুদ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই বীরবাহাদুর তার ছোট চোখ জোড়া আরও ছোট করে হেসে বললে, কাল সকালেই তো সাব, আমরা কলকাতায় চলে যাবো?

—কে বললে তোকে যে আমবা কলকাতায় যাচ্ছি? প্রশ্ন করে রুদ্র।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় বীরবাহাদুর, শাস্ত্রীসাব তো তাই বলে গেল। আপনি তো সাব, কলকাত্তার ডি-সি হয়েছেন।

—ও, খবরটা তোরও কানে গেছে?

বীরবাহাদুর সে কথার জবাব না দিয়ে একটু সময় চুপ্ করে থাকে। তারপর আবার হেসে বলে ওঠে, মেমসাহেব আপনাকে নিজের কাছে লিয়ে যাচ্ছেন, সাব।

—কী বলছিস তুই? ভ্রূ-কুঞ্চিত রুদ্র জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ সাব, জবাব দেয় বীরবাহাদুর, মেমসাহেব তো বালিগঞ্জ থাকেন! আপনি তো ঐ এলাকারই ডি-সি।

অশিক্ষিত নেপালী যুবক বীরবাহাদুর তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে কথাটা বললেও এতক্ষণে রুদ্রর খেয়াল হয় যে নবনীতাদের বালিগঞ্জেব বাড়িটা ডি-সি, সাউথের এলাকারই মধ্যে। কথাটা মনে হতেই সেই এয়ারপোর্টে দেখা নবনীতার শান্ত মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায় মনের মধ্যে। স্বপ্নবিধুর হয়ে ওঠে তার চোখ দুটো। নবনীতার সঙ্গে তার ব্যবধান দূর করে দেবার কোন পরিকল্পনা নাকি এটা? কিন্তু, কার পরিকল্পনা? কোন অদৃশ্য শক্তির, নাকি রাষ্ট্রমন্ত্রী অলকা মজুমদারের? তাই বুঝি একটা জেলার পুলিশ সাহেব থেকে কলকাতার ডি-সি, সাউথ! কিন্তু কেন? কী লাভ এতে অলকার?

সেইদিন বিকেলেই রুদ্রর ফেয়ারওয়েল মিটিং। মাত্র কয়েক ঘণ্টার

নোটীশে মিটিংয়ের ব্যবস্থা হলেও সেদিন সভায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। পুলিশ কর্মী ছাড়া জেলার প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত অন্য ডিপার্টমেণ্টের অনেকেও এসে হাজির হয়েছিলেন।

যথারীতি গুণগান, বক্তৃতা প্রভৃতির পরে কিছু বলতে উঠে রুদ্র পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশে কেবল একটা কথাই সেদিন বলেছিল, ভালোবাসুন—ডিপার্টমেণ্টকে ভালোবাসুন। দেশকে ভালোবাসা যতখানি কর্তব্য, ডিপার্টমেণ্টকে ভালোবাসাও ঠিক ততখানি। দেশ যদি হয় জীবন-ধাত্রী, তবে ডিপার্টমেণ্ট জীবন-দাত্রী। সেই জীবন-দাত্রীকে গ্লানি ও অপমান থেকে নিজের মায়ের মতই বাঁচান। সেই মায়ের চোখের জল মুছিয়ে তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন। অভাগিনী সেই মায়ের আপনারাই যে একমাত্র সন্তান।

, দীর্ঘ চারমাস পরে পুলিশ সাহেব রুদ্রর জিপখানা এসে দাঁড়ায় সুস্মিতার বাড়ির সামনে। এখনও সে এই জেলার এস-পি। পরের দিন সকাল আটটায় প্রকাশ শাস্ত্রীকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সে চলে যাবে।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দূরে কোথায় যেন জেগে ওঠে শাঁখের আওয়াজ, মফঃস্বল সহরের আনাচে কানাচে সন্ধ্যা-বন্দনার এই শব্দ এখনও মাঝে-মধ্যে শোনা যায়।

রুদ্র দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে যে ব্যক্তি সামনে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে প্রথমটায় চমকে ওঠে রুদ্র। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গালপাট্টা দাড়ি। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা এক মাথা এলোমেলো চুল, চোখে হাইপাওয়ার লেন্সের চশমা।

আবছা অন্ধকারে রুদ্র প্রথমটায় লোকটিকে চিনতে না পারলেও দীপক কিন্তু চিনতে পারে রুদ্রকে। দু'পা এগিয়ে গিয়ে রুদ্রকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে, আরে রুদ্র যে! আয়, আয়—ভেতরে আয়। আমি জানতাম যে তুই আসবি। এই জেলা ছেড়ে যাবার আগে অন্ততঃ একটিবার তোর বৌদির সঙ্গে দেখা করে যাবি। আজ সারাদিন ধরে সেই কথাই তো তোর বৌদিকে বোঝাচ্ছিলাম।

দীপকের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রুদ্র বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তুমি জেল থেকে ছাড়া পেলে কবে, দীপকদা?

—এই ছাখো, স্বাভাবসিদ্ধ কণ্ঠে হেসে উঠে বলতে থাকে দীপক, তুই তো এখনও এই জেলার পুলিশ সাহেব। আর, তুই নিজেই জানিস না যে তোর এলাকার একটা ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল ছাড়া পেয়ে সহরে ফিরে আসছে? এই

হচ্ছে তোদের এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন ! আবার তোরাই কিন্তু এস্‌কর্ট করে আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছিস।

—সেকি, বিস্ময়ের ঘোর কাটে না রুদ্রর। বলতে থাকে সে, জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ, অথচ পুলিশ এস্‌কর্ট কেন ?

তেমনি হাসতে হাসতে দীপক বললে, কে বলেছে ছাড়া পেয়েছি ? এমন ভয়ানক লোককে ছেড়ে দিয়ে কি তোদের সরকার কখনও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে ? প্যারোলে ছেড়েছে—এক মাসের জন্যে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছি। আবার সুড় সুড় করে সেই খাঁচায় গিয়ে ঢুকতে হবে।

একটু সময় চুপ করে থাকে রুদ্র। সরকার থেকে দীপকদার প্যারোলে মুক্তির হুকুমনামাটা তার হাতে পড়েনি। সম্ভবত প্রকাশ শাস্ত্রী ওটার ওপর এ্যাক্‌শন নিয়ে এস্‌কর্টের ব্যবস্থা করেছিল।

রুদ্র সেকথা দীপককে বলতেই দীপক তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে আবার বলে ওঠে, তাই হয়তো হবে। তা'ছাড়া, তুই তো হচ্ছিস এখন সেটিং সান্—অস্তগামী সূর্য। জেলা ছেড়ে যখন চলেই যাচ্ছিস তখন আর সব কিছুতে তোকে টেনে আনা কেন ? যাক গে, পরশু সকালে এসেছি। সরকাবের কাছে অঙ্গীকার করে এসেছি যে এই একটা মাস কোন রাজনৈতিক কাজের মধ্যে থাকবো না, তোদেব চোখে ধুলো দিয়ে পালাবো না ইত্যাদি। বলেই আবাব হেসে ওঠে দীপক।

—এখানে এসেই আমার বদলির খবর কার কাছে পেলে, দীপকদা ?

—আমি পাবো কেমন করে ? তোর বৌদিই দেখছি বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোর সব খবর রাখে।

দীপকদার কথায় কেমন যেন খট্‌কা লাগে রুদ্রর। কৌতূহলী স্বরে সে জিজ্ঞেস করে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে মানে ? বৌদি কোথায় ? কী হয়েছে তার ?

—ওহো—তুই বুঝি জানিস না ? বলতে থাকে দীপক, তা' তুই জানবিই বা কেমন করে। অনেকদিন তো এদিকে আসিস নি। আয়, পাশের ঘরে আয়।

দীপক কথাগুলো খুব সাধারণভাবে বললেও রুদ্রর বুকটা কেন যেন ধ্বক্‌ করে ওঠে। কী হয়েছে স্মিতা বৌদির ?

পাশের ঘরের দরজা দিয়ে আর ভেতরে ঢুকতে পারে না রুদ্র। দরজার চৌকাঠ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা প্রবল কান্নার স্রোত তার বুকের হৃদপিণ্ডটাকে ঠেলে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে রয়েছে তার স্মিতা বৌদি। দেখে আর চিনবার উপায় নেই তাকে। সরু

হাতের কব্জিতে কেবল ঢলঢলে একজোড়া শাঁখা। একরাশ রুক্ষ চুলের মাঝখানে তার শুকিয়ে ওঠা সুন্দর মুখখানি স্থির হয়ে রয়েছে। টানা টানা চোখ দুটি ঢুকে গেছে গর্তে। কেবল চোখের সেই দৃষ্টিটুকুই রয়েছে অপরিবর্তিত। ক্লান্তির কোন চিহ্নই নেই সেখানে। সেই আগের মতই স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি।

রুদ্রকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুস্মিতার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফিস্ ফিস্ করে সে বললে, এসো—এসো ঠাকুরপো। ভেতরে এসো।

হঠাৎ রুদ্র ঘরের ভেতর ঢুকেই দীপকের একটা হাত চেপে ধরে রুদ্ধ আবেগে বলতে থাকে, বলো দীপকদা, কী হয়েছে বৌদির, বলো? এই ক'টা মাসের মধ্যে এমন হলো কেন?

রুদ্রর কথায় দীপকের মুখের ওপর একটু ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ে। রুদ্রব কাঁধে একটা হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে সে বলতে থাকে, নার্ভাস হচ্ছিস কেন, রুদ্র? এই তো জীবন। এই কঠিন জীবনের মুখোমুখি তো প্রত্যেককেই একদিন দাঁড়াতে হবে। এ তো কেবল দেখছিস একটি মানুষের জীবনে মৃত্যুর পদধ্বনি। সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন এমনিভাবে একটা গোটা সমাজের মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাবি। সেদিন—

কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ থেমে যায় দীপক। সুস্মিতার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে রুদ্রকে আবাব বলতে থাকে, ক্যান্সার। প্রথমদিকে অবহেলা করেছে, ধরা পড়েনি। যখন ধরা পড়লো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অবিকল এদেশের সমাজ জীবনের ক্যান্সারের মত। এখন আর কোন উপায় নেই। চিকিৎসার বাইরে।

রুদ্রর মনে পড়লো সুস্মিতা বৌদির সেই সর্দি-কাশির কথা। সেবার সে তার গলায় মাফলার জড়ানো দেখেছিল। সেই বোধহয় শুরু। তাবপব চলছে অবহেলা। হয়তো বা আর্থিক অনটন, কিম্বা হয়তো দেখাশোনার লোকের অভাব। সেই মুহূর্তে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করে রুদ্র। সে নিজে যদি নিয়মিত এখানে যাওয়া-আসা করতো তা'হলে হয়তো চিকিৎসার একটা কিছু ব্যবস্থা হতো। কিন্তু কিছুই আর হলো না। অকালে নিঃশব্দে ঝরে পডতে চলেছে একটি জীবন। কিছুই আর করার নেই।

সুস্মিতার শিয়রের দিকে এগিয়ে যায় রুদ্র। সুস্মিতা স্নিগ্ধ চোখে তাকায় তার দিকে। নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে রুদ্র ধরা গলায় বললে, এমনিভাবে তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে ফেললে কেন, বৌদি?

সুস্মিতা কোন জবাব দেয় না, কেবল একটু ম্লান হাসে।

রুদ্র আবার বললে, কাল সকালেই আমি বদলি হয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি, বৌদি।

রুদ্রর কথায় স্মিতার ম্লান মুখখানা আরও একটু ম্লান হয়ে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে সে। তারপর মৃদু কণ্ঠে টেনে টেনে বললে, আমার একটা কথা রাখবে, ঠাকুরপো ?

জবাব দেয় রুদ্র, সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয়ই রাখবো, বৌদি। বলো।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে স্মিতা। তারপর বলতে থাকে, যে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তুমি তোমার ডিপার্টমেণ্টের কর্মীদের ঘিরে রেখেছো, তা' থেকে একটি মহিলাকে বঞ্চিত রেখো না, ঠাকুরপো। এটা যে তোমার নিজেরই অগৌরব। সংসারে যেমন ভুল-ভ্রান্তি আছে, তেমনি তার সংশোধনের পথও আছে। বৌদির এই কথাটাই কেবল মনে রেখো, ঠাকুরপো।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে ওঠে স্মিতা। ছল ছল চোখ মেলে রুদ্র কেবল তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

ফিরে আসার সময় দীপক রুদ্রর কাঁধে একটা হাত রেখে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললে, তোর বৌদি তো চললো। আমিও থাকবো কিনা জানি না। মেয়েটা রইলো তার মাসীর কাছে। সম্ভব হলে তার একটু খোঁজ খবর রাখিস।

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রুদ্র, কেন দীপকদা, তুমি আবার কোথায় চললে ? জেলে ফিরে যাবে না ?

—নিশ্চয়ই যাবো। দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে দীপক, তোদের সরকারকে যখন কথা দিয়েছি তখন নিশ্চয়ই ফিরে যাবো। তবে ফিরে গেলেই যে বেঁচে থাকবো তা' কি নিশ্চয় করে বলা যায় ? এমনও তো হতে পারে যে, জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে তোর হাতেই একদিন গুলি খেয়ে মরবো। কথাটা বলেই দীপক হালকা মেজাজে হেসে ওঠে।

রুদ্র কিন্তু হাসতে পারে না। দীপকের চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ্ করে থাকে। তারপর বললে, এমন গোয়ার্তুমি করতে যেও না, দীপকদা।

কথাটা বলেই রুদ্র আর দেরি না করে অপেক্ষমান জিপে গিয়ে উঠে বসে। এখান থেকে তার বাংলো মিনিট দশেকের পথ। এই পথটুকু যেতে যেতে কেবল স্মিতা বৌদির মুখখানাই তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

গভীর রাত। গরমে ঘুম আসছিল না রুদ্রর। পাখার হাওয়াও আগুন বলে মনে হচ্ছিল। দরজা খুলে তার সেই প্রিয় বারান্দায় ইজিচেয়ারে এসে বসে সে। সামনে অন্ধকারের মধ্যে কেবল মিটমিটে রাস্তার আলো। নির্জন

রাস্তা-ঘাট। দু'একটা কুকুরের ডাক ছাড়া আর কোন সাড়া-শব্দ নেই কোথাও।

রুদ্রর মাথার মধ্যে হাজার রকম চিন্তা। একটার পর একটা চিন্তা তার মাথার স্নায়ুতন্ত্রীকে নাড়া দিয়েই সরে পড়ে। স্থির হয়ে কিছুই যেন ভাবতে ভালো লাগে না সেই মুহূর্তে।

সহসা আকাশের দিকে তাকায় রুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারা পাল্টে যায় তার। মাথার ওপর সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত ঋষি একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে স্থির হয়ে আছেন। রুদ্র জানে না, এই সাত ঋষি অনন্তকাল ধরে কী প্রশ্ন রেখে চলেছেন মর্তের মানুষের কাছে। কি-ই বা তার উত্তর?

হঠাৎ আকাশের কালপুরুষের দিকে নজর পড়তেই রুদ্রর চিন্তা বইতে শুরু করে ভিন্ন খাতে। ইনিই তো জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সদাজাগ্রত প্রহরী। হাতে তাঁর ধনুক, কোমরে ঝুলছে তরবারি, আর পায়ের কাছের তারা দু'টি যেন কালপুরুষের দুটি কুকুর—লুব্ধক ও সরমা। কালপুরুষের মুখে শক্তির দম্ভ নেই, আছে ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রতেজ। এই তেজই সে লক্ষ্য করেছিল মাউণ্ট আবুর দিলওয়াড়া মন্দিরের সেই পাথরের ভৈরব মূর্তির চোখে-মুখে। তারও সঙ্গে ছিল একটি কুকুর ঐ কালপুরুষেরই কুকুরের মত।

মাথার ওপর কালপুরুষের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঐ কালপুরুষের সঙ্গেই একসময় নিজেকে মিশিয়ে দেয় রুদ্র। অনন্তকাল ধরে কালপুরুষের নক্ষত্রমণ্ডলীকে পাহারা দেবার মত সে নিজেও যেন মানুষের সমাজ সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকে সমাজ প্রহরী পুলিশ বাহিনীর একজন হয়ে যুগের পর যুগ অতিক্রম করে চলেছে। এ চলার যেন শেষ নেই। মানুষের সমাজ ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, এই পুলিশ বাহিনীও থাকবে ততদিন; আর তার সঙ্গেই মিশে থাকবে দেশ-কালের গণ্ডী পার-হওয়া অনাগত ভবিষ্যতের আর কোন্ এক রুদ্রদেব।

হঠাৎ কে যেন ডেকে ওঠে রুদ্রকে, দাদু—দাদুভাই!

চমকে ফিরে তাকায় রুদ্র। সেকালের ঘুসখোর দারোগা সোমেশ্বর—একালের পুলিশ সাহেব রুদ্রদেবের ঠাকুর্দা সোমেশ্বর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। তাঁর চোখের জলের প্রতিটি ফোঁটার মধ্যে চক্‌চক করছে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা।

—দাদু—দাদুভাই!

আবার ডাকেন সোমেশ্বর। কান্নার দমকে তাঁর কণ্ঠস্বর বুজে আসছে। সোমেশ্বরকে কাঁদতে দেখে রুদ্রর চোখেও জল এসে পড়ে। নিজেকে সামলে

নিয়ে সে সাড়া দেয়, এই তো—এই তো আমি, দাদু।

বলতে থাকেন বৃদ্ধ সোমেশ্বর, শোন্ দাদুভাই, আজ তোর কাছে নিজেকে মেলে ধরবো। ছেলের কাছে যা পারিনি, নাতির কাছে তা হয়তো পারবো।

রুদ্র ছল্ ছল্ চোখে কেবল তাকিয়ে থাকে তার সেই পিতামহের দিকে।

সোমেশ্বর তখনও অঝোরে কেঁদে চলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে নিজের শীর্ণ আঙুল দিয়ে দূরে নির্দেশ করে বলে ওঠেন, তাকিয়ে দেখ তো দাদুভাই, ওকে তুই চিনতে পারিস কিনা?

চোখ ফিরিয়ে তাকায় রুদ্রদেব। দূরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নারীমূর্তি। সম্পূর্ণ নগ্ন। ক্ষতবিক্ষত তার স্বর্ণাভ দেহ। সেই ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা, আর হাজার হাজার রক্তলোলুপ কীটপতঙ্গ উন্মত্তের মত পান করে চলেছে সেই মাতৃরক্ত। কিন্তু আশ্চর্য সেই নারীমূর্তির চোখের দৃষ্টি। ব্যথা-বেদনায় তার অপূর্ব সুন্দর মুখখানি যখন ম্লান হয়ে উঠেছে তখনও কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে এক স্বর্গীয় করুণাধারা। দেহযন্ত্রণা বিস্মৃত সেই নারীমূর্তি যেন আপন মনে এই মহাবিশ্বের মহাকবির কাছে আপন সন্তানের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে—

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

বিশ্বাস—আত্মবিশ্বাস, এই কঠিন সংসারে আপন সন্তানদের মনে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাই যেন কামনা করে চলেছে সেই নারীমূর্তি।

সেই সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা চিৎকার করে ওঠে রুদ্র, কে—কে—কে এই নারী?

জবাব দেন সোমেশ্বর, মা।

—কার মা?

—তোর—আমার—আমাদের অনেকের।

—দেশজননী?

কান্নাভেজা কণ্ঠে জবাব দেন সোমেশ্বর, না দাদুভাই, দেশজননী নয়। তবে তার চাইতে কোন অংশে খাটোও নয়। বলতে পারিস্ তোর আমার মত

হাজার হাজার পুলিশ কর্মীর বিভাগীয় জননী।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্রদেব। এতক্ষণে যেন সে চিনতে পেরেছে ঐ নারীমূর্তিকে। সেই সঙ্গে যেন বুঝতে পেরেছে ঐ রক্তলোলুপ কীটপতঙ্গগুলোর স্বরূপ। জানতে পেরেছে কেন ঐ মূর্তির স্বর্ণাভ দেহ এমন ক্ষতবিক্ষত।

নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অভিভূত রুদ্রদেব ঐ মূর্তির সঙ্গে নিজের কেমন যেন এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভব করতে থাকে। সেই সম্পর্ক যেন এক জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের। মানুষের সমাজ সৃষ্টির সেই আদিযুগে সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন যেদিন প্রথম অনুভূত হয়েছিল, সেই দিনটি থেকেই যেন এই নারীমূর্তির সঙ্গে তার পরিচয়।

সহসা নড়ে ওঠে সেই নারীমূর্তির ঠোঁট দু'খানা। বেদনাময় অসহায় কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি—শেষ কোথায়—শেষ কোথায়—শেষ কোথায়?

চারিদিক নিস্তব্ধ। কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর? কে দিতে পারে? কে শোনাবে এই অসহায় নারীকে আশার বাণী?

আবার সেই নারীর কান্নাঝরা কণ্ঠস্বর—শেষ কোথায়—শেষ কোথায়—শেষ কোথায়?

চমকে ওঠে রুদ্রদেব। এ প্রশ্নের জবাব যে তাকেই দিতে হবে। হঠাৎ দু'হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে ওঠে রুদ্র—আছে—আছে, এর শেষ আছে, মা। আমি বিশ্বাস করি এর শেষ আছে। চিরকাল এরকম চলতে পারে না—না, কিছুতেই না।

সোমেশ্বর কিন্তু তখনও কেঁদে চলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন তিনি, জানিস দাদুভাই, পুলিশ বিভাগের ঐ অভাগিনী জননী আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা সত্ত্বেও কোনদিন ওকে আমি ভালোবাসতে পারিনি।

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় রুদ্রদেব, হ্যাঁ দাদু, জানি।

—জানিস দাদুভাই, ওঁর বুকের স্তন্যধারায় তৃপ্ত না হয়ে ওঁর বুকের মাংস পর্যন্ত একদিন আমি কুরে কুরে খেয়েছি?

—হ্যাঁ, জানি।

—ব্যথায় যখন ওঁর ঠোঁটজোড়া নীল হয়ে উঠেছে, যন্ত্রণায় যখন মা আমার কেঁদে উঠেছেন তখনও আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিনি?

—হ্যাঁ, তাও জানি।

—এত জানার পরেও তুই তোর এই হতভাগ্য দাদুকে ঘৃণা করতে পারিস নি?

—না দাদু, জবাব দেয় রুদ্রদেব, কোনদিন তোমাকে ঘৃণা করতে পারবও না। আমি বিশ্বাস করি মানুষ যেমন ভুল করে, তেমনি একদিন সে তার সংশোধনও করে, যেমন পাপ করে, তেমনি তার প্রায়শ্চিত্তও করে।

—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কে করবে, দাদুভাই?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রুদ্রদেব, আমি করবো।

—পারবি? আমি পাপ করেছি, তুই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবি?

—পারতেই হবে দাদু, বলতে থাকে রুদ্রদেব, এক প্রজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো সেই প্রজন্মেই শেষ হয় না।

—কিন্তু তুই একা কতটুকু করতে পারবি, দাদুভাই? তোর ক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ। তোর ডাক শুনে কি কেউ এগিয়ে আসবে?

রুদ্রদেবের মুখের ওপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে এক আশ্চর্য আলোর আভা। আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে সে জবাব দেয়, ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তা'হলে একাই এগিয়ে যেতে হবে, দাদু।

এতক্ষণে সামান্য হাসির রেখা দেখা দেয় বৃদ্ধ সোমেশ্বরের মুখে। চোখে জল, মুখে হাসি, আর দৃষ্টিতে বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাকান আপন বংশধরের দিকে। তারপর প্রত্যয়ের স্বরে বলতে থাকেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ। দাদুভাই, আমি বিশ্বাস করি তুই পারবি—তুই পারবি।

সকালে পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙে যায় রুদ্রদেবের। সারারাত বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়েই সে কাটিয়েছে। রাতের সেই স্বপ্ন তখনও ভারি করে রেখেছে তার মনটাকে।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রুদ্রদেব। মনে পড়ে, এই জেলার পুলিশ সাহেব হিসেবে এটিই তার শেষ সকাল। এরপরে আবার তার সকাল হবে মহানগরী কলকাতায় যেখানে হয়তো একটি নারী কালের গর্ভে·ক্ষোভ ও অভিমানের বোঝা বিসর্জন দিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে রুদ্রদেবেরই অপেক্ষায়।

বারান্দায় রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ায় রুদ্রদেব। তাকিয়ে দেখে, ভোরের সূর্য তখন সবে দেখা দিয়েছে পূব আকাশের কোণে।